হায়াতে তাইয়েবা

শেখ আব্দুল কাদের (সওদাগর মল)
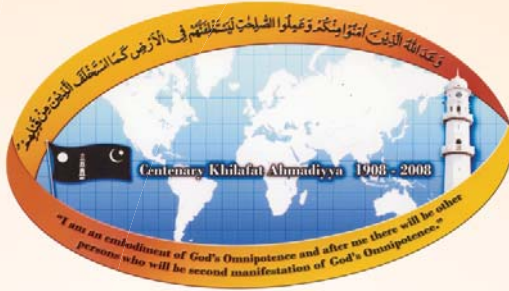
একটি খিলাফত জুবিলী প্রকাশনা

হায়াতে তাইয়েবা

১ ম খন্ড

শেখ আবদুল কাদের (সওদাগর মল)

প্রথম প্রকাশ	ফেব্রুয়ারি ১৯৬৩
প্রকাশক	**মুহাম্মদ শামসুর রহমান** সেক্রেটারী ইসলাহ্ ও ইরশাদ পূর্ব পাকিস্তান আঞ্জুমান আহমদীয়া ৪ বকশীবাজার রোড, ঢাকা-১।
মুদ্রণে	শফিক উদ্দীন খান শাহজাহান প্রিন্টিং ওয়ার্কস ৯৭/২, সিদ্দিক বাজার, ঢাকা-২
দ্বিতীয় সংস্করণ	ফেব্রুয়ারি ২০০৯
প্রকাশক	**জিল্লুর রহমান একাডেমী ফর ওরিয়েন্টাল ষ্টাডিজ** ১২-ডি, ২৭/৩২, পল্লবী, মিরপুর, ঢাকা-১২১৬
মুদ্রণে	**বাড-ওঁ-লিভস্** ২১৭/এ, ফকিরেরপুল ১ম লেন মতিঝিল, ঢাকা-১০০০।
সংখ্যা	১০০০ কপি
গ্রন্থ স্বত্ব	**ইসলাম ইন্টারন্যাশনাল পাবলিকেশন্স লিমিটেড** টিলফোর্ড, যুক্তরাজ্য
অনুবাদ স্বত্ব	**আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ**
শুভেচ্ছা মূল্য	পেপারব্যাক : ১২৫ টাকা (US $ 5.00) হার্ডব্যাক : ১৫০ টাকা (US $ 6.00)
Hayat-e- Tayabah **(Original in Urdu)**	By Sheikh Abdul Qadir (Saudagar Mal) Published by **Zillur Rahman Academy for Oriental Studies** 12-D, 27/32, Pallabi, Mirpur, Dhaka-1216, Bangladesh Cover Design : Hamidur Rahman

ISBN 978-984-992-005-2

হযরত মির্যা গোলাম আহ্‌মদ
ইমাম মাহ্‌দী ও মসীহ মাওউদ (আ.)
আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত-এর প্রতিষ্ঠাতা

দ্বিতীয় সংস্করণের ভুমিকা

"হায়াতে তাইয়েবা" হযরত মির্যা গোলাম আহমদ মসিহ মাওউদ ও মাহদী মাওউদ (আ.) এর জীবন ও কর্মের বিষয়ভিত্তিক একটি প্রামাণ্য গবেষণালব্ধ মৌলিক গ্রন্থ। যে কোন আন্দোলনের প্রবর্তক বিশেষত: কোন আধ্যাত্মিক আন্দোলন সূচনাকারীর জীবন আলোচনা সেই আন্দোলনের পরিধি, ব্যাপ্তি ও বিষয়বস্তু মূল্যায়নের সহায়ক হয়। আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের সদস্যদের নিকট হযরত মসিহ মাওউদ (আ.) এর একটি প্রামাণ্য জীবনী গ্রন্থ থাকা যেমন একান্ত প্রয়োজন ঠিক তেমনি যারা আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত সম্বন্ধে জানতে আগ্রহী তাদেরও তাঁর জীবন-চরিত জানার প্রয়োজন রয়েছে। এই গ্রন্থটি প্রতিশ্রুত মসিহ (আ.) এর ঘটনাবহুল জীবনের একটি হৃদয়গ্রাহী চিত্তাকর্ষক বিবরণ। এটি পড়ে পাঠক আত্মহারা হতে পারবেন এবং এমন এক ব্যক্তির ব্যাক্তিত্ব ও মর্যাদা সম্বন্ধে ধারণা করতে পারবেন যাঁকে স্বয়ং আল্লাহ তাআলা প্রতিশ্রুত মসিহ ও মাহদী হিসাবে মনোনীত করেছেন এবং যার ফলে মুহাম্মদ (সা.) এর ভবিষ্যদ্বাণী পরিপূর্ণতা লাভ করেছে। আমরা আশা করি পাঠক এই বইটি পড়ে উপকৃত হবেন। এ'রকম বই প্রত্যেক আহমদীর অবশ্যই পড়া উচিত। শুধুমাত্র অনুপ্রাণিত হবার জন্য নয়, বরং দাওয়াত ইলাল্লাহ ও তবলীগের উপকরণ হিসেবেও বইটি অতুলনীয়। বাংলা অনুবাদকৃত বইটির চলিত রূপে পুন:প্রকাশ বর্তমান সময়ের যথার্থ দাবি পূরণে একান্ত প্রয়োজন ছিল। এই বইয়ের লেখক মরহুম শেখ আবদুল কাদির এক হিন্দু পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন এবং তিনি খুব অল্প বয়সে ইসলাম ধর্মে দিক্ষিত হয়ে জামা'তে আহমদীয়ায় যোগদান করেন। পরে তিনি ইসলাম ধর্মের একজন সফল প্রচারক বা মিশনারি হিসেবে জামা'তে আহমদীয়ার সদর মুরুব্বি হন। তিনি জামা'তের অনেক বই পুস্তক রচনা করেছেন।

"হায়াতে তাইয়েবা" মূল বইটি উর্দু ভাষায় লেখা এবং ষাট দশকের প্রথম দিকে (১৯৬৩) বাংলায় অনূদিত হয়। মূল উর্দু পুস্তকের প্রথম খন্ডের প্রথম বাংলা অনুবাদ করেন মৌলবী মুহাম্মদ আলী আনোয়ার। মৌলবী মোহাম্মদ সাহেব ও প্রাক্তন সদর মুরুব্বী মৌলানা মুহিবউল্লাহ সাহেব যৌথভাবে অনুবাদ কর্মটি মূল উর্দু বইয়ের সাথে মিলিয়ে দেখেছিলেন। পাঠক প্রথম বাংলা সংস্করণের ভুমিকায় এবিষয়ে বিস্তারিত জানতে পারবেন।

ষ্টক শেষ হয়ে যাওয়ায় অনেকদিন থেকে বইটি দুষ্প্রাপ্য ছিল। আহমদীয়া খিলাফত শতবার্ষিকী উদযাপন উপলক্ষে কেন্দ্র থেকে আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত,

বাংলাদেশকে হায়াতে তাইয়েবা মূল বইটি পরিপূর্ণভাবে পুন:প্রকাশের দায়িত্ব দেয়া হয়। কাজে হাত দিয়ে দেখা গেল যে বাংলায় প্রথম প্রকাশিত "হায়াতে তাইয়েবা" মূল বইয়ের প্রথম খন্ডের অনুবাদ মাত্র। (সম্পূর্ণ বইটির অনুবাদ নয়)। হয়ত বইটির বাকি অংশ পরবর্তীকালে অনুবাদ করে প্রকাশ করার কথা ভাবা হয়েছিল। কিন্তু অনেক অনুসন্ধান করেও বাকি অংশের বাংলা অনুবাদ হয়েছে কিনা সে সম্বন্ধে নিশ্চিত হওয়া যায়নি। বর্তমানে বাকি অংশের অনুবাদের কাজ হাতে নেয়া হয়েছে। সিদ্ধান্ত নেয়া হয় যে আপাততঃ বাংলায় প্রথম প্রকাশিত 'হায়াতে তাইয়েবা' চলিত ভাষায় রূপান্তর করে যথাশিগগির পুন:প্রকাশ করা হোক। দ্বিতীয় খন্ডও অনুবাদ করে পরবর্তিতে প্রকাশ করা হবে।

আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ এর সদস্য ও সেবক হিসাবে "জিল্লুর রহমান একাডেমী ফর ওরিয়েন্টাল স্টাডিজ" তাদেরকে খিলাফত জুবিলীর বরকত লাভের আশায় এই জামাতের পক্ষে হায়াতে তাইয়েবার বাংলা অনুবাদ পুন:প্রকাশ করার ইচ্ছা প্রকাশ করে। তাদের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে ন্যাশনাল জামাত তাদেরকে এইমর্মে অনুমতি প্রদান করে। জিল্লুর রহমান একাডেমীর সদস্য জনাব হামিদুর রহমান ও সদর মুরুব্বী মাওলানা সালেহ আহমদ সাহেব যৌথভাবে প্রথম অনুবাদটির ভাষা চলিতকরণ, পরিমার্জন ও প্রাঞ্জল করেছেন। সদর মুরুব্বি মাওলানা সালেহ আহমদ এই রূপান্তর পুনরায় মূল উর্দু বইয়ের সাথে মিলিয়ে দেখেছেন। আল্লাহ আমাদের সকলের এই প্রচেষ্টা গ্রহণ করুন এবং এই পুস্তক পুন:প্রকাশের সাথে যারা জড়িত তাদের সকলকে উত্তম পুরস্কারে ভূষিত করুন। বাড ও লীভস এর স্বত্বাধিকারী জনাব মুহাম্মদ নুরুল ইসলাম মিঠু মুদ্রণের গুরুদায়িত্ব পালনের পাশাপাশি প্রুফ রিডিং এর কঠিন দায়িত্বও পালন করেছেন। আল্লাহ তার এই নেক প্রচেষ্টার উত্তম পুরস্কার দিন।

আমি জিল্লুর রহমান একাডেমীর এই প্রচেষ্টার প্রশংসা করছি এবং জামা'তের সকলকে একাডেমীর সদস্যদের জন্য দোয়ার আবেদন জানাচ্ছি। মহান আল্লাহ তাআলা তাদের সকল চেষ্টা সফল করুন এবং তাদেরকে শক্তি প্রদান করুন যেন তারা কাজ করে যেতে পারে এবং এই সামান্য সূচনা সময়ের সাথে সাথে আরও অনেক প্রসার লাভ করতে পারে।

মোবাশশেরউর রহমান
ন্যাশনাল আমীর
আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ

بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ
نَحۡمَدُہٗ وَنُصَلِّیۡ عَلٰی رَسُوۡلِہِ الۡکَرِیۡمِ
وَعَلٰی عَبۡدِہِ الۡمَسِیۡحِ الۡمَوۡعُوۡدِ
خدا کے فضل اور رحم کے ساتھ
ھوالنّاصر

প্রথম প্রকাশের ভূমিকা

অশান্তির আঁধারে বারে বারে পথ হারানো যেমন মানব জাতির স্বভাব, শান্তির সুবিমল আলো ও সুশীতল ছায়ায় তাদেরকে ফিরিয়ে আনার জন্য তাদেরই মধ্য থেকে জরুরি সময়ে এক এক মহাপুরুষকে আবির্ভূত করাও তেমনি আল্লাহ্ তাআলার চিরন্তন নিয়ম। এভাবে অন্ধকারের পর আলো এবং অশান্তির পর শান্তির উদ্ভব আমরা হযরত আদম (আ.)-এর যুগ থেকে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন স্থানে খণ্ড খণ্ড আকারে ঘটতে দেখেছি। কিন্তু এক নির্ধারিত সময়ে জগৎব্যাপী মহাতিমির নির্দিষ্ট ছিল । সেই মহাতিমির দূরীভূত করার জন্য হযরত ইব্রাহিম (আ.) তাঁর পুত্র হযরত ইসমাইল (আ.) কে নিয়ে কাবাঘর নির্মাণ করে আল্লাহ্ তাআলার কাছে দোয়া করছিলেন :

رَبَّنَا وَابۡعَثۡ فِیۡہِمۡ رَسُوۡلًا مِّنۡہُمۡ یَتۡلُوۡا عَلَیۡہِمۡ اٰیٰتِکَ
وَیُعَلِّمُہُمُ الۡکِتٰبَ وَالۡحِکۡمَۃَ وَیُزَکِّیۡہِمۡ ؕ اِنَّکَ اَنۡتَ الۡعَزِیۡزُ الۡحَکِیۡمُ ۝

"হে আমাদের রাব্ব্, তাদের মধ্য থেকে এক প্রেরিত পুরুষের আবির্ভাব কর, যিনি তাদের কাছে তোমার আয়াত পাঠ করবেন, পুস্তক এবং জ্ঞান শিক্ষা দিবেন এবং তাদেরকে পবিত্র করবেন; নিশ্চয়ই তুমি মহা-শক্তিশালী ও জ্ঞানী।" [সূরা-আল্ বাকারাহ্', রুকু-১৫]

এই দোয়ার কবুলিয়তে হযরত মুহাম্মদ (স.)-এর আবির্ভাব। তিনি বিশ্বে এক অখণ্ড মানবতা স্থাপন করার জন্য এক অমর শান্তিপূর্ণ বিধান দিয়ে গেছেন । আল্লাহ্ তাআলা তাঁকে বিশ্বনবী 'রাহ্মাতুল্লিল্ আলামীন' করে পাঠিয়েছিলেন। তাঁর রহমতের ধারা সকল জাতির কাছে পৌঁছাতে থাকা মুসলমানদের কর্তব্য ছিল। কিছুকাল তারা আমল ও তবলীগ দ্বারা এ কর্তব্য পালন করছিল। যতদিন তারা এ কর্তব্যে স্থির ছিল, ততদিন তারা বিজয়ী ও উন্নতিশীল ছিল এবং ইসলাম ধর্ম দ্রুত প্রসার লাভ করছিল। কিন্তু বাদশাহী পেয়ে ভোগবিলাসে মেতে তারা যখন আমল ও তবলীগ ছেড়ে দিল, তখন তাদের দ্রুত অধ:পতন হল এবং অচিরেই 'দাজ্জালিয়ত' অর্থাৎ বিকৃত খ্রিষ্টধর্ম প্রবল হয়ে উঠল। সকল জাতির

মধ্যে তবলীগ করা মুসলমানদের জন্য ফরজ করা হয়েছিল, কিন্তু মুসলমানরা তবলীগ ছেড়ে দিল। বনি ইসরাইল বংশের বাইরে তবলীগ করা খ্রিষ্টানদের জন্য নিষিদ্ধ ছিল। কিন্তু খ্রিষ্টানরা রাজ্য বিস্তারের সাথে সাথে জাতি ধর্ম নির্বিশেষে তবলীগ শুরু করে দিল এবং সকল জাতিকে তাদের ধর্মে ক্রমশ: টেনে আনতে লাগল। এক দিকে যেমন তারা মুসলমানদের রাজ্যসমূহ কেড়ে নিতে লাগল, অপর দিকে ইসলাম ধর্মের ওপরও বিভিন্ন দিক দিয়ে গুরুতর আঘাত হানতে লাগলো। একদিন ছিল যখন জগতের কোন জাতি মুসলমানদের প্রতি চোখ তুলে কথা বলতে পারত না। কিন্তু পরবর্তীতে মুসলমানদের নিজেদের দোষে এমন দিন আসল, যখন খ্রিষ্টানরা তাদের দেশ নিয়েই ক্ষান্ত হল না– তাদের ধর্মকেও ভূপৃষ্ঠ থেকে মুছে ফেলার জন্য তৎপর হল। গত শতাব্দীর শেষভাগে নিজেদের কৃতকার্যতা দেখে তারা এমন সাহসী হয়ে উঠল যে প্রকাশ্যভাবে ঘোষণা করল, আর একশ' বছরের মধ্যে তারা ইসলামকে ধরাপৃষ্ঠ থেকে মুছে ফেলবে। আলেম উলামাগণ তাদের আক্রমণের সামনে হীনবল, ক্ষীণকণ্ঠ ও অবনত মস্তক এবং আপন গৃহে তারা পরস্পরের বিরুদ্ধে কুফরী ফতোয়ার তলোয়ার হেনে নিজেদেরকে দুশমনের সহজলব্ধ শিকারে পরিণত করতে লাগল। জগতের বুকে মহাদুর্দিন নেমে আসল। আল্লাহ্ তাআলা হযরত মুহাম্মদ (স.) কে পাঠিয়েছিলেন বিশ্বনবী করে ও ইসলামকে বিশ্বধর্ম করে। কিন্তু জগতের মাত্র এক-পঞ্চমাংশ লোক তাঁর কলেমা পাঠ করল। কিন্তু খ্রিষ্টানরা হযরত ঈসা নবীকে আল্লাহর পুত্ররূপে সাজিয়ে জগতের অর্ধেকেরও বেশি লোককে তাদের ধর্মে দীক্ষিত করে নিল। এই দৃশ্য সামনে রেখে আলেম উলামা নিশ্চেষ্টভাবে বসে থেকে হযরত মুহাম্মদ (স.)-কে বিশ্বনবী ও ইসলামকে বিশ্বধর্ম বলে আত্মপ্রসাদ লাভ করতে কুণ্ঠাবোধ করল না। হযরত মুহাম্মদ (স.)-এর দাবি যদি সত্য হয় এবং নিশ্চয়ই তা সত্য, তবে এমন অবস্থা থেকে উদ্ধারের উপায় কি ছিল? কে এ অবস্থার প্রতিকার করবে?

প্রত্যেক নামাযের শেষভাগে আমরা বিনা ব্যতিক্রমে যে দরূদ শরীফ পড়ি এবং যার ফজিলত সর্বজন স্বীকৃত, এর মধ্যেই এই অবস্থার প্রতিকার চাওয়া হয়েছে। বর্তমানের বিপদ ও ব্যাধি যেরূপ গুরুতর তার প্রতিকার পদ্ধতিও সেরূপ বিরাট। গত চতুর্দশ শতাব্দী যাবৎ যে পরিমাণ দরূদ পড়া হয়েছে এবং আজও হচ্ছে এর সমষ্টির প্রবল বন্যায় গগণচুম্বি জঞ্জালও তৃণখণ্ডের মত ভেসে যেতে বাধ্য। দরূদ শরীফের সারকথা আল্লাহ্ তাআলার কাছে এই কাতর প্রার্থনা যে, হযরত ইব্রাহিম (আ.) ও তাঁর অনুবর্তিদের যেভাবে আধ্যাত্মিক ও পার্থিব কল্যাণে ভূষিত করা হয়েছিল, হযরত মুহাম্মদ (স.) এবং তাঁর অনুবর্তিদেরকেও যেন সেরূপ কল্যাণে ভূষিত করা হয়। হযরত ইব্রাহিম (আ.) এর বড় গৌরবের বস্তু হযরত মুহাম্মদ (স.)।

তৎকালীন অন্ধকার জগতে এসে তিনি হযরত ইব্রাহিম (আ.)-এর অনুসরণে জগতকে আলোকিত করেছিলেন। আজকের জগৎ শিক্ষা ও সভ্যতায় অভূতপূর্ব উন্নতি করলেও এর ভবিষ্যৎ মহা অন্ধকার। এই অন্ধকারকে দূর করার জন্য দরূদ শরীফের প্রার্থনার কবুলিয়তের ফলশ্রুতিতে আজ হযরত মুহাম্মদ (স.)-এর অনুসরণে এক মহামানবের আবির্ভাবের প্রয়োজন। যেহেতু হযরত মুহাম্মদ (স.) ধর্মের শিক্ষা ও আদর্শকে পূর্ণ করে গেছেন, সেজন্য এখন শুধু তাঁর শিক্ষা ও আদর্শকে পুনরুজ্জীবিত করে জগতে প্রচারের জন্য এক প্রেরিত পুরুষের প্রয়োজন। মানুষ যখন আল্লাহ্ তাআলার ধর্মকে ত্যাগ করে, আল্লাহ্ তাআলা স্বয়ং তখন স্বীয় ধর্মকে সঞ্জীবিত করার ব্যবস্থা করে থাকেন। মুসলমানরা যেহেতু সত্যধর্মের তবলীগকে বাদ দিয়ে ইসলামকে রসাতলে দিয়েছে, আল্লাহ্ তাআলা তাই এর সঠিক তবলীগের জন্য এক নবী প্রেরণ করে ইসলাম ও ইসলামের সম্মানকে উচ্চতর মিনারে স্থাপিত করার ব্যবস্থা করেছেন। পবিত্র কুরআনের ভাষায় ব্যাপারটি এই :

هُوَ الَّذِيٓ اَرْسَلَ رَسُوْلَهٗ بِالْهُدٰى وَدِيْنِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهٗ عَلَى الدِّيْنِ كُلِّهٖ

"তিনি (আল্লাহ্ তাআলা) আপন রসুলকে হেদায়াত সহকারে পাঠিয়েছেন যেন তাঁর দ্বারা তিনি এ (ইসলাম ধর্মকে) সকল ধর্মের ওপর জয়যুক্ত করেন।" ['সূরা আস্‌সাফ', রুকু ১]

এই আয়াত পাঠে বুঝা যায় যে, প্রতিশ্রুত মহাপুরুষ সকল ধর্মের তুলনামূলক সমালোচনার মাধ্যমে অকাট্য প্রমাণ ও যুক্তি দ্বারা ইসলাম ধর্মকে সকল ধর্মের ওপর জয়যুক্ত করবেন। হযরত মুহাম্মদ (স.) 'শরীয়তকে' পূর্ণ করেছিলেন। মুসলমানদের কর্তব্য ছিল এর আমল দ্বারা 'প্রচারকে' পূর্ণ করা এবং সমগ্র মানবজাতিকে নিয়ে এক অখণ্ড মানবতা কায়েম করা। পরিত্যক্ত এই কাজ করা প্রতিশ্রুত মহাপুরুষের জন্য নির্দিষ্ট ছিল। ধর্মের তুলনামূলক বিচারে ইসলামের সত্যকে সকল জাতির কাছে সহজে গ্রহণযোগ্য করার জন্য আল্লাহ্ তাআলা আগে থেকে প্রত্যেক দেশ ও কালের নবীর মাধ্যমে তাদের জাতিকে বর্তমান যুগের বিস্তারিত বিপদ-সঙ্কেত দিয়ে এ যুগে এক উদ্ধারকর্তার আগমন বার্তা জানিয়ে তাঁকে গ্রহণ করার আদেশ দিয়েছিলেন। সে অনুসারে প্রত্যেক জাতি আপন আপন ধর্মের প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী এ যুগের উদ্ধারকর্তার আগমনের অধীর প্রতীক্ষা করছিল। মনে হয়েছিল যেভাবে তারা প্রতীক্ষা করছিল, প্রতিশ্রুত মহাপুরুষ আসলেই যেন সবাই তাঁকে সাদরে গ্রহণ করে নিবেন । পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্ তাআলা খেদোক্তি করেছেন :

يٰحَسْرَةً عَلَى الْعِبَادِ ۚ مَا يَأْتِيْهِمْ مِّنْ رَّسُوْلٍ اِلَّا كَانُوْا بِهٖ يَسْتَهْزِءُوْنَ ○

“হায়! আমার বান্দাদের জন্য পরিতাপ। এমন কোন রসুল আসেন না, যার আগমনে তারা তাঁকে ঠাট্টা বিদ্রূপ না করে।” [‘সূরা ইয়াসিন’, রুকু ২]

এই খেদোক্তি এবারও সত্যে পরিণত হয়েছে। প্রতিশ্রুত পুরুষ যথাসময়ে বিপদের সন্ধিক্ষণেই আর্বিভূত হলেন। কিন্তু মানব জাতি তাঁকে উপহাস করল। তাঁর বিরোধিতা করল। এমন কি, যে মুসলমানদের ধর্মকে তিনি বিনা ব্যতিক্রমে প্রতিষ্ঠা করতে আসলেন, তারাও তাঁর চরম বিরোধিতা করল।

যাঁর পবিত্র জীবনী এই বইতে লিখিত হয়েছে, তিনি হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আ.) সকল জাতির জন্য সেই প্রতিশ্রুত মহাপুরুষ। প্রত্যেক ধর্মগ্রন্থে তাঁর আগমনের লক্ষণাবলী লিপিবদ্ধ আছে। সুতরাং তাঁকে চেনার ও গ্রহণ করার জন্য কোন অসুবিধা ছিল না। তাঁর আগমনের সুসংবাদ ও আহ্বানে তাঁর সত্য জানার ও তাঁকে গ্রহণ করার পরিবর্তে মানুষ তাঁকে মিথ্যাবাদী প্রতিপন্ন করার জন্যই বেশি তৎপর হয়ে পড়ল। অবশ্য, জগতে নবুয়তের অনেক মিথ্যা দাবিদারও আবির্ভূত হয়েছে। কিন্তু মিথ্যা নবীর আবির্ভাবের কারণে কখনও সত্য নবীর দাবি বাতিল হয় না এবং মিথ্যা নবীর আবির্ভাবের সম্ভাবনা আছে বলে কোন সত্য নবীর দাবিকেও বিবেচনা করব না বললে জগতে আজ কোন ধর্ম থাকত না। মিথ্যার ভয়ে সত্যকে দেখতে অস্বীকার করলে ক্ষতিগ্রস্ত হতে হবে। সুতরাং, সকল দাবি প্রণিধানযোগ্য। বিশেষত:, যখন যুগ ও এর লক্ষণাবলী কোন নবীর আবির্ভাবের সাক্ষ্য দেয়।

নবুওতের দাবি তিন শ্রেণীর ব্যক্তিরা করে থাকে। যথা:- সত্য নবী, মিথ্যাবাদী এবং পাগল। ‘ফলেই গাছের পরিচয় হয়’। ফল দেখে যা সত্য বলে প্রতিপন্ন হয়, তাই মানতে হবে। পাঠকের বিচারের সুবিধার জন্য তিন শ্রেণীর দাবিদারের পরিচয় তালিকা নিচে দেয়া হল :

পাগল :

১। তার দাবির সমর্থনে কোন যুক্তি, নিদর্শন ও সফলতা থাকে না।
২। তার কোন কর্মসূচী থাকে না।
৩। তার সাথে আল্লাহ্ তাআলা ও মানুষ–কারো সাহায্য থাকে না।
৪। তার কেউ অনুগামী হয় না।
৫। তার জীবদ্দশায় বা তার মৃত্যুর পর তার কোন জামাত থাকে না।
৬। আমোদ উপভোগ করতে অপরিণত বয়সের বালক ছাড়া পরিণত বয়স্ক ব্যক্তিগণ তার প্রতি ভ্রূক্ষেপ বা তার বিরোধিতা করে না।

৭। নিজের দাবিতে নিজেও সে কায়েম থাকে না।

মিথ্যাবাদী ঃ

১। তার দাবিতে আংশিক যুক্তি থাকে, কিন্তু নিদর্শন ও সফলতা থাকে না।
২। নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করা ছাড়া তার কোন কর্মসূচী থাকে না।
৩। তার মিথ্যা ওহী ও ইলহাম লাভের দাবি থাকে, কিন্তু তার সাথে আল্লাহ্ তাআলার সাহায্য থাকে না।
৪। কিছু মানুষ পার্থিব স্বার্থসিদ্ধির জন্য তার সঙ্গী হয়, কিন্তু তার মৃত্যুর পর তার কোন অনুগামী বা জামাত থাকে না।
৫। তার বিরোধিতা হয় এবং এর ফলেই তার সমূলে বিনাশ ঘটে।
৬। মরণের পর মিথ্যাবাদী হিসেবে তার অভিশপ্ত নাম থেকে যায়।

সত্য নবীর পরিচয় ঃ

১। আল্লাহ্ তাআলার কাছ থেকে প্রাপ্ত ওহির ভিত্তিতে তিনি দাবি করে থাকেন এবং তাঁর দাবির সাথে পূর্ণতম যুক্তিযুক্ত নিদর্শন ও সফলতা থাকে।
২। আল্লাহ্ তাআলা সদা তাঁর সাথে বাক্যালাপ করে থাকেন এবং আল্লাহর কাছ থেকে সাহায্য ও বিজয় সর্বদা তাঁর সাথী হয়।
৩। তাঁর জীবদ্দশায় এক পবিত্র জামা'ত লাভ হয় এবং মরণের পর তা উন্নতিশীল থাকে।
৪। ধর্মযাজকরা তাঁর প্রধান শত্রু হয়ে থাকে, কিন্তু তাদের চরম বিরোধিতা সত্ত্বেও তিনি বিজয়ী হন এবং তারা পরাজিত ও লাঞ্ছিত হয়।
৫। তাঁর মৃত্যু পর তাঁর নাম ও পয়গামের সম্মান অক্ষয় হয়ে যায়।

উপরোক্ত পরিচয় তালিকার আলোতে হযরত আহমদ (আ.)-এর দাবি পর্যালোচনা করলে তাঁর সত্য 'মধ্যাহ্ন সূর্যের ন্যায় দেদীপ্যমান' হয়ে পড়ে। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্ তাআলা মিথ্যা দাবিকারীর পার্থক্য প্রকাশার্থে মুহাম্মদ রসুলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম সম্বন্ধে বলেছেন :

وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْاَقَاوِيْلِ

"এবং তিনি যদি নিজের কোন কথা আমার নামে বানিয়ে বলতেন, তাহলে আমরা তাঁর দক্ষিণ হস্ত ধরে নিশ্চয় তাঁর জীবন শিরা কেটে দিতাম।" ['সূরা আল্-হাক্কা', রুকু ২]

আল্লাহ্ তাআলার এই নিয়মকে সামনে রেখে হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আ.) ফারসি ভাষায় তাঁর এক প্রার্থনা তাঁর সত্য নির্ণয়ের জ্বলন্ত কষ্টিপাথর স্বরূপ রেখে গেছেন :

ای قدیر و خالق ارض وسما -
ای رحیم و مهربان و رهنما -
ای که میداري تو برد لها نظر -
ایکه از تو نیست چیزی مستتر-
گر تو بیني مرا پر فسق و شر-
گر تو دیداستي که هستم بد گهر -
پاره پاره کن من بدکار را -
شاد کن این زمره اغیار را -
اتش افشان بردر و دیوار من -
دشمن باش و تبه کن کار من -

"হে জমিন ও আসমানের সৃষ্টিকর্তা, সর্বশক্তিমান!
হে দয়াশীল করুণাময় পথপ্রদর্শক,
হে অন্তর্যামী! তোমার দৃষ্টি থেকে কিছুই গোপন নেই।
যদি তুমি আমাকে পাপ ও দুষ্টামিতে ভরা দেখ,
যদি তুমি আমার অন্তরকে কলুষ ভরা দেখ,
(তবে) আমার মত দুষ্টকে তুমি টুকরা টুকরা করে দাও।
আমার বিরুদ্ধবাদী দলকে সন্তুষ্ট করে দাও।
আমার ঘর দরজার উপর অগ্নিবৃষ্টি কর-
তুমি আমার দুশমন হও এবং আমার সমস্ত কর্মকান্ডকে নষ্ট করে দাও।"

উপরোক্ত প্রার্থনা পাঠ করলে অন্তরাত্মা ও সর্বাঙ্গ কেঁপে ওঠে। কোন মিথ্যাবাদীর পক্ষে এমন ভয়ংকর প্রার্থনা করা এবং উক্ত প্রার্থনার পর টিকে থাকা অসম্ভব। হযরত আহমদ (আ.) ৪০ বছর যাবত আল্লাহ্ তাআলার কালাম লাভের দাবি করে কাগজে, পুস্তকে, বৈঠকে, জলসায় বহুল প্রচার করেন। জগতের সকল ধর্মাবলম্বীর পক্ষ থেকে তাঁর বিরোধিতা এমনকি প্রাণনাশের চেষ্টা করা হয়। কিন্তু তাঁর সাথে আল্লাহ্ তাআলার ওয়াদা ছিল :

يعصمك من الناس

“আমি মানুষের হাত থেকে তোমাকে রক্ষা করব।” এ ইলহামে আল্লাহ্ তাআলার আরও ওয়াদা ছিল ঃ

انى متوفيك و رافعك إلى

“আমি তোমাকে স্বাভাবিক মৃত্যু দেব এবং সসম্মানে তোমাকে আমার দিকে উঠাব।”

আল্লাহ্ তাআলা স্বীয় প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী বিরুদ্ধবাদিদের সব ষড়যন্ত্র ও প্রচেষ্টাকে বিফল করে যথাসময়ে তাঁকে সম্মানজনক স্বাভাবিক মৃত্যু দিয়েছেন।

পাঠক! তাঁর পবিত্র জীবনী পাঠে দেখতে পাবেন তাঁর জীবন কত পবিত্র, কত মহান। তাঁর যুক্তি কিরূপ অকাট্য। তার নিদর্শনাবলী কত উজ্জ্বল। তিনি কিরূপ সাফল্যমণ্ডিত। তাঁর বিরুদ্ধবাদিরা কিভাবে পদে পদে লাঞ্ছিত ও অপমানিত। তাঁর পদে পদে কিভাবে আল্লাহ্ তাআলার সাহায্য বিদ্যমান ও তাঁর বিরুদ্ধবাদিরা আল্লাহ্ তাআলার সাহায্য হতে কেমন বঞ্চিত এবং কঠোর শাস্তিতে নিপতিত। তাঁর জামাত কত দ্রুত উন্নতি ও প্রসার লাভ করেছে। আজ জগতের এমন কোন দেশ নেই, যেখানে তাঁর জামাত প্রতিষ্ঠিত হয়নি। তিনি ইসলামকে আজ জীবন্ত করেছেন। তাঁর শিষ্যরা আজ “লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর্ রসুলুল্লাহ” কলেমার ঝাণ্ডাকে উন্নততর হস্তে উড্ডীন করে নির্ভীক চিত্তে সকল দেশে পবিত্র কুরআন ও হযরত মুহাম্মদ (দ.)-এর শিক্ষার শ্রেষ্ঠত্বের তুলনামূলক অভিযান চালিয়েছে। তাঁর শিষ্যদের হাতে তীর, তলোয়ার, কামান, মিসাইল, এটম বোম বা রকেট নেই। কিন্তু আছে পবিত্র কুরআন, রসুল করীম (দ.)-এর সুন্নত ও আল্লাহ্ তাআলার অপরাজেয় সাহায্য। আজ হযরত মুহাম্মদ (দ.)-এর শিক্ষা ও আদর্শ জগতের অন্ধকার দূর করে শান্তি আনতে সক্ষম। সেই কাজেই আজ আহমদীয়া জামা’ত রত।

অজানা এক গ্রামের তিনি এক অচেনা মানুষ ছিলেন। কিন্তু অল্পকালের মধ্যে তিনি সারা বিশ্বে পরিচিত হয়ে পড়েছেন। তাঁর যুক্তি ও শিক্ষার সামনে যে কোন দেশের ছোট হতে বড় পর্যন্ত যে কেউ দৃষ্টিপাত করেছে, তাকে মাথা নত করতে হয়েছে। তাঁর ভবিষ্যদ্বাণীগুলির পূর্ণতা মানবজাতিকে ক্রমশঃ অভিভূত করেছে। সব দেশের সব ধর্মের সত্যান্বেষীরা তাঁর শিক্ষার আলোকে ইসলাম গ্রহণ করে ধন্য হচ্ছে। অচিরেই এমন অবস্থা ও সময় আসবে, যখন সারা বিশ্বে ইসলামই একমাত্র ধর্ম হবে এবং জগতে অখণ্ড মানবতা স্থাপিত হয়ে স্বর্গরাজ্য প্রতিষ্ঠিত হবে।

কিন্তু কারও শিক্ষা গ্রহণের পূর্বে তার জীবনী জানা প্রয়োজন। ভাষার ব্যবধানের জন্য বাংলা ভাষাভাষী ভাইয়েরা এই মহাপুরুষের জীবনী সম্বন্ধে অজ্ঞাত ছিলেন।

আজ সেই অভাব পূরণ করা হচ্ছে। হযরত আহমদ (আ.)-এর জীবনীর প্রথম খণ্ড প্রকাশ করা গেল। দ্বিতীয় খণ্ড, ইন্‌শাআল্লাহ্, শিগগির প্রকাশ করা হবে।

এই পুস্তক মূল উর্দু ভাষায় লিখিত "হায়াতে তাইয়েবার" বাংলা অনুবাদ। এই পুস্তকের লেখক জনাব আবদুল কাদের সাহেব হিন্দু ছিলেন। তাঁর নাম ছিল সওদাগর মাল। তিনি অল্প বয়সে ইসলাম গ্রহণ করেন এবং আহমদীয়া ধর্ম শিক্ষালয়ে উচ্চতম শিক্ষা লাভ করে বহু বছর আহমদীয়া জামাতের মিশনারী হিসাবে কাজ করেছেন। তিনি বহু পরিশ্রম সহকারে এই পুস্তক সংকলন করেন। এর বাংলা অনুবাদ করেছেন মৌলবী মুহাম্মদ আলী আনওয়ার সাহেব। মৌলবী মুহাম্মদ মুহিবুল্লাহ সাহেব এবং আমি যৌথভাবে এ অনুবাদ দেখেছি। অনুবাদের কাজ খুব কঠিন। সুতরাং ত্রুটি থাকা খুব স্বাভাবিক। পাঠক তা উপেক্ষা করে মূল বিষয়টি অনুধাবন করে আল্লাহ্ তাআলার প্রেরিত পুরুষের সত্যের পরিচয় দৃষ্টে তাঁকে গ্রহণ করে ও তাঁর প্রদর্শিত পথে চলে স্বয়ং শান্তি লাভ করুন এবং জগতে প্রচার করে জগতে শান্তি এনে আল্লাহ্ তাআলার আশিস লাভের অধিকারী হোন।
আমাদের শেষ কথা, সকল প্রশংসা একমাত্র আল্লাহ্ তাআলার জন্য।

ইতি-
খাকসার

মৌলবী মোহাম্মদ
আমীর, পূর্ব পাকিস্তান আঞ্জুমান আহমদীয়া।

সূচিপত্র

প্রথম অধ্যায়

জন্মগ্রহণ থেকে 'বারাহীনে আহমদীয়া' প্রণয়ন পর্যন্ত

দ্বিতীয় অধ্যায়
‘বারাহীনে আহমদীয়া’ প্রণয়ন থেকে ‘প্রথম বয়আত’ গ্রহণ পর্যন্ত

তৃতীয় অধ্যায়

'বয়আতের ঘোষণা' থেকে 'মসজিদে মুবারকের' সম্প্রসারণ পর্যন্ত

ফটোসূচী

প্রকাশকের নিবেদন।

১৯৬৩ সালে হায়াতে তাইয়েবা প্রথম খন্ড সাধুভাষায় অনূদিত হয়। দীর্ঘদিন পর খিলাফত জুবিলি উপলক্ষে আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশের সিদ্ধান্ত অনুসারে সাধুভাষায় অনুদিত হায়াতে তাইয়েবার প্রথম সংস্করণটি চলিত ভাষায় রূপান্তর, পরিমার্জন ও সরলীকরণ করে জিল্লুর রহমান একাডেমীকে পুন:প্রকাশের দায়িত্ব দেয়া হয়।

অনুবাদ একটি দুরুহ কাজ। তদুপরি সাধুভাষায় অনূদিত একটি অনুবাদ কর্মকে পুনরায় চলিত ভাষায় রূপান্তর আরও দুরুহ। আমরা যথাসাধ্য চেষ্টা করেছি প্রথম প্রকাশের ভুলত্রুটি যথাসম্ভব সংশোধন করে চলিত রীতি অনুযায়ী প্রথম সংস্করণের ভাষা সরল ও পরিমার্জিত করতে। তবুও কিছু ভুলত্রুটি থাকা স্বাভাবিক। দ্বিতীয় খন্ডের অনুবাদের কাজ চলছে। পরবর্তিতে দ্বিতীয় খন্ডের সাথে প্রথম খন্ড একত্রিত করে প্রকাশকালে বর্তমান সংস্করণের সব ভুলত্রুটি সংশোধন করে পুন:প্রকাশ করবো। ইনশাআল্লাহ।

যা হোক, বর্তমান সংস্করণে পাঠকগণ যে সকল ভুল–ভ্রান্তি লক্ষ্য করবেন, আমাদেরকে জানালে বাধিত হব। অবশেষে, আল্লাহ তাআলার কাছে কাতর প্রার্থনা- তিনি আমাদের ভুল-ভ্রান্তি ক্ষমা এবং গ্রন্থখানিকে সর্বোতভাবে গৃহীত ও কল্যাণময় করুন। এই পুস্তক প্রকাশের সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে আল্লাহ তাআলা উত্তম পুরস্কারে ভূষিত করুন। আমীন!

বিনীত

এডভোকেট মুজীবুর রহমান
জিল্লুর রহমান একাডেমী ফর ওরিয়েন্টাল ষ্টাডিজ ঢাকা।

হায়াতে তাইয়েবা

১ ম খন্ড

হায়াতে তাইয়েবা

بسم الله الرحمن الرحيم

نَحْمَدُهٗ وَنُصَلِّیْ عَلٰی رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ

وَعَلٰی عَبْدِهِ الْمَسِيْحِ الْمَوْعُوْدِ

প্রথম অধ্যায়

জন্মগ্রহণ থেকে 'বারাহীনে আহমদীয়া' প্রণয়ন পর্যন্ত

বংশ পরিচয় :

হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আ.) ইমাম মাহদী ও মসিহ্ মাওউদ আলাইহেস্ সালাতু ওয়াস্ সালাম পারস্য দেশবাসী বিখ্যাত বরলাস কুলে জন্মগ্রহণ করেন। এই বংশের আদি পুরুষ কারাচার হিজরী ষষ্ঠ শতাব্দীতে ইসলাম গ্রহণ করেন। কারাচার যিনি চুগ্‌তাই এর উজির ও একজন খ্যাতনামা সেনাপতি ছিলেন। তিনি সমরকন্দের দক্ষিণে প্রায় ত্রিশ মাইল দূরে কিশ অঞ্চলে তার গোত্রের লোকদের নিয়ে বসতি স্থাপন করেন। তাঁর পৌত্র বরকাশের দুই পুত্র ছিলেন। একজনের নাম ছিল তুরাগে এবং অপরজনের নাম ছিল হাজী বরলাস। প্রসিদ্ধ ইরান সম্রাট তৈমুরলং[১] সাহেব-কেরাণ তুরাগের পুত্র ছিলেন। কিশ রাজ্য হাজী বরলাসের অধীনে ছিল। কিন্তু হাজী সাহেবের ভ্রাতুষ্পুত্র তৈমুর শক্তিশালী হয়ে উঠলে হাজী বরলাস এই এলাকা পরিত্যাগ করতে বাধ্য হলেন। তৎকালীন ইতিহাস থেকে যে ভৌগোলিক অবস্থা জানা যায়, তা থেকে নির্ণীত হয় যে, ভলগা হতে পারস্যোপসাগর এবং আফগানিস্তান ও বেলুচিস্তান হয়ে বুখারা পর্যন্ত বিস্তৃত ভূ-ভাগ 'পারস্য' নামে অভিহিত হত। বরং কারো কারো মতে অধিকাংশ আফগানিস্তান, বর্তমান বেলুচিস্তান এবং কাশগড় ব্যাপি বিস্তৃত গঙ্গার উৎপত্তি স্থানের উত্তরাঞ্চলও এর অন্তর্ভুক্ত ছিল। কিশও উল্লিখিত সীমানাবলীর অন্তর্বর্তী ভূ-ভাগের মধ্যেই অবস্থিত। কিন্তু আব্বাসীয় খলিফাগণের সময়ে এই এলাকা 'মা-ওরা-উন-নহরে'র অংশীভূত বলে গণ্য হত।[২]

---

(১) ভারতে মুঘল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা যহীর উদ্দিন বাবর শাহ্ তৈমুরলং এর বংশে জন্মগ্রহণ করেন।

(২) 'আন-নাজমুস- সাকেব; ২য় খন্ড, ১৮২ পৃ:।

মির্যা হাদী বেগ :

কিশ রাজ্য থেকে যখন তৈমুর তাঁর পিতৃব্য হাজী বরলাসকে বহিস্কৃত করলেন, তখন তিনি খুরাসানে আশ্রয় গ্রহণ করেন এবং সেখানেই প্রাণত্যাগ করেন। অত:পর, তৈমুর খুরাসান এলাকা জয় করে তার চাচার সন্তানদেরকে জায়গীর প্রদান করেন। এজন্য তারা সেখানেই বসবাস করতে থাকেন।

কিন্তু কিছুকাল পরে এই বংশের একজন বুজুর্গ মির্যা হাদী বেগ সাহেব তাঁর পরিবার পরিজনকে নিয়ে পুনরায় পূর্বপুরুষদের বাসস্থান সমরকন্দ অঞ্চলে গমন করেন। সেখানে কিছুকাল অবস্থানের পর কোন অজানা কারণে পূর্ব পুরুষদের প্রিয় দেশ ত্যাগ করে ভারতাভিমুখে আগমন করেন। হযরত আকদাস (আ.) তাঁর এই হিজরত প্রসঙ্গে বলেন :

"চুগ্‌তাই সুলতানাতের প্রতিষ্ঠাতা বাবর বাদশাহের সময়ে এই 'নিয়াযমন্দে-এলাহীর (অর্থাৎ আল্লাহর কৃপার ভিখারী) 'বুযুর্গ' (পূর্ব পুরুষ) খাস সমরকন্দ[১] থেকে কোন অজানা কারণে বহু লোকজনসহ হিজরত করে দিল্লী আগমন করেন। প্রকৃতপক্ষে, প্রাপ্ত কাগজপত্র থেকে একথা পরিষ্কারভাবে বোঝা যায় না যে, তারা বাবরের সঙ্গে ভারতবর্ষে অগমন করেন, নাকি তার অব্যবহিত পরেই এদেশে আগমন করেন। কিন্তু অধিকাংশ কাগজপত্র পর্যালোচনা দ্বারা একথা স্পষ্টরূপে প্রমাণিত হয় যে, বাবরের সঙ্গেই এসে থাকুন বা কিছুকাল পরেই এসে থাকুন, এ শাহী খান্দানের সাথে তাদের এমন কোন বিশেষ সম্বন্ধ ছিল যার ফলে তারা এই সরকারের দৃষ্টিতে সম্মানিত প্রধানদের মধ্যে গণ্য হন। সমসাময়িক বাদশাহের কাছ থেকে তাঁরা বহু গ্রাম জায়গীর রূপে প্রাপ্ত হন এবং তাঁদেরকে একটি বড় জমিদারীর তালুকদার করা হয়।[২]

হযরত আকদাস (আ.) এর নিজ হাতে লিখিত খান্দানী অবস্থা :

হযরত আকদাস (আ.) তাঁর রচিত কোন কোন পুস্তকে তাঁদের পরিবার সম্বন্ধে নিজ হাতে যে বর্ণনা লিপিবদ্ধ করেছেন এখানে উদ্ধৃত করা সমীচীন মনে করি। হুযুর (আ.) বলেন :

"আমাদের বংশ হলো মুঘল বরলাস। আমার পূর্ব পুরুষদের প্রাচীন কাগজপত্র থেকে যা এখন পর্যন্ত সংরক্ষিত আছে, জানা যায় যে, তারা এদেশে সমরকন্দ থেকে আগমন করেন। তাদের সঙ্গে অনুচর, ভৃত্য, পরিবারের লোক ও আত্মীয়

(১) তুর্কিস্তান।
(২) 'ইযালায়ে আউহাম' প্রথম সংস্করণ, হাশিয়া ১১২-২২ পৃঃ।

স্বজনসহ প্রায় দু'শ ব্যক্তি ছিলেন। আমাদের আদি পুরুষ একজন সম্ভ্রান্ত রইস রূপে এদেশে প্রবেশ করেন এবং লাহোর থেকে আনুমানিক পঞ্চাশ ক্রোশ উত্তর-পূর্ব দিকে সেকালে একটি জংলা পতিত ভূমিতে বসতি স্থাপন করেন। এটাই এই গ্রাম। তারা এটা আবাদ করেন এবং ইসলামপুর নামে অভিহিত করেন। পরে তা ইসলামপুর 'কাযিমাঝি' বলে খ্যাতি লাভ করে। কালক্রমে লোকে 'ইসলামপুর' শব্দ ভুলে যায় এবং কাযিমাঝি স্থলে শুধু 'কাযি' অবশিষ্ট থাকে। পরে এটি কাদি' শব্দে রূপান্তরিত হয় এবং বিকৃতি লাভ করে 'কাদিয়ানে' পরিণত হয়।[১] 'কাযিমাঝি' নাম প্রচলিত হওয়ার কারণ রূপে বলা হয় যে, প্রায় ষাট ক্রোশ ব্যাপী বিস্তৃত এই সম্পূর্ণ এলাকাটি তখনকার দিনে 'মাঝা' নামে পরিচিত ছিল। সম্ভবত: এটা এই কারণে 'মাঝ' নামে অভিহিত হত যে, এতদাঞ্চলে বহু মহিষ ছিল এবং এদেশীয় ভাষায় মহিষকে 'মাঝ' বলা হয়। আমাদের পূর্বপূরুষগণ গ্রামসমূহের জায়গীরদারী ছাড়া আঞ্চলিক শাসন কর্তৃত্বও লাভ করেন। সেজন্য তাঁরা 'কাযী' বলে বিখ্যাত ছিলেন। কি কারণে, কেন, আমাদের পূর্বপূরুষগণ সমরকন্দ থেকে এদেশে আগমন করেন, সে সম্বন্ধে আমার কিছু জানা নেই। কিন্তু কাগজ-পত্র থেকে সন্ধান পাওয়া যায় যে, ওই দেশেও তারা সম্ভ্রান্ত উমারা এবং রিয়াসতের মালিক ছিলেন। পারিবারিক কোন বিরোধ ও অনৈক্যের কারণে তাদেরকে দেশ ত্যাগ করতে হয়। তারপর, এদেশে এসে সমসাময়িক বাদশাহের কাছ থেকে বহু গ্রাম জায়গীর প্রাপ্ত হন। ফলে, এতদঞ্চলে তারা এক চিরস্থায়ী রিয়াসত লাভ করেন।"[২]

মির্যা ফয়েয মুহাম্মদ সাহেব :

মির্যা হাদী বেগের ওফাতের পর তাঁর পরিবারের প্রভাব, প্রতিপত্তি বৃদ্ধি পেতে থাকে। নবম পুরুষে মির্যা ফয়েয মুহাম্মদ সাহেবের কর্তৃত্বকালে মুঘল সুলতানাতের সাথে এই পরিবারের আরো গভীর সম্পর্ক স্থাপিত হয়। ১৭১৬ খ্রিষ্টাব্দে শাহানশাহ ফররুখসিয়ার মির্যা ফয়েয মুহম্মদ সাহেবকে 'হাফত-হাযারী' পদে অধিষ্ঠিত করে 'আযদুদ্-দাউলা' উপাধি প্রদান করেন। আযদুদ্-দাউলার অর্থ তিনি স্বাধীনভাবে সাত হাজার জোয়ান সম্বলিত ফৌজ রাখতে পারতেন। এই সম্মান তৎকালে কেবলমাত্র রাষ্ট্রের শ্রেষ্ঠ বিশ্বস্ত ব্যক্তিরাই প্রাপ্ত হতেন।

(১) কাদিয়ান বাটালা থেকে ১২ মাইল, অমৃতসর থেকে ৩৬ মাইল এবং লাহোর থেকে ৭০ মাইল দূরে অবস্থিত। (গ্রন্থকার)
(২) 'কিতাবুল-বারিয়্যা', হাশিয়া, ১৩৪ পৃঃ।

মির্যা গুল্ মুহাম্মদ সাহেব :

হযরত আকদাস আলাইহেস্ সালাতু ওয়াস্ সালাম মির্যা গুল্ মুহাম্মদ সাহেব প্রসঙ্গে ‘কিতাবুল-বারিয়্যা’-তে লিখেছেন :

“শিখ শাসনামলের প্রথম দিকে আমার প্রপিতামহ মির্যা গুল্ মুহাম্মদ সাহেব এ অঞ্চলে একজন স্বনামধন্য, বিখ্যাত রইস ছিলেন। তখন তার কাছে ৮৫টি গ্রাম ছিল। বহু গ্রাম শিখদের উপর্যুপরি আক্রমণের ফলে তার হস্তচ্যুত হয়। তবুও তার এমন চিত্ত প্রশস্ততা ও দানশীলতা ছিল যে, এই প্রকার স্বল্প অবশিষ্ট সম্পত্তি থেকেও কিছু গ্রাম তিনি কোন কোন আত্মকলহরত মুসলমান রইসকে দান করেন। ওইগুলো এখনো তাঁদের কর্তৃত্বাধীনে আছে। বস্তুতঃ, তিনি দেশময় অরাজকতার সময়ে তার এলাকার একজন স্বাধীন রইস ছিলেন। সর্বদা কমবেশি প্রায় পাঁচশ ব্যক্তি তার দস্তরখানে আহার করতেন। একশরও বেশি উলামা, সাধুপুরুষ ও কুরআন শরীফের হাফেজ তার কাছে বাস করতেন। তাদের জন্য যথেষ্ট বৃত্তি নির্ধারিত ছিল। তার দরবারে অধিকাংশ সময়ে আল্লাহ্ ও তাঁর রসুলের (সা.) হাদীস নিয়ে আলোচনা হত। তার কর্মচারী ও সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের মধ্যে কেউই বেনামাযী ছিলেন না। এমন কি, যাঁতা পরিচালিকা স্ত্রীলোকরাও দৈনিক পাঁচ ওয়াক্তের এবং তাহাজ্জুদের নামায আদায় করত। প্রতিবেশী সম্ভ্রান্ত মুসলমানরা যাদের অধিকাংশই আফগান ছিলেন, তৎকালে ইসলামপুর নামে অভিহিত কাদিয়ানকে ‘মক্কা’ বলতেন। কারণ, সেই বৈপ্লবিক যুগে প্রত্যেক মুসলমানের জন্য এই কল্যাণপুরী, আশ্রয়ের স্থান ছিল এবং অন্যান্য অধিকাংশ স্থানেই কুফর, অনাচার ও জুলুম পরিলক্ষিত হত। কাদিয়ানে ইসলাম, ধর্মানুরাগ, পবিত্রতা এবং ন্যায় বিচারের সুগন্ধি পাওয়া যেত। আমি নিজে তখনকার সমসাময়িক ব্যক্তিদের দেখেছি। তারা কাদিয়ানের এমন সুন্দর অবস্থার কথা বর্ণনা করতেন, যেন সেকালে সেইসময় এটা একটা মনোরম উদ্যান স্বরূপ ছিল। সেখানে ধর্মের সাহায্যকারী সাধু, জ্ঞানী এবং অতিশয় ভদ্র ও সৎ-সাহসী শত শত ব্যক্তি তরুরাজিরূপে বিরাজমান ছিলেন। এ অঞ্চলে এরূপ বহু ঘটনা প্রসিদ্ধ আছে, যার দ্বারা প্রমাণিত হয় যে মির্যা গুল্ মুহাম্মদ সাহেব মরহুম তৎকালীন ‘মাশায়েখ’ (শীর্ষস্থানীয় আউলিয়া) এবং ‘কেরামত সম্পন্ন’ ব্যক্তিদের মধ্যে একজন ছিলেন। তার সঙ্গ লাভার্থে বহু সালেহ এবং বিজ্ঞ ব্যক্তি কাদিয়ানে সমবেত হয়েছিলেন। আরো আশ্চর্যের বিষয়, তার এমন কোন কোন কেরামত প্রসিদ্ধ আছে যে, তাদের সত্যতা সম্বন্ধে সংখ্যাগরিষ্ঠ বিরুদ্ধবাদী এক সম্প্রদায়ও সাক্ষ্য দান করে আসছে। বস্তুত রাজ্য এবং অধিনায়কত্ব ছাড়াও সততা, ধর্মশীলতা, পৌরুষ, দৃঢ়চিত্ততা, ধর্মের সাহায্য এবং মুসলমানগণের

সহানুভূতিমূলক গুণাবলীর জন্য তাঁর অত্যন্ত সুখ্যাতি ছিল। তাঁর মজলিসে অংশগ্রহণকারী সবাই ধর্মভীরু, সদাচারী, ইসলামী মর্যাদাবোধ সম্পন্ন, পাপাচার থেকে বিরত, সৎসাহসী ও প্রভাবশালী ব্যক্তিত্ব ছিলেন। আমি বহুবার আমার পিতার কাছে শুনেছি তৎকালে মুঘল রাষ্ট্রের একজন উজির কাদিয়ান আগমন করেন। তিনি 'গিয়াসুদ্-দওলা' নামে অভিহিত ছিলেন। তিনি মির্যা গুল্ মুহাম্মদ সাহেবের গাম্ভীর্য্য, মেধা, সাহসিকতা, মহাসঙ্কল্প, ধৈর্য্যশীলতা, বিবেক বুদ্ধি, ইসলামের পৃষ্ঠপোষকতা, ধর্মের সাহায্যার্থে উৎসাহ, ধর্মভীরুতা, পবিত্রতা এবং তাঁর দরবারের গাম্ভীর্য দর্শন করেন। তার আড়ম্বরহীন দরবারকে বুদ্ধিমান, সদাচারী ও বীর পুরুষগণে পরিপূর্ণ দেখতে পান। তখন তিনি সজল নয়নে বলেছিলেন, "যদি আমি আগে জানতে পারতাম যে এই জঙ্গলের মধ্যে মুঘল বংশের এরূপ এক ব্যক্তি আছেন, যার মধ্যে রাজোচিত অত্যাবশ্যকীয় গুণাবলী বিদ্যমান আছে, তাহলে আমি ইসলামী রাষ্ট্রকে অক্ষুণ্ন রাখার চেষ্টা করতাম। চুগতাই বাদশাহদের অলসতা, অযোগ্যতা এবং গুণহীনতার দিনে তাকে দিল্লীর তখতে বসাতাম।"

"এখানে উল্লেখ করা নিরর্থক হবে না যে, উল্লিখিত গুণসম্পন্ন আমার প্রপিতামহ, অর্থাৎ মির্যা গুল্ মুহাম্মদ অন্যান্য উপসর্গসহ হিক্কারোগে প্রাণত্যাগ করেন। রোগের তীব্রতার সময় চিকিৎসকরা একমত হয়ে বলেন যে, এই রোগে কিছু দিন মদ্য ব্যবহার করলে উপকারের সম্ভাবনা আছে। কিন্তু তাঁর সামনে এটা নিবেদন করার মত সাহস কারও হয়নি। অবশেষে, তাদের মধ্যে কেউ একজন নম্র ভাষায় এটা নিবেদন করলেন। তখন তিনি বললেন, 'যদি খোদা তাআলা আমাকে আরোগ্য দান করতে চান, তবে তাঁর সৃষ্টিতে আরো বহু ওষুধ আছে। আমি এই অপবিত্র বস্তু ব্যবহার করতে চাই না। আমি আল্লাহর 'কাজা ও কদরে', তাঁর নির্দেশ ও নিয়তিতে সম্পূর্ণ রাজি আছি। অবশেষে, কয়েকদিন পরে তিনি এই রোগে ইহধাম পরিত্যাগ করেন।[১] তাঁর মৃত্যু অবধারিত ছিল। কিন্তু তার ধর্মভীরুতার এই অভিব্যক্তি চিরস্মরণীয় হয়ে রয়েছে। তিনি মদপানের পরিবর্তে মৃত্যুকে বরণ করলেন। মৃত্যু থেকে অব্যহতি লাভের জন্য মানুষ কত কিছু করে থাকে। কিন্তু তিনি পাপে লিপ্ত হওয়া অপেক্ষা মৃত্যুকে শ্রেয় মনে করলেন। আক্ষেপ, ওই সকল নবাব, আমীর উমারা এবং ভূপতিগণের অবস্থার জন্য! এই কিছুদিনের জীবনে তারা আপন খোদা এবং তার আদেশাবলী সম্বন্ধে সম্পূর্ণ বেপরোয়া হন এবং খোদা তাআলার সাথে যাবতীয় সম্পর্ক ছিন্ন করে পাপাচারে নিমগ্ন থাকেন, পানির ন্যায় মদ পান করেন এবং এই প্রকারে

(১) মির্যা গুল্ মুহাম্মদ সাহেব যথাসম্ভব খ্রিষ্টীয় ১৮০০ সালে পরলোক গমন করেন। (সিরাতুল-মাহদী, ১ম খণ্ড, ১২৯ পৃঃ দ্রষ্টব্য)

নিজেদের জীবনকে নিতান্ত অশুচি ও অপবিত্র করে এবং স্বাভাবিক জীবনকাল থেকে বঞ্চিত ও নানা প্রকার ভয়ঙ্কর ব্যাধিগ্রস্ত হয়ে শীঘ্রই প্রাণত্যাগ করেন এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য অত্যন্ত ঘৃণিত অনুকরনীয় আদর্শ রেখে যান।'

মির্যা আতা মুহাম্মদ সাহেব :

"এখন, সার কথা, আমার প্রপিতামহ পরলোক গমনের পর তার স্থানে আমার দাদা সাহেব অর্থাৎ তাঁর সুযোগ্য পুত্র মির্যা আতা মুহাম্মদ সাহেব তার স্থলাভিষিক্ত হন। তার সময়ে খোদা তাআলার রহস্যময় বিজ্ঞতা ও বিশেষ উদ্দেশ্যে শিখগণ যুদ্ধে জয় লাভ করে। দাদা সাহেব মরহুম তার রিয়াসত রক্ষার্থে বহু চেষ্টা করেন। কিন্তু নিয়তি তাঁর অভিপ্রায়ের অনুকূলে না থাকায় অকৃতকার্য হন। পরিশেষে দাদা সাহেব মরহুমের কাছে কেবলমাত্র কাদিয়ান রয়ে গেল। কাদিয়ান তখন একটি দূর্গাকারের বসতি ছিল।[১] এর চারটি গম্বুজ ছিল। গম্বুজগুলোতে কিছু সিপাহী ও তোপ থাকত। চতুর্দিকে প্রায় বাইশ ফুট উঁচু প্রাচীরের বেষ্টনী ছিল। প্রাচীরগুলো এরূপ প্রশস্ত ছিল যে, তিনটি ঘোড়া অনায়াসে এগুলোর ওপর দিয়ে দৌড়ে যেতে পারত। ঘটনাক্রমে রামগড়িয়া নামের এক দল শিখ প্রথমে চক্রান্তপূর্বক অনুমতি নিয়ে কাদিয়ানে প্রবেশ করে। অত:পর এটা অধিকার করে বসে। তখন আমাদের পূর্বপুরুষগণের খুবই দুর্গতি হলো। ইস্রাইলী জাতির মত তাঁরা ধরা পড়লো এবং বন্দী হলো। তাদের ধনরত্ন সব লুট হলো। বহু মসজিদ ও ভাল ভাল বাড়িঘর ধুলিস্মাৎ করা হলো। অজ্ঞতা ও বিদ্বেষবশে বাগানগুলোকে কেটে ফেলা হলো। কোন কোন মসজিদকে ধর্মশালা অর্থাৎ শিখ মন্দিরে পরিণত করা হলো। তার মধ্যে একটি মসজিদ ঐভাবে এখনো শিখদের অধিকারে আছে। তখন আমাদের পূর্বপুরুষদের একটি পাঠাগারও ভস্মীভূত করা হয়। এতে হাতে লেখা পাঁচ'শ কপি কুরআন শরীফও অত্যন্ত বেয়াদবির সাথে পোড়ানো হয়। অবশেষে, শিখরা কিছুটা চিন্তা করে আমাদের পূর্বপুরুষদেরকে অন্যত্র চলে যাওয়ার নির্দেশ দিল এবং স্ত্রী পুরুষ সবাইকে ঘোড়ার গাড়িতে চড়িয়ে সেখান থেকে বের করে দিল। তারা পাঞ্জাবের একটি ক্ষুদ্র রাজ্যে আশ্রয় গ্রহণ করলেন।[৩] কিছুদিন পরে, ওই সব শত্রুর চক্রান্তের ফলে আমার দাদা সাহেবকে বিষ প্রয়োগ করা হলো।"

---

(১) কাদিয়ানের দুর্গে যাতায়াতের জন্য চারটি ফটক ছিল। এগুলোর নাম ছিল বাটালী দরজা, পাহাড়ি দরজা, মুরী দরজা এবং নাঙ্গী দরজা। (শেখ মাহমুদ আহমদ ইরফানী সাহেব মরহুম প্রণীত 'কাদিয়ান', প্রথম সংস্করণ, ৬ পৃ:)

(২) অনুমানিক ১৮০২ খ্রিষ্টাব্দ। ('কাদিয়ান' ৭৯ পৃ:)

(৩) অর্থাৎ, কপুরথলা রাজ্য।

মির্যা গোলাম মুর্তযা সাহেব :

"অত:পর, রণজিৎ সিংহের রাজত্বকালের শেষভাগে আমার ওয়ালেদ সাহেব (পিতা) মির্যা গোলাম মুর্তযা কাদিয়ানে প্রত্যাগমন করেন। পিতার গ্রামসমূহের মধ্যে পাঁচটি গ্রাম তিনি ফিরে পেলেন । কারণ, এই সময়ের মধ্যে রণজিৎ সিংহ অন্যান্য অধিকাংশ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্য হস্তগত করে একটি বড় রাষ্ট্র স্থাপন করেছিলেন। আমাদের সমস্ত গ্রামগুলিই রণজিৎ সিংহের করায়ত্ত ছিল। একদিকে লাহোর থেকে পেশাওয়ার পর্যন্ত এবং অপরদিকে লুধিয়ানা পর্যন্ত তার রাজ্য বিস্তৃত ছিল। যা হোক, আমাদের প্রাচীন রিয়াসতটি ভূলুণ্ঠিত হয়ে অবশেষে পাঁচটি গ্রাম মাত্র হাতে থাকলো। তবু পুরাতন বংশ হিসাবে আমার ওয়ালেদ সাহেব অর্থাৎ মির্যা গোলাম মুর্তযা এতদাঞ্চলে খ্যাতনামা ও ধনাঢ্য ব্যক্তি রইস ছিলেন। গভর্নর জেনারেলের দরবারে উপবেশনাধিকারী রাজন্যবর্গের অন্তর্ভুক্ত গণ্য করে তাকে সর্বদা আমন্ত্রণ করা হতো। স্যার ল্যাপেল গ্রীফিন সাহেবও তৎ-প্রণীত "পাঞ্জাবের রাজন্যবর্গের ইতিহাসে" তার বিষয়েও উল্লেখ করেছেন। যা হোক, তিনি শাসক কর্তৃপক্ষের দৃষ্টিতে অত্যন্ত প্রিয় ও শ্রদ্ধেয় ব্যক্তি ছিলেন। অনেক সময় তার মনোতুষ্টির উদ্দেশ্যে উচ্চ রাজকর্মচারিরা, যথা কমিশনার, ডেপুটি কমিশনার তার সাথে সাক্ষাৎ করার জন্য তার বাড়িতে আসতেন।"[১]

স্যার ল্যাপল গ্রিফিনের সাক্ষ্য :

আমাদের বিবেচনায়, এস্থলে স্যার ল্যাপল গ্রিফিনের বিবৃতিটি সন্নিবিষ্ট করলে অপ্রাসঙ্গিক হবে না। স্যার ল্যাপল তার লিখিত 'পাঞ্জাব চীফ্স' নামক পুস্তকে পাঞ্জাবের রাজন্যবর্গের ইতিহাসে হযরত আহমদ কাদিয়ানী (আ.) এর পরিবার সম্বন্ধে লিখেছেন :

"সম্রাট বাবরের রাজত্বের শেষ বছর অর্থাৎ ১৫৩০ খ্রিষ্টাব্দে হাদী বেগ নামক জনৈক সমরকন্দবাসী মুঘল স্বদেশ পরিত্যাগ করে পাঞ্জাবে আগমন করেন এবং গুরদাসপুর জেলায় বসতি স্থাপন করেন। তিনি কিছু লেখাপড়া জানতেন এবং কাদিয়ানের চতুর্পার্শ্বস্থ প্রায় ৭০টি[২] গ্রামের এক 'কাযী' অর্থাৎ ম্যাজিষ্ট্রেট নিযুক্ত হন। কথিত আছে, তিনি কাদিয়ান প্রতিষ্ঠা করেন এবং এর নাম ইসলামপুর কাজী রাখেন, যা ক্রমশ: পরিবর্তিত হয়ে কাদিয়ান নাম ধারণ করে।[৩] বহু পুরুষ

(১) 'কিতাবুল-বারিয়্যা,' প্রথম সংস্করণ, হাশিয়া, ১৩৪-৪৬ পৃ:।

(২) এটি ঠিক নয়, ৮৫টি গ্রাম ছিল। এ সম্বন্ধে আগে বলা হয়েছে। (গ্রন্থকার)

(৩) "পাঞ্জাব চীফস" পুস্তকে এই স্থানে টীকায় লিখিত আছে, "পাঞ্জাবী ভাষায় 'যাদ' (ض) অক্ষরের উচ্চারণ অধিকাংশ স্থলে আরবিতে 'দ' হয়ে পড়ে। যেমন, 'গুম্বজ-গুম্বদ', 'ওস্তাজ- ওস্তাদ'।"

ব্যাপী এই পরিবার বাদশাহের অধীনে সম্মানিত রাজকার্যে অধিষ্ঠিত ছিল। শিখদের অভ্যুত্থানের সময়ে তারা হীনদশাগ্রস্ত ছিলেন। গুল্ মুহাম্মদ ও তার পুত্র আতা মুহাম্মদ রামগড়িয়া ও কানহাইয়া শিখ দলগুলোর সাথে অবিরত সংগ্রামে লিপ্ত থাকেন। কাদিয়ানের পার্শ্ববর্তী স্থানগুলো এদের অধীনে ছিল। আতা মুহাম্মদ তার সমস্ত সম্পত্তিচ্যুত হয়ে বিগোয়ালে সর্দার ফতেহ্ সিংহ আহলুওয়ালিয়ার শরণার্থী হলেন এবং তার রক্ষণাধীনে তিনি বার বছর কাল নিরাপদে বসবাস করেন। তার মৃত্যুর পর রামগড়িয়া দলের রণজিৎ সিংহ সমস্ত জায়গীর হস্তগত করে এবং তিনি গোলাম মুর্তযাকে কাদিয়ানে ফিরে যাওয়ার জন্য আহ্বান করে তার পূর্ব-পুরুষদের জায়গীরের এক বৃহদাংশ তার হাতে সমর্পণ করেন। অত:পর, তিনি তার ভাইদের সহ মহারাজার সৈনিক বিভাগে যোগদান করেন এবং কাশ্মীর সীমান্তে ও অন্যান্য স্থানে যোগ্যতার পরিচয় দেন। নওনেহাল সিংহ, শের সিংহ এবং লাহোর দরবারের আমলে গোলাম মুর্তযা সর্বদা রণক্ষেত্রে কাজ করেছেন। ১৮৪১ খ্রিষ্টাব্দে জেনারেল ভেন্টুরার সাথে তাকে মণ্ডি ও কুলু পাঠানো হয়। ১৮৪০ সালে এক দল পদাতিক সৈন্যের অধিনায়করূপে তিনি পেশাওয়ার যান। হাজারার বিদ্রোহ দমনে তিনি বিশেষ দক্ষতার পরিচয় দেন। ১৮৪৮ সালের বিদ্রোহে তিনি তার সরকারের সাথে বিশ্বস্ততা রক্ষা করেন এবং সরকার পক্ষে যুদ্ধ করেন। তার ভাই গোলাম মুহিউদ্দীনও এই সময়ে উত্তম সামরিক কাজ সম্পাদন করেন। যখন দেওয়ান মূল সিংহের সাহায্যার্থে ভাই মহারাজ সিংহ সসৈন্যে মুলতানের দিকে অগ্রসর হচ্ছিলেন, তখন গোলাম মুহিউদ্দীন অন্যান্য জায়গীরদার লঙ্গর খাঁ সহিওয়াল এবং সাহেব খাঁ তিওয়ানাসহ মুসলমান অধিবাসীদেরকে উৎসাহিত করেন এবং মিস্র সাহেব দয়ালের বাহিনীর সাথে একযোগে বিদ্রোহীদেরকে আক্রমণ করে সম্পূর্ণরূপে পরাজিত করেন। চেনাব নদী ব্যতীত অপর কোন দিকে শত্রুদের পালাবার রাস্তা থাকলো না। শত্রুপক্ষের ছয়শ'র বেশি লোক পানিতে ডুবে মরলো।

"যখন ইংরেজ অধিকৃত দেশের সাথে পাঞ্জাবকেও সংযোজিত করা হলো তখন এই পরিবারের জায়গীরও বাজেয়াপ্ত হলো। কিন্তু সাতশ টাকার একটি পেনশন গোলাম মুর্তযা ও তার ভাইকে দেয়া হলো। কাদিয়ান ও পার্শ্বস্থ কয়েকটি গ্রামে তাদের মালিকী স্বত্ব বহাল থাকলো। ১৮৫৭ খ্রিষ্টাব্দে সরকারকে সিপাহী বিদ্রোহের সময় এই পরিবার প্রভূত সাহায্য করেন। মির্যা গোলাম মুর্তযা অনেক লোককে সেনাবাহিনীতে ভর্তি করে দেন। তার পুত্র গোলাম কাদের তখন জেনারেল নিকলসনের বাহিনীতে ছিলেন, যখন উক্ত সেনাপতি শিয়ালকোট থেকে পলাতক ৪৬ নং দেশীয় পদাতিক বিদ্রোহী বাহিনীকে ত্রিমুঘাটে ধ্বংস

করেন। জেনারেল নিকলসন গোলাম কাদেরকে একটি সনদ দেন। এতে লেখা আছে যে, ১৮৫৭ খ্রিষ্টাব্দে কাদিয়ানের পরিবার জেলার অন্যান্য পরিবার অপেক্ষা অধিক বিশ্বস্ততা রক্ষা করেছে।[১]"

নির্বাসনের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস :

উপরে একটি পাদটীকায় আমরা বলেছি, মির্যা গুল্‌মুহাম্মদ সাহেব ১৮০০ খ্রিষ্টাব্দে পরলোকগমন করেন। তার মৃত্যুর পর মির্যা আতা মুহাম্মদ সাহেবের সময়ে শিখরা বন্ধুত্বমূলক সাক্ষাতের ছলে ভিতরে প্রবেশ করে কাদিয়ান অধিকার করে[২] এবং মির্যা আতা মুহাম্মদ সাহেব পরিবার পরিজনসহ কপুরথলা রাজ্যের বিগোয়াল নামক স্থানে আশ্রয় গ্রহণ করতে বাধ্য হন। এটা ১৮০২ বা ১৮০৩ খ্রিষ্টাব্দের ঘটনা। রাজা ফতেহ্ সিংহ তখন কপুরথলার রাজা। তিনি মির্যা আতা মুহাম্মদ সাহেবকে সাদরে গ্রহণ করে প্রশস্ত অন্ত:করণের পরিচয় দেন। জীবিকা নির্বাহের জন্য তাকে দুটি গ্রাম দেয়ার আগ্রহ প্রকাশ করলে মির্যা সাহেব তাকে এই বলে প্রত্যাখান করলেন যে তিনি এই গ্রামগুলো গ্রহণ করলে তার সন্তানদের মনোবল হ্রাস পাবে এবং পারিবারিক স্মৃতি রক্ষার চিন্তা তাদের মন থেকে লোপ পেতে থাকবে।

মির্যা আতা মোহাম্মদ সাহেব নির্বাসিত অবস্থায় ক্রমাগত এগারো বছর ব্যাপী বহু কষ্টভোগের পর আনুমানিক ১৮১৪ খ্রিষ্টাব্দে কপুরথলাতেই মৃত্যবরণ করেন।[৩] তার পুত্র মির্যা গোলাম মুর্তযা সাহেব রাতের বেলায় তার জানাযা কাদিয়ানে নিয়ে আসেন এবং শিখদের বাধা দান সত্ত্বেও অত্যন্ত সাহসিকতার সাথে পারিবারিক কবরস্থানে তাকে সমাধিস্থ করেন। তার মৃত্যুর পর বাহ্যিকভাবে পরিবারটি সম্পূর্ণ নিরুপায় হয়ে পড়্লো। অল্প বিস্তর ২০ বছর পর্যন্ত এভাবে কাটলো কিন্তু এক্ষণে হযরত আকদাস মসীহ পাক (আ.) এর জন্মগ্রহণের সময় নিকটবর্তী হচ্ছিল। খোদা তাআলা অদৃশ্য হাত দিয়ে তাদের কাদিয়ান প্রত্যাবর্তনের ব্যবস্থা করলেন। ১৮৩৪ বা ১৮৩৫ খ্রিষ্টাব্দে মহারাজা রণজিৎ সিংহ তার পিতা হযরত মির্যা গোলাম মুর্তযা সাহেবকে কাদিয়ান রিয়াসতের পাঁচটি গ্রাম প্রদান করলেন। শিখ আমল পর্যন্ত অর্থাৎ ক্রমাগত চৌদ্দ বছর এই গ্রামগুলো তার কর্তৃত্বাধীনে থাকলো। কিন্তু ১৮৪৯ খ্রিষ্টাব্দের ২৭শে মার্চ, পাঞ্জাব প্রদেশ ইংরেজ শাসনাধীনে আসলে কোন কোন বিদ্রোহী সর্দারের জায়গীরগুলো

(১) 'পাঞ্জাব চীফস', ২য় খণ্ড, ৬৭-৬৮ পৃঃ।
(২) এই ব্যাপারে কোন কোন স্থানীয় মুসলমানও বিশ্বাসঘাতকতা করেছিল।
(৩) 'কাদিয়ান। ৭৮ পৃঃ।

সমেত কাদিয়ানের জায়গীরও কেড়ে নেয়া হলো। বদান্যতা স্বরূপ সাতশ' টাকার একটি মামুলী পেনশন মাত্র পরিবারটির জন্য ধার্য করা হলো। পাঞ্জাবে ইংরেজ শাসন সুপ্রতিষ্ঠিত হলে, তিনি তার দীর্ঘকালীন নীতি অনুযায়ী এই নতুন গভর্ণমেন্টকে পূর্ণ সহযোগিতা করেন। হযরত আকদাস (আ.) এর জীবনী আলোচনা প্রসঙ্গে আমরা স্থানে স্থানে তাঁর পিতার জীবনের প্রাসঙ্গিক কিছু অংশ নিয়েও আলোচনা করবো' "ইনশাআল্লাহ্"।

হযরত মির্যা গোলাম মুর্তযা সাহেবের বিবাহ

হযরত আহমদ কাদিয়ানী আলাইহেস সালাতু ওয়াস সালামের শ্রদ্ধেয় পিতা হযরত মির্যা গোলাম মুর্তযা সাহেবের বিবাহ হুশিয়ারপুর জেলার ইমামগণের একটি সম্মানিত মুঘল পরিবারে হয়েছিল। হযরত আকদাসের শ্রদ্ধেয়া মাতার নাম ছিল চেরাগ বিবি। পরিতোষ দৃষ্টি, আতিথেয়তা এবং দরিদ্র পালন তার চরিত্রের অন্যতম বৈশিষ্ট্য ছিল। তিনি গরিব মিসকিনকে বিশেষ যত্নসহকারে আহার করাতেন এবং অভাবগ্রস্ত ব্যক্তিগণের প্রয়োজনাদির প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখতেন। কোন দরিদ্র ব্যক্তির মৃত্যু হলে তৎক্ষণাৎ তার জন্য কাফন তৈরি করে তার ঘরে প্রেরণ করা তার চিরকালীন অভ্যাস ছিল।

হযরত মির্যা গোলাম মুর্তযা সাহেবের সন্তান

হযরত চেরাগ বিবি সাহেবার গর্ভে হযরত মির্যা গোলাম মুর্তযা সাহেবের পাঁচটি সন্তান জন্মগ্রহণ করেন।

(১) মুরাদ বিবি–হুশিয়ারপুরের মির্যা মুহাম্মদ বেগের সাথে তার বিয়ে হয়। এই মহিলা সত্য স্বপ্ন ও কাশফ দর্শন করতেন।

(২) মির্যা গোলাম কাদের সাহেব–ইনি হযরত আকদাসের (আ.) বড় ভাই ছিলেন। ইংরেজ সরকারের অধীনে তিনি কিছু সম্মানজনক রাজকার্যে অধিষ্ঠিত ছিলেন। এরপর নিজ জেলা অর্থাৎ গুরদাসপুরের জেলা দপ্তরের সুপারিন্টেনডেন্ট পদেও সমাসীন থাকেন। প্রসঙ্গক্রমে এই পুস্তকের নানা স্থানে আমরা তার সম্বন্ধে আলোচনা করবো।

(৩) তার আরো একটি পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। কিন্তু কিছুকাল পরেই তার মৃত্যু হয়।

(৪) জান্নাত বিবি–এই কন্যা হযরত আকদাসের (আ.) সঙ্গে যমজ জন্মগ্রহণ করেন জন্মের কয়েকদিন পর তার মৃত্যু হয়।

(৫) হযরত মির্যা গোলাম আহমদ সাহেব কাদিয়ানী মসীহ মাওউদ ও মাহদী মাসঊদ আলাইহেস্ সালাতু ওয়াস্ সালাম, যাঁর সাথে এখন বিশ্বের ভাগ্য জড়িত।

হযরত আকদাসের বংশ তালিকা :

বিশেষ দ্রষ্টব্য :

(১) হযরত আকদাস (আ.) মুহাম্মদ সুলতানের বংশধর ছিলেন বলে এখানে শুধুমাত্র তারই বংশধরদের সংক্ষিপ্ত তালিকা সন্নিবিষ্ট হয়েছে। বিস্তারিত বিবরণের জন্য 'সিরাতুল-মাহদী', সাহেবজাদা হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব (মাদ্দা-যিল্লুহুল আলী) প্রণীত, প্রথম সংস্করণ, ১১৬ পৃঃ দেখুন।

(২) মির্যা ফয়েয মুহাম্মদ সাহেবের পরবর্তী অবস্থা বিস্তারিতভাবে জানা যায়। এজন্য তার পরবর্তী বংশ তালিকাও দেয়া হল।

হযরত আকদাস মির্যা গোলাম আহম্‌দ (আ.) এর জন্ম :

শিখ আমলে হযরত আকদাসের জন্ম হয়। তখন জন্মের দিক, ক্ষণ, তারিখের কোন সঠিক কাগজপত্র রাখা হতো না। তাদের পরিবারও তখন উদ্বেগময় অবস্থায় ছিল। একারণে সনদরূপে গৃহীত হতে পারে এরূপ কোন দলিল পাওয়া যায় না, যার উপর নির্ভর করে জন্ম তারিখ সঠিকরূপে নিরূপণ করা যায়। অবশ্য, ইদানিং হযরত সাহেবজাদা মির্যা বশীর আহমদ সাহেব এম, এ, হযরত আকদাসের কোন কোন লেখা এবং কিংবদন্তী অনুযায়ী নির্ধারণ করেন যে, হযরত আকদাস ১৩ই ফেব্রুয়ারি ১৮৩৫ খ্রিষ্টাব্দ মোতাবেক ১৪ই শাওয়াল ১২৫০ হিজরী শুক্রবার ফজরের নামাযের সময় ভূমিষ্ট হন। একথা বিশেষ রূপে উল্লেখযোগ্য যে, তাঁর (আ.) জন্মের সঙ্গে সঙ্গেই তাঁর (আ.) পরিবারের নির্বাসন অবস্থা ও অর্থ-কষ্ট দূরীভূত হয়।

আমরা বলেছি হুযুর যমজ জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ভূমিষ্ট হওয়ার আগে যে কন্যা সন্তানটি জন্মগ্রহণ করে, কয়েকদিন পরেই তার মৃত্যু হয়। এই ঘটনার প্রতি ইঙ্গিত করে তিনি কখনো কখনো বলতেন, "আমার মনে হয়, এই প্রকারে খোদা তাআলা আমার মধ্য থেকে নারীসুলভ স্বভাব সম্পুর্ণরূপে দূরীভূত করেন।" তাঁর যমজ জন্মগ্রহণ করার মধ্যে আরো একটি বিষয় নিহিত ছিল। এতে সেই ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হলো, যা কোনো কোনো ইসলামী পুস্তকে লিখিত ছিল, অর্থাৎ, প্রতিশ্রুত মাহদী যমজ জন্মগ্রহণ করবেন।[১]

---

(১) 'ফসুসুল্-হেকাম', হযরত মুহিউদ্দীন ইবনে আরবি প্রণীত, ১৩০৮ হিজরী সালে মুদ্রিত মৌলানা আল্-ফায়েল মুহাম্মদ মুবারক আলীর অনুবাদ ৩৬ পৃঃ।

হযরত আকদাসের জন্মগ্রহণের কয়েক বছর আগে তের শতাব্দীর মুজাদ্দেদ হযরত সৈয়দ আহমদ বেরেলবী (রহমতুল্লাহে আলাইহে) এবং হযরত ইসমাঈল শহীদ সাহেব হাজারা জেলার অন্তর্বর্তী বালাকোট নামক স্থানে শহীদ হয়েছিলেন এবং ইংরেজ শাসন শক্তির অধীনে খ্রিষ্টান ধর্ম বন্যার ন্যায় পাঞ্জাব ব্যতীত ভারতবর্ষের অবশিষ্ট সমগ্র অংশকে গ্রাস করতে চলেছিল। এর পরেই পাঞ্জাবের পালা ছিল। খ্রিষ্টানরা সর্বপ্রথমে, ঠিক ১৮৩৫ খ্রিষ্টাব্দে, অর্থাৎ হযরত আকদাস (আ.) এর জন্ম বছরে লুধিয়ানায় তাদের প্রথম প্রচার মিশন কায়েম করে। সুতরাং তা কেমন ঐশী হস্তক্ষেপ ছিল যে, একদিকে ক্রুশীয় ধর্ম প্রচারের ব্যবস্থা হওয়ার সঙ্গেই অপর দিকে খোদা তাআলা এই ফিৎনার অঙ্কুর বিনাশের উদ্দেশ্যে ক্রুশ-ভঙ্গকারীকে নিকটবর্তী এক জেলায় আবির্ভূত করলেন। অত:পর, এই ক্রুশ ভঙ্গকারী যখন দীক্ষা গ্রহণ করার জন্য আদিষ্ট হলেন, তখন তিনি সর্বপ্রথম বয়আত নিবার স্থান হিসাবে লুধিয়ানাকেই মনোনীত করলেন।

হযরত আকদাসের শৈশব :

একটি ফারসি প্রবাদ আছে, "হোনহার দারাখত কে চিক্‌নে চিক্‌নে পাত।" ঠিক এই প্রবাদ বাক্য অনুযায়ী হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আ.) এর শৈশবও অতিশয় পবিত্র এবং উজ্জ্বল ছিল। অন্য ছেলেমেয়েদের সাথে অনর্থক খেলাধুলা বা দুষ্টামিতে যোগদান করা তাঁর অভ্যাস ছিল না।[১] নবীগণের চিরন্তন রীতি অনুযায়ী একবার তাঁর ছাগল চরাবার সুযোগ ঘটে ছিল। তা এরূপে ঘটে–একবার তিনি গ্রামের বাইরে এক কূপের উপর বসেছিলেন। বাড়ি থেকে তাঁর কোন জিনিস আনার প্রয়োজন হলো। এক ব্যক্তি পাশেই ছাগল চরাচ্ছিল। তিনি তাকে বললেন, "তুমি আমাকে বাড়ি থেকে অমুক জিনিস এনে দাও।" সেই ব্যক্তি বলল, আমার ছাগলগুলো দেখবে কে।" তিনি বললেন, "তুমি যাও, আমি এগুলো দেখবো।" তদনুযায়ী তিনি তার ছাগলগুলো চরাতে লাগলেন এই প্রকারে খোদা তাআলা এক হিসাবে নবীদের নীতি (সুন্নত) তাঁর দ্বারা পালন করালেন।[২]

তার জীবন চরিত লেখক, সেলসেলার সুপ্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক হযরত শেখ ইয়াকুব আলী ইরফানী সাহেব (রাযি আল্লাহু আনহু) তাঁর শৈশবের একটি অত্যাশ্চর্য জনক ঘটনা লিখেছেন। একবারে ছোটবেলাতেই একজন সমবয়স্কা মেয়েকে (পরে যার সাথে তাঁর বিয়ে হয়) তিনি বলতেন, "দোয়া কর যেন খোদা আমাকে

(১) 'আল্-হাকাম; ১৪ই জুন, ১৯৩২ খ্রিষ্টাব্দ ১০ম পৃঃ।
(২) 'সিরাতুল মাহদী', ১ম খণ্ড, দ্বিতীয় সংস্করণ, ২৫০ পৃঃ।

নামায পড়ার সৌভাগ্য দেন।"[১]

তাঁর পবিত্র স্বভাব, সাধু চরিত্র ও অভ্যাসের জন্যই যে কেউ তাকে অন্তর্চক্ষু দিয়ে দেখেছেন সে-ই তাঁর ভক্ত হয়েছেন। বেলুচিস্তান নিবাসী মিঞা মুহাম্মদ হুসায়েন সাহেব নামক একজন আহমদী শিক্ষক বলেন, "আমাকে মৌলবী বুরহানুদ্দীন সাহেব (রাযি আল্লাহু আনহু) বলেছেন যে, একবার হযরত মসিহ্ মাওউদ আলাইহেস সালাতু ওয়াস সালাম, কিল্লা মিঞাসিংহের মৌলবী গোলাম রসুল সাহেবের কাছে গিয়েছিলেন। তখন হুযুর কেবল বালকমাত্র। ওই মজলিসে কোন বিষয় নিয়ে আলোচনা হচ্ছিল। কথা প্রসঙ্গে মৌলবী গোলাম রসুল সাহেব বললেন, **এ জামানায় কোন নবী হওয়ার থাকলে, এই ছেলে নবুয়তের যোগ্য।** মৌলবী গোলাম রসুল সাহেব একজন অলি ও কেরামতসম্পন্ন ব্যক্তি ছিলেন। তিনি হযরত মসীহ মাওউদ আলাইহেস সালাতু ওয়াস্ সালামের দেহে স্নেহ-ভরে হাত বুলাতে বুলাতে এই কথা বলেছিলেন। মৌলবী বুরহানুদ্দীন সাহেব (র.) বলেন যে, তিনি নিজে ওই মজলিসে উপস্থিত ছিলেন।"[২]

হযরত আকদাসের শিক্ষা :

ইংরেজ শাসনের আগে পাঞ্জাবে শিখ-রাজত্ব ছিল। শিক্ষার প্রতি শিখ-গভর্ণমেন্টের আদৌ কোন দৃষ্টি ছিল না। দেশের সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিরা আপন আপন ঘরেই শিক্ষকদেরকে গৃহ-শিক্ষকরূপে রাখতেন। ইংরেজ আমলের প্রাথমিক যুগেও শিক্ষার ব্যাপারে অল্প–বিস্তর এই ব্যবস্থাই প্রচলিত ছিল। হযরত আকদাস (আ.) এর শিক্ষার জন্যও এমন ব্যবস্থা করা হয়েছিল। হযরত নিজেই তাঁর প্রাথমিক শিক্ষার বিষয় বর্ণনা করেছেন। এজন্য হুযুরের ভাষাতেই এর উল্লেখ সমীচীন মনে করি। হুযুর বলেন : "আমার বয়স যখন ৬/৭ বছর, তখন একজন ফারসি ভাষাবিদ্ আমার জন্য উপযুক্ত বেতনে শিক্ষক নিযুক্ত করা হয়। তিনি কুরআন শরীফ এবং কিছু ফারসি কেতাব আমাকে পড়িয়েছিলেন। এই বুজুর্গের নাম ছিল ফযলে ইলাহী। আমার বয়স আনুমানিক দশ বছরের সময় একজন আরবি ভাষাবিদ মৌলবী সাহেব আমার শিক্ষার জন্য নিয়োজিত হন। তার নাম ছিল ফযল আহমদ। আমার মনে হয় আমার শিক্ষা খোদা তাআলার 'ফযলের' তার বিশেষ কৃপার একটা প্রাথমিক বীজ থাকার ফলে সেই শিক্ষকদের নামের প্রথম শব্দও ফযলই ছিল। উপরোক্ত মৌলবী সাহেব একজন দীনদার ও বুজুর্গ ব্যক্তি ছিলেন। তিনি অত্যন্ত মনোযোগ ও পরিশ্রমের সাথে আমাকে

(১) 'হায়াতুননবী' ১ম খন্ড, ২য় সংখ্যা, ১৫৮ পৃঃ।
(২) 'রাওয়াইয়াতে সাহাবা', (অপ্রকাশিত) খন্ড ১২,১০৪-১০৫ পৃঃ।

পড়াতেন। আমি আরবি-ব্যাকরণের ছারফের কোন কোন কেতাব এবং নহবের কোন কোন নিয়মাবলী তার কাছে পাঠ করি। পরে আমার বয়স যখন ১৭/১৮ বছর হলো, তখন আরও একজন মৌলবী সাহেবের কাছে কয়েক বছর শিক্ষা লাভের সুযোগ ঘটেছিল। তার নাম ছিল গুল্ আলী শাহ্। তাকেও ওয়ালেদ সাহেব বেতনভুক্ত করে আমাকে কাদিয়ানে পড়াবার জন্য নিয়োগ করেন। এই শেষোক্ত মৌলবী সাহেবের কাছে আমি নহব, যুক্তি বিজ্ঞান এবং দর্শন শাস্ত্র প্রভৃতি প্রচলিত জ্ঞানবিজ্ঞান, যতখানি খোদা তাআলা চাইলেন অর্জন করলাম। চিকিৎসা শাস্ত্রের কোন কোন কিতাব আমি ওয়ালেদ সাহেবের কাছে পাঠ করি। চিকিৎসা বিদ্যার দিক থেকে তিনি একজন সুনিপুণ চিকিৎসক ছিলেন।"[১]

এই বিবৃতিতে যে তিনজন শিক্ষকের কথা বর্ণিত হয়েছে তাদের মধ্যে প্রথম শিক্ষক অর্থাৎ মৌলবী ফযল ইলাহী সাহেব কাদিয়ানের বাসিন্দা এবং হানাফী ছিলেন। দ্বিতীয় শিক্ষক, অর্থাৎ মৌলবী ফযল আহ্মদ সাহেব গুজরানওয়ালা জেলার অন্তর্গত ফিরোযওয়ালার অধিবাসী ছিলেন। তিনি আহলে হাদিস সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন। তৃতীয় শিক্ষক মৌলবী গুল্ আলী শাহ্ বাটালাবাসী এবং শিয়া সম্প্রদায়ের ছিলেন।[২] মোট কথা খোদা তাআলা তার শিক্ষার জন্য এমন সব শিক্ষক নিয়োজিত করে ছিলেন, যাঁরা মুসলমানগণদের প্রসিদ্ধ সম্প্রদায়গুলোর অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। এমন করার কারণ এই যে তাঁর উপর অদূর ভবিষ্যতে মুসলমানদের সংস্কারের সুমহান কার্যভার ন্যস্ত হওয়ার ছিল। এই ব্যবস্থার ফলে, তিনি এসব শিক্ষকদের কাছে থেকে প্রত্যেক সম্প্রদায়ের ধর্ম বিশ্বাস ও ক্রিয়া-কর্ম, আকায়েদ ও আমল সম্বন্ধে বেশ কিছুটা জানতে পেরেছিলেন।

প্রচলিত খেলায় অংশ গ্রহণ :

আমরা যে সময়ের কথা নিয়ে আলোচনা করছি, সে সময়ে সাধারণত কুস্তি, কাবাডি, মুগুর ভাঁজা এবং ভার মুগুর উত্তোলনের ব্যায়াম ও খেলা প্রচলিত ছিল। কর্মহীন লোকদের মধ্যে পাখি ধরা, পাখি পালন এবং মোরগ লড়াই-এর সাধারণ প্রচলন ছিল। হযরত আকদাস (আ.) শেষোক্ত যাবতীয় আমোদ-প্রমোদগুলো স্বভাবত পছন্দ করতেন না। তথাপি নির্দিষ্ট সীমানার মধ্যে থেকে তিনি নিয়মিত শরীর চর্চা এবং ক্রীড়া-কৌতুকে অংশ গ্রহণ করতেন। বাল্যকালে তিনি সাঁতার কাটা শিখেন। কখনও কখনও কাদিয়ানের পুকুরগুলোতে তিনি সাঁতার কাটতেন

(১) 'কিতাবুল্-বারিয়া,' ১৪০-৫০ পৃঃ।
(২) 'হায়াতুন্-নবী,' ১ম জেল্ফ, ৫১ পৃঃ।

এবং প্রথম জীবনে ঘোড়ায় চড়াও শিখেছিলেন। এতে তিনি বিশেষ পারদর্শিতা লাভ করেন। কিন্তু তাঁর বিশেষ ব্যায়াম ছিল পায়ে হাঁটা চলা। শেষ বয়স পর্যন্ত তিনি তা কায়েম রেখে ছিলেন। ভ্রমণার্থে অনেক দূর দূরান্তে হেঁটে যেতেন এবং অত্যন্ত দ্রুত হাঁটতেন।[১]

প্রথম বিয়ে :

পনের ষোল বছর বয়সে তাঁর পরম ভক্তিভাজন পিতা তাঁর বিয়ে তাঁর আপন মামা মির্যা জমিয়ত বেগ মরহুমের মেয়ে হুরমত বিবির সাথে সম্পাদন করেন। এটা তাঁর প্রথম বিয়ে। এই বিয়ের ফলে তাঁর দুই পুত্র–মির্যা সুলতান আহমদ সাহেব এবং মির্যা ফযল আহমদ সাহেব যথাক্রমে সম্ভবত ১৮৫৩ খ্রিষ্টাব্দে এবং ১৮৫৫ খ্রিষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। মির্যা ফযল আহমদ সাহেব বহুকাল পরে নিঃসন্তান অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেন। কিন্তু হযরত মির্যা সুলতান আহমদ সাহেব ইংরেজ সরকারের অধীনে বিভিন্ন রাজকার্যে অধিষ্ঠিত থেকে ডেপুটি কমিশনরের পদে উন্নীত হন এবং অবশেষে বাহাওয়ালপুর রাজ্যের অর্থমন্ত্রীরূপে অবসর গ্রহণ করেন। পেনশন প্রাপ্তির অল্পকাল পর তিনি তাঁর ছোট ভাই হযরত মির্যা বশীরুদ্দীন মাহমুদ আহমদ খলিফাতুল মসিহ সানী আইয়াদাহুল্লাহু তাআলার হাতে বয়আত করে আহমদীয়া সেলসেলায় যোগদান করেন। তিনি শুধু একজন সুযোগ্য রাজকর্মচারীই ছিলেন না, পক্ষান্তরে তিনি একজন প্রসিদ্ধ লেখক এবং বহু গ্রন্থের প্রণেতা ছিলেন। তাঁর প্রণীত প্রায় ৫০টি পুস্তক মুদ্রিত হয়ে প্রকাশিত হয়েছে। একথা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য যে, তাঁর জেষ্ঠ পুত্র হযরত মির্যা আযীয আহমদ সাহেব এম এ বাল্যকালেই পিতামহ হযরত মসীহে মাওউদ আলাইহেস সালাতু ওয়াস্ সালামের হাতে বয়আত করেন। তিনি এডিএম পদ্ থেকে অবসর গ্রহণ করে পেনশন পেয়েছেন। এখন তিনি সিলসিলার কেন্দ্রে নাযেরে আলার পদে নিযুক্ত আছেন। খোদা তার আয়ুতে বরকত দিন। তার সমগ্র জীবন অত্যন্ত আন্তরিকতা এবং ধর্ম পরায়ণতার সাথে কাটিয়ে যাচ্ছেন। চাকরি জীবনে সততা, ন্যায়, নিষ্ঠা, কর্তব্যপরায়ণতা, এবং সুবিচারের অত্যুচ্চ আদর্শ স্থাপন করেছেন।

হযরত আকদাসের নির্জনপ্রিয়তা :

দেশের সাধারণ নিয়মের বিপরীতে বিয়ের পরেও হযরত আকদাসের নির্জন প্রিয়তায় তিলমাত্র প্রভেদ ঘটেনি। কাদিয়ানের নিকটবর্তী একজন হিন্দু জাট বলতেন যে, হযরত মির্যা সাহেব থেকে তিনি ২০ বছরের বড় ছিলেন। বড় মির্যা

(১) 'সিলসিলা আহমদীয়া,' হযরত সাহেবজাদা মির্যা বশীর আহমদ সাহেব প্রণীত, ১০ পৃঃ।

সাহেবের[১] কাছে প্রায়ই তার আসা-যাওয়া ছিল। তার সামনে বহুবার এরূপ ঘটেছে যে কোন উচ্চ রাজকর্মচারী বা রইস "বড় মির্যা সাহেবের" সাথে সাক্ষাতের জন্য আগমন করলে কথা প্রসঙ্গে তারা জিজ্ঞাসা করেন "মির্যা সাহেব, আপনার বড় ছেলের (অর্থাৎ মির্যা গোলাম কাদের সাহেবের) সঙ্গেতো সাক্ষাৎ হয় কিন্তু আপনার ছোট ছেলের সঙ্গে কখনও হয় না।" তখন তিনি উত্তর দিতেন, "হাঁ, আমার দ্বিতীয় পুত্র গোলাম কাদেরের ছোট। কিন্তু সে নির্জনেই থাকে।" তারপর, তিনি কাউকে পাঠিয়ে 'মির্যা সাহেবকে' ডেকে আনতেন। তিনি আনত নয়নে উপস্থিত হতেন এবং পিতার পাশে সামান্য ব্যবধানে বসতেন। অধিকাংশ সময় মুখের উপর বাম হাত রাখা তাঁর অভ্যাস ছিল। তিনি কোন কথা বলতেন না। কারো প্রতি তাকাতেন না। "বড় মির্যা" সাহেব বলতেন, "এখন তো এই নববধূকে দেখলেন।" আরো বলতেন, "আমার এই ছেলে 'মুসীতার'।[২] সে চাকরিও করে না, কোন উপায়-উপার্জনও করে না।" তারপর, তিনি হেসে বলতেন, "চল, তোমাকে কোন মসজিদে ইমাম করে দেই। এতে অন্তত দশ মণ শস্য খাবার জন্য ঘরে আসবে।" এই উপাখ্যান বলার পর সেই জাট বলতেন, "আজ তিনি জীবিত থাকলে দেখতে পেতেন যে, ইনি কেমন শাহানশাহ্ রূপে নিজগৃহে সমাসীন এবং কত শত শত লোক দূর-দূরান্ত থেকে তাঁর দরজায় গোলামীর জন্য আসে।"[৩]

অত্যধিক পড়াশুনা :

পাঠ হিসাবে, সর্বাপেক্ষা অধিক তিনি কুরআন মজীদ তেলাওয়াত করতেন। এমন কি, কোন কোন দর্শক বলেন, "আমরা তাঁকে সদা কুরআন করীম পাঠে রত দেখেছি।"

তার জ্যেষ্ঠ পুত্র হযরত মির্যা সুলতান আহমদ সাহেব বর্ণনা করেন যে, "হযরত আকদাসের কাছে একটি কুরআন মজীদ ছিল। তিনি এটি পাঠ করতেন এবং চিহ্নিত করতে থাকতেন।" তিনি আরো বলেন, "আমি কোন প্রকার অতিশয়োক্তি না করেই বলতে পারি যে, সম্ভবতঃ দশ হাজার বার তিনি তা পাঠ করেছিলেন।"[৪] কিতাব পাঠে তিনি এরূপ নিমগ্ন থাকতেন যে, তখন তাঁর বাহ্যজ্ঞান বিলুপ্ত হয়ে যেত।

---

(১) হযরত মির্যা গোলাম মুর্তযা সাহেব।

(২) ইহা একটি পাঞ্জাবী ভাষার শব্দ। এর দ্বারা এরূপ ব্যক্তিকে বুঝায়, যিনি তার অধিকাংশ সময় মসজিদে নামায এবং কুরআন শরীফ পাঠে অতিবাহিত করেন।

(৩) "তাযকেরাতুল-মাহদী," দ্বিতীয় খণ্ড, ৩০ পৃঃ।

(৪) 'হায়াতুন-নবী,' ১ম খন্ড, ১০৮ পৃঃ।

এপ্রসঙ্গে হযরত আকদাস (আ.) স্বয়ং বলছেন :

“ঐ সময়ে কিতাব দেখার প্রতি আমার এরূপ ঝোঁক ছিল, যেন আমি এ জগতে থাকতাম না। পাছে স্বাস্থ্যহানি হয় এই ভয়ে আমার ওয়ালেদ সাহেব আমাকে অত্যন্ত সহানুভূতির সাথে বার বার এই উপদেশই দিতেন যে, পুস্তক পাঠ কমানো উচিত।[১]

মামলা-মোকাদ্দমা তদ্‌বির

হযরত আকদাসের পরম ভক্তিভাজন পিতা হযরত মির্যা গোলাম মুর্তযা সাহেব দেখলেন যে তিনি ধর্মগ্রন্থসমূহ পাঠ এবং নামায, রোযা প্রভৃতি ঐশী নির্দেশাবলী পালনে নিমগ্ন থাকেন, কিন্তু সাংসারিক ব্যাপারে একজন জমিদার হিসাবে তাঁর কাছে যে সকল কাজ-কর্ম আসত, তিনি ওই সব বিষয়ে সম্পূর্ণ উদাসীন থাকতেন। এজন্য তাঁর চিন্তা হতো তার অবর্তমানে এই পুত্র অগ্রজের গলগ্রহ না হয়ে পড়েন।[২] সুতরাং, মোকাদ্দমাদির তদ্‌বিরের জন্য তিনি তাঁকে আদেশ দিতেন। তিনি পিতার আদেশ পালনের ইচ্ছায় ওই সব মোকাদ্দমা পরিচালনা কাজে ব্রতী হতেন সত্য, কিন্তু স্বভাবতঃ তিনি এই কাজ অপছন্দ করতেন। তিনি নিজেই লিখেছেন :

“আমার ওয়ালেদ সাহেব পিতৃ-পিতামহদের গ্রামসমূহ পুনরুদ্ধারের উদ্দেশ্যে ইংরেজ আদালতে মোকাদ্দমা পরিচালনা করলেন। তিনি তার সেবায় আমাকেও নিয়োজিত করেছিলেন। এক সুদীর্ঘ সময় আমি সব কাজে ব্যাপৃত ছিলাম। আমার দুঃখ হয়, আমার বহু সময় এই সমস্ত নিরর্থক বিবাদে নষ্ট হল। একই সঙ্গে ওয়ালেদ সাহেব জমিদারীর বিষয়াদির তত্ত্বাবধানের নিমিত্তে আমাকে নিযুক্ত করলেন। আমি এরূপ রুচি ও স্বভাবসম্পন্ন ব্যক্তি ছিলাম না। এজন্য প্রায়ই ওয়ালেদ সাহেব অসন্তুষ্ট হতেন। আমার প্রতি তার সহানুভূতি ও দয়া অত্যন্ত বেশি ছিল। কিন্তু তিনি চাইতেন যে, সাধারণ মানুষের ন্যায় আমিও ঘর-সংসারের প্রতি আকৃষ্ট হই। কিন্তু আমার মন এ বিষয় সম্পূর্ণ বিমুখ ছিল। একবার একজন কমিশনার কাদিয়ান আসতে চাইলেন। আমার ওয়ালেদ সাহেব কয়েকবার আমাকে বললেন, তাঁর অভ্যর্থনার্থে দুই তিন ক্রোশ এগিয়ে গিয়ে তাকে নিয়ে আসা উচিত। কিন্তু একাজ করতে আমার মনে অত্যন্ত ঘৃণা জন্মাল এবং আমি অসুস্থও ছিলাম তাই আমি যেতে পারিনি। সুতরাং, এই বিষয়টিও

(১) ‘কিতাবুল-বারিয়্যা,’ দ্বিতীয় সংস্করণ, পাদটিকা ১৫০ পৃঃ।

(২) হযরত খলিফাতুল মসিহ সানী আইয়্যেদাহুল্লাহু-তাআলা বেনাসরিহিল আযীয কর্তৃক বিবৃতি, ‘আল-হাকাম,’ ‘সিরাতে মাসিহ মাওউদ সংখ্যা,’ ৫পৃঃ মে- জুন ১৯৪৩ যুক্ত সংখ্যা।

তার অসন্তুষ্টির কারণ হল। তিনি চাচ্ছিলেন আমি সাংসারিক কাজকর্মে প্রতি মুহূর্ত লিপ্ত থাকি। আমার দ্বারা তা হচ্ছিল না। তথাপি আমি মনে করি যে, আমি সদুদ্দেশ্যে পৃথিবীর জন্য নয়, শুধু পিতার আজ্ঞানুবর্তিতায় পুণ্যার্জণের নিমিত্তে আমি ওয়ালেদ সাহেবের সেবায় সম্পূর্ণরূপে আত্মনিয়োগ করেছিলাম এবং তাঁর জন্য দোয়ায় মশগুল থাকতাম। তিনি আন্তরিক বিশ্বাসের সাথে আমাকে মাতৃ-পিতৃ-ভক্ত বলে জানতেন। বহু সময় বলতেন, 'আমি শুধু দয়াপরবশ হয়ে আমার এই ছেলেকে সাংসারিক বিষয় কর্মের প্রতি মনোযোগী করতে চাই। না হয়, আমি জানি যেদিকে তার মন পড়ে আছে, অর্থাৎ ধর্মের দিকে- প্রকৃত ও সত্য বিষয় তাই। আমরা আমাদের জীবন অযথা নষ্ট করছি।"[১]

ধর্ম ইতিহাস পাঠে স্পষ্টত: জানা যায় যে, আল্লাহ্ তাআলা যাঁদের উপর মানব জাতির সংস্কারের দায়িত্ব অর্পণের অভিপ্রায় করেন, প্রত্যাদিষ্ট করার আগে তাঁদেরকে এমন সব অবস্থার মধ্য দিয়ে পরিচালিত করেন, যার অভিজ্ঞতা বিশ্ব-সংস্কারের কাজে নানা প্রকার সাহায্য করে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ, হযরত আকদাসের অবস্থার প্রতিই দৃষ্টিপাত করুন। তাঁর সময়ে ন্যায় বিচার লাভের জন্য ইংরেজ আদালতগুলো প্রতিষ্ঠিত হয়। এই সব বিচারালয়ে উভয় পক্ষের উকিলেরা সাধারণত: সত্যবাদিতা, সততা ও সাধুতাকে জলাঞ্জলি দিয়ে মোকাদ্দমা পরিচালনা করতেন। তিনি এর বিপরীত, মোকাদ্দমা পরিচালনায় এমন অতুলনীয় আদর্শ স্থাপন করেন যে কেউ বলতে পারতো না তিনি কোন মোকাদ্দমায় বিন্দুমাত্র সত্যের অপলাপ করেছেন। পরবর্তী পৃষ্ঠাগুলো থেকে এটা সুস্পষ্ট হবে যে, তিনি এব্যাপারে এক প্রকার অতুলনীয় আদর্শ স্থাপন করে গেছেন। তাঁর অতি বড় শত্রুও এটা অস্বীকার করতে পারেনি যে, তিনি এ ক্ষেত্রে অতি মহান আদর্শ রেখে গেছেন।

আপাতত: এই ব্যাপারে তাঁর 'মামুরিয়ত' বা প্রত্যাদিষ্ট হওয়ার পূর্বেকার কয়েকটি ঘটনা উদাহরণ হিসাবে উপস্থিত করছি।

(এক) এক মোকাদ্দমার তদ্‌বিরের জন্য তাঁকে লাহোর যেতে হয়েছিল। লাহোরে তিনি সৈয়দ মুহাম্মদ আলী শাহ্ সাহেবের বাড়িতে অবস্থান করেন। শাহ্ সাহেব কাদিয়ানের একজন সম্ভ্রান্ত রইস ছিলেন। বন বিভাগে চাকরি বশত: লাহোরে বাস করতেন। চীফ কোর্টে মোকাদ্দমা ছিল। শাহ্ সাহেবের কর্মচারী হযরত আকদাসের জন্য খাবার পৌছাতেন। একদিন লোকটি খাবার ফেরত নিয়ে আসলো। শাহ সাহেব জিজ্ঞাসা করলেন, "মির্যা সাহেব কি খাবার খাননি?"

(১) 'কিতাবুল্-বারিয়্যা', টিকা, ১৫০-৫২ পৃঃ

লোকটি প্রত্যুত্তর করল, "তিনি বলেছেন, পরে গিয়ে খাবার খাবেন।" অল্পক্ষণ পরেই তিনি অত্যন্ত প্রফুল্লমুখে শাহ্ সাহেবের বাড়ি পৌঁছলেন। শাহ সাহেব জিজ্ঞাসা করলেন, "আপনি আজ এত প্রফুল্ল কেন? কি ফয়সালা হয়েছে?" তিনি বললেন, "মোকদ্দমা খারিজ হয়ে গেছে। কিন্তু আল্লাহ্ তাআলার শোকর যে, ভবিষ্যতে তা আর চলবে না।"[১] এ সংবাদে শাহ্ সাহেব অত্যন্ত দুঃখিত হলেন। কিন্তু তিনি একটুও বিচলিত হলেন না। কোন সংসারী লোক হলে, উচ্চ আদালতে মোকাদ্দমায় পরাজয় হওয়াতে তার দুঃখ ও মনোকষ্টের অন্ত থাকত না। কিন্তু তিনি আনন্দ উপভোগ করলেন। আল্লাহ্ তাআলার কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করলেন। মোকাদ্দমা থেকে অব্যাহতি পেয়ে খোদা তাআলার প্রতি মনোনিবেশের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে।

(দুই) হযরত আকদাস বলেন :
"আমি বাটালায় একটি মোকাদ্দমার তদ্‌বিরের জন্য গিয়েছিলাম। নামাযের সময় হলো। আমি নামায পড়তে লাগলাম। চাপরাশী ডাক দিল। আমি নামাযরত ছিলাম। এমন সময়ে প্রতিপক্ষ উপস্থিত হল। তারা এক তরফা রায়ের মাধ্যমে লাভবান হতে চাইল এবং এর উপর অত্যন্ত জোর দিল। কিন্তু আদালত তা গ্রাহ্য করলেন না। তিনি মোকাদ্দমা তাদের বিরুদ্ধে নিষ্পত্তি করলেন। ডিক্রি আমার পক্ষে হল। আমি নামাযের পর উপস্থিত হলাম। তখন আমার খেয়াল ছিল, সম্ভবত: বিচারক আইনের চোখে আমার অনুপস্থিতিকে দেখেছেন। কিন্তু আমি উপস্থিত হয়ে যখন বললাম আমি নামায পড়ছিলাম, তখন তিনি বললেন, 'আমি তো আপনার পক্ষে ডিক্রি দিয়েছি।"[২]

(তিন) হযরত আকদাসের বয়স যখন পঁচিশ বা ত্রিশ বছর, তখন একটি গাছ কাটা নিয়ে প্রজাদের সাথে তাঁর শ্রদ্ধেয় পিতার বিবাদ দেখা দেয়। ভক্তিভাজন পিতার মতে ভূমির মালিকানা স্বত্ব মূলে গাছেরও তিনি মালিক। এজন্য প্রজাদের বিরুদ্ধে দাবি করে তিনি মোকাদ্দমা দায়ের করেন। হুযুরকে মোকাদ্দমা পরিচালনার জন্য গুরুদাসপুর পাঠান হল। তাঁর সঙ্গে দুই জন সাক্ষীও ছিল। তিনি খাল পার হয়ে পাঠানওয়ালা গ্রামে ক্লান্তি নিবারণের জন্য একটু বসলেন এবং সঙ্গীদেরকে সম্বোধন করে বললেন, "ওয়ালেদ সাহেব অযথা দুশ্চিন্তা করেন, গাছ ক্ষেতের মত। এরা দরিদ্র ব্যক্তি। যদি কেটে নেয়, তাতে ক্ষতি কি? আমি আদালতে একথা বলতে পারব না যে, গাছগুলো সম্পূর্ণ আমাদের। অবশ্য, আমাদের অংশ থাকতে পারে।" তাঁর উপর প্রজাদেরও অগাধ বিশ্বাস

(১) 'হায়াতুন-নবী,' প্রথম খন্ড, ৫৭ পৃ:
(২) 'হায়াতুন্-নবী,' প্রথম খন্ড, ৫৬ পৃষ্ঠাঃ

ছিল। ম্যাজিষ্ট্রেট প্রজাদেরকে প্রকৃত ব্যাপার কি জিজ্ঞাসা করলে তারা নি:সঙ্কোচে বললো, "মির্যা সাহেবকেই জিজ্ঞাসা করুন।" ম্যাজিষ্ট্রেট জিজ্ঞাসা করলে তিনি বললেন, "আমার মতে গাছ ক্ষেতের মত। ক্ষেতে যেমন আমাদের অংশ আছে, তেমনি গাছেও অংশ আছে।" তাঁর এই উক্তির ফলে ম্যাজিষ্ট্রেট প্রজাদের পক্ষে মিমাংসা করলেন। বাড়ি আসার পর তাঁর ওয়ালেদ সাহেব বৃত্তান্ত অবগত হয়ে তাঁর প্রতি অসন্তুষ্ট হলেন।[১]

বিনয় ও উন্নত চরিত্র :

হযরত আকদাসের জ্যেষ্ঠ পুত্র হযরত মির্যা সুলতান আহমদ সাহেব মরহুম (রাযি.) বলতেন, "ওয়ালেদ সাহেব একজন মুঘলের ন্যায় জীবনযাপন করেননি, ফকিরের ন্যায় জীবন অতিবাহিত করেন।"[২]

কাদিয়ানের কানাইলাল পোদ্দারের বিবৃতি :

"একবার হযরত মির্যা সাহেবকে বাটালা যেতে হয়েছিল। তিনি আমাকে 'এক্কা' করে দিতে বললেন। খালের ওপর পৌঁছে হুযুরের স্মরণ হলো ঘরে কোন জিনিস ফেলে এসেছেন। তিনি এক্কাওয়ালাকে সেখানে রেখে পায়ে হেঁটে ঘরে ফিরে আসলেন। পুলের উপর এক্কাওয়ালা অন্য যাত্রী পেয়ে বাটালা চলে গেল। মির্যা সাহেব সম্ভবত: পায়ে হেঁটেই বাটালা গিয়েছিলেন। তখন আমি এক্কাওয়ালাকে ডেকে মার দিয়ে বললাম, 'হতভাগা, মির্যা নেযাম দ্বীন হলে তোকে সেখানে তিন দিন বসে থাকতে হলেও বসে থাকতি। কিন্তু ইনি সাধু ও দরবেশ প্রকৃতির মানুষ বলে তুই তাঁকে ফেলে চলে গেলি'? যখন মির্যা সাহেব এ বিষয় জানতে পারলেন, তিনি ডেকে আমাকে বললেন 'সে আমার জন্য কিভাবে বসে থাকতো? সে ভাড়া পেয়েছে চলে গেছে'।"[৩]

হযরত আকদাসের এক খাদেম মির্যা ইসমাইল বেগ-এর সাক্ষ্য এই : "হযরত আকদাস প্রত্যাদিষ্ট হওয়ার আগে তাঁর শ্রদ্ধেয় পিতার আদেশে যখন মোকাদ্দমা পরিচালনার জন্য যেতেন, তখন আরোহণের জন্য সঙ্গে ঘোড়াও থাকত। আমিও প্রায়ই সঙ্গে থাকতাম। কিন্তু তিনি পায়ে হেঁটেই রওয়ানা হতেন এবং আমাকে ঘোড়ার উপর সওয়ার করাতেন। আমি বারংবার অস্বীকার করে বলতাম, 'হুযুর আমার লজ্জা বোধ হয়।' তিনি বলতেন :

(১) মিঞা আল্লাহ ইয়ার ঠিকাদার সাহেবের বর্ণনা, 'রাওয়াইয়াতে সাহাবা,' নবম খণ্ড, ১৯২-৯৩ পৃ:।
(২) 'সিরাতুল্-মাহদী,' প্রথম খন্ড, দ্বতীয় সংস্করণ, ২১৯ পৃ:।
(৩) 'আল্-হাকাম,' সিরাতে মসিহ মাওউদ সংখ্যা, মে-জুন ১৯৪৩ খ্রিষ্টাব্দ।

'পায়ে হেঁটে চলায় আমার লজ্জা হয় না, ঘোড়ায় চড়তে তোমার লজ্জা কিসের'? কাদিয়ান থেকে রওয়ানা হওয়ার সময় সর্বদা হযরত আমাকে প্রথমে ঘোড়ায় চড়াতেন। অল্প বিস্তর অর্ধেক পথ যাওয়ার পর আমি ঘোড়া থেকে নামতাম এবং তিনি সওয়ার হতেন। সেভাবে, আদালত থেকে ফেরার সময় প্রথমে আমাকে আরোহণ করাতেন। পরে নিজে আরোহণ করতেন। তখন ঘোড়া যে চালে চলতো সেই চালেই চলতে দেয়া তাঁর রীতি ছিল'।[১]

মির্যা দ্বীন মুহাম্মদের বিবৃতি :

"আমি প্রথমে হযরত মসিহ মাওঊদ আলাইহেস্ সালাতু ওয়াস্ সালামের সাথে পরিচিত ছিলাম না। অর্থাৎ, তাঁর খেদমতে যাওয়ার অভ্যাস আমার ছিল না। হযরত নির্জনে, নিরুদ্দেশের ন্যায় জীবনযাপন করতেন। তিনি নামায রোযার পাবন্দ এবং শরীয়ত-প্রিয় লোক ছিলেন। এই গুণই আমাকে তাঁর কাছে পৌঁছাল। আমি তাঁর খেদমতে থাকতে লাগলাম। যখন মোকাদ্দমার তত্ত্বাবধানের জন্য যেতেন, তখন ঘোড়ার ওপর তাঁর সাথে আমাকে পেছনে বসাতেন এবং বাটালা পৌঁছে নিজেদের বাসভবনে ঘোড়া বাঁধতেন। এই বাসভবনে একটি উপরতলার কক্ষ ছিল। তিনি তাতে অবস্থান করতেন। এই বাড়ি দেখাশোনার কাজ একজন তত্ত্বাবধায়কের ওপর ছিল। সে একজন গরিব লোক ছিল। তিনি সেখানে পৌঁছে দুই পয়সার রুটি আনাতেন। এটা তাঁর নিজের জন্য আনা হত। তার মধ্যে একটি রুটির এক-চতুর্থাংশের এক টুকরা পানিসহ খেতেন। অবশিষ্ট রুটি, ডাল যা সঙ্গে থাকত তা সেই তত্ত্বাবধায়ককে দিতেন। আমাকে খাওয়ার জন্য চার আনা দিতেন। তিনি অতি অল্প খেতেন। তাঁর কোন প্রকার রসনা বিলাসের অভ্যাস ছিল না।"[২]

আঁ-হযরত (সা.) এর জিয়ারত :

১৮৬৪ অথবা ১৮৬৫ খ্রিষ্টাব্দে যখন তাঁর বয়স ত্রিশ কি একত্রিশ তখন তিনি আঁ–হযরত (স.) কে দর্শন করেন। আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের প্রতি তখন তাঁর যে প্রেম এবং প্রীতি ছিল তা এই কাশফ বা জাগ্রত স্বপ্নের মাধ্যমে প্রকাশিত হয়। এটা তাঁর গৌরবোজ্জ্বল ভবিষ্যৎ নির্দেশ করে। এজন্য পাঠক-পাঠিকাকে হুযুরের রুহানী মোকাম অর্থাৎ আধ্যাত্মিক মর্যাদার সাথে

(১) 'আল্-হাকাম,' ২১ শে-২৮শে মে ১৯৩৪ খ্রিষ্টাব্দ।
(২) 'হায়াতে আহমদ', দ্বিতীয় খন্ড, ১৯৬ পৃঃ।

পরিচিত করার উদ্দেশ্যে তা এখানে বর্ণনা করা সমীচীন বলে মনে করি। হুযুর বলেন :

"যৌবনের শুরুতে এক রাতে আমি স্বপ্নে দেখলাম আমি এক জাঁকজমকপূর্ণ বাড়িতে আছি। তা অত্যন্ত পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ছিল। এর মধ্যে আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের সম্বন্ধে চর্চা হচ্ছিল। আমি লোকদেরকে জিজ্ঞাসা করলাম, 'হুযুর কোথায়'? তারা একটি কামরার প্রতি ইশারা করল। আমি অন্যান্য লোকজনের সাথে ভিতরে গেলাম। আমি হুযুরের খেদমতে পৌঁছলে, হুযুর অত্যন্ত সন্তুষ্ট হলেন। তিনি আমার সালামের উৎকৃষ্ট উত্তর দিলেন। তাঁর রূপ, সৌন্দর্য ও কমনীয়তা এবং তাঁর স্নেহভরা দৃষ্টি আমার এখনও স্মরণ আছে। আমি তা কখনো ভুলতে পারব না। তাঁর প্রেম আমাকে বিমুগ্ধ করল। তাঁর অপরূপ সুন্দর চেহারা আমাকে বিমোহিত করল। তখন তিনি আমাকে বললেন, 'আহমদ, তোমার ডান হাতে কি আছে? আমি ডান হাতের দিকে তাকিয়ে দেখলাম, আমার হাতে একটি কিতাব আছে এবং তা আমারই রচিত বলে মনে হলো। আমি নিবেদন করলাম, 'হুযুর এটা আমার রচিত একটি গ্রন্থ'।[১] 'আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এই কিতাবটি দেখে আরবি ভাষায় জিজ্ঞাসা করলেন, 'তুমি এর নাম কি রেখেছ? এই অধম নিবেদন করলো, 'এই কিতাবের নাম আমি 'কুতবী' রেখেছি। যা হোক, আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ওই কিতাবটি আমার কাছে থেকে নিলেন। কিতাবটিতে আমাদের হযরত মুকাদ্দাস নবীর পবিত্র হাতের স্পর্শ লাগামাত্র তা একটি অতিশয় মনোরম ও সুন্দর ফলে পরিণত হল। এটি দেখতে পেয়ারার মত ছিল। কিন্তু আকারে তরমুজের সমান ছিল। আঁ-হযরত (স.) যখন এই ফলটি বিতরণ করার উদ্দেশ্যে ফালা ফালা করতে চাইলেন, তখন তা থেকে এত মধু নির্গত হতে লাগলো যে, আঁ-হযরতের (স.) পবিত্র হাত কনুই পর্যন্ত মধুময় হয়ে গেল। তখন একটি মৃত ব্যাক্তি, যে দরজার বাইরে পড়ে ছিল, আঁ-হযরতের মুজেযায় সঞ্জীবিত হয়ে এই অধমের পিছনে এসে দাঁড়াল। হাকিমের সামনে বিচারপ্রার্থীর মতো এই অধম আঁ-হযরতের (স.) সম্মুখে দাঁড়িয়ে ছিলাম। আঁ-হযরত মহা গৌরবান্বিত ও প্রতাপান্বিত বিচারকর্তারূপে এক মহাবীরের মত আসন অলঙ্কৃত করছিলেন।

তারপর সারকথা এই যে, আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম আমাকে ফলটির এক ফালি এই উদ্দেশ্যে দিলেন যেন আমি সেই পুনর্জ্জীবিত ব্যক্তিকে দিই। বাকি টুকরাগুলো তিনি আমার আঁচলে রাখলেন। আমি সেই টুকরাটি ওই

(১) 'আয়নায়ে কামালাতে ইসলাম', ৫৪৮-৪৯ পৃঃ।

নবজীবনপ্রাপ্ত ব্যাক্তিকে দিলাম। সে তা তৎক্ষণাৎ খেয়ে ফেললো।[১] আমি দেখলাম, এর ফলে আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের আসন উর্ধে উত্থিত হয়ে (কক্ষের) ছাদ স্পর্শ করল। আমি দেখলাম তখন, তাঁর পবিত্র চেহারা এমন দীপ্তিময় হয়ে উঠল, মনে হলো এর উপর সূর্য ও চাঁদের আভা নিপতিত হয়েছে। আমি আনন্দে বিভোর হয়ে তাঁর পবিত্র চেহারার প্রতি চেয়ে থাকলাম এবং আমার চোখ দিয়ে অশ্রু নির্গত হতে লাগলো। তারপর আমি জাগ্রত হলাম। আমি তখনো কাঁদছিলাম এবং আল্লাহ্ তাআলা আমার হৃদয়ে সংকেত দিলেন যে সেই মৃত ব্যক্তি ইসলাম এবং আল্লাহ্ তাআলা তাকে আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের রুহানী কল্যাণে এখন আমার হাতে সঞ্জীবিত করবেন। আল্লাহুমা সাল্লে আলা মুহাম্মাদেও ওয়া বারেক্ ওয়াসাল্লেম, ইন্নাকা হামীদুম্ মাজীদ।"[২]

পিতা-পুত্রে বাদানুবাদ :

হযরত আকদাসের শ্রদ্ধেয় পিতার তীব্র আকাঙ্ক্ষা ছিল তাঁর পুত্র শুধু কুরআন মজীদ ও অন্যান্য ধর্ম পুস্তক পাঠেই নিমগ্ন না থাকুক বরং কোন সম্মানজনক রাজকার্যে অধিষ্ঠিত থেকে ভবিষ্যৎ সংসার জীবনেও উন্নতি লাভ করুক। এই উদ্দেশ্যে তিনি কয়েকবার চাকরির দিকে তাঁর মনোযোগ আকর্ষণ করতে চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু প্রতিবারই তাঁর ধর্মানুরাগ এবং সাংসারিক কাজ-কর্মে নি:স্পৃহ দেখতে পেয়ে ক্ষান্ত হয়ে যেতেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ, একবারের ঘটনা, একজন ইংরেজ অফিসার গুরদাসপুর জেলায় আগমন করেন। তিনি তাঁর পিতার পূর্ব পরিচিত। পিতা একে বড় সুযোগ মনে করে কাহলোয়ান গ্রামের একজন শিখ ঝাণ্ডা সিংহকে বললেন, যাও, গোলাম আহমদকে ডেকে আন। আমার পরিচিত একজন ইংরেজ হাকিম জেলায় এসেছেন। সে ইচ্ছা করলে তাকে কোন ভাল চাকরি নিয়ে দিতে পারে। ঝাণ্ডা সিংহ বলেনঃ "আমি মির্যা সাহেবের কাছে গিয়ে দেখলাম চার দিকে পুস্তক রাশির স্তূপের মধ্যে বসে কিছু পাঠ করছেন। আমি বড় মির্যা সাহেবের বার্তা পৌঁছালাম। মির্যা সাহেব হেসে প্রত্যুত্তর করলেন, 'যেখানে চাকরি নেয়ার ছিল, আমি নিয়ে নিয়েছি'। বড় মির্যা সাহেব বললেন, 'বাস্তবিক চাকরি নিয়েছ'? মির্যা সাহেব বললেন, 'হাঁ' নিয়েছি'। এতে বড় মির্যা সাহেব বললেন, আচ্ছা, যদি চাকরি নিয়ে থাকে, তবে ভাল'।[৩] বুদ্ধিমান পিতা তার ভাগ্যবান পুত্রের সংকেত উত্তমরূপে বুঝতে পারতেন। যখন তিনি জানালেন

(১) 'বারাহীনে-আহ্মদীয়া', তৃতীয় খণ্ড, ২৪৮-৪৯ পৃঃ পাদটীকার টীকা।
(২) 'আয়নায়ে কামালাতে ইসলাম', ৫৪৮-৪৯ পৃঃ।
(৩) 'সিরতুল-মাহদী', প্রথম খণ্ড, প্রথম সংস্করণ, ৪৮ পৃঃ।

যে পার্থিব কোন চাকরির তার প্রয়োজন নেই, তিনি একমাত্র পরম আরাধ্যের চাকরি গ্রহণ করেছেন। তাঁর শ্রদ্ধাভাজন পিতা সাথে সাথে এটা হৃদয়ঙ্গম করলেন এবং বললেন যে বাস্তবিক, চাকরি নিয়ে থাকলে ভাল। কিন্তু তা এত সাময়িক উচ্ছ্বাস ছিল, যার প্রভাবে তাঁর ওয়ালেদ সাহেব চুপ হয়ে গেলেন। না হয় তাঁর আকাঙ্ক্ষা এটাই ছিল যে পারিবারিক প্রভাব প্রতিপত্তি বজায় রাখার জন্য পুত্র কোন না কোন স্থানে চাকরি গ্রহণ করে পার্থিব ঐশ্বর্য লাভ করুক। বস্তুত:, তাঁকে চাকরির উদ্দেশ্যে কোন কোন স্থানে প্রেরণ করাও হয়েছিল। কিন্তু কোথাও তার মন টিকলো না। অবশ্য, ভবিষ্যৎ জীবনে আল্লাহ্ তাআলার পক্ষ থেকে তাঁর উপর যে মহান কার্যভার ন্যস্ত হওয়া নির্ধারিত ছিল, তৎসংক্রান্ত বিষয়ে তিনি বহু অভিজ্ঞতা লাভ করলেন।

শিয়ালকোটে চাকরি :

১৮৬৭ খ্রিষ্টাব্দের নিকটবর্তী সময়ে অনিচ্ছা সত্ত্বেও কয়েক বছর তাঁকে সরকারি চাকরি করতে হয়েছিল। এই চাকরির ফলে তিনি চার বছর শিয়ালকোট অবস্থান করেন। সেখানে যে অভিজ্ঞতা লাভ করেন, সে প্রসঙ্গে তিনি বলেনঃ

"এই অভিজ্ঞতা দ্বারা আমি জানতে পারলাম যে, অধিকাংশ চাকরিজীবি অত্যন্ত গর্হিত জীবনযাপন করেন। তাদের মধ্যে অতি অল্পসংখ্যক লোকই পুরোপুরী নামায-রোযা পালন করেন এবং পরীক্ষার সময়–যা তাদের জন্য উপস্থিত হয়- অবৈধ আনন্দ থেকে আত্মরক্ষা করেন। সর্বদা আমি তাদের মুখ দেখে আশ্চার্যান্বিত হয়েছি। অধিকাংশকেই দেখেছি বৈধ বা অবৈধভাবে অর্থোপার্জনের মধ্যেই তাদের সম্যক আকাঙ্ক্ষা সীমাবদ্ধ। বহুজনেরই দিবারাত্রির যাবতীয় চেষ্টা শুধু এই সাময়িক জীবনের পার্থিব উন্নতির জন্য নিবদ্ধ থাকতে দেখেছি। আমি চাকরিজীবিদের মধ্যে খুব অল্পসংখ্যক লোক এমন পেয়েছি যারা শুধু খোদা তাআলার মহিমা স্মরণপূর্বক উন্নত চরিত্র, গাম্ভীর্য, দয়া, দাক্ষিণ্য, সততা, সংযম, বিনয় ও নম্রতা, সৃষ্ট জীবের প্রতি সহানুভূতিশীলতা, পবিত্র চিত্ততা, বৈধ আহার, সত্যবাদিতা এবং পরহেজগারির গুণে গুণান্বিত। অধিকাংশকেই অহঙ্কার, অনাচার, ধর্ম বিষয়ে বেপরোয়া এবং নানা প্রকার হীন চরিত্রে শয়তানের ভাই হিসেবে দেখেছি। যেহেতু আল্লাহ্ তাআলার এই হেকমত ছিল যে, সব প্রকার সব রকম মানুষের সম্পর্কে আমার অভিজ্ঞতা লাভ হয়, সে জন্য আমাকে সব ধরনের লোকের সাথে বাস করতে হয়েছে।[১]"

(১) 'কিতাবুল্-বারিয়্যা', দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৫৩-১৫৪ পৃঃ।

"চাকরি কারাগার" :

শিয়ালকোটের চাকরির সময়ে একবার তাঁর শ্রদ্ধেয়া মাতা হায়াত নামে জনৈক নাপিত এর মাধ্যমে তাকে চার জোড়া কাপড় প্রেরণ করেন। দানশীল স্বভাব বশতঃ তা থেকে এক জোড়া বস্ত্র তিনি ওই নাপিতকে প্রদান করলেন, অথচ এটা বিশেষ যত্ন সহকারে তাঁর জন্যই তৈরি করা হয়েছিল। নাপিত কথা প্রসঙ্গে তাঁকে চাকরি সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করলো যে, চাকরিটি কি তাঁর পছন্দ হয়েছে? তিনি বললেন, "এটিতো কারাগার বিশেষ"।[১]

আল্লাহ্ তাআলা কর্তৃক বিপদ থেকে রক্ষা করার অলৌকিক ঘটনা :

শিয়ালকোট যাওয়ার পর প্রথমদিকে তাকে ঝাণ্ডানওয়ালায় দোতালা ঘরের একটি কক্ষে বাস করতে হয়। এই কক্ষের বারান্দা ভূপতিত হওয়া এবং মোজেযা স্বরূপ তাঁর কল্যাণে বসবাসরত ব্যক্তিদের সবারই রক্ষা পাওয়ার ঘটনা উল্লেখ প্রসঙ্গে হযরত আকদাস বলেন "এক রাতে এক বাড়ির উপর তালায় আমি ঘুমাচ্ছিলাম। একই কক্ষে আমার সাথে পনেরো ষোল ব্যক্তি ঘুমাচ্ছিল। রাতে ছাদের কড়িকাঠে কড়কড় শব্দ হচ্ছিল। আমি সবাইকে জাগিয়ে বললাম কড়িকাঠের অবস্থা আশঙ্কাজনক মনে হচ্ছে। এখান থেকে বের হওয়া জরুরি। তারা বললেন, মনে হয়, কোন ইঁদুর হবে। ভয়ের কোন কারণ নেই। এই বলে তারা ঘুমিয়ে পড়লেন। কিছুক্ষণ পরে আবার ঐধরনের শব্দ হল। তখন আমি তাদেরকে আবার জাগিয়ে তুললাম। কিন্তু তবু তারা ভ্রূক্ষেপ করলেন না। তৃতীয় বার কড়িকাঠে আবার শব্দ হলো। তখন আমি তাদের সবাইকে জোর করে উঠিয়ে ঘর থেকে বের করে দিলাম। সবাই বেরিয়ে যাওয়ার পর আমিও সেখান থেকে বের হলাম। আমি সিঁড়ির দ্বিতীয় ধাপে পা দেয়া মাত্র ছাদটি নিচে ধসে পরলো এবং দ্বিতীয় ছাদটিসহ ভূপতিত হল। বলপূর্বক সবাইকে বের করায় সবাই রক্ষা পেল।[২]

শিয়ালকোটের কিছু কিছু ঘটনা :

দ্বিতল ঘর ধসে পরার পর হযরত আকদাস কিছু সময় কাশ্মীরী মহল্লায় বাস করেন। অবশেষে শিয়ালকোটের জামে মসজিদের সামনে হাকিম মনসব আলী সাহেব দলিল লেখকের সাথে একটি বৈঠকখানায় কিছুদিন থাকেন। তিনি মিঞা ফযল দ্বীন সাহেবের কনিষ্ঠ ভাই উমরা নামক এক কাশ্মীরীর বাড়িতে বাস

(১) 'সিরতুল্-মাহদী', প্রথম খণ্ড, ২৩৬ পৃঃ।
(২) 'হায়াতুন্-নবী', প্রথম জেল্‌দ, দ্বিতীয় নং ১৭০ পৃঃ।

করতেন। স্বয়ং গ্রন্থকারের এই বাড়ি দেখার সুযোগ হয়েছিল ১৯৪০ খ্রিষ্টাব্দে। মিঞা ফযল দ্বীন সাহেবের আত্মীয়দের মধ্যে কেউ আমাকে বলেছিল বা, হযরত সাহেব সম্বন্ধে জ্ঞাত ছিলো যে, তিনি কোর্ট থেকে এসে দরজায় প্রবেশের পর পিছনে তাকিয়ে দরজার কপাট বন্ধ করতেন না, কারণ পিছনের তলার কোন অপরিচিত স্ত্রীলোকের প্রতি নজর না পড়ে। ঘরে প্রবেশ করে প্রথমে দুই হাত পিছনে দিকে করে প্রথমে দরজা বন্ধ করতেন, তারপর ফিরে শিকল লাগাতেন। অত:পর ঘরে কুরআন মজীদ পাঠ এবং নামাযে দীর্ঘ সেজদা করা ছাড়া তাঁর কোন কাজ ছিল না। কোন কোন আয়াত লিখে দেয়ালে ঝোলাতেন এবং পরে ওগুলো সম্বন্ধে চিন্তা করতে থাকতেন। কোন কোন সময় অফিসের কাজে কোন জমিদার তার বাড়িতে এসে সাক্ষাৎ করতে চাইলে তিনি মিঞা ফযল দ্বীন সাহেবকে বলতেন, "মিঞা ফযল দ্বীন তাদেরকে বলে দিন যে, আমি তাদের কাজ অফিসেই করে দিব। এখানে স্মরণ করিয়ে দেয়ার প্রয়োজন নেই।

জনসেবার প্রেরণাও তাঁর অন্ত:করণে অত্যন্ত প্রবল ছিল। মাসব্যাপী চাকরির পর অফিস থেকে যে বেতন তিনি ঘরে আনতেন, তা থেকে খাবার ইত্যাদি বাবদ সামান্য খরচ হাতে রেখে অবশিষ্ট টাকা দিয়ে মহল্লার বিধবা ও অভাবগ্রস্ত ব্যক্তিদের কাপড় তৈরি করে দিতেন বা নগদ বন্টন করতেন।[১] চিকিৎসা শাস্ত্রেও তাঁর যথেষ্ট ব্যুৎপত্তি ছিল। যে রোগীই আসত, তিনি তার চিকিৎসা করতেন এবং আরোগ্য লাভের জন্য আল্লাহ্ তাআলার কাছে দোয়া করতেন।

ভারতবর্ষকে খ্রিষ্টান করার দৃঢ় সঙ্কল্প ও এতে শিয়ালকোটের ভূমিকা :

১৮৫৭ খ্রিষ্টাব্দে সিপাহী বিদ্রোহের পর ইংরেজরা ভালোভাবে বুঝতে পারল শাসন ব্যবস্থা এবং প্রচার শক্তির মাধ্যমে এদেশবাসীকে খ্রিষ্টান করতে না পারলে পুনরায় বিদ্রোহজনক অবস্থার সৃষ্টি হওয়া বিচিত্র নয়। এই উদ্দেশ্যে লণ্ডনে বড় বড় পরিকল্পনা প্রণয়ন হতে লাগল। বৃটিশ পার্লামেন্টের একজন সদস্য মি: এঙ্গেলস ওই সময়ে খ্রিষ্টানদের উদ্দেশ্যে একটি প্রানোদ্দীপক বক্তৃতায় বলেন :

"খোদা তাআলা আমাদেরকে সুদিন দিয়েছেন এবং ভারত সাম্রাজ্যকে ইংল্যাণ্ডের অধীন করে দিয়েছেন যেন যিশু খ্রীষ্টের বিজয় পতাকা ভারতের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত উড্ডীন হয়। ভারতবর্ষকে খ্রিষ্টান করার মহান কাজকে পূর্ণতা দান করার উদ্দেশ্যে প্রত্যেকেরই তাবৎ শক্তি ব্যয় করা কর্তব্য। এতে কোন প্রকার শৈথিল্য করা উচিত নয়।"

---

(১) 'সিরাতুল-মাহদী', তৃতীয় খণ্ড, ৯৪ পৃ:।

১৮৬২ খ্রিষ্টাব্দে ইংল্যেণ্ডের প্রধানমন্ত্রী লর্ড পামষ্টিন এবং ভারত সচিব চার্লস উডের কাছে একটি প্রতিনিধি দল উপস্থিত হয়। লর্ড সভা এবং সাধারণ সভার সদস্যগণ ছাড়াও আরও অনেক গণ্যমান্য ব্যক্তি এতে ছিলেন। ইংল্যাণ্ডের সর্ব প্রধান পাদ্রী কেন্টারবারীর আর্চ বিশপ এই প্রতিনিধিদের পরিচয় করিয়ে দেন। ভারত সচিব এই প্রতিনিধিদেরকে লক্ষ্য করে বলেন:

"আমার প্রত্যয় আছে যে, ভারতবর্ষে খ্রিষ্টধর্মে দীক্ষা গ্রহণকারী প্রত্যেক নব খ্রিষ্টান ইংল্যাণ্ডের সাথে এক নতুন একতাসূত্রে আবদ্ধ হবে এবং বৃটিশ সাম্রাজ্যকে সুদৃঢ় করার জন্য সে এক নতুন গ্রন্থিস্বরূপ হবে।[১]

খ্রিষ্টানদের প্রধান প্রধান মণ্ডলি গুলোর এ প্রকার চেষ্টা-চরিত থেকে স্পষ্টত: প্রতীয়মান হয় যে, খ্রিষ্টান জাতি মনে করেছিলো তারা খ্রিষ্টান ধর্মের প্রচারে পুরোপুরি জোর দিলে অল্পকালের মধ্যেই তারা তাদের অভিপ্রায়ে সিদ্ধি লাভ করতে পারবে এবং দেশের অধিকাংশ অধিবাসীকে খ্রিষ্টান করে সাম্রাজ্যকে দৃঢ় ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করতে সমর্থ হবে। পাঞ্জাবের মিশন গুলোর মধ্যে শিয়ালকোট মিশনের একটি দেদীপ্যমান বিশেষত্ব ছিল। কারণ, এই মিশন দেশ রক্ষার এক বিশেষ পরিকল্পনা অনুসারে স্থাপিত হয়। হযরত আকদাসের দ্বারা ক্রুশ ভঙ্গ করার কাজ গ্রহণ করা আল্লাহ তাআলার অভীষ্ট ছিল। এজন্য তিনি তাঁর প্রকৃতির মধ্যে খ্রিষ্টান ধর্মের প্রতিকূলে এক অসাধারণ উদ্যমের সৃষ্টি করেন এবং প্রারম্ভ কাল থেকেই এর জন্য সুযোগ উপস্থিত করতে থাকেন।

পাদ্রী বাটলার সাহেব এম. এ.'র উপর হযরত আকদাসের ব্যক্তিত্বের প্রভাব :

যে সব পাদ্রী সাহেবের সাথে তাঁর ধর্ম বিষয়ে মত বিনিময়ের সুযোগ হয়েছিল, তার মধ্যে পাদ্রী বাটলার সাহেব এম. এ. শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি ছিলেন। তাঁর বক্তৃতা ও যুক্তিসমূহ পাদ্রী সাহেবের হৃদয়ে এমনভাবে প্রভাব বিস্তার করেছিল যে, তিনি প্রায়ই কাচারির শেষ সময়ে হযরত আকদাসের কাছে উপস্থিত হয়ে তাঁর সাথে আলাপ করতেন তাঁর বাসস্থান পর্যন্ত যেতেন এবং অত্যন্ত হৃষ্টচিত্তে সেই ছোট গৃহটিতে তাঁর সঙ্গে বসতেন। কোন কোন সঙ্কীর্ণ-চেতা খ্রিষ্টান পাদ্রী সাহেবকে এতে বাধা প্রদান করলো এবং বললো যে এটা তাঁর পক্ষে মানহানিকর এবং

---

(১) 'উলামা-এ-হক্ আওর উনকে মুজাহাদানা কারনামা জমিয়তুল- উলামা-এ-হিন্দের নাজেম মৌলানা সৈয়দ মিঞা সাহেব প্রণীত, ২৫-২৬ পৃ:।

(২) The Mission by R. Clerk 1904 Page 234 (vide Life of Ahmad, by A.R. Dard M.A. Ex. Muslim Missionary, London.)

মিশনের পক্ষেও অপমানজনক। কিন্তু পাদ্রী সাহেব একান্ত গম্ভীর ও শান্তভাবে প্রত্যুত্তর করলেন :

"তিনি একজন মহামানব। তিনি অতুলনীয়। তোমরা তা বুঝতে পারনা। আমি বেশ বুঝি।"১

খ্রিষ্টীয় মতবাদের ক্রম:বর্ধমান প্লাবনের প্রতিরোধ :

শিয়ালকোটে অবস্থান কালে খ্রিষ্টান ধর্মের ক্রম:বর্ধমান প্লাবনকে তিনি এমন সুন্দর, দৃঢ় ও সুচারুভাবে তাঁর শক্তিশালী যুক্তি দ্বারা প্রতিহত করেন যে, শত্রু মিত্র সবাই তাঁর কাছে পরাজয় স্বীকার করেন। নিম্নে আমরা সামসুল উলামা মৌলানা সৈয়দ মীর হাসান সাহেব মরহুম শিয়ালকোটীর দু'টি বিস্তারিত সাক্ষ্য লিপিবদ্ধ করছি, যার মাধ্যমে স্পষ্টভাবে জানা যাবে যে তিনি কেমন পূত-পবিত্র জীবনযাপন করতেন এবং ইসলামের পক্ষ সমর্থনে তিনি কেমন গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকা পালন করেছিলেন।

শিয়ালকোট অবস্থান সম্পর্কে মৌলানা সৈয়দ মীর হাসান সাহেবের প্রথম বিবৃতি :

প্রাচ্যের বিখ্যাত উর্দূ কবি ডা: স্যার মোহাম্মদ ইকবালের ওস্তাদ মরহুম সামসুল উলামা জনাব মৌলানা সৈয়দ মীর হাসান সাহেব বলেছেন : হযরত মির্যা সাহেব ১৮৬৪ খ্রিষ্টাব্দে চাকরি উপলক্ষে শিয়ালকোট আগমন করেন এবং সেখানে অবস্থান করেন। তিনি নির্জনতা প্রিয় ও সাধু ব্যক্তি ছিলেন। তিনি যাবতীয় বাজে ও অযথা কাজ ও কথা থেকে বিরত থাকতেন। এজন্য অধিকাংশ সাধারণ লোকের সাথে সাক্ষাতে অযথা সময়ের অপচয় হয় বলে তিনি তা পছন্দ করতেন না। উকিল লালা ভীম সেন সাহেব তাঁর একান্ত বন্ধু ছিলেন। তার মাতামহ মিঠন লাল বাটালায় অতিরিক্ত সহকারী কর্মকর্তা ছিলেন। বাটালায় মির্যা সাহেব এবং লালা সাহেবের পরস্পর পরিচয় ছিল। এইজন্য শিয়ালকোটেও তাঁদের পূর্ণ হৃদ্যতা অক্ষুণ্ন ছিল। শিয়ালকোটে মির্যা সাহেবের সর্বাপেক্ষা অন্তরঙ্গ বন্ধু যদি কেউ ছিল তো লালা সাহেবই ছিলেন। লালা সাহেব একজন শান্ত প্রকৃতির, ফারসি ভাষাবিদ এবং মেধাবী ব্যক্তি ছিলেন। মির্যা সাহেব বিদ্যানুরাগী ছিলেন বলে তিনি তাকে অত্যন্ত ভালবাসতেন।

মির্যা সাহেবের পাণ্ডিত্য সম্পর্কে অফিসের কর্মচারীরা অপরিচিত ছিল। ওই

(১) মিঞা মেরাজ দ্বীন সাহেব উমর লিখিত, 'হযরত মসীহ মাওউদের সংক্ষিপ্ত জীবন চরিত, চতুর্থ সংস্করণের 'বারাহীনে আহ্মদীয়ার সাথে সাংযোজিত, ৫৬ পৃ:।

বছরেই গ্রীষ্মের প্রারম্ভে মুহাম্মদ সালেহ নামে এক আরব যুবক শহরে আগমন করে। তাকে গুপ্তচর বলে সন্দেহ করা হয়। ডেপুটি কমিশনার হরিকসন সাহেব (পরে তিনি রাওয়ালপিণ্ডি বিভাগের কমিশনার হয়েছিলেন) তার আদালতে মুহাম্মদ সালেহকে জিজ্ঞাসাবাদ করার উদ্দেশ্যে তলব করেন। দোভাষীর প্রয়োজন হল। মির্যা সাহেব যেহেতু আরবি ভাষায় ব্যুৎপত্তি রাখতেন এবং আরবিতে উত্তমরূপে বক্তৃতা দিতে ও রচনা লিখতে পারতেন সেজন্য তাঁকে ডেকে আদেশ দিলেন, "আমি যে সব কথা বলবো তা আরব সাহেবকে জিজ্ঞাসা করে এর উত্তর উর্দুতে আমাকে লিখে দিন।" মির্যা সাহেব এই কাজ যথাযোগ্যভাবে সম্পাদন করেন। তখন তাঁর যোগ্যতা লোক সমুখে প্রতিভাত হল।

সে সময়েই মৌলবী এলাহি বকস সাহেবের প্রচেষ্টায়, যিনি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গুলোর চীফ মুহাররার ছিলেন (বর্তমানে এই পদের নাম স্কুল গুলোর জেলা ইনসপেক্টর) কাচারীর কেরানিদের ইংরেজি শিক্ষার জন্য একটি নৈশ বিদ্যালয় স্থাপিত হয়। পেনশনভোগী ডাক্তার মীর শাহ্ সাহেব অধ্যাপক নিযুক্ত হন। মির্যা সাহেবও ইংরেজি শিক্ষা শুরু করেন এবং দু' একটি ইংরেজি পুস্তক পাঠ করেন।[১]

তখন ধর্ম আলোচনায় মির্যা সাহেবের প্রগাঢ় অনুরাগ ছিল। পাদ্রী সাহেবদের সাথে প্রায়ই তাঁর আলোচনা হতো। এক দেশীয় খ্রিষ্টান পাদ্রী আলাইশা সাহেবের সাথে তাঁর বিতর্ক হয়েছিল। পাদ্রী সাহেব হাজীপুরার দক্ষিণ দিকে একটি কুঠিতে বাস করতেন। পাদ্রী সাহেব বললেন খ্রিষ্টান ধর্ম গ্রহণ করা ব্যতীত 'মুক্তি' সম্ভবপর নয়। মির্যা সহেব মুক্তির অর্থ জিজ্ঞাসা করলেন এবং বিস্তারিত ব্যাখ্যা চাইলেন। পাদ্রী সাহেব কোন বিস্তারিত ব্যাখ্যা দিলেন না। তর্ক থেকে এই বলে নিবৃত্ত হলেন যে, তিনি কোন প্রকার যুক্তিবিদ্যা পাঠ করেননি।

পাদ্রী বাটলার সাহেব এম. এ. একজন বড় বিজ্ঞ ব্যক্তি ও দার্শনিক ছিলেন। মির্যা সাহেবের সাথে তাঁর বহুবার ধর্মালোচনা হয়। তিনি গোহদপুর গ্রামের পাশে বাস করতেন। একবার পাদ্রী সাহেব বললেন, "মসীহ বিনা পিতায় জন্মগ্রহণ করার মধ্যে এই রহস্য নিহিত ছিল যে তিনি কুমারী মরীয়মের গর্ভে জন্ম হওয়ায় আদমের পাপের উত্তরাধিকার থেকে মুক্ত ছিলেন। কারণ, আদম পাপী ছিলেন।" মির্যা সাহেব বললেন, "মরীয়মও আদমের বংশধর। সুতরাং আদমের উত্তরাধিকার থেকে মুক্ত হওয়ার অর্থ কি? অধিকন্তু স্ত্রীলোকই আদমকে কুমন্ত্রণা প্রদান করে। ফলে আদম নিষিদ্ধ বৃক্ষের ফল খেয়ে পাপী হয়েছিলেন। সুতরাং মসীহের জন্ম সংশ্রব থেকেও মুক্ত থাকা উচিত ছিল। এতে পাদ্রী সাহেব নিরুত্তর

(১) সেকালে প্রথম পুস্তকে বর্ণ পরিচয় থাকত এবং দ্বিতীয় পুস্তকে অক্ষর-সংযোগে সহজশব্দ গঠনের প্রাথমিক অনুশীলন থাকত। ('সিরাতুল্-মাহদী,' প্রথম খণ্ড, দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৫৯ পৃ:)

রইলেন। পাদ্রী বাটলার সাহেব মির্যা সাহেবকে অত্যন্ত সম্মান করতেন। তাঁর সাথে অত্যন্ত শ্রদ্ধার সাথে কথা-বার্তা বলতেন। মির্যা সাহেবের প্রতি পাদ্রী সাহেবের অত্যন্ত ভালবাসা ছিল। পাদ্রী সাহেব বিলাত প্রত্যাগমনের সময় মির্যা সাহেবের সাথে সাক্ষাতের জন্য আদালতে আসেন। ডেপুটি কমিশনার সাহেব পাদ্রী সাহেবের আগমনের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করলেন। পাদ্রী সাহেব উত্তরে বললেন, মির্যা সাহেবের সাথে সাক্ষাৎকারের জন্য তিনি আগমন করেছেন। তিনি দেশে চলে যাচ্ছেন তাই মির্যা সাহেবের সাথে শেষ সাক্ষাৎ করবেন। এজন্য মির্যা সাহেব যেখানে বসেছিলেন, সেখানে গিয়ে মেঝের উপর বসলেন এবং হযরত আকদাস এর সাথে সাক্ষাৎ করে বিদায় হলেন।

মির্যা সাহেব পাদ্রীদের সাথে তর্ক করতে বিশেষভাবে পছন্দ করতেন বলে, জলন্ধরের মুরাদ বেগ যিনি নিজের ছদ্মনাম প্রথমে শেকেস্তা এবং পরে 'মুয়াহহেদ' রাখেন, মির্যা সাহেবকে বললেন, "সৈয়দ আহমদ খান সাহেব তৌরাত ও ইঞ্জিলের ভাষ্য লিখেছেন। আপনি তার সাথে পত্রালাপ করলে অনেক সাহায্য পাবেন।" ফলে, মির্যা সাহেব স্যার সৈয়দকে আরবিতে পত্র লিখেন।

আদালতের কেরানীদের মধ্যে অফিসের ভূতপূর্ব মুহাফেজ শেখ আল্লাহ্-দাদ সাহেব মরহুমের সাথে তাঁর অত্যন্ত প্রীতি এবং অকৃত্রিম প্রগাঢ় ভালবাসা ছিল। শহরের প্রাচীনদের মধ্যে মৌলবী মাহবুব আলী সাহেবের সাথে মির্যা সাহেবের আন্তরিক প্রীতির সম্পর্ক ছিল। মৌলবী সাহেব একজন নির্জনবাসী, সদা উপাসনারত অত্যন্ত সাধু এবং নক্সবন্দী তরিকার একজন সুফি ছিলেন।

যে বৈঠকখানায় মির্যা সাহেব দলিল লিখক হাকীম মনসব আলীর সাথে একত্রে বাস করতেন, তা বাজারের উপর ছিল এবং হাকীম হুসামুদ্দিন সাহেব মরহুমের[১] ঔষধালয় খুব কাছে ছিল। এই ঔষধালয়ে হাকীম সাহেবের ওষুধ প্রস্তুতের উপকরণ থাকত। এখানে ওষুধ বিক্রি হত এবং এটাই তার চিকিৎসালয় ছিল। এই কারণে হাকীম সাহেব এবং মির্যা সাহেবের মধ্যে পরিচয় ঘটে। হাকীম সাহেব মির্যা সাহেবের কাছে 'কানুনচা' এবং মোজেযের কিছু অংশ অধ্যয়ন করেন।

মির্যা সাহেব চাকরি পছন্দ করতেন না। এজন্য তিনি মুক্তারি পরীক্ষার জন্য প্রস্তুতি শুরু করেন এবং আইনের পুস্তকাদি পাঠ করতে লাগলেন। কিন্তু পরীক্ষায়

(১) পরীক্ষায় কৃতকার্য না হওয়ার একটি বাহ্যিক কারণও ছিল। ২২ জন পরীক্ষার্থী পরীক্ষা দিয়েছিলেন। নারায়ন সিংহ নামক এক ব্যক্তি পরীক্ষায় দুষ্টুমি করতে গিয়ে ধরা পড়ে। ফলে, সকল পরীক্ষার্থীকেই ফেল বলে ঘোষণা করা হয়। ('সিরাতুল্-মাহ্দী', তৃতীয় খণ্ড ১৭৯ পৃ: পণ্ডিত দেবীরামের বিবৃতি।)

সফলতা লাভ করতে পারলেন না? কি প্রকারেই বা তা করতে পারতেন? পার্থিব কাজের জন্য তো তাঁর জন্ম হয়নি। বস্তুত: বিধাতা প্রত্যেক মানুষকেই বিশেষ কাজের জন্য সৃষ্টি করেছেন।

ওই সময়ে পাঞ্জাব ইউনিভার্সিটি নতুন প্রতিষ্ঠিত হয়। সেখানে আরবি অধ্যাপকের প্রয়োজন ছিল। মাসিক বেতন ১০০ টাকা। আমি তাঁর খেদমতে আরজ করলাম, 'আপনি দরখাস্ত দিন। আরবি ভাষায় আপনার ব্যুৎপত্তি আছে, আমি নিশ্চিত আপনি এই পদে নিযুক্ত হবেন। তিনি বললেন, 'আমি অধ্যপনা পছন্দ করি না। অনেকে জ্ঞানার্জনের পর বহু দুষ্কর্ম করে এবং বিদ্যাকে অবৈধ কাজের উপায় ও অস্ত্র রূপে ব্যবহার করে। আমি এই আয়াতে বর্ণিত সতর্কবাণীকে অত্যন্ত ভয় করি। আল্লাহ তাআলা বলেছেন বলেছেন :

اُحْشُرُوا الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا وَاَزْوَاجَهُمْ[১]

এই উত্তর থেকে বোঝা যায়, তিনি কত সাধু-প্রাণ ছিলেন।

একবার কেউ একজন জিজ্ঞাসা করেছিল, নবীদের স্বপ্নদোষ হয় না কেন? তিনি বললেন, নবীদের জাগ্রত এবং নিদ্রিত উভয় অবস্থায় কেবলমাত্র পবিত্র চিন্তাই থাকে। নাপাক চিন্তা তাঁদের হৃদয়ে স্থান পায় না। এজন্য তাঁদের নিদ্রাতেও স্বপ্নদোষ হয় না।

একবার পোশাক সম্বন্ধে আলোচনা চলে। কেউ বললো, খুব চওড়া মুহুরীদার (ঢিলা) পায়জামা ভাল। মির্যা সাহেব বললেন, লজ্জাস্থান আবরণের জন্য সঙ্কীর্ণ মুহুরীযুক্ত পায়জামা অতি উত্তম। এতে অধিক পর্দা হয়। কারণ, এদিয়ে জমিন থেকেও পর্দা করা যায়। সবাই এই অভিমত পছন্দ করল।

অবশেষে, মির্যা সাহেব চাকরিতে বীতশ্রদ্ধ হয়ে ১৮৬৮ সালে পদত্যাগ করে এখান থেকে চলে যান। ১৮৭৭ সালে একবার তিনি আসেন এবং লালা ভীম সেনের বাড়িতে অবস্থান করেন। নিমন্ত্রণ উপলক্ষে তিনি হাকীম মীর হুসামুদ্দীন সাহেবের বাড়িতে যান। এই বছরে স্যার সৈয়দ আহমদ খান গুফেরা লাহু (তাকে ক্ষমা করা হউক) কুরআন শরীফের তফসীর প্রণয়ন শুরু করেন। তিন রুকুর তফসীর আমার কাছে পৌঁছাল। যখন আমি এবং শেখ আল্লাহ্-দাদ সাহেব মির্যা সাহেবের মুলাকাতের জন্য লালা ভীম সেন সাহেবের বাড়িতে যাই তখন কথা প্রসঙ্গে স্যার সৈয়দ সাহেবের সম্বন্ধে আলোচনা হয়। ইতিমধ্যে তফসীর নিয়েও আলোচনা শুরু হয়। আমি বললাম, 'তিন রুকুর তফসীর আমার হাতে পৌঁছেছে। এতে অর্থাৎ তফসীরে দোয়া এবং ওহি অবতরণের বিষয়ে বিতর্ক করা

(১) অর্থাৎ ফেরেশ্‌তাগণকে বলা হবে, "যারা অন্যায় করেছে, তাদেরকে এবং তাদের সঙ্গীকে একত্রিত কর।" (সূরাহ্ 'আস্-সাফ্ ফাত', ২৩ আয়াত)।

হয়েছে। মির্যা সাহেব বললেন, 'আগামীকাল আপনি আসার সময় তফসীরসহ আসবেন। পরদিন যখন সেখানে গেলাম, তখন তফসীরের উভয় স্থানই তিনি শুনলেন। তিনি সন্তুষ্ট হলেন না এবং তফসীর পছন্দ করলেন না। লেখক- মীর হাসান।"[১]

মৌলানা সৈয়দ মীর হাসান সাহেবের দ্বিতীয় বিবৃতি :

হযরত মির্যা সাহেব প্রথমে কাশ্মিরী মহল্লায় এই অধমের গরিবখানার খুব কাছেই উমরা নামক এক কাশ্মিরীর বাড়ি ভাড়া নিয়ে বসবাস করতেন। আদালত থেকে এসে কুরআন শরীফ পাঠে নিমগ্ন হতেন। বসে, দাঁড়িয়ে এবং পাঁয়চারী করতে করতে তেলাওয়াত করতে থাকতেন এবং খুব কাঁদতেন। এরূপ ভয় ও ভক্তি সহকারে পাঠ করতেন যার কোন তুলনা নেই। তদানীন্তন প্রথানুসারে সাক্ষাৎপ্রার্থী ব্যক্তিগণ কর্মকর্তাদের কাছে যেভাবে উপস্থিত হতেন, তাঁর সাক্ষাৎ প্রার্থীরাও তাঁর খেদমতে সেভাবে উপস্থিত হতেন। উল্লিখিত বাড়ির মালিক উমরার বড় ভাই ফযল দ্বীন সাহেব মহল্লার একজন প্রতাপশালী লোক ছিলেন। তিনি তাকে ডেকে বলতেন, 'মিঞা ফযল দ্বীন, তাদেরকে বুঝিয়ে বলে দিন এখানে এসে তাদের এবং আমার সময় নষ্ট না করেন। আমি কিছু করতে পারি না। আমি হাকীম নই। আমার যা কর্তব্য অফিসেই তা করে আসি। ফযল দ্বীন সাহেব তাদেরকে বুঝিয়ে বিদায় করে দিতেন। মৌলবী আবদুল করিম সাহেবও এই মহল্লায় জন্মগ্রহণ করেন এবং এখানেই যৌবনে পদার্পণ করেন। তিনি পরে মির্যা সাহেবের বিশেষ সহচরদের মধ্যে গণ্য হন।

অত:পর, জামে মসজিদের সামনে মির্যা সাহেব একটি বৈঠকখানায় মনসব আলী হাকীমের সঙ্গে একত্রে বাস করতেন। তিনি (অর্থাৎ মনসব আলী) দলিল লিখকের পদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। বৈঠকখানার কাছে ফযল দ্বীন নামে একজন বৃদ্ধ দোকানদার ছিলেন। তিনি রাতেও দোকানেই থাকতেন। তার অধিকাংশ বন্ধু-বান্ধব সন্ধ্যার পর দোকানে আসতেন। তারা সবাই ভাল মানুষ ছিলেন। কোন কোন সময় মির্যা সাহেবও সেখানে যেতেন এবং সময় সময় মিশন স্কুলের হেড মাষ্টার নসরুল্লাহ নামে জনৈক খ্রিষ্টানও সেখানে উপস্থিত হতেন। মির্যা সাহেব এবং হেডমাষ্টর সাহেবের মধ্যে ধর্ম বিষয়ে প্রায়ই তর্ক হতো। মির্যা সাহেবের ভাষণে উপস্থিত ব্যক্তিরা উপকৃত হতেন।

মৌলবী মাহবুব আলম সাহেব একজন বুজুর্গ, পরম সাধু, সৎ ও সাধক পুরুষ

(১) 'সিরতুল-মাহদী', প্রথম খণ্ড, প্রথম সংস্করণ ১৫৪ পৃ:।

ছিলেন। মির্যা সাহেব তার কাছেও যেতেন এবং লালা ভীম সেনকেও মৌলবী সাহেবের কাছে যাওয়ার জন্য তাগিদ করতেন। ফলে, তিনিও কখনো কখনো মৌলবী সাহেবের কাছে যেতেন। যখনি পীরমুরিদী এবং বয়আতের বিষয় নিয়ে আলোচনা হত, তখন মির্যা সাহেব বলতেন যে মানুষের পক্ষে স্বয়ং চেষ্টা ও পরিশ্রম করা উচিত। আল্লাহ তাআলা বলেন,[১] وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا

মৌলাবী মাহবুব আলম সাহেব এতে রাগ হয়ে বলতেন যে, বয়আত ব্যতীত পথ পাওয়া যায় না। ধর্ম বিষয়ে মির্যা সাহেবের শ্রেষ্টত্ব ও প্রাধান্য তো সুপ্রকাশিত। কিন্তু বহ্যিকভাবে শারীরিক দৌড়েও তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব তখনকার উপস্থিত ব্যক্তিদের মধ্যেও পরিষ্কারভাবে প্রতিপন্ন হয়েছিল।

ব্যাপারটি এভাবে ঘটে। একবার কোর্টের কাজ সেরে কর্মচারীরা ঘরে ফিরছিলো। তখন দ্রুত দৌড়াবার এবং প্রতিযোগিতার বিষয়ে আলোচনা হয়। প্রত্যেকেই অধিক দ্রুত দৌড়াবার দাবি করল। অবশেষে, জনৈক বিল্লা সিংহ সর্বাপেক্ষা অধিক দৌড়াবার দাবি করল। মির্যা সাহেব বললেন, 'আমার সাথে দৌড়াও। দেখা যাবে, কে কত দ্রুত দৌড়াতে পারে'। অবশেষে শেখ ইলাহদাদ সাহেব বিচারক নিযুক্ত হলেন এবং স্থির হল, সেখান থেকে কোর্টের রাস্তা ও শহরের মধ্যবর্তী সীমারেখা সেতু পর্যন্ত খালি পায়ে দৌড়াবেন। জুতাগুলি এক ব্যক্তি তুলে রাখলেন। প্রথমে এক ব্যক্তিকে পুলের উপর প্রেরণ করা হল যাতে সাক্ষ্য দিতে পারে যে কে প্রতিযোগিতায় জয়ী হয়েছে। সেতুর উপর প্রথমে পৌঁছে মির্যা সাহেব এবং পরে বিল্লা সিংহ একই সময়ে দৌড়ে। অন্যরা সাধারণ গতিতে পিছনে রওয়ানা হলেন। সেতুর উপর পৌঁছে জানা গেল হযরত মির্যা সাহেবই জয়ী হয়েছেন এবং বিল্লা সিংহ পিছনে রয়েছে।[২]

গ্রন্থকারের বিনীত নিবেদন এই যে, উক্ত প্রকার ধর্মীয় মর্যাদা সম্পর্কিত একটি ঘটনা হযরত মৌলবী ইসমাঈল শহীদ (রহ.) এর জীবনেও ঘটে। একজন শিখ সাতারুর সাথে তাঁর প্রতিযোগিতা হয়েছিল এবং তিনি তাকে পরাজিত করেছিলেন।

মুনশি সিরাজউদ্দীন সাহেবের সাক্ষ্য :

'জমিদার' পত্রিকার সম্পাদক প্রসিদ্ধ মুসলমান নেতা মৌলবী জাফর আলী খাঁ সাহেবের শ্রদ্ধেয় পিতা মুনশি সিরাজউদ্দীন সাহেব মরহুম লিখেছেন :

---

(১) 'যারা আমাদের পথে সাধনা করে, নিশ্চয়ই আমরা তাদেরকে আমাদের পথ প্রদর্শন করে থাকি" (সুরা আনকাবুত, শেষ আয়াত)

(২) 'সিরাতুল-মাহদী,' প্রথম খণ্ড, দ্বিতীয় সংস্করণ, ২৭০-৭২ পৃঃ।

"মির্যা গোলাম আহমদ সাহেব সম্ভবত ১৮৬০ অথবা ১৮৬১ খ্রিষ্টাব্দে[১] শিয়ালকোট জেলায় মুহাররার ছিলেন। আমরা প্রত্যক্ষ করেছি যৌবনেও তিনি পরম সাধু, ধর্মপরায়ণ ও বুজুর্গ ছিলেন। অফিসের কাজ-কর্মের পর তাঁর সব সময় ধর্মানুশীলনে অতিবাহিত হত। সর্বসাধারণের সাথে অল্পই মেলামেশা করতেন।"[২]

চাকরি ছেড়ে কাদিয়ান প্রত্যাগমনের জন্য পিতার নির্দেশ :

হযরত আকদাস শিয়ালকোট হতে চাকরি ছেড়ে আসার কারণ সম্পর্কে লিখেছেন :

"অবশেষে, আমার অন্যত্র থাকা শ্রদ্ধেয় পিতার কাছে অত্যন্ত অসহনীয় হয়ে উঠল। এজন্য আমার মতের অনুকূল তার আদেশে আমি পদত্যাগ করে আমার রুচি বিরুদ্ধ এই চাকরি থেকে মুক্তি লাভ করে শ্রদ্ধেয় পিতার খেদমতে উপস্থিত হলাম। মসনবী প্রণেতা রুমীর উক্তি অনুযায়ী আমার ওই দিনগুলি অত্যন্ত ঘৃণা, অনিচ্ছা এবং দু:খে কেটেছিল:

من بہر جمعیتے نالاں شُدم   جفت خوشحالاں و بدحالاں شُدم
ہر کسے از ظنِ خود شُد یارِ من   وز درونِ من بجست اسرارِ من"

"আমি সকল দলে মনের মানুষের সন্ধানে কেঁদে ফিরেছি। সুখী ও দুঃখী সকল দলেই ভিড়েছি। প্রত্যেকেই নিজ স্বার্থে আমার বন্ধু সেজেছে। কিন্তু আমার অন্তরের রহস্য কেউ অনুসন্ধান করল না"।[৩]

শ্রদ্ধেয়া মাতার ইন্তেকাল -১৮৬৮ সাল :

তাঁর শ্রদ্ধেয় পিতা যখন তাঁকে পদত্যাগ করে ঘরে প্রত্যাবর্তনের জন্য নির্দেশ দেন, তখন তাঁর শ্রদ্ধেয়া মাতা কাদিয়ানে কঠিন রোগে আক্রান্ত ছিলেন। মনে হয় রোগ শয্যায় তাঁর শ্রদ্ধেয়া মা তাঁকে ঘরে ফিরিয়ে আনার জন্য তাঁর শ্রদ্ধেয় পিতাকে অনুরোধ করেন। পুত্রের জন্য মাতার অন্তরে অত্যন্ত স্নেহ ছিল। খোদাভক্ত প্রিয় পুত্র দীর্ঘ চার বছর দূরে থাকায় তাঁর মন উদাস হওয়া স্বাভাবিক ছিল। তিনি যখন অমৃতসর পৌঁছে কাদিয়ানের জন্য ঘোড়া গাড়ির ব্যবস্থা করছিলেন, তখন কাদিয়ান থেকে আরও এক ব্যক্তি তাঁকে আনার জন্য অমৃতসর

---

(১) সাল এবং বয়স নিরূপণে মুনশি সাহেবের স্মরণ শক্তি বিশ্বস্ততা রক্ষা করেনি। প্রকৃতপক্ষে তা ১৮৬৪-৬৮ খ্রিষ্টাব্দের এই ঘটনা।

(২) 'জমিদার' পত্রিকা, মে, ১৯০৮ সাল।

(৩) 'কিতাবুল বারিয়্যা,' দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৫৩-৫৫ পৃ: হাশিয়া।

পৌঁছল। ওই ব্যক্তি গাড়িওয়ালাকে বলল, “দ্রুত গাড়ি চালাও। তাঁর মায়ের অবস্থা খারাপ।” একটু পরে বলল, “খুবই সঙ্কটাপন্ন ছিল। তাড়াতাড়ি কর, পাছে তাঁর মৃত্যু না হয় থাকে।” এটা শোনামাত্র তিনি বুঝতে পারলেন যে, তাঁর শ্রদ্ধেয়া মাতা ইন্তেকাল করেছেন। কাদিয়ান পৌঁছে নিশ্চিতভাবে জানলেন, তাঁর শ্রদ্ধেয়া মাতা পরলোক গমন করেছেন। “ইন্না লিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজেউন।”[১]

“নিশ্চয়ই আমরা আল্লার জন্য এবং নিশ্চয়ই আমরা তাঁরই দিকে প্রত্যাবর্তন কারী।”

যদিও তাঁর পক্ষে মাতৃবিয়োগ ভীষণ বেদনাদায়ক ছিল, কিন্তু তিনি নীরবে পূর্ণ ধৈর্য ও স্থৈর্যের সাথে এই মহাশোক সম্বরণ করলেন। ইতিপূর্বে বলা হয়েছে যে, তাঁর শ্রদ্ধেয় পিতা তাঁকে সাংসারিক বিষয়-কর্মে নির্লিপ্ত এবং ধর্মগ্রন্থ সমূহ পাঠে নিমগ্ন দেখে “মোল্লা” বলে ডাকতেন । কিন্তু এর বিপরীতে তাঁর শ্রদ্ধেয়া মাতা তার সততা ধর্মপরায়ণতা এবং পবিত্র জীবনযাপনের জন্য তাঁকে অত্যন্ত স্নেহ করতেন। তাঁর জন্য মাতার অপার স্নেহ ছিল। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ব্যাপারে তাঁর জন্য অস্থির হয়ে পড়তেন। তিনি তাঁর যাবতীয় প্রয়োজনের প্রতি লক্ষ্য রাখতেন। শ্রদ্ধেয়া মাতার জন্য হযরত আকদাসের মায়া এর মাধ্যমে সহজে অনুমান করা যায় যে, যখনই তাঁর সম্বন্ধে তিনি কোন কথা বলতেন তাঁর চোখ দিয়ে অশ্রু ঝরতে থাকত। তাঁর জীবনী লেখক হযরত শেখ ইয়াকুব আলী ইরফানী সাহেব (রাযি আল্লাহু আনহু) প্রত্যক্ষ বর্ণনা, একবার হুযুর আলাইহেস সালাম ভ্রমণ উপলক্ষে পারিবারিক প্রাচীন করবস্থানের দিকে রওয়ানা হন। রাস্তা থেকে সরে তিনি আবেগভরে তাঁর মাতা সাহেবার কবরের পাশে সহচরগণসহ এক দীর্ঘ দোয়া করলেন। তাঁর দু চোখ অশ্রুসিক্ত ছিল।[২]

তাঁর শ্রদ্ধেয়া মাতা হযরত চেরাগ বিবি সাহেবার মৃত্যুর তারিখ এখন পর্যন্ত নির্দিষ্টরূপে জানা যায়নি। এটা নিশ্চিত ১৮৬৮ সালে তিনি মৃত্যুবরণ করেন। তাঁকে কাদিয়ানের পশ্চিম দিকস্থ ঈদগাহের সংলগ্ন প্রাচীন খান্দানী গোরস্থানে সমাহিত করা হয়।

পারলৌকিক বিষয়ে হযরত মির্যা গোলাম মুর্তযা সাহেবের অনুরাগ :

হযরত মির্যা গোলাম মুর্তযা সাহেব যখন পূর্বপুরুষদের সম্পত্তি উদ্ধারের জন্য মামলা মোকদ্দমায় অবতীর্ণ হন, তখন আপন কৃতকার্যতা সম্বন্ধে তাঁর সম্পূর্ণ

(১) ‘সিরাতুল-মাহদী,’ প্রথম খণ্ড, দ্বিতীয় সংস্করণ, ৪৩-৪৪ পৃ:
(২) ‘হায়াতে আহমদ, প্রথম খন্ড, দ্বিতীয় সংখ্যা ১৪৩ পৃ:।

প্রত্যয় ছিল। কিন্তু দীর্ঘকাল ধরে এই সব মোকদ্দমার টানাটানিতে লিপ্ত থেকে যখন সফলতা লাভ হল না বরং করায়ত্ত সম্পত্তি ও সঞ্চিত ধন বিনষ্ট হতে দেখতে পেলেন, তখন তাকে অত্যন্ত চিন্তান্বিত থাকতে দেখা যেত। জীবন সঙ্গিনীর বিয়োগ বেদনা তাকে আরও ভারাক্রান্ত করে তুললো।

হযরত আকদাস এই সব ঘটনার আলোচনা প্রসঙ্গে লিখেছেন

"আমি যখন আমার পিতার খেদমতে পুনরায় উপস্থিত হলাম, তখন দস্তুর মত ওই সব জমিদারীর কাজ-কর্মেই নিয়োজিত হলাম। কিন্তু অধিকাংশ সময় কুরআন শরীফ নিয়ে চিন্তা এবং তফসীর ও হাদিসের কিতাবসমূহ পড়াশুনা করে কাটতে লাগলো। অনেক সময় শ্রদ্ধেয় পিতাকে ওই সব পুস্তক পাঠ করে শোনাতাম। ওয়ালেদ সাহেব তার অকৃতকার্যতার জন্য প্রায়ই শোকার্ত ও চিন্তিত থাকতেন। মোকদ্দমা পরিচালনায় তার প্রায় ৭০ হাজার টাকা ব্যয় হয়েছিল। পরিণামে, সফলতা লাভ হয়নি। কারণ আমাদের পিতৃ-পিতামহদের গ্রামগুলো বহু বছর আগেই আমাদের হাতছাড়া হয়েছিল এসব পুনরুদ্ধার করা এক প্রকার খামখেয়ালি ছিল। এই বিফলতার কারণে শ্রদ্ধেয় পিতা অত্যন্ত গভীর শোক সন্তাপ ও অস্থিরতার মধ্যে সময় অতিবাহিত করছিলেন। এই সব অবস্থা দেখে আমার নিজের মধ্যে এক পবিত্র পরিবর্তন আনার সুযোগ হল। কারণ শ্রদ্ধেয় পিতার বিষাদময় জীবনের চিত্র আমাকে সেই নিষ্কলঙ্ক জীবন লাভের শিক্ষা প্রদান করেছিল, যা পার্থিব পথ থেকে পবিত্র। যদিও হযরত মির্যা সাহেবের ভূসম্পত্তির কিছু গ্রাম অবশিষ্ট ছিল এবং ইংরেজ সরকারের পক্ষ থেকে কিছু বার্ষিক বৃত্তিও ধার্য ছিল এবং চাকরি কালের পেন্‌শন ছিল, কিন্তু তিনি যে, বিত্ত বৈভব দেখেছিলেন সেই তুলনায় এগুলি কিছুই ছিল না। এজন্য তিনি সর্বদা চিন্তান্বিত ও বিষণ্ন থাকতেন এবং বারংবার বলতেন, 'এই পার্থিব সংসারের জন্য যত চেষ্টা করেছি, যদি আমি ধর্মের উদ্দেশ্যে অনুরূপ চেষ্টা করতাম, তবে আজ সম্ভবত আমি একজন 'কুতুব' বা সমসাময়িক 'গাউস' হতে পারতাম'। তিনি প্রায়ই এই ছড়া আবৃত্তি করতেন :

عمر بگذشت و نماندست جز ایامے چند بہ کہ در یادِ کسے صبح کنم شامے چند

("জীবন অতিবাহিত হল, আর কয়েকটি দিনমাত্র অবশিষ্ট আছে। তাঁকে স্মরণ করে কিছু রাতে কান্নাকাটি করে ভোর করাই শ্রেয়।)

আমি অনেক সময় দেখেছি তিনি স্বরচিত একটা ছড়া গদগদভাবে পাঠ করতেন। তা ছিল এই :

از درِ تو اے کسِ ہر بیکسے   نیست امیدم کہ رَوَم نا امید

হে পতিত প্লাবন, নিরাশ্রয়ের আশ্রয়, তোমার দ্বার হতে বিমুখ হয়ে ফেরার আশঙ্কা নেই।

কখনো আন্তরিক বেদনায় স্বরচিত এ কাব্যপদ পাঠ করতেন :

بآبِ دیدۂ عشاق وخاکپائے کسے   مرا دِلے ست کہ درخوں تپد بجائے کسے

(ভক্তদের অশ্রুও দীনহীনতা সহআমার হৃদয় তাঁর তরে রক্ত রঞ্জনের মাঝে তাপ লাভ করে।')[১]

কপুরথলা রাজ্যের শিক্ষা বিভাগের উচ্চতর পদ প্রত্যাখ্যান :

শিয়ালকোট থেকে কাদিয়ান আসার কিছুদিন পরে হযরত আকদাসকে কপুরথলা রাজ্যের পক্ষ থেকে শিক্ষা বিভাগের প্রধান কর্তার পদ গ্রহণের জন্য আহবান করা হয়। এই আহ্বান প্রত্যাখ্যান উপলক্ষে তিনি তাঁর পিতার কাছে নিবেদন করলেন:

"আমি কোন চাকরি করতে চাই না। দুই জোড়া খদ্দরের কাপড় তৈরি করে দিবেন এবং যেমন পছন্দ রুটি পাঠিয়ে দিবেন।"

তাঁর শ্রদ্ধেয় পিতার জীবনে তখন সুস্পষ্ট পরিবর্তন ঘটেছিল। পুত্রের এই উত্তর শুনে জনৈক গোলাম নবীকে আবেগভরে সম্বোধন পূর্বক বললেন, 'মিঞা গোলাম নবী, এই বিষয়েই তো আমার সন্তুষ্টি। সত্য পথ এটাই যে পথে সে চলছে।[২]

পার্থিব ঝামেলা থেকে সম্পূর্ণভাবে মুক্ত থাকার জন্য পিতার কাছে আবেদন :

পিতার মন পরিবর্তন এবং ধর্মের প্রতি মনোনিবেশ দেখে তিনি অনুভব করতে পারলেন যে, এখন তাঁর কাছে পার্থিব ঝামেলা সম্পূর্ণভাবে অবসর প্রাপ্তির জন্য আবেদন করলে সম্ভবতঃ তিনি মঞ্জুর করবেন। বস্তুতঃ এটাকে সুবর্ণ সুযোগ মনে করে তিনি শ্রদ্ধেয় পিতার কাছে ফারসি ভাষায় একটি আবেদনপত্র লিখলেন। নিম্নে তা উল্লেখ করা হলো :

---

(১) 'কিতাবুল-বারিয়্যা,' দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৫৫-৫৬ পৃঃ।
(২) 'হায়াতুন্-নবী,' প্রথম খন্ড, দ্বিতীয় সংখ্যা, ১৮৫ পৃঃ।

"حضرت والد مخدوم من سلامت ! مراسم غلامانه و قواعد فدویانه بجا آورده معروض حضرت والا میکند چونکه
دریں ایام برای العین مے بینم و بچشم سر مشاہدہ مے کنم کہ در ہمہ ممالک و بلاد ہر سال چناں وبائے مے افتد کہ دوستاں
را از دوستاں و خویشاں را از خویشاں جدا مے کند و ہیچ سالے نمے بینم کہ ایں نائرہ عظیم و چنیں حادثہ الیم در آں
سال شور قیامت نیفگند۔ نظر برآں دل از دنیا سرد شدہ است و رُو از خوفِ جاں زرد و اکثر ایں دو مصرعہ شیخ
مصلح الدین شیرازی بیاد مے آیند و اشک حسرت ریختہ میشود ؎

مکن تکیہ بر عمرِ ناپائدار   مباش ایمن از بازی روزگار

و نیز ایں دو مصرعہ ثانی از دیوان فرخ قادیانی نمک پاش جراحت دل میشود۔

بدنیائے دوں دل مبند اے جواں   کہ وقتِ اجل مے رسد ناگہاں

لہٰذا میخواہم کہ بقیہ عمر در گوشہ تنہائی نشینم و دامن از صحبتِ مردم بچینم و بیاد او سبحانہ مشغول شوم مگر
گذشتہ را عذرے و مافات را تدارکے شود۔

عمر بگذشت و نماندست جز ایامے چند   بہ کہ در یادِ کسے صبح کنم شامے چند

کہ دنیا را اساسے محکم نیست و زندگی را اعتبارے نے۔ وَمَنْ خَافَ عَلٰى نَفْسِهٖ اٰمِنَ مِنْ اٰفَةِ غَيْرِهٖ۔
والسلام[2] [1]

পত্রটির অনুবাদ এই :

"শ্রদ্ধেয় হযরত ওয়ালেদ সাহেব সালামত,
শ্রদ্ধার সাথে আপনার খেদমতে সেবকের বিনীত নিবেদন এই যে, আজকাল স্বচক্ষে দেখছি এবং প্রতিদিন প্রত্যক্ষ করছি প্রত্যেক দেশ ও ভূ-খণ্ডে প্রতি বছর এমনভাবে মহামারির প্রাদুর্ভাব হচ্ছে, বন্ধুকে বন্ধুর কাছ থেকে এবং আত্মীয়কে আত্মীয়ের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন করছে এবং এমন কোন বছর যাচ্ছে না যে, ভীষণ অগ্নিকান্ড ও ভয়াবহ দুর্ঘটনা প্রকাশ পাচ্ছেনা বা এর ধ্বংস-লীলার মাধ্যমে কিয়ামত সদৃশ্য কোলাহল সৃষ্টি হচ্ছে না। এই সব অবস্থা দেখে আমার মন সংসার বিরাগী হয়ে গেছে, হৃদয় দুঃখে মলিন হয়েছে এবং প্রায়ই হযরত শেখ সাদী সিরাজী রহমতুল্লাহে আলাইহে রচিত এই পঙক্তিদ্বয় স্মরণ হচ্ছে এবং আক্ষেপ ও অনুশোচনার অশ্রুপাত করছি যে :

নশ্বর জীবনের উপর ভরসা কোরো না,
কাল-চক্র থেকে বেখবর থেকো না।

ফাররুখ কাদিয়ানীর১ 'দিওয়ান' থেকেও এই পঙক্তিদ্বয় আমার কাঁটা ঘায়ে লবণ

(১) 'সিরতুল মাহদী,' প্রথম খণ্ড, দ্বিতীয় সংস্করণ, ২৫৫-৫৬ পৃঃ এবং 'দাওয়াতুল-আমীর,' (উর্দু) ২৬১ পৃঃ।

ছিটা দিচ্ছে :

নশ্বর জগতের মধ্যে মন দিবে না
কারণ মৃত্যু দৈবাৎ উপস্থিত হয়।

এজন্য আমি চাই, অবশিষ্ট জীবন নির্জনে, নীরব কক্ষে যাপন করি এবং জনসাধারণ ও তাদের মজলিস থেকে দূরে থাকি এবং পবিত্র আল্লাহ তাআলাকে স্মরণ করতে নিমগ্ন হই যেন এ দিয়ে অতীতের ত্রুটি পূরণ হয়।

অধিকাংশ জীবন অতিবাহিত হয়েছে,কয়েকটি দিনমাত্র অবশিষ্ট আছে। এই রাতগুলো আল্লাহকে স্মরণে ভোর করাই শ্রেয়।

কারণ, পৃথিবীর কোন দৃঢ়ভিত্তি নেই এবং জীবনের কোন বিশ্বাস নেই। ক্ষণিক জীবনের কোন ভরসা নেই। যে ব্যক্তি নিজের সম্বন্ধে চিন্তাশীল, তার কোন বিপদের আশঙ্কা নেই।

হযরত আকদাসের শ্রদ্ধেয় পিতা এই পত্রের কি উত্তর দিয়েছিলেন তা আজ পর্যন্ত জানা যায়নি। কিন্তু খুব সম্ভব এই পত্রে যে মূল্যবান ভাবাবেগ প্রকাশ পেয়েছে, তিনি নিশ্চয়ই এর মর্যাদা রক্ষা করেছিলেন।

আধুনিক গবেষণা মূলে সর্বপ্রথম ইলহাম এবং উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ :

১৮৬৮ অথবা ১৮৬৯ খ্রিষ্টাব্দের ঘটনা। পাঞ্জাবে আহলে হাদীস সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে তখন ভীষণ আন্দোলন চলছিল। যদি কোন মসজিদের মোল্লা জানতে পারত যে, কোন আহলে-হাদীস (তাদের ভাষায় কোন 'ওহাবী') নামায পড়েছে, তবে কোন কোন সময় মসজিদের মেঝে পর্যন্ত খুঁড়ে ফেলে দেয়া অথবা ধুয়ে ফেলা হত। ওই সময়ে মৌলবী মুহাম্মদ হুসায়েন সাহেব বাটালবী, দিল্লী থেকে মৌলবী সৈয়দ নাযির হুসায়েন দেহলবীর কাছে শিক্ষা লাভ শেষে বাটালায় সবে মাত্র ফিরে এসেছেন। মুসলমান জনসাধারণের মধ্যে তার বিরুদ্ধে ভীষণ উত্তেজনার সৃষ্টি হয়েছে। হযরত আকদাস কোন কাজের জন্য বাটালা গিয়েছিলেন। আলোচনার জন্য বিশেষ অনুরোধের কারণে এক ব্যক্তি তাঁকে মৌলবী মুহাম্মদ হুসায়েন সাহেবের বাড়িতে নিয়ে যান। সেখানে মৌলবী সাহেবের পিতাও উপস্থিত ছিলেন। ধর্ম বিষয়ে আলোচনা শোনার জন্য বহু লোক ব্যাকুল হয়ে অপেক্ষা করছিল। তিনি মৌলবী মুহাম্মদ হুসায়েন সাহেবের সামনে গিয়ে বসলেন এবং মৌলবী সাহেবকে জিজ্ঞেস করলেন, "আপনার দাবি কি?"

(১) ওই সময় হযরত আকদাস আলাইহেস্ সালাম এই 'কাব্য নাম' ব্যবহার করতেন এবং এই পংতিদ্বয় তাঁরই রচিত।

মৌলবী সাহেব বললেন, "আমার মতে কুরআন মজীদ সকলের প্রধান এবং তার পর রসুল (সা.) এর হাদিসের স্থান; এবং আমার অভিমত হলো, আল্লাহর কিতাব এবং আল্লাহর রসুল (সা.) এর হাদিসের বিরুদ্ধে কোন মানুষের কোন মতামত প্রমাণ হিসেবে গ্রহণযোগ্য নয়। এই কথা শুনে অসঙ্কোচে হুযুর বললেন, "আপনার এই মত সম্পূর্ণ যৌক্তিক এবং এর বিরুদ্ধে আপত্তি অচল। সুতরাং আপনার সাথে তর্কের প্রয়োজন নেই।" হুযুর এটি বলা মাত্র জনতা উন্মাদের মত চিৎকার করে উঠল, "পরাজিত হয়েছে," "পরাজিত হয়েছে।" যে ব্যক্তিবিশেষ অনুনয় করে তাঁকে সেখানে এনেছিল, সে-ও খুবই রাগান্বিত হয়ে বললো, "আপনি আমাদেরকে অপমান করেছেন, লাঞ্ছিত করেছেন।" কিন্তু তিনি পর্বতের মতো অচল, অটল রইলেন। লোকের কোলাহল, কলরব তাঁকে আদৌ বিচলিত করলো না। যেহেতু তিনি এই তর্ক শুধু আল্লাহর উদ্দেশ্যে পরিত্যাগ করেছিলেন, সে জন্য আল্লাহ তাআলা এই ব্যাপারে সন্তুষ্ট হয়ে তাঁকে ইলহাম করে জানালেন :

"خدا تیرے اس فعل سے راضی ہوا اور وہ تجھے بہت برکت دے گا۔ یہاں تک کہ بادشاہ تیرے کپڑوں سے برکت ڈھونڈھیں گے۔" [১]

("খোদা তোমার এই কাজে সন্তুষ্ট হয়েছেন এবং তিনি তোমাকে বহু আশিস প্রদান করবেন। এমন কি, বাদশাহ তোমার কাপড় থেকে আশিস অনুসন্ধান করবে।") অতঃপর, কাশফে তিনি ওই সকল বাদশাহকেও দর্শন করেন। তারা ৬/৭ জনের চেয়ে কম ছিলেন না। তারা ঘোড়ায় বসেছিলেন। হুযুর আলাইহেস্ সালাম তাঁর একটি আরবি কেতাবে এই কাশফ প্রসঙ্গে লিখেছেন :

'আমি একটি শুভ স্বপ্নে এক দল নিষ্ঠাবান মোমেন ও ন্যায়পরায়ণ বাদশাহ দেখেছি। তাদের কেউ এই দেশের (ভারতবর্ষের) ছিলেন, কেউ ছিলেন আরবের, কেউ পারস্যের, কেউ সিরিয়ার, কেউ তুরস্কের এবং কেউ অন্যান্য দেশের ছিলেন। আমি তাদেরকে জানতাম না। অত:পর, খোদা তাআলার পক্ষ থেকে আমাকে জানানো হলো 'তারা তোমার সত্যতা ঘোষণা করবেন, তোমার উপর ঈমান আনবেন, তোমার প্রতি দরূদ পাঠ করবেন, তোমার জন্য দোয়া করবেন এবং আমি তোমাকে বহু বরকত (আশিস) দিব-এমন কি, বাদশাহ তোমার কাপড় থেকে আশিস অনুসন্ধান করবেন।'[২]

এই ইলহাম সম্বন্ধে আমরা আমাদের কোন মন্তব্য করব না। কেবলমাত্র এটুকু

(১) 'বারাহীনে-আহমদীয়া,' চতুর্থ খণ্ড, ৫২-২১ পৃ: হাশিয়া ও অন্যান্য বহু কেতাব।
(২) 'লাজ্নাতুন নূর,' ৩-৪ পৃ: হতে অনুদিত।

নিবেদন করা প্রয়োজন মনে করি যে, তা ওই সময়কার ইলহাম, যখন তিনি সম্পূর্ণ অজ্ঞাতভাবে নির্জনে বাস করতেন এবং কেউ জানত না যে, তাঁর ভবিষ্যৎ কিরূপ গৌরবময় হবে।

স্বপ্ন ও কাশফের আধিক্য এবং কাদিয়ানের হিন্দুদের জন্য নিদর্শনাবলি :

ইমাম মাহদীর আবির্ভাবের সময় নিকটবর্তী হচ্ছিল। পথভ্রষ্ট মানব জাতির পথ প্রদর্শনার্থে বিশ্ব স্রষ্টা তাঁকে প্রত্যাদিষ্ট পুরুষের আসনে অধিষ্ঠিত করতে চেয়েছিলেন। এজন্য তিনি তাঁকে বহুল পরিমাণে স্বপ্ন ও কাশফ প্রদর্শন করতে লাগলেন। কখনো কখনো তিনি ঐশী-বাণীও প্রাপ্ত হতে লাগলেন। কাদিয়ানের দু'জন হিন্দু লালা শরমপৎ ও লালা মলাওয়ামাল তাঁর কাছে খুব বেশি যাতায়াত করতেন। তাদের সম্বন্ধেও কিছু নিদর্শন তাঁর কাছে প্রকাশিত হল।

১৮৭০ সালে এক মামলায় কাদিয়ানের একজন আর্য সমাজী হিন্দু, লালা শরমপতের আত্মীয় বিশ্বম্ভর দাস এবং খুশহাল চান্দ নামক আরো একজন হিন্দুর কারাদণ্ড হয়েছিল। উচ্চ আদালতে তারা আপিল করেন। আপিলের ফল কি হবে জানার জন্য লালা শরমপৎ হযরত আকদাসের কাছে আবেদন করল। তাঁর পক্ষে এক হিন্দুর কাছে ইসলামের শ্রেষ্ঠত্ব নির্ধারণের এটা উৎকৃষ্ট সুযোগ ছিল। তিনি আল্লাহ তাআলার সমীপে দোয়া করলেন। রাতে কাশ্‌ফ-যোগে তাঁকে জানানো হলো এই মামলায় নথি চিফ্ কোর্ট থেকে সেশন কোর্টে ফেরৎ আস্‌বে। সেখানে তার ভাইদের কারাদণ্ডের অর্ধেক মাফ হয়ে যাবে। কিন্তু তার অপর সাথী সম্পূর্ণ শাস্তি ভোগ করবে। এই ঐশী সংবাদ কাদিয়ানের হিন্দুদেরকে বলা হলে, ঘটনাক্রমে বুঝার কোন গোলমালের কারণে কয়েক দিন পরে এই জনরব প্রচারিত হল আপিল মঞ্জুর হয়েছে এবং বিশ্বম্ভর দাস খালাস পেয়েছে। হযরত এই খবর শুনে দু:খিত হলেন। কাদিয়ানের হিন্দুরা ঘি-বাতি জ্বালিয়ে আলোক সজ্জা করল এবং ভবিষ্যদ্বাণী মিথ্যা হয়েছে বলে ঘোষণা করল। বাজারে এ পর্যন্ত রটলো যে, অপরাধীরা গ্রামে ফিরে এসেছে। তিনি যখন এই খবর পেলেন, তখন এ'শার নামাযের প্রস্তুতির সময়।

হুযুর বলেন :

"এই চিন্তায় আমার যে অবস্থা হল, তা একমাত্র আল্লাহ্ জানেন। এই চিন্তায় আমি জীবন্মৃত স্বরূপ হলাম। আমি বুঝতে পারছিলাম না, আমি কি জীবিত, না মৃত। এমনি অবস্থায় নামায শুরু হল! সেজদায় যখন গিয়েছি, তখন ইলহাম হল, لَا تَحْزَنْ إِنَّكَ أَنْتَ الْأَعْلَىٰ অর্থাৎ, 'শোক করো না, তুমিই জয়ী হবে'। তখন আমি

শরমপতকে এর সংবাদ দেই। তখন প্রকৃত ঘটনা জানা গেল আপিল দায়ের হয়েছে মাত্র। বিশ্বম্ভর দাস মুক্তি লাভ করেনি।[১]

পরে তাই হল, যা সুস্পষ্ট ভবিষ্যদ্বাণী দ্বারা আমাকে জানানো হয়েছিল। হিন্দুরা আশ্চর্যান্বিত ও হতভম্ব হয়ে পড়ল।

প্রসঙ্গক্রমে লালা মলাওয়ামাল সম্বন্ধেও একটি নিদর্শন বর্ণিত হল। তারিখের দিক দিয়ে এটা ১৮৮১ সালের ঘটনা। লালা মলাওয়ামাল দীর্ঘ কাল যাবত ক্ষয় রোগে ভুগছিলেন। রোগ কঠিন হয়ে পড়লে নৈরাশ্য জন্মালো। তখন নিরুপায় হয়ে তিনি একদিন হযরত সাহেবের খেদমতে এসে কাঁদতে লাগলেন।

হুযুর বলেন :

"তার অসহায় অবস্থা দেখে আমার মন গলে গেলো। আমি এক, অদ্বিতীয় আল্লাহর দরবারে তাঁর জন্য দোয়া করলাম। খোদার কাছে তাঁর আরোগ্য লাভ নির্দিষ্ট ছিল বলে দোয়া করার সঙ্গে সঙ্গেই ইলহাম হলো قُلْنَا يَا نَارُ كُوْنِيْ بَرْدًا وَّسَلَامًا অর্থাৎ, 'আমরা জ্বরাগ্নিকে বললাম, তুমি শীতল ও নিরাময় হও।" তখনি সেই হিন্দু এবং আরো কয়েকজন হিন্দুকে এই ইলহামটি জানানো হয়। তারা এখনো এই গ্রামে উপস্থিত আছে এবং গ্রামেরই অধিবাসী। আমি খোদার উপর সম্পূর্ণ ভরসা করে দাবি করলাম ওই হিন্দু শিশ্চয়ই তারপর আরোগ্য লাভ করবে এবং এই রোগে মরবে না। অতঃপর এক সপ্তাহও অতিবাহিত হয়নি, উল্লিখিত হিন্দু এই প্রাণনাশক রোগ থেকে মুক্ত হয়ে পূর্ণ স্বাস্থ্য লাভ করলেন। আলহামদু লিল্লাহে আলা যালেকা।"[২]

লালা মালাওয়ামাল কাদিয়ানের একজন সম্ভ্রান্ত আর্য ছিলেন। যদিও তিনি এবং লালা শরমপৎ শত শত নিদর্শন দেখেও ইসলাম গ্রহণ করেননি, তবু পার্থিব দিক দিয়ে তারা ভদ্রভাবে জীবনযাপন করেন। লালা মালাওয়ামাল দীর্ঘ ৯৫ বছর বয়সে দেশ বিভাগের কয়েক বছর পর কাদিয়ানে ইহলীলা ত্যাগ করেন। তিনি তার সন্তানদেরকে উপদেশ দিয়ে গেছেন 'মির্যা সাহেবের ভবিষ্যদ্বাণী অনুসারে তার পরিবারের লোকেরা নিশ্চয় কাদিয়ানে প্রত্যাবর্তন করবেন। সুতরাং, তোমরা কাদিয়ানের বর্তমান আহমদীগণের বিরুদ্ধাচরণ করো না।"

লালা মালাওয়ামাল কাদিয়ানের হিন্দু বাজারে তার দোকানে প্রায়ই বসে থাকতেন এবং হযরত আকদাস কোন কোন রোগের যে সকল ব্যবস্থাপত্র করতেন, ওই

(১) 'কাদিয়ানকে আরিয়া আওর হাম,' ২৮-২৯ পৃঃ।
(১) 'বারাহীনে আহমদীয়া,' তৃতীয় খণ্ড, ২২৭-২৮ পৃঃ, 'হাশিয়া-দর-হাশিয়া'।

সকল ওষুধ প্রস্তুত করে বিক্রি করতেন। আহমদী বন্ধুগণও ওই সব ওষুধ ক্রয় করতেন এবং তার কাছে হযরত আকদাসের প্রথম জীবনের ঘটনাবলী শুনতেন।

কাশফে পূর্ববর্তী কোন কোন বুজুর্গের সাথে সাক্ষাৎলাভ :

১৮৭২ সালে হযরত আকদাস স্বপ্নযোগে হযরত ঈসা মসিহ আলাইহেস সালামের সাথে একই পাত্রে আহার করেন এবং হৃদ্যতার সাথে বাক্যালাপ করেন।১ এই সময়ে প্রায়ই হযরত বাবা নানক সাহেব রহমতুল্লাহে আলাইহের সাথে স্বপ্নযোগে তাঁর দেখা হয়। তিনি নিজেকে মুসলমান বলে প্রকাশ করেন।২

১৮৭৫ সালে তিনি হযরত সৈয়দ আবদুল কাদের জিলানী রহমতুল্লাহে আলাইহের সাথে স্বপ্নযোগে সাক্ষাৎ লাভ করেন এবং তাঁকে জানানো হয় যে তাঁর এবং সৈয়দ আব্দুল কাদের জিলানীর আত্মার স্বাভাবিক বৃত্তিগুলোর মধ্যে পরস্পর সামঞ্জস্য বিদ্যমান।৩

আট নয় মাসব্যাপী রোজা এবং স্বর্গীয় জ্যোতির অবতরণ :

১৮৭৫ সালের শেষ ভাগে, অথবা ১৮৭৬ সালের শুরুতে একজন বৃদ্ধ, পবিত্র দর্শন বুজুর্গ স্বপ্নে তাঁর কাছে উপস্থিত হন। তিনি বললেন "স্বর্গীয় জ্যোতির্মালা প্রাপ্তির জন্য কিছুদিন রোযা রাখা নবীগণের চিরন্তন নিয়ম।" এর দ্বারা তিনি সঙ্কেত করলেন "আমি যেন রিসালত পরিবারের রীতি পালন করি।" বস্তুত:, তিনি আট নয় মাস ধরে সংগোপনে রোযা রাখার মাধ্যমে সাধনা করেন। এ সম্পর্কে তিনি লিখেছেন :

"সুতরাং আমি কিছু সময় ধরে নিয়মিতভাবে রোযা রাখা যথাযথ মনে করলাম। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এই ভাবের উদয় হল যে, এটি গোপনে পালন করা শ্রেয়। আমি এই ব্যবস্থা করলাম সুতরাং ঘর থেকে বৈঠকখানায় খাবার আনাতাম এবং তা গোপনে কোন কোন এতিম ছেলেকে দান করতাম তাদেরকে পূর্বেই ঠিক করে যথাসময়ে উপস্থিত থাকার জন্য আমি তাগিদ করে দিয়েছিলাম। এইভাবে সারাদিন রোযায় অতিবাহিত করতাম এবং খোদা তাআলা ছাড়া এই রোযাগুলি সম্বন্ধে কেউ জানত না। ২/৩ সপ্তাহ পরে আমি বুঝতে পারলাম একবেলা পূর্ণ আহারে রোযা থাকায় আমার কোন কষ্ট হয় না। এজন্য আহারের পরিমাণ কিছু

(১) 'বারাহীনে-আহমদীয়া,' তৃতীয় খণ্ড, ২৫৩ পৃ:, 'হাশিয়া-দর-হাশিয়া'।
(২) 'নযুলুল্-মসিহ্', ২০৪ পৃ:।
(৩) 'যামিমায়ে-বারাহীনে-আহমদীয়া,' পঞ্চম খণ্ড, ৬৫ পৃ:, হাশিয়া।

হ্রাস করা উত্তম বিবেচনা করলাম। সুতরাং আমি সেদিন থেকে খাবারের পরিমাণ হ্রাস করতে লাগলাম। এমন কি দিনেরাতে শুধু একটি রুটিই যথেষ্ট হত। এইভাবে আমি আহার হ্রাস করতে লাগলাম। অবশেষে, আট প্রহরের পর যথাসম্ভব কয়েক তোলা রুটি মাত্র আমার আহার্য রইল। সম্ভবত:, আট-নয় মাস ধরে আমি এরূপ করলাম। দু' তিন মাসের শিশুও যে খাদ্যে ধৈর্য ধারণ করতে পারে না, সেরূপ অল্প আহার সত্ত্বেও খোদা তাআলা আমাকে সকল প্রকার আপদ-বিপদ হতে রক্ষা করলেন। এ রকম রোযার ফলে আমি যে সকল বিস্ময়কর অভিজ্ঞতা লাভ করলাম, তা সূক্ষ্ম 'মুকাশাফাত' বা আধ্যাত্মিক দর্শন লাভ ছিল, যা ওই সময়ে আমার কাছে প্রকাশিত হয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ, কোন কোন পূর্ববর্তী নবীর সাথে সাক্ষাৎ লাভ হয় এবং এই উম্মতে যে সকল উচ্চ শ্রেণীর আউলিয়া গত হয়েছেন তাঁদের সাথেও সাক্ষাৎ হয়। একবার সম্পূর্ণ জাগ্রত অবস্থায় জনাব রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম, ইমাম হাসান ও হুসায়েন রাযি আল্লাহু আনহু, হযরত আলী রাযি আল্লাহু আনহু এবং হযরত ফাতেমা রাযি আল্লাহু আনহার দর্শন লাভ করি। এটা স্বপ্ন ছিল না। এক প্রকার জাগ্রত অবস্থা ছিল। বস্তুত:, এভাবে কোন কোন পবিত্র ব্যক্তির সাক্ষাৎ পাই তা বর্ণনা করতে গেলে অনেক দীর্ঘ হয়ে পড়বে। এছাড়াও 'আনওয়ারে রুহানী' –আধ্যাত্মিক জ্যোতির্মালা –রূপকভাবে সবুজ ও রক্তবর্ণ স্তম্ভাকার এমন মনোরম ও মনোহর দৃশ্যরূপে দর্শন লাভ হত, যা বর্ণনাতীত। সেই জ্যোতির্ময় স্তম্ভগুলো সোজা উর্ধ আকাশের দিকে চলে গিয়েছিল। তার মধ্যে কোন কোনটি শুভ্রোজ্জ্বল, কোন কোনটি সবুজ এবং কোনটি ঘোর লাল ছিল। মনের সাথে এদের এমন সম্বন্ধ ছিল যে তাদেরকে দেখে হৃদয় আনন্দে বিভোর হয়ে যেত। এসমস্ত দেখে হৃদয় ও আত্মা এমন আনন্দ লাভ করত, যার তুলনা জগতে নাই। আমার মতে, সেই স্তম্ভগুলো খোদা এবং বান্দার প্রেমের সংযোগ এক প্রকার রূপক আকৃতিতে প্রকাশিত করা হয়েছিল। অর্থাৎ তা এক জ্যোতিঃ ছিল যা উর্ধ হতে নিম্নে অবতরণ করেছিলো ও উভয়ের মিলনে স্তম্ভাকৃতি ধারণ করেছিল। এগুলো আধ্যাত্মিক ও রুহানী বিষয়। জগত তা অবগত নয়। কিন্তু পৃথিবীতে এমন ব্যক্তিরাও আছেন, যারা এই সব বিষয়ে অবহিত হয়ে থাকেন।

"যা হোক, এই পরিমাণ রোযা রাখার ফলে আমার কাছে যে সকল আশ্চর্য বিষয় প্রকাশিত হয়েছিল তা ছিল নানা প্রকারের 'মুকাশাফাত' বা আধ্যাত্মিক দর্শন।"[১]

---

(১) 'কিতাবুল-বারিয়্যা,' ১৬৪-৬৬ পৃ:, পাদটীকা।

হযরত আব্দুল্লাহ গজনবী ও কিছু অন্যান্য বুজুর্গের সাথে সাক্ষাৎ :

এ সময়ে হযরত আকদাস কোন কোন বুজুর্গের সাথে সাক্ষাতের উদ্দেশ্যে সফর করেন এবং তাঁর কাছেও আল্লাহ ওয়ালাগণের যাতায়াত শুরু হয়। সংক্ষেপে, নিম্নে আমরা একজন মাত্র বুজুর্গের কথা বলছি। তিনি ছিলেন হযরত মৌলবী আব্দুল্লাহ্ গজনবী সাহেব। এই বুজুর্গ আফগানিস্থানের গজনী জেলার অধীনে গিরো নামক পল্লীতে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি এবাদত গোযার ছিলেন। সদা আল্লাহ তাআলার স্মরণে নিমগ্ন থাকতেন। রসুল (স.)-এর আশেক ছিলেন। একটি স্বপ্নে তিনি দেখতে পেলেন 'সহীহ্ বুখারী ধূলাবৃত'। স্বপ্নের মধ্যেই তিনি তা পরিষ্কার করতে লাগলেন। এই স্বপ্ন দর্শনের পর তিনি সহীহ বুখারী অধিক পাঠ শুরু করেন। গজনীর জালেম উলামাগণ তার এই অবস্থা দর্শনে তাকে "ওহাবী" বলে ঘোষণা করে তার বিরুদ্ধে কুফরের ফতোয়া দেয়। তার মুখে কালি লেপন করে গাধার পিঠে বসিয়ে তাকে দেশ থেকে বিতাড়িত করে। এতে তিনি হিজরত করে অমৃতসর আসলেন।[১] এই বুজুর্গের সাথে হযরত আকদাসের সাক্ষাৎ হয়।

হযরত আকদাস এই সাক্ষাৎ প্রসঙ্গে বলেন :

"হযরত আব্দুল্লাহ গজনবীর জীবদ্দশায় একবার খয়েরদী এবং একবার অমৃতসরে তার সাথে আমার দেখা হয়। আমি তাকে বললাম, 'আপনি ইলহাম প্রাপ্ত হয়ে থাকেন। আমার একটি উদ্দেশ্য আছে। এর জন্য আপনি দোয়া করবেন। কিন্তু উদ্দেশ্যটি কি, আমি আপনাকে বলব না'। তিনি বললেন, 'গোপন রাখা কল্যাণকর। আমি ইন্‌শাআল্লাহ্ দোয়া করব। ইলহাম ইচ্ছাধীন নয়'। আমার উদ্দেশ্যটি ছিল দ্বীনে মুহাম্মদী আলাইহেস সালাতু ওয়াস সালাম দিন দিন অবনতির দিকে যাচ্ছে, খোদা এর সহায় হোন। তারপর আমি কাদিয়ান চলে যাই। অল্পদিন পরে, ডাকযোগে তার চিঠি পাই, তাতে লিখা ছিল, 'এই অধম আপনার জন্য দোয়া করেছিল। ইলকা হয়েছে وَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكٰفِرِيْنَ

(আমাদেরকে কাফেরদের বিরুদ্ধে সাহায্য কর)। এত শিগগির ইলহাম হওয়ার সুযোগ এই অধম অল্পই লাভ করেছে। এটা আপনার আন্তরিকতার ফলে হয়েছে দেখছি।"[২] এটা ছিল প্রাথমিক প্রকাশ। নতুবা আল্লাহ তাআলার আদেশে তিনি পরে তাঁর একজন ভক্ত মুরীদ মুনশি মুহাম্মদ ইয়াকুব সাহেবকে এ পর্যন্তও বলেছিলেন, "হযরত মির্যা সাহেব আমার পরে এক বিরাট কাজের জন্য

(১)'সিরাতে সানোয়ী,' মৌলবী আবদুল মজিদ সাহেব সোহদরবী প্রণীত।

(২) হকিকতুল্-ওহী,' প্রথম সংস্করণ, ২৩৯-৪০ পৃঃ।

প্রত্যাদিষ্ট হবেন।" তাঁর মৃত্যুর কয়েকদিন আগে ১৮৮১ সালের ফেব্রুয়ারিতে তিনি আল্লহ তাআলার কাছ থেকে কাশ্‌ফযোগে সংবাদ লাভ করে ভবিষ্যদ্বাণী করেন :

"একটি জোতি্যঃ আকাশ থেকে কাদিয়ানের দিকে অবতরণ করছে। কিন্তু দু:খের বিষয়, আমার সন্তানরা এটা থেকে বঞ্চিত থাকবে।"[১]

বস্তুত:, হযরত মৌলবী গজনবী সাহেবের এই ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হয়েছে। তার সন্তানরা হযরত আকদাসকে শুধু গ্রহণের সৌভাগ্য থেকেই বঞ্চিত হয়নি, বরং তার বিরুদ্ধাচরণেও অগ্রবর্তী ভুমিকা গ্রহণ করেছে। হযরত মৌলবী গজনবী সাহেব ১৮৮১ সালের ১৫ই ফেব্রুয়ারি মৃত্যুবরণ করেন এবং অমৃতসরের বাইরে সুলতানবিন্ডে সমাধিস্থ হন। ফা-ইন্না লিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজেউন'।

হযরত আকদাসের পিতার ইন্তেকাল, জুন ১৮৮৬ :

১৮৮৬ সালের জুন মাসের প্রথম ভাগে হযরত আকদাস একটি মামলার ব্যাপারে লাহোর যান। তিনি তখন লাহোরেই ছিলেন, একটি স্বপ্নের মাধ্যমে তাঁকে জানান হল যে, তাঁর পিতার মৃত্যুর সময় নিকটবর্তী। এ সম্বন্ধে তিনি লিখেছেন :

"আমি এই স্বপ্ন দেখার পর তাড়াতাড়ি কাদিয়ান পৌঁছলাম এবং আমার পিতাকে আমাশয় রোগে আক্রান্ত দেখলাম। কিন্তু এরূপ কোন আশঙ্কা ছিলনা যে আমার আসার পরদিনই তিনি পরলোকগমন করবেন। কারণ, রোগের প্রকোপ প্রশমিত হয়েছিল এবং তিনি খুব শান্তভাবে বসে থাকতেন। পরদিন দুপুর বেলা আমরা সমস্ত আত্মীয়-স্বজন তার কাছে উপস্থিত ছিলাম। তখন মির্যা সাহেব দয়াপরবশ হয়ে আমাকে বললেন 'এখন, তুমি গিয়ে একটু আরাম কর'। তখন জুন মাস। প্রচন্ড গরম। আমি বিশ্রামের জন্য একটি চৌবারায় গেলাম। একজন খাদেম পা দাবাচ্ছিল। ইতিমধ্যে সামান্য তন্দ্রালু ভাব এলে আমার কাছে ইলহাম হল, وَالسَّمَاءِ وَالطَّارِقِ অর্থাৎ, 'আকাশের কসম, কারণ আকাশ কাযা কদরের (ঐশী মিমাংসা ও বিধানের) উৎস। এবং সেই ঘটনার কসম, যা সূর্যাস্তের পর সংঘটিত হবে'। আমাকে বুঝান হল যে, এ ইলহাম খোদা তাআলার পক্ষ থেকে শোকার্তের প্রতি সহানুভূতি প্রকাশের আকারে হয়েছে এবং দুর্ঘটনা এই যে আজই শ্রদ্ধেয় পিতা সূর্যাস্তের পর ইহধাম ত্যাগ করবেন। সুবহানাল্লাহ খোদাওন্দে আযীম, মহাপ্রভুর কিবা মহিমা! জীবন নষ্ট হওয়ার অনুতাপে এক ব্যক্তি প্রাণত্যাগ করছেন। তার পরলোকগমন শোক সহানুভুতিসূচক ভাষায়

(২) 'হায়াতুন-নবী, প্রথম খন্ড, ৮০-৮২ পৃ:।

বর্ণিত হল। এতে অধিকাংশ ব্যক্তিই আশ্চর্য্য বোধ করবে খোদা তাআলা কর্তৃক শোকার্তের জন্য সহানুভুতি প্রকাশের অর্থ কি? কিন্তু স্মরণ রাখা কর্তব্য যে হযরত আয়যা ও জাল্লা শানুহু, মহামহিমাময় খোদা যখন কাউকে কৃপার দৃষ্টিতে দেখেন, তখন একজন বন্ধুর ন্যায় তার সাথে এরূপ ব্যবহার করেন। উদাহরণ স্বরূপ, হাদিস সমূহে আল্লাহ তাআলার সুহাস্যের কথা বর্ণিত আছে। তাও এই অর্থেই।"[১]

বস্তুত: হযরত আকদাসের পিতা সেইদিনই সূর্যাস্তের পর পরলোকগমন করে। 'ফা-ইন্না লিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজেউন'। তাঁকে কাদিয়ানের মসজিদ আকসার এক কোণে দাফন করা হয়। এবিষয়ে পরে বলা হবে। ইনশাআল্লাহ তাআলা।

পিতার ইন্তেকালের পর ঐশী তত্ত্বাবধান :

পিতার ইন্তেকালে শোকাভিভূত হওয়া স্বাভাবিক ছিল। মানব প্রকৃতি সুলভ স্বাভাবিক দুর্বলতাবশত: নিমেষের জন্য তাঁর মনে এই চিন্তার উদয় হলো যে, আয়ের যে সব উপায় তাঁর পিতার জীবদ্দশায় তার সাথে সংশ্লিষ্ট ছিল, সেগুলো বন্ধ হওয়ায় না জানি কত অসুবিধার সৃষ্টি হবে। এই চিন্তা হওয়া মাত্রই তিনি পুনরায় ওহী লাভ করলেন, أَلَيْسَ اللّٰهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ অর্থাৎ 'আল্লাহ কি তাঁর বান্দার জন্য যথেষ্ট নন ?" হুযুর বলেন:

"এই ইলহাম দ্বারা আমি অত্যাশ্চার্য সান্ত্বনা লাভ করলাম। লোহার পেরেকের মত এটা আমার অন্ত:করণে প্রবেশ করল। সুতরাং সেই মহামহিমান্বিত, আয্যা ওয়া জাল্লা খোদার কসম, যাঁর হাতে আমার জীবন রয়েছে, তিনি তাঁর সুসংবাদবাহী ইলহাম এভাবে আমাকে সত্য করে দেখিয়েছেন আমি তা কল্পনাও করতে পারতাম না। তিনি আমার এমন তত্ত্বাবধান করেছেন যে, কোন পিতা কখনো তা করতে পারত না। আমার প্রতি তিনি অনবরত এমন আশিস বর্ষণ করেছেন যে তা গণনা করা আমার সাধ্যাতীত।"[২]

এই ইলহামটির মধ্যে এক বিরাট ভবিষ্যদ্বাণী নিহিত ছিল। তিনি তৎক্ষণাৎ লালা মালাওয়ামাল সাহেবকে সমস্ত বিষয়ে খুলে বললেন এবং অমৃতসরে হাকিম মুহাম্মদ শরীফ কালানুরী সাহেবের কাছে তাকে পাঠালেন যেন তিনি এ শব্দগুলো খোদাই করে একটি আংটি বানিয়ে পাঠিয়ে দেন। মালাওয়ামাল সাহেব অমৃতসর গিয়ে নগদ পাঁচ টাকায় একটি আংটি তৈরি করে আনলেন। এভাবে একজন হিন্দু

---

(১) 'কিতাবুলল্-বারিয়্যা,' পাদটীকা, ১৫৯-৬১ পৃ:।
(২) 'কিতাবুল বারিয়্যা', ১৬২-৬৩ পৃ।

এবং একজন মুসলমান, ভারতবর্ষের প্রধান দুই জাতির প্রতিনিধিরূপে এই 'আযীমুশ্‌শান' নিদর্শনের সাক্ষী হয়ে রইলেন।

এই আংটি এখনও হযরত মির্যা বশীরুদ্দীন মাহমুদ আহমদ খলিফাতুল্‌ মসীহ্‌ সানী আয়্যাদাহুল্লাহু-তাআলা বেনাস্‌রিহিল্‌ আযীযের কাছে আছে। সম্পত্তি বন্টনে এ আংটি তাঁর ভাগে পড়েছে। এই আংটি ছাড়া হযরত আকদাসের কাছে আরো দু'টি আংটি ছিল। তার মধ্যে একটি ১৮৯২ খ্রিষ্টাব্দে বানানো হয় এর উপর হযরত আকদাসের এই ইলহমটি খোদাইকরা ছিল :

اُذْكُرْ نِعْمَتِيَ الَّتِيْ اَنْعَمْتُ عَلَيْكَ غَرَسْتُ لَكَ بِيَدِيْ رَحْمَتِيْ وَقُدْرَتِيْ

অর্থাৎ 'খোদার নেয়ামতকে স্মরণ কর, যা তিনি তোমাকে দিয়েছেন। তোমার জন্য রহমত এবং কুদরতের (কৃপা ও মহিমার) ভিত্তি নিজ হাতে স্থাপন করেছেন। অপর আংটি ১৯০৬ সালে বানানো হয়। শিয়ালকোট জেলার অন্তর্গত বনবাজেয়া নামক স্থানের একটি মুখলেস স্বর্ণকার হযরত আকদাসের কাছে হুযুরের জন্য একটি আংটি বানানোর আবেদন করে এবং এর উপর কি লিখতে হবে জিজ্ঞাসা করলে হুযুর مولا بس (আমাদের বন্ধু ও প্রভু খোদা যথেষ্ট) লিখবার অনুমতি প্রদান করেন। হযরত আকদাসের মৃত্যুর কিছুদিন পর হযরত উম্মুল-মুমেনীন (রা.) এই আংটিগুলো লটারির মাধ্যমে বন্টন করলেন। আশ্চর্যের বিষয়, কয়েকবার লটারি দ্বারা একই ফল হল। অর্থাৎ প্রথম আংটি হযরত আমীরুল মুমেনীন খলিফাতুল মসীহ্‌ সানী আইয়্যাদাহুল্লাহু-তাআলার নামে উঠলো। দ্বিতীয় আংটিটি হযরত সাহেবজাদা মির্যা বশীর আহমদ সাহেবের নামে উঠল এবং তৃতীয় আংটিটি হযরত সাহেবজাদা মির্যা শরীফ আহমদ সাহেবের নামে উঠল এবং এইভাবে বন্টন সম্পন্ন করা হল।

'মসজিদ আকসার' পাশে পিতার দাফন :

হযরত আকদাসের পিতা মসজিদ আকসার পাশে চিহ্নিত স্থানে সমাহিত হন। এই মসজিদ আকসা নির্মাণের সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত এখানে সন্নিবিষ্ট করা সমীচীন মনে করি। কারণ এর সঙ্গেও সিলসিলার বহু কথা জড়িত আছে। ইতিপূর্বে আমরা বলেছি যে, জমিদারী সংক্রান্ত মামলাগুলোয় ক্রমাগত পরাজিত হয়ে শেষ বয়সে হযরত আকদাসের পিতা খোদা তাআলার সন্তুষ্টি অর্জনের প্রতি অমিত তেজে অগ্রসর হন। তিনি সিদ্ধান্ত নিলেন দুনিয়ার জন্য বহু অর্থ খরচ করেছেন, যার ফলে পরিতাপ ছাড়া আর কিছুই লাভ হয়নি। এখন সর্বদা খোদা তাআলার মহিমা ঘোষণা করার জন্য একটি মসজিদ নির্মাণ করবেন। বিচিত্র কি তিনি আল্লাহ্‌ তাআলার ক্ষমা লাভ করেন ! এই উদ্দেশ্যসাধনের জন্য তিনি গ্রামের

মাঝখানে সাতশ' টাকা ব্যয়ে শিখদের কাছ থেকে একটি পতিত বাড়ি ক্রয় করেন এবং গভীর সন্তাপ ও আন্তরিকতাসহ একটি মসজিদের ভিত্তি স্থাপন করেন।

হযরত আকদাস আলাইহেস্ সালাতু ওয়াস্ সালাম এই মসজিদ নির্মাণের যে পটভূমিকা বর্ণনা করেছেন, এখানে তা উল্লেখ করা একান্তই প্রাসঙ্গিক মনে করি হুযুর বলেন :

"মহামহিমান্বিত, হযরতে ইজ্জত জাল্লা শানুহু আল্লাহ্ তাআলার সম্মুখে তার শূন্য হাতে যাওয়ার পরিতাপ শেষ বয়সে দিন দিন বাড়তে লাগল। তিনি বহুবার ব্যথিত হৃদয়ে বলতেন, সংসারের বৃথা ঝগড়া বিবাদে আমার জীবন অযথা ব্যয় করেছি।" একবার শ্রদ্ধেয় পিতা একটি স্বপ্ন বর্ণনা করেন। তিনি স্বপ্নে রসুলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামকে মহা প্রতাপের অধিকারী এক মহামহিমান্বিত বাদশাহের মত তাঁর বাড়িতে আসতে দেখেন। তখন তিনি তাঁকে স্বাগত জানাতে দৌঁড়ালেন। কাছে গিয়ে তিনি পকেটে হাত দেয়া মাত্র একটি টাকা পেলেন । ভাল করে তিনি দেখলেন যে তা অচল টাকা। এটা দেখে তিনি অশ্রুপাত করলেন। তারপর নিদ্রা ভেঙ্গে গেল। তারপর, নিজেই এর অর্থ বর্ণনা করলেন, দুনিয়াদারির সাথে খোদা এবং রসুলের প্রেম অচল টাকারই মত। আরো বলতেন তারই মত তার পিতার শেষজীবন ও বিপদাপদ, চিন্তা ও অনুশোচনায় অতিবাহিত হয়েছিল। যে কাজেই তিনি হাত দিতেন, অকৃতকার্য হতেন। তাঁর পিতা, অর্থাৎ আমার দাদা সাহেবের একটি কবিতাও শোনাতেন। এর একটি পঙ্ক্তি আমি ভূলে গেছি। অপর পঙ্ক্তিটি এই : "جب تدبیر کرتا ہوں تو پھر تقدیر ہنستی ہے" 'যখন চেষ্টা করি, তখন ভাগ্য পরিহাস করে।' তার এই ব্যাথা ও চিন্তা বৃদ্ধ বয়সে বহুগুণে বৃদ্ধি পায়। এ ভাবনায় প্রায় ছয় মাস আগে শ্রদ্ধেয় পিতা এই গ্রামের মাঝখানে একটি মসজিদ নির্মাণ করেন। যা এখানকার জামে মসজিদ। তিনি নির্দেশ করে যান এই মসজিদের এক কোণে তার কবর হবে, যেন খোদা আযযা ওয়া জাল্লার নাম তার কানে পৌঁছতে থাকে। আশ্চর্য কি, এটাই তার মাগফিরাতের হেতু হতে পারে। বস্তুত:, যেদিন মসজিদের ইমারত নির্মাণ সম্পন্ন হয় এবং সম্ভবত: মেঝের কয়েকটি ইটের গাঁথুনি বাকি ছিল, এর কয়েক দিন আগে মাত্র শ্রদ্ধেয় পিতা আমাশয় রোগে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুবরণ করেন এবং এই মসজিদের ওই কোণেই তাকে দাফন করা হয়, যেখানে দাঁড়িয়ে তিনি চিহ্নিত করেছিলেন। 'আল্লাহুম্মারহামহু ওয়াদাখেলহুল্-জান্নাতা। অর্থাৎ হে আল্লাহ! তাঁর প্রতি দয়া কর এবং তাকে জান্নাতবাসী করা! আমীন। তিনি প্রায় ৮০ অথবা ৮৫ বছর আয়ু পেয়েছিলেন।"[১]

(১) 'কিতাবুল বারিয়্যা,' ১৫৭-৫৯ পৃঃ।

এখন যদিও এই মসজিদ সিলসিলার ক্রমবর্ধমান প্রয়োজনে যথেষ্ট বাড়ানো হয়েছে, কিন্তু মূল অংশ আগের মতই অক্ষুণ্ন আছে এবং ছোট প্রাঙ্গণটি, যা ক্ষুদ্রাকৃতি ইট দ্বারা নির্মিত হয়েছিল তাও তেমনি বিদ্যামান। হযরত আকদাসের পিতার কবর এখন মসজিদের প্রাঙ্গণে অবস্থিত। এই জন্য এর উপর চতুর্দিকে প্রাচীর নির্মাণ করে দেয়া হয়েছে, যেন বৃষ্টি ইত্যাদি পানি থেকে তা নিরাপদ থাকে। তাঁর পিতার কত বড় সৌভাগ্য! তিনি তৎকালীন অবস্থানুসারে সর্বাধিক এটাই মাত্র কামনা করেছিলেন যে, আযানের ধ্বনি যেন তার কানে পৌঁছে। কিন্তু মহামহিমাময় আল্লাহ জাল্লা শানুহু মসজিদের ভিত্তিস্থাপনপূর্বক আল্লাহর জিকির কে (স্মরণ) এত অধিক উচ্চ মর্যাদা দিয়েছেন যে, সেই সময় থেকে আজ পর্যন্ত এর মধ্যে ধারাবাহিকভাবে আল্লাহর জিকির বা এলাহি গুণগান হয়ে আসছে, 'ইনশাআল্লাহ' কিয়ামত পর্যন্ত হতে থাকবে। এখানে অনেকেই পাঁচ ওয়াক্তের নামায এবং নফল সমূহ পড়ে থাকেন। এটা কাদিয়ানের জামে মসজিদ হিসেবেও ব্যবহৃত হয়। জুমআর নামায হয় এবং বিভিন্ন জলসা অনুষ্ঠিত হয়। এছাড়াও কুরআন করীমের দরসও এই মসজিদে নিয়মিতভাবে প্রদান করা হয়।

আশ্চর্যের বিষয় এই যে দরস প্রদানকারি সাধারণতঃ এই কবরের কাছেই দাঁড়িয়ে দরস দিয়ে থাকেন। হযরত খলিফাতুল মসীহ আউয়ালের (রাযি.) সম্বন্ধেও বয়স্করা বলেন যে, তিনি এখানেই দাঁড়াতেন। হযরত হাফেজ রওশন আলী সাহেব (রাযি.) এবং শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক হযরত মৌলানা সৈয়দ সারওয়ার শাহ সাহেবকেও (রাযি.) এইস্থানেই দাঁড়িয়ে দরস প্রদান করতে দীর্ঘকালব্যাপী প্রত্যক্ষ করেছি। হযরত খলিফাতুল মসীহ সানী আইয়্যাদাহুল্লাহু তাআলা সম্পূর্ণ কুরআন শরীফ এই কবরের পাশে দাঁড়িয়ে কয়েক বছর পর্যন্ত দরস দিয়ে শেষ করেন এবং আবার শুরু থেকে দরস দেয়া শুরু করেন। শেষোক্ত দরস কয়েক বছরব্যাপী চলতে থাকা অবস্থায় ১৯৪৭ সালের রাষ্ট্রীয় দুর্বিপাক উপস্থিত হয়।

পারিবারিক সম্মান ও প্রতিপত্তি কায়েম থাকা সম্পর্কে কিছু ইলহাম :

'আলাইসাল্লাহো বে-কাফিন্ আব্দুহু'- "আল্লাহ্ কি তাঁর বান্দার জন্য যথেষ্ট নন"- এই আজীমুশ্বান ইলহাম উপরে বর্ণিত হয়েছে। এর প্রকৃত অর্থ হল যে তাঁর সম্পূর্ণ তত্ত্বাবধান এখন স্বয়ং খোদা তাআলা করবেন। এই ইলহামের সমর্থনে তাঁকে কোন কোন দৃশ্যও দেখানো হয়েছে। হুযুর আকদাস বলেন :

"কোন কোন সময় স্বপ্ন বা কাশফ-যোগে আধ্যাত্মিক বিষয়াবলী দৈহিক অবয়ব ধারণপূর্বক মানবাকারে পরিদৃষ্ট হয়েছে। আমার পিতা গাফারাল্লাহো লাহু একজন সম্ভ্রান্ত রইস এবং আপন এলাকায় খ্যাতিমান পুরুষ ছিলেন। আমার মনে আছে,

তিনি যখন ইন্তেকাল করলেন, তখন তার পরলোকগমনের দ্বিতীয় বা তৃতীয় দিনে আমি একটি পরমা সুন্দরী স্ত্রীলোককে স্বপ্নযোগে দেখি। তার অবয়ব এখনো আমার চোখের সামনে ভাসছে। সে বলল, তার নাম 'রাণী' এবং ঈঙ্গিতে বলল, তিনি গৃহের সম্মান ও শ্রী। আরো বলল, আমি প্রস্থান করতে চেয়েছিলাম, কিন্তু তোমার জন্য থেকে গেলাম।"[১]

হুযুর আরো লিখেছেন,

"ঐ সময়েই আমি স্বপ্নযোগে একজন সুশ্রী পুরুষকে দর্শন করি। আমি তাকে বললাম, 'তুমি আশ্চর্যজনক সুশ্রী। সঙ্কেতে সে বলল, 'আমি তোমার 'বখতে বেদার (সৌভাগ্য) এবং 'তুমি আশ্চর্য্যজনক সুশ্রী কথার উত্তরে বললো, 'হাঁ, আমি দর্শনধারী পুরুষ'।"[২]

বহুলাকারে ঐশী বাক্যালাপ শুরু :

হুযুর আকদাসের শ্রদ্ধেয় পিতার মৃত্যুর পর থেকেই তাঁর কাছে বহুলাকারে ঐশী বাণী আসতে থাকে। তিনি বলেনঃ

"একদিকে তিনি (অর্থাৎ হযরত ওয়ালেদ মাজেদ) ইহলোক ত্যাগ করেন এবং অপর দিকে বিপুল আকারে আমার ওপর ঐশীবাণীর ধারা প্রবাহিত হতে যাচ্ছে। আমি জানি না, আমার কোন পুণ্যের ফলে আমার প্রতি এই ঐশী অনুগ্রহ। আমি শুধু এইটুকু অনুভব করি যে আমার অন্তঃকরণে খোদা তাআলার প্রতি বিশ্বস্ততার স্বাভাবিক আকর্ষণ আছে। তা কোন বস্তুর বাধায় প্রতিরুদ্ধ হতে পারে না। সুতরাং তা আল্লাহরই কৃপা।[৩]"

জ্যেষ্ঠ ভাইয়ের আমলে :

হযরত আকদাসের পিতার মৃত্যুর পর তাঁর জ্যেষ্ঠ ভাই মির্যা গোলাম কাদের সাহেব পারিবারিক বিষয় সম্পত্তির পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করলেন। যদি হযরত আকদাস ইচ্ছা করতেন, তবে সম্পত্তি ভাগের দাবি পূর্বক নিজের অংশ পৃথক করে নিতে পারতেন। কিন্তু তিনি বিষয় সম্পত্তির প্রতি আদৌ মনোনিবেশ করেননি। বরং এটা অভ্যাসরূপে বরণ করে নিলেন যে, খাদ্য পানীয় যাই পেতেন ভাইয়ের সৌজন্য বলে গ্রহণ করতেন। কখনও কোন প্রকার আপত্তি উত্থাপন করতেন না। ৮/৯ মাসব্যাপী ক্রমাগত রোযা রাখার ফলে স্বল্পাহারী

(১) ইযালায়ে-আওহাম,' ২১৩ পৃঃ।

(২) 'ইযালায়ে আওহাম,' ২১৩-১৪ পৃঃ।

(৩) 'কিতাবুল বারিয়্যা,' পাদ টীকা ১৬৩ পৃঃ।

জীবন নির্বাহে তিনি অভ্যস্ত হয়ে পড়েছিলেন। এই কারণে এসময়েও তিনি সেই ‘মোজাহেদার’ (সাধনার) পূর্ণ সদ্ব্যবহার করলেন। অধিকাংশ সময়েই নিজের খাদ্য দরিদ্রদের মধ্যে বন্টন করে নিজে এক পয়সার ছোলা খেয়ে জীবন ধারণ করতেন। যদি এতে না হত, তবে উপবাসেই দিনাতিপাত করতেন। তাঁর সম্বন্ধে জ্যেষ্ঠ ভাই শ্রদ্ধেয় পিতার অনুরূপ ধারণাই পোষণ করতেন। তিনিও তাঁকে সংসার সম্পর্কে উদাসীন মনে করে কখনও কখনও তাঁর সাধুতা ও ধর্মপরায়ণতা দর্শনে মন, প্রাণে তাঁর প্রতি মুগ্ধ হয়ে পড়তেন। তদুপরি আল্লাহ তাআলার অসীম অনুগ্রহে মাতা সাহেবার এক বিশেষ স্নেহের ছায়া ও মহা অনুগ্রহ ছিল। কিন্তু জ্যেষ্ঠ ভাইয়ের আমলে তাঁর অসুবিধা বেড়ে গেল। তাঁর ভাই গুরুদাসপুরে ডেপুটি কমিশনারের অফিসে সুপারিন্টেনডেন্ট ছিলেন এবং অধিকাংশ সময় তিনি সেখানেই থাকতেন। গৃহ ব্যবস্থার যাবতীয় দায়িত্ব ভ্রাতৃ–জায়ার উপর ন্যস্ত ছিল। তিনি তাঁর প্রতি কঠোর ব্যবহার করতেন। বস্তুত: এসময়ে তিনি যে চরম ধৈর্য ও সহনশীলতার এবং উচ্চ আদর্শ প্রদর্শন করেন তার দৃষ্টান্ত কেবল আম্বিয়া কেরামের পবিত্র জীবনসমূহেই পাওয়া যায়। বস্তুত:, যখন আল্লাহ্ তাআলা তাঁকে ‘মামুরিয়তের ’ (প্রত্যাদিষ্ট ধর্ম-সংস্কারকের) পদে অভিষিক্ত করলেন এবং শত-সহস্র ব্যক্তি তাঁর দস্তরখানায় খাবার খেতে লাগলেন, তখন কোন কোন সময় পূর্বের কথা তাঁর স্মরণ হত, এবং তিনি তাঁর ভাবাবেগ নিম্নোক্ত কবিতার শ্লোকে প্রকাশ করতেন :

لُفَاظَاتُ الْمَوَائِدِ كَانَ أُكْلِي   وَصِرْتُ الْيَوْمَ مِطْعَامَ الْأَهَالِي

অর্থাৎ, “এক সময় দস্তরখানার উচ্ছিষ্ট খাদ্য আমার খাবার ছিল আর এখন আমার দস্তরখানায় আল্লাহর কৃপায় শত-সহস্র ব্যক্তি আহার করে।” এজন্য যাবতীয় প্রশংসা আল্লাহরই।

এই সময়টা তাঁর জন্য এমনই কঠোর এবং নিরুৎসাহ ব্যঞ্জক ছিল যে, একবার তিনি কোন ধর্মীয় প্রয়োজনে একটি পত্রিকার জন্য ভাইয়ের কাছে সামান্য কিছু টাকা চেয়ে পাঠালে, ভাইসাহেব সেটা অপব্যয় বলে প্রত্যাখ্যান করেন।

“বড় চাচী এলেন” :

“تائی آئی” “বড় চাচী এলেন” এটা হযরত আকদাসের একটি বিখাত ইলহাম। যদিও ১৯০০ সালে তিনি এ ইলহাম পান, প্রসঙ্গক্রমে আমরা তা নিয়ে এখানে আলোচনা করব। যে সময়ে এই ইলহাম অবতীর্ণ হয়েছিল, সেই সময়ে তিনি এর অর্থ কিছুই বুঝতে পারেননি। খোদা তাআলার মহিমা! হযরত আকদাস যে ভ্রাতৃ-জায়া কর্তৃক নিপীড়িত হয়েছিলেন, আল্লাহ তাআলার বিশেষ কৃপায় সেই

ভ্রাতৃ-জায়া ১৯২১ সালে হযরতের পুত্র হযরত মির্যা বশীরউদ্দীন মাহমুদ খলিফাতুল-মসিহ সানী আইয়্যাদাহুল্লাহু তাআলার পবিত্র হাতে দীক্ষা গ্রহণ করে আহমদীয়া সিলসিলায় যোগ দেন। অত:পর, "তায়ী-আয়ী" (বড় চাচী এলেন) ইলহামের অর্থ বোধগম্য হল। সমস্ত পরিবারে তিনি 'তায়ী' (বড় চাচী) বলে খ্যাতি লাভ করেন। আল্লাহ তাআলা তাঁর আন্তরিকতা এত বৃদ্ধি করেন যে, তিনি ওসীয়্যতও করেন। ১৯২৭ সালের ১লা সেপ্টেম্বর ৯৭ বছর বয়সে তিনি পরলোকগমন করেন এবং কাদিয়ানে 'বেহেশতী মাকবেরায়' সমাহিত হন। 'ফা-ইন্নলিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজেউন'।

পূর্বপুরুষের সম্পত্তিতে মির্যা আযম বেগের ওয়ারিশী দাবির মোকদ্দমা :

খোদা তাআলার অপূর্ব লীলা যতদিন পর্যন্ত হযরত আকদাস সম্পূর্ণ সম্পত্তির অধিকার স্বত্ব একা প্রাপ্ত হননি ততদিন পর্যন্ত স্বপ্ন ও কাশফের ভবিষ্যদ্বাণী অনুসারে পারিবারিক সম্মান ও প্রতিপত্তি ক্রমেই হ্রাস পেতে থাকে। মির্যা গোলাম কাদের সাহেবের আমলে মির্যা আযম বেগ, ভুত-পূর্ব অতিরিক্ত সহকারি কমিশনার কিছু স্বত্বহীন ওয়ারিশ পক্ষে তাঁর সম্পত্তিতে অংশীদার হওয়ার দাবিতে এক মামলা দায়ের করেন। হযরত আকদাস বলেন :

"আমার মরহুম ভ্রাতা মির্যা গোলাম কাদের সাহেব বিজয় লাভের দৃঢ় বিশ্বাস নিয়ে জবাব দেয়ায় ব্যাপৃত হন। আমি এ সম্পর্কে দোয়া করলে, জ্ঞানময় খোদা তাআলার কাছ থেকে ইলহাম প্রাপ্ত হলাম :

أُجِيبُ كُلَّ دُعَائِكَ إِلَّا فِي شُرَكَائِكَ

('তোমার ওয়ারিশদের বিষয় ছাড়া তোমার সমস্ত দোয়া কবুল করব') সুতরাং আমি সব আত্মীয়দেরকে একত্র করে স্পষ্টভাবে বলে দিলাম যে জ্ঞানময় খোদা আমাকে সংবাদ দিয়েছেন, তোমরা এই মামলায় কখনো জয়ী হবে না। এজন্য এটা থেকে বিরত হওয়া কর্তব্য। কিন্তু আমার বাহ্যিক প্রভাব প্রতিপত্তি ও উপায় উপকরণের প্রতি লক্ষ্য করে এবং তাঁর বিজয় লাভ সুনিশ্চিত মনে করে তারা আমার কথার কোন মূল্য দিলেন না। তিনি মামলা পরিচালনা শুরু করলেন। নিম্ন আদালতে তিনি জয় লাভও করলেন। কিন্তু 'আলেমুল-গায়েব' খোদার ওহির অন্যথা কিভাবে সম্ভবপর? অবশেষে, চীফ কোর্টে আমার ভাই পরাজিত হলেন এবং এই প্রকারে এই ইলহামের সত্যতা সবার কাছে প্রকাশিত হল।"[১]

---

(১) 'নযুলুল্-মসিহ', ২১২-১৩ পৃ:।

খোদা তাআলার হাজার হাজার শোকর, হযরত মির্যা বশীরুদ্দীন মাহমুদ আহমদ খলিফাতুল-মসীহ সানী আইয়্যাদাহুল্লাহু তাআলার সময়ে সেই সম্পত্তি ক্রয় করা হয়েছে এবং এই প্রকারে হারিয়ে যাওয়া পারিবারিক সম্পত্তির পুনরুদ্ধার হয়েছে।

ডাক বিভাগের মোকদ্দমা :

১৮৭৭ সালে অমৃতসরের একজন খ্রিষ্টান রালইয়ারাম উকিল হযরত আকদাসের বিরুদ্ধে এক মামলা দায়ের করেন। বিস্তারিত বিবরণ হযরত আকদাসের ভাষায় প্রদত্ত হল:

"অমৃতসরের রালইয়ারাম নামে এক খ্রিষ্টান উকিল ছিল। তার একটি প্রেস ছিল এবং ওই প্রেস থেকে একটি পত্রিকা বের হতো। এই অধম ইসলামের সমর্থনে আর্যদের মোকাবিলায় তার প্রেসে দুই দিকে খোলা একটি প্যাকেটে (Book Post) একটি প্রবন্ধ ছাপার জন্য পাঠাই এবং সাথে একটি চিঠিও পাঠাই। চিঠিতে এমন কোন কোন কথা ছিল, যার মাধ্যমে ইসলামের সমর্থন এবং অন্যান্য ধর্ম বাতিল হওয়ার প্রতি ইঙ্গিত ছিল এবং এতে প্রবন্ধটি মুদ্রণের তাগিদও ছিল। একারণে সেই খ্রিষ্টান, ধর্ম বিরেধিতার কারণে রেগে অগ্নিশর্মা হল। ঘটনাচক্রে সে শত্রুতাবশত: আক্রমণার্থে একটি সুযোগও লাভ করল। প্যাকেটে (Book Post) কোন স্বতন্ত্র চিঠি রাখা আইনত: দন্ডনীয় অপরাধ ছিল,[১] যে সম্বন্ধে এই অধমের কিছুই জানা ছিল না। ডাক বিভাগীয় আইন অনুসারে এই প্রকার অপরাধের শাস্তি পাঁচশ টাকা জরিমানা বা ছয়মাস পর্যন্ত কারাদন্ড নির্দিষ্ট ছিল। সুতরাং সে সংবাদদাতা সেজে ডাক বিভাগের কর্মচারীদের মাধ্যমে এই অধমের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করল।

এই মামলা সম্বন্ধে কোন কিছু অবগত হওয়ার আগে, স্বপ্ন যোগে আল্লাহ্ তাআলা আমার কাছে প্রকাশ করলেন 'রালইয়ারাম উকিল আমাকে দংশনের জন্য একটি সাপ পাঠিয়েছে এবং আমি সেটাকে মাছের মত ভেজে তাকে ফিরিয়ে দিয়েছি।' আমি জানি তা এই কথার প্রতি নির্দেশ করছিল যে, পরিণামে এই মামলা যেভাবে আদালতে নিস্পত্তি হবে, তা এমন একটি দৃষ্টান্ত যা ভবিষ্যতে উকিলদের কাজে আসতে পারে।

যাহোক, আমি এই অপরাধে জেলা গুরুদাসপুর সদরে আহূত হলাম এবং যে সমস্ত উকিলের সাথে মামলা সম্বন্ধে পরামর্শ করলাম, তারা এটাই পরামর্শ

---

(১) ডাক বিভাগের এই আইন এখন নেই। কিন্তু আমরা যে সময়ের কথা নিয়ে আলোচনা করছি, সে সময়ে এই আইন ছিল। দেখুন Act. No. 14 of 1886 sections 12 and 56 ; & Government of India Notification No. 2424, dated December 7, 1877, section 43.

দিলেন মিথ্যা কথা বলা ছাড়া কোনই উপায় নেই। তারা পরামর্শ দিলেন, এভাবে বর্ণনা দিন যে আপনি প্যাকেটে চিঠি দেননি। রালইয়ারাম নিজেই তা করেছেন। সান্ত্বনাস্বরূপ তারা আরও বললেন, এই প্রকার বিবৃতি দিলে সাক্ষ্যের উপর মামলা নিষ্পত্তি হয়ে যাবে এবং দুই চারটি মিথ্যা সাক্ষী দেয়ালেই মুক্তি লাভ হবে। না হয় মামলার অবস্থা অত্যন্ত খারাপ। বাঁচার অন্য কোন উপায় নেই। কিন্তু আমি সবাইকেই এই উত্তর দিলাম আমি কোন অবস্থায় সত্যবাদিতা ত্যাগ করতে পারবো না। যা হয় হোক। তখন সেদিনই বা পরদিন আমাকে এক ইংরেজের আদালতে উপস্থিত করা হল। আমার বিপক্ষে ডাক বিভাগের অফিসার সরকারি বাদী হিসেবে উপস্থিত হলেন। তখন বিচারকর্তা নিজ হাতে আমার বিবৃতি লিপিবদ্ধ করলেন এবং সবার আগে আমাকে এটাই জিজ্ঞেস করলেন, "এই চিঠিটি কি আপনি নিজ হাতে প্যাকেটের মধ্যে রেখেছিলেন? এই চিঠি এবং এই প্যাকেট কি আপনার?" তখন আমি সরাসরি বললাম, "এই চিঠি এবং এই প্যাকেট দু'টোই আমার এবং আমি এই চিঠি প্যাকেটের মধ্যে রেখেছিলাম। কিন্তু সরকারের মাশুল ফাঁকি দেয়ার দুরভিসন্ধিতে এ কাজ করিনি। আমি এই চিঠিকে এই প্রবন্ধ থেকে কোন স্বতন্ত্র জিনিস মনে করিনি আর এতে আমার ব্যাক্তিগত কোন কথাও ছিল না।" এই কথা শোনামাত্র খোদা তাআলা এই ইংরেজের মন আমার দিকে ফিরিয়ে দিলেন এবং আমার বিপক্ষে ডাকবিভাগের অফিসার বহু চেঁচামেচি করলেন এবং ইংরেজিতে দীর্ঘ বক্তৃতা দিলেন যা আমি বুঝতে পারিনি। কিন্তু আমি এতটুকু বুঝতে পেরেছিলাম যে, প্রত্যেক বক্তৃতার পর ইংরেজিতে ওই হাকিম নো' 'নো' বলে তার সমস্ত কথাই বাতিল করছিলেন। অবশেষে যখন সেই বাদী পক্ষের অফিসার তার যাবতীয় অজুহাত বর্ণনা করল এবং সম্যক বিষোদগার করল, তখন বিচারক রায় লেখায় মনোনিবেশ করলেন এবং যথাসম্ভব এক ছত্র কি দেড় ছত্র লিখে আমাকে বললেন- আচ্ছা, আপনি যেতে পারেন। এটা শুনে আমি আদালত ঘর থেকে বের হলাম এবং পরম দয়ালূ আল্লাহ'র কাছে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করলাম, যিনি একজন ইংরেজ অফিসারের বিপক্ষে আমাকেই জয়ী করলেন। আমি ভালভাবে জানি, তখন সত্যবাদিতার কল্যাণে খোদা তাআলা এই বিপদ থেকে আমাকে মুক্তি দান করেছেন।

ইতিপূর্বে আমি স্বপ্নে দেখি এক ব্যাক্তি আমার টুপি নামানোর জন্য হাত বাড়িয়েছে। আমি বললাম, 'কি করছেন? তখন সে টুপিটি আমার মাথাতেই রেখে দিল এবং বললো 'মঙ্গল' 'মঙ্গল'।"[১]

(১) 'আয়নায়ে-কামালাতে ইসলাম,' ২৯৭–৯৯ পৃঃ।

ভাবুন দেখি এই মামলায় তার জন্য কত বড় পরীক্ষা ছিল। তার স্থানে অন্য কেউ হলে হয়তো এই কঠিন পরীক্ষায় স্থির থাকতে পারতো না। কিন্তু হযরত আকদাস ছিলেন মূর্তিমান সত্য। তিনি তার স্থানে অবিচল থাকলেন এবং তার উকিলদের পরামর্শ গ্রহণ না করে আদালতে সত্য-সত্য বর্ণনা দিলেন। 'আল্লাহুম্মা সাল্লে আলা মুহাম্মাদেওঁ ওয়া আলা আলে মুহাম্মদ।

মারাত্মক রোগ থেকে অলৌকিক আরোগ্য লাভ :

১৮৮০ সালে হযরত আকদাস মারাত্মক অন্ত্রশূল রোগে আক্রান্ত হন। বারবার পায়খানার বেগ হতো, রক্তপাত হতো। এ অবস্থা প্রায় ১৬ দিন পর্যন্ত ছিল। তিনবার আত্মীয়-স্বজনরা তাঁকে 'সুরা ইয়াসীন' পড়ে শোনালেন। শেষ পর্যন্ত তাঁদের নিশ্চিত ধারণা হয়েছিল সন্ধ্যা পর্যন্ত কবরস্থ করতে হবে। বস্তুত:, যখন তাঁর অবস্থা খুব সঙ্গীন ও নৈরাশ্যজনক হয়ে পড়লো এবং তাঁর আত্মীয়রা দেয়ালের আড়ালে কান্না করছিলেন, তখন পরম আরোগ্যদাতা খোদা ইলহাম দ্বারা এই দোয়া শিখালেন :

سُبْحَانَ اللّٰهِ وَ بِحَمْدِهٖ سُبْحَانَ اللّٰهِ الْعَظِيْمِ - اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّ اٰلِ مُحَمَّدٍ

('আল্লাহ্ পবিত্র, এবং তাঁরই প্রশংসা, পরম পবিত্র মহামহিমান্বিত আল্লাহ। আল্লাহ! মুহাম্মদ এবং তাঁর অনুগামীদের প্রতি কৃপা কর) এই দোয়া ইলহাম হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর হৃদয়ে একথা এলকা (উদয়) হল যে বালু মিশ্রিত নদীর পানিতে হাত ভিজিয়ে এই পবিত্র বাক্যগুলো পাঠ করে বুক, পিঠ, দু'হাত ও মুখের ওপর বুলালে তিনি আরোগ্য লাভ করবেন। তিনি বলেছেন :

"তাড়াতড়ি বালু মেশানো পানি আনা হল এবং যেমন আমাকে শিখানো হয়েছিল, তেমনই করলাম। তখন আমার অবস্থা এমন ছিল যে, আমার প্রতিটি লোমকূপ দিয়ে যেন আগুন বের হচ্ছিল। সমস্ত শরীরে ভীষণ জ্বালা ছিল। অজ্ঞাতসারে মনের অবস্থা এমন ধারণ করেছিল যে মৃত্যু হলেও ভাল, তবু এই অবস্থা থেকে মুক্তিলাভ হবে। কিন্তু যখন ওই প্রক্রিয়া শুরু করলাম–সেই খোদার কসম যার হাতে আমার প্রাণ রয়েছে - প্রতিবার এই বাক্যগুলো পাঠ এবং শরীর পানি দিয়ে মোছার সঙ্গে সঙ্গে আমার মনে হচ্ছিল যেন সেই আগুন ভিতর থেকে বের হয়ে যাচ্ছে এবং তীব্র দাহের পরিবর্তে শরীর শীতল ও আরাম হয়ে যাচ্ছে। এমন কি, পেয়ালার পানি শেষ হয়নি অথচ আমি দেখতে পেলাম রোগ আমাকে সম্পূর্ণভাবে পরিত্যাগ করেছে। আমি ষোলদিন পর রাতে সুস্থ অবস্থায় ঘুমাতে গেলাম। যখন ভোর হল তখন আমি ইলহাম প্রাপ্ত হলাম :

وَاِنْ كُنْتُمْ فِيْ رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلٰى عَبْدِنَا فَاْتُوْا بِشِفَآءٍ مِّنْ مِّثْلِهٖ -

অর্থাৎ–“যদি তোমরা এই নিদর্শন সম্বন্ধে সন্দেহ কর যা আরোগ্যলাভে আমি প্রদর্শন করেছি তবে তোমরা এর অনুরূপ অন্য কোন দৃষ্টান্ত উপস্থাপন কর।”[১]

জজ নবাব সরদার মুহাম্মদ হায়াত খাঁ'র পদচ্যুতির পর বহালের সুসংবাদ :

এ সময়েই তাঁর জ্যেষ্ঠ ভাই মির্যা গোলাম কাদের সাহেব জজ নবাব সরদার মুহাম্মদ হায়াত খাঁ সাহেবের জন্য দোয়া করতে বলেন। সরকার তাকে কোন দোষের অভিযোগে সাময়িকভাবে পদচ্যুত করেন। পদচ্যুতির কাল দীর্ঘ হয়ে যাওয়ায় তিনি নানা প্রকার বিপদগ্রস্ত হন। হযরত আকদাস তার জন্য দোয়া করার পর স্বপ্নে দেখলেন, যেন নবাব সাহেব তার সামনে দাঁড়িয়ে আছেন এবং তিনি তাকে বলছেনঃ

“আপনি কোন চিন্তা করবেন না। খোদা সবকিছুই করতে পারেন। তিনি আপনাকে মুক্তি দিবেন।”[২]

বস্তুত যদিও বাহ্যিক অবস্থা দেখে চাকরিতে তার পুনরায় প্রতিষ্ঠিত হওয়া অসম্ভব বলে বিবেচিত হচ্ছিল, তারপরও তিনি আবার প্রতিষ্ঠিত হলেন। ‘ফাল্‌-হাম্‌দুলিল্লাহে আ'লা যালেকা’।

অতুলনীয় আধ্যাত্মিক পরিবর্তনের এক রাত :

হযরত মৌলবী আব্দুল্লাহ গজনবী সাহেবের মৃত্যুর কথা ইতিপুর্বে বর্ণিত হয়েছে এবং এটাও বলা হয়েছে, তিনি ১৮ই ফেব্রুয়ারি ১৮৮১ সালে মৃত্যুবরণ করেন। এর কিছু দিন আগে হযরত আকদাস এক সফর উপলক্ষে যখন গুরুদাসপুর অবস্থান করছিলেন, তখন এক রাতে স্বপ্নযোগে জানতে পারেন, হযরত মৌলবী আব্দুল্লাহ্‌ গজনবী সাহেবের মৃত্যু সন্নিকটে। ঘুম ভেঙ্গে গেলে তিনি অনুভব করেন, এক স্বর্গীয় আকর্ষণ তাঁর মধ্যে কাজ করছে। এমনকি, ইলহামে ইলাহীর পর্যায় শুরু হলো। সেই রাতের রুহানী পরিবর্তন উপলক্ষে তিনি বলেন :

“সেই এক রাত ছিল। ওই রাতে আল্লাহ্‌ তাআলা আমার পরম ও চরম ইসলাহ্‌ করলেন এবং এমন পরিবর্তন সংঘটিত হল যা মানুষের হাতে বা মানুষের ইচ্ছায় হওয়া অসম্ভব”।[৩]

---

(১) ‘তিরয়াকুল্‌-কুলুব’ ৩৭–৩৮ পৃষ্ঠা।
(২) ‘বারাহীনে আহমদীয়া’, তৃতীয় খন্ড, ২৫২ পৃষ্ঠা। ‘হাশিয়া দর-হাশিয়া’ নং-১ এবং ‘আল-হাকাম’, ১০ই সেপ্টেম্বর ১৯০২ সাল, ৩২ পৃষ্ঠা।
(৩) ‘নযুলুল্‌-মসীহ্‌’ ২৩৭ পৃষ্ঠা।

দ্বিতীয় অধ্যায়

‘বারাহীনে আহ্‌মদীয়া’ প্রণয়ন হতে প্রথম বয়আত গ্রহণ পর্যন্ত

“বারাহীনে-আহ্‌মদীয়ার প্রণয়নের” পটভূমি :

হযরত মসিহ মাউদ (আ.) এর সুপ্রসিদ্ধ কিতাব ‘বারাহীনে-আহমদীয়া’ সম্বন্ধে আলোচনার আগে পাঠকের সামনে এর রচনার পটভূমি বর্ণনার জন্য তখনকার ধর্মীয় আন্দোলন গুলোর পর্যালোচনা অত্যাবশ্যক। খ্রিষ্ট ধর্মের আন্দোলন সম্পর্কে ইতিপূর্বে বলা হয়েছে। এছাড়া, দেশে আর্য ও ব্রাহ্ম সমাজ কর্তৃক দুটি প্রসিদ্ধ আন্দোলন শুরু হয়েছিল। এ আন্দোলনের তিনটি উদ্দেশ্য ছিল, ইসলামের বিপক্ষে একজোটে উপর্যুপরি আক্রমণ দ্বারা মুসলমানদেরকে তাদের ধর্ম থেকে সরিয়ে দেয়া।

এর উপলক্ষ ছিল ১৮৫৭ সালের সিপাহী বিদ্রোহ। হিন্দুরা ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে উত্তেজনা সৃষ্টির জন্য মুসলমানদেরকে সিপাহী বিদ্রোহে অস্ত্ররূপে ব্যবহার করে।[১] মুসলমানদের প্রতি পূর্ব থেকেই ইংরেজদের কুদৃষ্টি ছিল। হিন্দুরাও এর সুযোগ গ্রহণ করল। স্বামী দয়ানন্দ বোম্বাই শহরে আর্য সমাজ নামে এক আন্দোলন শুরু করেন। আর্য সমাজের ভিত্তি স্থাপিত হওয়ার কয়েক মাস পরেই এর কিছু উচ্চ হিন্দু নেতার পরামর্শে এই সিদ্ধান্ত গৃহীত হল যে, ইসলাম ও ইসলাম ধর্মের প্রবর্তক হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহ আলাইহে ওয়া সাল্লামের ওপর পীড়াদায়ক আক্রমণদ্বারা মুসলমানদের বিরুদ্ধে ঘৃণাকর বৈরি পরিবেশ সৃষ্টি করতে হবে এবং ‘দেশপ্রেম’ ও ‘জাতির উন্নতির’ নামে হিন্দুদেরকে ব্যাপকভাবে সঙ্ঘবদ্ধ করতে হবে। পণ্ডিতজী এ ব্যাপারে একটি অসুবিধার সম্মুখীন হলেন। বেদ হিন্দু সংগঠনের ভিত্তিপ্রস্তর রূপে ব্যবহৃত হতে পারত। কিন্তু একদিকে অধিকাংশ হিন্দুই এর ভাষা সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অজ্ঞ এবং পক্ষান্তরে, কালের আবর্তে বেদ এরূপ বিকৃত ও পরিবর্তিত হয়েছিল যে, এর অনুবাদ প্রকাশ করলেও বর্তমান সভ্যতার যুগে তাদ্বারা উপকারের আশা ছিল না। এ সমস্যা সমাধানার্থে পণ্ডিত দয়ানন্দ মহাশয় ‘সত্যার্থ প্রকাশ’ নামক একটি নতুন গ্রন্থ হিন্দুদের সামনে উপস্থিত করলেন। এ পুস্তকে বেদ বর্ণিত শিক্ষা ও ধর্ম বিশ্বাস গুলোর কষ্টকল্পিত ব্যাখ্যা দিয়ে হিন্দুধর্মের এক নতুন দৃষ্টিভঙ্গির ভিত্তি সংস্থাপন করা হল।

(১) ‘তারিখে-উরুজে আহ্‌দে সাল্‌তানতে আঙ্গলেশিয়া হেন্দ’, ৬৬পৃ:, ১৯০৪ সালে দিল্লীর ‘শামসুল্‌ মুতাবে’ প্রেসে মুদ্রিত সংস্করণ।

সমসাময়িক শিক্ষিত সম্প্রদায় তা নিজের করে নিতে শুরু করল। ফলে এ আন্দোলন ক্রমশঃ বিস্তার ও প্রসিদ্ধি লাভ করতে লাগল। যদিও ভারতবর্ষের বিভিন্ন শহরেও তা নিয়ে চর্চা শুরু হল, কিন্তু পাঞ্জাবের কোনো কোনো শহর যথা- লাহোর, অমৃতসর ও রাওয়ালপিণ্ডিতে এর শক্তিশালী শাখা স্থাপিত হল। এই নব-আন্দোলন সৃষ্টির অল্পকালের মধ্যেই হযরত আকদাস এর মোকাবিলা শুরু করলেন। তিনি এর মূল ভিত্তির উপর এরূপ কার্যকরী আঘাত হানলেন যে, আর্য সমাজের প্রতিষ্ঠাতা ও অনুবর্তিগণ হতভম্ব হয়ে পড়ল। ১৮৭৭ সালের ৭ই ডিসেম্বর 'উকীল হিন্দুস্তান' পত্রিকায় আর্য সমাজের প্রতিষ্ঠাতা পণ্ডিত দয়ানন্দ মহাশয় আত্মা সম্বন্ধে মত প্রকাশ করতে গিয়ে বললেন :

'আত্মা অগণিত, অসংখ্য। এমন কি, স্বয়ং পরমেশ্বরও এর সংখ্যা জানেন না। এই কারণে সর্বদা মুক্তি লাভ ঘটছে এবং ঘটতে থাকবে; কখনও শেষ হবে না।"

এই অমূলক ধর্মমত প্রকাশ মাত্র হযরত আকদাস এর খণ্ডনে ভুরি ভুরি যুক্তি প্রমাণ উপস্থাপন করলেন। আর্যদের পক্ষে অমৃতসরের বাবা নারায়ণ সিংহ, সেক্রেটারী আর্য সমাজ ও পণ্ডিত খড়ক সিংহ নামে উৎসাহী আর্য সদস্য, মোকাবিলার জন্য পর পর অগ্রসর হলেন। কিন্তু যুক্তি-তর্কে উভয়ের এমন পরাজয় ঘটল যে, মৃত্যুকাল পর্যন্ত তারা আর মাথা উঠায়নি। পণ্ডিত খড়ক সিংহ বেদের প্রতি এমন বীতশ্রদ্ধ হল যে, সে আর্য সমাজ পরিত্যাগপূর্বক খ্রিষ্ট ধর্ম গ্রহণ করল এবং বিভিন্ন কাগজে পরিষ্কার লিখল ঐশীজ্ঞান ও সত্যবাদিতার সাথে বেদের কোন সম্পর্ক নেই, তাই এটা ঐশীবাণী হতে পারে না ইত্যাদি, ইত্যাদি।[১] অপর একব্যক্তি তার সাথে মোকাবিলায় এমন নিরুত্তর হল যে, হিন্দু পণ্ডিতরা তার উত্তর সমূহকে বাচালতা বলে প্রকাশ করল। অপরের কথা বাদ দিন, স্বয়ং পণ্ডিত দয়ানন্দ মহাশয়ের উপর হযরত আকদাসের প্রবন্ধ গুলোর এরূপ প্রতিক্রিয়া হল যে, সেও বেসামাল হয়ে পড়ল। হযরত সাহেব তাকে বারবার মোকাবিলার জন্য আহ্বান করতে লাগলেন। পণ্ডিতজী যখন দেখতে পেল তিনি নাছোড়বান্দা, তখন পন্ডিতজী তিনজন আর্য সমাজীকে তার কাছে এই মন্তব্যসহ প্রেরণ করল :

'যদিও আত্মা প্রকৃত পক্ষে অগণিত নয়, তথাপি পুনর্জন্ম চিরকাল চলতে থাকবে। যখন সব আত্মা মুক্তিলাভ করবে, তখন পুনরায় তাদেরকে প্রয়োজনবোধে মুক্তি হতে বের করে দেয়া হবে।"[২]

(১) 'শাহ্নায়ে-হক', ২৪ পৃঃ প্রথম সংরস্করণ।
(২) 'তবলিগে-রিসালত', প্রথম খণ্ড, ৬৬৭ পৃঃ।

নি:সন্দেহে এটা দয়ানন্দ মহাশয়ের খোলাখুলি পরাজয় এবং হযরত আকদাসের সুস্পষ্ট বিজয়। যখন জনসমাজে এই মোকাবেলা নিয়ে খুব আলোচনা চলল, তখন পণ্ডিতজী অপমান ঢাকবার জন্য তাঁকে তর্কযুদ্ধে আহ্বান করল। হযরত আকদাস তৎক্ষণাৎ পণ্ডিতজীর আহ্বানে সাড়া দিলেন। কিন্তু পণ্ডিতজী নিজেই তর্ক থেকে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করল। এই পৃষ্ঠ প্রদর্শনের কৃত্রিম কারণ বর্ণনা করতে গিয়ে জনৈক আর্য সমাজী পণ্ডিত মহাশয় লিখেছেন :

"আর্য সমাজের অভ্যন্তরীণ মতভেদের ফলে মির্যা গোলাম আহ্মদ কাদিয়ানী সুযোগ লাভ করলেন। তিনি আর্য সমাজের বিরুদ্ধে অমৃতসরের 'সফিরে হিন্দ্' পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে দীর্ঘকালব্যাপী প্রবন্ধের পর প্রবন্ধ লিখা শুরু করলেন। ওই সকল প্রবন্ধে স্বামী দয়ানন্দজী মহারাজকে প্রতিযোগিতামূলক মোকাবেলার আহ্বানও করল। স্বামী দায়নন্দ ওই সময়ে রাজস্থান পরিভ্রমণে ছিলেন এই জন্য তিনি বখ্তাওর সিংহ এবং মুনশি ইন্দ্রমন মুরাদাবাদীকে আহ্বানে সাড়া দিতে বলেছিলেন। কিন্তু দু:খের বিষয়, ঠিক সেই সময় কোনো কারণে স্বামীজী ইন্দ্রমন মুরাদাবাদীকে আর্য সমাজ থেকে বহিস্কৃত করে দেন। এ জন্য 'মুবাহাসা' হয়নি। হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (সাহেব) এই ঘটনার পুরোপুরি ফল লাভ করলেন এবং আর্যদের বিরুদ্ধে এমন অকাট্য যুক্তিপূর্ণ সাহিত্য প্রণয়ন করলেন যে, এর ফলে মুসলমানদের মনে আর্য ধর্ম সম্বন্ধে ঘৃণার সৃষ্টি হল।"[১]

ব্রাহ্ম আন্দোলনের অকৃতকার্যতা :

ইসলামের বিরুদ্ধে অপর একটি শক্তিশালী আন্দোলন ব্রাহ্ম সমাজ পরিচালিত করছিল। হযরত আকদাস এর বিরুদ্ধেও এরূপ তীব্র সমালোচনা করলেন যে, সেটা বেশিদূর অগ্রসর হতে পারল না। ব্রাহ্ম সমাজের এক নেতা লিখেছে :

'রাজা রামমোহন রায়ের মহা ব্যক্তিত্বের ফলে ব্রাহ্ম সমাজ ইংল্যান্ড ও আমেরিকায় ইউনিটেরিয়ান চার্চ রূপে স্থাপিত হল। কিন্তু দুঃখের বিষয় কাদিয়ানী সম্প্রদায়ের কারণে ভারতবর্ষের মুসলমানদের উপর অত্যন্ত কুপ্রভাব জন্মাল এবং মুসলমানদের মধ্যে শ্রদ্ধাস্পদ ব্যক্তিগণ, যারা ব্রাহ্মসমাজের নিয়মাচার বশত: প্রভাবান্বিত হয়েছিলেন, প্রায় সবাই পশ্চাদপদ হলেন।"[২]

ব্রাহ্ম সমাজের অপর এক নেতা দেবেন্দ্র পাল মহাশয় লিখেছে :

'ব্রাহ্ম সমাজ আন্দোলন একটি মহা ঝটিকারূপে উত্থিত হল এবং দেখতে দেখতে

(১) 'আরিয়াসমাজ আওর প্রচার কে সাধনা' পণ্ডিত দেবদত্ত প্রণীত, ১২ পৃ:।
(২) 'হিন্দুত্ব' (হিন্দী) রামদাস গৌড় প্রণীত, ৯৮২ পৃ:।

শুধু ভারতবর্ষেই নয় বিদেশেও শাখা বিস্তার লাভ করল। ভারতে শুধু হিন্দু ও শিখগণ এর প্রভাব গ্রহণ করলেন এমন নয়, বরং মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্য থেকেও একটি বৃহৎ দল এতে যোগদান করলেন। প্রতিদিন শত শত মুসলমান ব্রাহ্ম সমাজে প্রবেশ করতে লাগলেন। দীক্ষা গ্রহণ শুরু হওয়ার সঙ্গেই জানা গেল, বড় বড় মুসলমান পরিবার ব্রাহ্ম সমাজের সাথে শুধু সহমতই পোষণ করতেন না বরং দস্তুরমত এই সমাজের সদস্যও হয়েছিলেন। কিন্তু ঠিক সেই সময়েই মুসলমানগণের একজন শ্রেষ্ঠ বিদ্বান মির্যা গোলাম আহ্‌মদ কাদিয়ানী হিন্দু ও খ্রিষ্টানদের বিরুদ্ধে গ্রন্থ প্রণয়ন শুরু করেন এবং তর্ক যুদ্ধে তাদেরকে আহ্বান করেন। দুঃখের বিষয়, ব্রাহ্ম সমাজের কোনো বিদ্বানই এই আহ্বানের প্রতি মনোনিবেশ করেননি। ফলে, যে সব মুসলমান ব্রাহ্ম সমাজের শিক্ষা দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন, তারা শুধু সরে পড়লেন, তাই নয়, বরং যে সব মুসলমান ব্রাহ্ম সমাজে রীতিমত প্রবেশ করেন, তারাও ক্রমশ ব্রাহ্মসমাজ পরিত্যাগ করলেন।”[১]

‘বারাহীনে আহ্‌মদীয়া’ প্রণয়ন ও প্রকাশঃ

হযরত আকদাস লক্ষ্য করলেন, ইসলামবিরোধী উল্লিখিত আন্দোলনগুলো সম্পর্কে শুধু কাগজে প্রবন্ধ প্রকাশ দ্বারা স্থায়ী ফল লাভ সম্ভবপর নয়। কারণ, পত্রিকা বহুদিন সংরক্ষিত হয় না। কিছু সময় চর্চা থাকে। তারপর, মূল বিষয় মানুষের স্মৃতি থেকে অপসৃত হয়। সুতরাং, তিনি ‘বারাহীনে আহ্‌মদীয়া’ নামক একটি স্থায়ী গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। এই পুস্তকে তিনি কুরআন মজীদ এবং আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের সত্যতা সম্বন্ধে এমন শক্তিশালী প্রমাণ উপস্থাপন করলেন যে, জগত চমৎকৃত হল।

আর্য সমাজ বেদের পর কোন ঐশী বাণী স্বীকার করত না। ব্রাহ্মসমাজ মূল ইলহামই অস্বীকার করেন এবং মুক্তির জন্য শুধু বিবেককেই যথেষ্ট মনে করে। পাশ্চাত্য দর্শন শাস্ত্রের দ্বারা প্রভাবান্বিত মুসলমানরাও ইউরোপের জড় উন্নতি দেখে ইল্‌হামের অস্বীকারের প্রতি ঝুকে পড়েছিলেন। ইসলামের আলেমগণ সামান্য কথায় একে অপরকে কুফরের ফতোয়া দেয়ায় লিপ্ত ছিলেন। ইসলাম একান্তই নি:স্ব ও নি:সহায় অবস্থায় নিপতিত হয়েছিল। কিছু লোক খ্রিষ্টান ধর্মে আশ্রয় গ্রহণ করছিল এবং কিছু লোক আর্য সমাজ এবং ব্রাহ্ম সমাজের কুক্ষিগত হচ্ছিল। এমন পরিস্থিতির সময় কাদিয়ানের নির্জন কোণ থেকে খোদার একজন পাহলোয়ান উত্থিত হলেন। তিনি কুরআন মজিদের শ্রেষ্ঠত্ব, আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু

(১) ‘কৌমুদী; , (হিন্দু পত্র) কলিকাতা, আগস্ট ১৯২০।

আলাইহে ওয়াসাল্লামের সত্যতা, ইল্হামের প্রয়োজনীয়তা এবং এর প্রকৃত তত্ত্ব ও তথ্যে পরিপূর্ণ, এমন একটি অতুলনীয় গ্রন্থ প্রণয়ন করলেন যে, এর ফলে একদিকে ইসলামের শত্রুরা নাজেহাল ও পর্যদুস্ত হয়ে পড়ল এবং অন্যদিকে ভারতবাসী মুসলমানদের সাহস বেড়ে গেল। এই পুস্তকের প্রথম খণ্ড ১৮৮০ সালে প্রকাশিত হয়। এই খণ্ডে তিনি পৃথিবীর যাবতীয় ধর্মের নেতৃবর্গকে আহ্বান জানিয়ে বলেন, কুরআন মজিদের যথার্থতা এবং আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের সত্যতা প্রমাণ করার জন্য তিনি যে সব যুক্তি স্বীয় ইলহামী পুস্তক অর্থাৎ কুরআন করীম থেকে উপস্থাপন করেছেন, যদি কোনো অমুসলমান এর অর্ধেক বা এক-তৃতীয়াংশ, বা এক-চতুর্থাংশ বা এক-পঞ্চমাংশও তাদের ধর্ম বিশ্বাসের সত্যতার প্রমাণ রূপে তাদের ঐশী পুস্তক থেকে প্রদর্শন করতে পারেন, অথবা যদি যুক্তি উপস্থিত করতে অক্ষম হন তবে তিনি যে সব যুক্তি দিয়েছেন, ওগুলোকে ধারাবাহিকভাবে খণ্ডন করেন, তবে তিনি তার দশ সহস্র টাকার সম্পত্তি তার হাতে সমর্পণ করবেন। কিন্তু এই শর্ত বাধ্যকর থাকবে যে, নির্বাচিত তিনজন জজের একটি বোর্ড এই মিমাংসা দিবেন যে শর্তানুযায়ী জবাব দেয়া হয়েছে।

এই চ্যালেঞ্জের প্রত্যুত্তরে কোনো কোনো ইসলামবিরোধী এই কেতাবের রদ লিখার তোড়জোড় ঘোষণা করতে লাগল। এতে তিনি তৎক্ষণাৎ লিখলেন :

সব সাহেবানকেই দিব্য দিয়ে বলছি যে, আমার মোকাবিলা করতে কিঞ্চিৎমাত্র বিলম্ব করবেন না। প্ল্যাতু হোন, ব্যাকনের অবতার হোন, আরিস্ততলের দৃষ্টি ও চিন্তা শক্তি আনয়ন করুন, স্বকল্পিত ঈশ্বরগণের কাছে সাহায্যার্থে করজোড় করুন, তারপর দেখুন, আমার খোদা বিজয়ী হন–না আপনাদের কল্পিত ভগবানদের বিজয় হয়।”[১]

এই কেতাবের জবাবে কোনো গ্রন্থ প্রকাশ করা খ্রিষ্টান, আর্য সমাজ এবং ব্রাহ্ম সমাজের কর্তব্য ছিল। কিন্তু স্বামী দয়ানন্দ ‘বারাহীনে-আহ্মদীয়া’ প্রকাশিত হওয়ার পর তিন বছর পর্যন্ত জীবিত থেকেও সম্পূর্ণ নীরব থাকল। ব্রাহ্ম সমাজও চুপ থাকল। অবশ্য পেশাওয়ারের জনৈক আর্য পণ্ডিত লেখরাম– যিনি পরে তাঁর মোকাবিলায় উপস্থিত হয়ে আর্য সম্প্রদায়ের কপালে চির পরাজয়ের টিকা লাগিয়ে ইহধাম ত্যাগ করেন, ‘তক্জীবে বারাহীনে আহমদীয়া’ নামক একটি পুস্তক লিখেন। যারা এই পণ্ডিত মহাশয়ের রচনাদি দেখার সুযোগ লাভ করেছেন, তারা উত্তমভাবে জানেন, তার লেখাতে গালাগালি ও ঠাট্টা বিদ্রুপ ব্যতিত আর কিছুই থাকত না। উল্লিখিত পুস্তকটির নাম থেকেই প্রতীয়মান হয়

(১) ‘বারাহীনে আহমদীয়া,’ দ্বিতীয় খণ্ড, কভার পেজ, ২, ৩, ৪ পৃঃ।

এ বিষয়বস্তু কেবল অবান্তর বাক্যের সমষ্টি ছিল। কিন্তু এরও জবাব দেয়া হয়। হযরত আকদাসের স্বনামখ্যাত শিষ্য হযরত মৌলানা নুরুদ্দীন সাহেব রাযি আল্লাহু আন্‌হু–যিনি পরে তাঁর প্রথম খলিফা পদে অধিষ্ঠিত হন, 'তসদিকে বারাহীনে আহ্‌মদীয়া' নামে এর জবাব প্রকাশ করেন, যা পড়ার মত একটি পুস্তক। তিনি ছাড়া আরও কোনো কোনো ব্যক্তি যারা আহমদীয়া সিলসিলায় যোগদান করেননি, 'বারাহীনে আহমদীয়ার' সমর্থনে এবং 'তক্‌জীবে বারাহীনে-আহমদীয়ার" খণ্ডনমূলক অনেক কিতাব লিপিবদ্ধ করেন।

আমি আগে উল্লেখ করেছি যে, উক্ত মূল্যবান পুস্তক পাঠে মুসলমানের সাহস বেড়ে যায় এবং তারা একে অযাচিত ধনরূপে পেয়ে এই পুস্তকের মর্যাদা ও সম্মান দিতে থাকেন। তদনুসারে নিম্নে কয়েকজন গণ্যমান্য মুসলমানের অভিমত উদ্ধৃত করা হল।

'বারাহীনে আহ্‌মদীয়া' সম্বন্ধে মৌলবী আবু সায়ীদ মুহাম্মদ হুসাইন বাটালবীর অভিমত:

প্রসিদ্ধ আহলে হাদিস নেতা মৌলবী আবু সায়ীদ মুহাম্মদ হুসাইন বাটালবী লিখেছেন:

"আমাদের মতে এই কিতাব এ যুগে বর্তমান অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে এমন একটি কিতাব যার তূল্য কোনো পুস্তক আজ পর্যন্ত ইসলামে রচিত হয়নি এবং ভবিষ্যতের কথা জানা নেই।"[১] لَعَلَّ اللّٰهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذٰلِكَ اَمْرًا

এর প্রণেতাও ইসলামের সাহায্যে ধন ও প্রাণ, কলম, কাগজ, লেখা ও কার্য এবং আদর্শ ও আলোচনা দ্বারা এমন একনিষ্ঠ প্রমাণিত হয়েছেন যে, তার তুলনা পূর্ববর্তী মুসলমানদের মধ্যে একান্তই বিরল।

আমাদের এই কথাগুলোকে কেউ পূর্বদেশীয় অতিরঞ্জন মনে করলে আমাদের অন্ততঃ এমন একটি কিতাবের নাম বলে দিতে হবে যার মধ্যে ইসলামের সমস্ত বিরোধী সম্প্রদায়ের বিশেষ করে আর্য ও ব্রাহ্ম সমাজের এমন জোরদার খণ্ডন আছে এবং ইসলামের এমন দুই চারজন সেবকের সন্ধান দিতে হবে যারা ইসলামের জন্য জান, মাল, কলম ও কথার দ্বারা সেবা করা ছাড়াও আদর্শ নমুনার দায়িত্বও বহন করেছেন এবং ইসলামের বিরুদ্ধবাদী ও ইলহামে অবিশ্বাসীদের প্রতিযোগিতা করার জন্য বীরত্বব্যঞ্জক আহ্বান দিয়ে দাবি করেছেন

(১) 'সুরাতালাক' রুকু ২। অনুবাদ : "হয়ত আল্লাহ্ তাআলা এরপর নতুন কিছু সৃষ্টি করবেন।"

যে, ইলহাম সম্পর্কে 'যার সন্দেহ হয়, তিনি আমার কাছে উপস্থিত হয়ে অভিজ্ঞতা ও প্রত্যক্ষ জ্ঞান লাভ করুন।' এই প্রকারে অভিজ্ঞতা প্রত্যক্ষ দর্শনের রস-স্বাদ গ্রহণ করার আহ্বান বিজাতীয়দেরকেও প্রদান করছেন।[১]

সুফি আহ্‌মদ জান সাহেবের অভিমত :

সুফি হযরত হাজী আহ্‌মদ জান সাহেব লুধিয়ানার এক সুপ্রসিদ্ধ আলেম ছিলেন এবং তার ভক্তমণ্ডলি অনেক দূর-দূরান্তব্যাপী বিস্তৃত ছিলেন। তিনি লিখেছেন :
"মহামহিম, বিশ্ব কল্যাণকর পরম দানশীল ইসলামের জীবন্ত প্রতীক, সর্বজন বরেণ্য হযরত মির্যা গোলাম আহ্‌মদ সাহেব (চির আশিস তার উপর) পাঞ্জাবের গুরুদাসপুর জেলার অন্তর্গত কাদিয়ানের প্রধান সম্ভ্রান্ত পুরুষ ছিলেন। তার প্রণীত তিন'শত ফর্মার পুস্তক 'বারাহীনে আহমদীয়া' প্রাঞ্জল উর্দু ভাষায় লেখা। প্রায় পঁয়ত্রিশ ফর্মাযুক্ত এর চার খন্ড অত্যন্ত মনোরমভাবে ছাপাও হয়ে গেছে। অবশিষ্ট অংশগুলোও ক্রমশ: প্রকাশিত হয়ে ক্রেতাদের কাছে পৌছতে থাকবে। তিনি-এই কিতাবে ইসলাম ধর্ম আর মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়সাল্লামের নবুওত এবং কুরআন শরীফের সত্যতার তিনশ' যৌক্তিক ও ঐতিহাসিক প্রমাণ দ্বারা প্রতিপাদন করছেন খ্রিষ্টান, আর্য, প্রকৃতবাদী, হিন্দু ও ব্রাহ্মসমাজ প্রভৃতি ধর্মগুলোর সব ইসলাম বিরোধী অপবাদ গবেষণা করে খণ্ডন করছেন। গ্রন্থকার মহোদয় দশ হাজার টাকা পুরস্কার প্রদানের ইশতেহার দিয়েছেন। যদি ইসলামের বিরুদ্ধবাদী বা ইসলাম অস্বীকারকারী এ পুস্তকে প্রদত্ত সমস্ত প্রমাণ বা অর্ধেক বা এক পঞ্চমাংশও খণ্ডন করতে পারে তবে, গ্রন্থকার সাহেব তাঁর দশ হাজার টাকা মূল্যের সম্পত্তি তার নামে লিখেদিবেন। এই চতুর্দশ শতাব্দীতে যখন প্রত্যেক ধর্মের মধ্যেই অনাচারের ঝড় বইছে এবং নতুন নতুন লোক কাফের হচ্ছে এবং নতুন নতুন লোক মুসলমান হচ্ছে তখন এমন্ একটি গ্রন্থ এবং এমন একজন মুজাদ্দেদের একান্ত প্রয়োজন ছিল, যেরূপ 'বারাহীনে আহমদীয়া' গ্রন্থ এবং এর প্রণেতা জনাব শ্রদ্ধেয় সেব্য মির্যা গোলাম আহমদ সাহেব 'দামা ফায়যুহু' (তাঁর উপর নিত্য আধ্যাত্মিক কল্যাণ হোক) তিনি ইসলামের সর্ব প্রকারের দাবি বিরুদ্ধবাদীদের কাছে প্রমাণ করতে প্রস্তুত। তাঁর বয়স চল্লিশ কি পঁয়তাল্লিশ হবে, তাঁর পূর্বপুরুষদের আদি বাসস্থান প্রাচীন পারস্য বলে জানা যায়। তিনি অত্যন্ত ভদ্র, অমায়িক ও লজ্জাশীল সুপুরুষ। তাঁর চেহারা থেকে ঐশী প্রেম নি:সৃত হয়। পাঠক, আমি সদুদ্দেশ্যে এবং সত্যের পরম অনুপ্রেরণায় নিবেদন করছি যে, নি:সন্দেহে জনাব মির্যা সাহেব যুগ মুজাদ্দেদ,

(১) 'ইশাআতুস, সুন্নাহ', সপ্তম খণ্ড, ষষ্ঠ সংখ্যা, ১৬৯-১৭০ পৃ:।

ধর্মান্বেষীদের জন্য সূর্যস্বরূপ, পথভ্রষ্টদের জন্য পথ প্রদর্শক, ইসলাম বিরোধীদের জন্য ক্ষুরধার তরবারি, ঈর্ষাপরায়ণদের জন্য অকাট্য প্রমাণ। নিশ্চিত ভাবে জেনে নাও পুনরায় এমন সময় আর পাবে না। আল্লাহর ইজ্জত কায়েম হয়েছে। উজ্জ্বল প্রভাকররূপে অকাট্য প্রমাণাদিসহ এরূপ পথ প্রদর্শক স্বরূপ প্রেরিত হয়েছেন, যেন তিনি সত্যের অনুরক্ত ব্যক্তিদেরকে আলো দান করেন– অন্ধকার ও বিপথগামিতা থেকে বের করেন এবং মিথ্যাবাদীদের বিরুদ্ধে দলিল কায়েম করেন।”[১]

সুফি আহ্মদ জান সাহেব, যাঁর সমালোচনা উপরে প্রদত্ত হল তিনি একজন কামেল সুফি ছিলেন। হাজার হাজার ভক্ত তাঁর কাছে ‘বয়আত’ গ্রহণপূর্বক তাঁর মণ্ডলিভুক্ত হয়েছিলেন। কিন্তু তিনি যখন ‘বারাহীনে-আহ্মদীয়া’ দর্শন করলেন অমনি পাঠকগণের পক্ষ হতে হযরত আকদাসকে সম্বোধনপূর্বক বললেন:

ہم مریضوں کی ہے تمہیں پہ نظر   تم مسیحا بنو خُدا کے لیے

(অর্থাৎ, “আমরা যত রোগী তোমারই ওপর আমাদের সকলের দৃষ্টি নিবদ্ধ, তুমি খোদার উদ্দেশ্যে আমাদের ‘মসিহ্’ হও”।)
শুধু এটাই নয়, অত:পর যখনই কোনো ব্যক্তি তার শিষ্য হওয়ার জন্য আসত, তিনি বলতেন:

“সূর্যের উদয় হয়েছে। এখন তারকাগুলোর প্রয়োজন নেই। যাও, হযরত সাহেবের কাছে দীক্ষা গ্রহণ কর।”[২]

প্রসিদ্ধ আছে যে, তিনি হযরত আকদাসের কাছে দীক্ষা গ্রহণের জন্য আবেদনও করেছিলেন। কিন্তু হুযুর বললেন, যে, আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে আদেশ না হওয়া পর্যন্ত ‘বয়আত’ নিতে তিনি প্রস্তুত নন।

মৌলবী মুহাম্মদ শরীফ সাহেব বাঙ্গালোরীর অভিমত :

মৌলানা মুহাম্মদ শরীফ সাহেব বাঙ্গালোরের বিখ্যাত মুসলমান সংবাদপত্র ‘মনসুরে মুহাম্মদী’র সম্পাদক ছিলেন। তিনি ‘জাআল্ হাক্কো ও যাহাকাল বাতেলা, ইন্নাল বাতেলা কানা যাহুকা” (সত্য এসেছে, অসত্য পলায়ন করেছে; নিশ্চয়ই অসত্য দ্রুত পলায়ন করে থাকে) শীর্ষক প্রবন্ধে লিখলেন:

‘দীর্ঘকাল যাবত আমাদের আগ্রহ ছিল ইসলামের আলেমদের মধ্যে কোন

(১) ‘তাআস্সুরাতে কাদিয়ান,’ মালীক ফজল হুসায়েন সাহেব প্রণীত, ৬৪-৬৮ পৃঃ।
(২) ‘এলামাতে খোদাওন্দে করীম, পীর ইফতেখার আহমদ সাহেব প্রণীত।

হযরত, যাকে খোদা দ্বীনের সাহায্য করার তৌফিক দেন, এমন কোনো কিতাব রচনা প্রণয়ন ও সংকলন করেন, যা বর্তমান কালোপযোগী হয় এবং যৌক্তিক ও ঐতিহাসিক প্রমাণ দ্বারা কুরআন করীম আল্লাহ তাআলার বাক্য হওয়া এবং আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের নবুওতের সত্যতা প্রতিপাদ করে। খোদার শোকর, এই আগ্রহ পূর্ণ হয়েছে।"[১]

কয়েক মাস পরে আবার লিখলেন:

'এই কিতাবের অধিক প্রশংসা করা সম্ভব নয়। প্রকৃত পক্ষে, যেরূপ গভীর গবেষণা দ্বারা এই কিতাবে ইসলামের শত্রুদের উপর ইসলামের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে তা কোনো প্রশংসার অপেক্ষা রাখে না।

حاجت مشاطہ نیست روئے دلآرام را

কিন্তু আমরা এটা না বলে পারি না যে, নিঃসন্দেহে কিতাবটির কোনো তুলনা নেই এবং যেভাবে মহাপরাক্রমের সাথে যথার্থ প্রমাণ দেয়া হয়েছে এবং গ্রন্থকার 'মাদ্দা যিল্লুহু (তাঁর ছায়া দীর্ঘ হোক') তাঁর কাশফ ও ইলহাম সমূহও ইসলামের বিরুদ্ধবাদীদের কাছে প্রকাশ করে দিয়েছেন তাতে কারও কোনো সন্দেহ থাকলে তারা ঐশী কাশফ এবং পরম জ্যোতির্মালা যা ঐশ্বী কৃপা এসব বিষয়ে গ্রন্থকারের পবিত্র সাহচর্যে থেকে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা লাভ করতে পারে।

ইসলামের পৃষ্ঠ-পোষকতায় এবং নবুওত ও কুরআনের সত্যতা সংস্থাপনে এই লা-জবাব কিতাবের কোনই তুলনা নেই। এটা এমন উচ্চাঙ্গের রচনা এবং অকাট্য যুক্তি প্রমাণ সম্বলিত যে এর উত্তরের জন্য বিরুদ্ধবাদীদের দশ হাজার টাকার পুরস্কার প্রদানের ঘোষণা করা হয়েছে। এই ইশতেহার বহুকাল আগে দেয়া হয়। কিন্তু কেউ এ পর্যন্ত কলম ধরার সাহস করেনি।"[২]

'বারাহীনে-আহ্‌মদীয়ার' বিভিন্ন খণ্ড প্রকাশের সময় কাল:

'বারাহীনে-আহমদীয়ার প্রথম দুই খণ্ড ১৮৮০ সালে, তৃতীয় খণ্ড ১৮৮২ সালে এবং চতুর্থ খণ্ড ১৮৮৩ সালে প্রকাশিত হয়।

'বারাহীনে-আহ্‌মদীয়া প্রকাশের জন্য হযরত আকদাসের প্রচেষ্টা :

দেশের প্রসিদ্ধ পত্রিকাগুলোর বদৌলতে 'বারাহীনে আহমদীয়ার' পরিচয় দেশের এক প্রান্ত হতে অপর প্রান্ত পর্যন্ত বিস্তার লাভ করল। কিন্তু অধিকাংশ মুসলমান

(১) 'মনসুরে মুহাম্মদ' (বাঙ্গালোর) ২৫ রজব ১৩০০ হিঃ সাল।
(২) 'মনসুরে মুহাম্মদ,' (বাঙ্গালোর) ৫ই জমাদিউল আখের, ১৩০১ হিঃ সাল

আমীর উমারা এরূপ উদাসীন ছিল যে, এই কিতাব কেনার জন্য হযরত সাহেবকে ক্রমাগত তাদের পত্র লিখতে হয়েছিল। এ সময় তিনি ভীষণ কর্মব্যস্ত থাকতেন তবু, তিনি নিজেই প্যাকেট প্রস্তুত করতেন এবং গ্রাহকের ঠিকানাও লিখতেন।

নবাব সিদ্দিক হাসান খাঁর আশ্চর্য ব্যবহার :

নবাব সিদ্দিক হাসান খাঁ সাহেব মরহুম, 'আহলে-হাদিস' সম্প্রদায়ের একজন প্রসিদ্ধ আলেম ছিলেন। ভূপালের শাসন কর্তা নবাব শাহজাহান বেগমের সাথে তার বিয়ে হওয়ায় তার খ্যাতি আরো ছড়িয়ে পড়ে। তিনি ধর্মীয় পুস্তকাদি প্রকাশের জন্য বিশেষ যত্নবান ছিলেন। এজন্য হযরত আকদাস তাকে একজন সুহৃদ মুসলমান মনে করে 'বারাহীনে আহ্‌মদীয়া' প্রকাশে অংশ গ্রহণের প্রতি তার দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। হযরতের প্রেরণার ফলে প্রথমে তিনি পনের বিশটি বই কেনার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। কিন্তু দ্বিতীয়বার এবিষয়টি স্মরণ করানো হলে তিনি ইংরেজ গভর্ণমেন্টের ভয়ের ওজর দিয়ে পরিষ্কারভাবে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করেন এবং 'বারাহীনে-আহ্‌মদীয়ার' যে প্যাকেট তার কাছে পৌঁছেছিল তা ছিন্ন বিচ্ছিন্ন করে প্রত্যাখ্যান করেন। হযরত আকদাসের একজন মুরীদ হাফেজ হামেদ আলী শাহ সাহেব বলেন, যখন কিতাব ফেরৎ আসল তখন হযরত সাহেব পায়চারি করছিলেন। কিতাবের এমন দুর্দশা দেখে হযরতের চেহারা মুবারক পরিবর্তন হয়ে গেল এবং রাগে রক্তবর্ণ ধারণ করল। হযরত সাহেবকে জীবনে এরূপ রাগান্বিত হতে দেখা যায়নি। তাঁর চেহারা দেখে মনে হচ্ছিল তিনি অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হয়েছেন। তিনি দস্তুর মত এদিক সেদিক পায়চারি করতে লাগলেন এবং নিরব থাকলেন। হঠাৎ তার পবিত্র মুখ থেকে এই শব্দগুলো উচ্চারিত হল :

"আচ্ছা, আপনি আপনার গভর্ণমেন্টকে সন্তুষ্ট করুন।"

এই দোয়াও করলেন তার সম্মান বিনষ্ট হোক। অত:পর, 'বারাহীনে-আহ্‌মদীয়ার' চতুর্থ খণ্ড প্রকাশ কালে হযরত আকদাস নবাব সাহেবের এই নীতি বিরুদ্ধ আচরণের প্রতি সঙ্কেতপূর্বক লিখলেন:

"আমরাও নবাব সাহেবকে ভরসার স্থল মনে করি না। খোদাবন্দ করীমই নির্ভরস্থল এবং তিনিই যথেষ্ট। (খোদা করুন, ইংরেজ গভর্ণমেন্ট নবাব সাহেবের প্রতি অত্যন্ত সন্তুষ্ট হোক)।"[১]

---

(১) চতুর্থ খণ্ড 'বারাহীনে-আহমদীয়ার' সাথে ইশতেহার।

হযরত আকদাসের এরূপ লেখার কয়েক মাস পরেই, যে ইংরেজ গভর্ণমেন্টের 'সন্তুষ্টির জন্য' নবাব সাহেব 'বারাহীনে-আহ্মদীয়া' ক্রয় করতে অস্বীকার করেছিলেন, সেই ইংরেজ গভর্ণমেন্ট তার বিরুদ্ধে একটি রাজনৈতিক মোকদ্দমা দাঁড় করায়। তার 'নবাব' উপাধি কেড়ে নেয়া হলো। এর ফলে, নবাব সাহেব বেশ উদ্বিগ্ন হয়ে পড়লেন, আল-আমান ওয়াল হাফীয। এই সব বিপদাপদ থেকে নিস্কৃতি পাওয়ার জন্য তিনি বহু চেষ্টা করলেন। কোনো চেষ্টাই সফল হল না। এসম্বন্ধে হযরত আকদাস বলেন:

"নবাব সিদ্দিক হাসান খাঁ সাহেবের ওপর এই যে বিপদ (এবতেলা) উপস্থিত হয়েছিল তা আমার একটি ভবিষ্যদ্বাণীর ফলে হয়েছিল। 'বারাহীনে-আহ্মদীয়া'তে তা লিখিত আছে। তিনি আমার কিতাব 'বারাহীনে-আহ্মদীয়া' ছিন্নভিন্ন করে প্রত্যাখ্যান করেন। আমি দোয়া করলাম, তার সম্মান বিনষ্ট হোক। বস্তুত: এমনই ঘটল।"[১]

নবাব সাহেব যখন তার অপরাধ বুঝতে পারলেন, তিনি হযরত আকদাসের খেদমতে অত্যন্ত অনুনয় বিনয় করে পত্রযোগে দোয়ার আবেদন করলেন। হযরত আকদাস বলেন :

"তখন আমি তাকে কৃপার পাত্র মনে করে দোয়া করলাম। আল্লাহ তাআলা আমাকে বললেন শাস্তি থেকে তাকে রক্ষা করা হল'। অবশেষে কিছুকাল পরে তার সম্বন্ধে গভর্ণমেন্টের আদেশ হল, সিদ্দিক হাসান খাঁ সম্পর্কিত নবাব উপাধি বহাল রইল।"[২]

'বারাহীনে-আহ্মদীয়ার প্রকাশ মূলতবি':

'বারাহীনে আহমদীয়ার' চতুর্থ খণ্ড ১৮০৪ খ্রিষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। এই খণ্ডের শেষ পৃষ্ঠায় হযরত আকদাস এই ঘোষণা প্রকাশ করেন:

'প্রথমে যখন এই কিতাব প্রণয়ন করা হয়, তখন এর অন্য প্রকার অবস্থা ছিল। অত:পর সহসা ঐশী মহিমা প্রকাশিত হলো এই অধমাধম বান্দাকে মুসার ন্যায় এমন এক জগত সম্বন্ধে সংবাদ দেয়া হলো যার সম্বন্ধে এই অধমের ইতিপূর্বে কোনো পরিচয় ছিল না। অর্থাৎ, এই অধমও হযরত ইবনে ইমরানের ন্যায় তার চিন্তার অন্ধকার রাতে পরিভ্রমণে ব্যস্ত ছিল। একবার পর্দার অন্তরাল থেকে 'ইন্নি আনা রাব্বুকা' (আমিই তোমার প্রভু, সৃষ্টি ও পালনকর্তা') শব্দ হল এবং এমন

(১) ঐ
(২) 'তাতিম্মায়ে-হাক্কিকাতুল-অহী ৩৭পৃ:

গুপ্ত বিষয় সমূহ প্রকাশিত হল যা আমার জ্ঞান বা ধারণার অতীত ছিল। সুতরাং এখন হতে প্রকাশ্যে ও অপ্রকাশ্যে হযরত রাব্বুল আলামীন আমার অভিভাবক ও কার্যনির্বাহক হলেন।"[১]

তদনুযায়ী সংস্কারক ও প্রত্যাদিষ্ট হওয়ার দাবির পর ঐশী ইচ্ছায় ২৩ বছর পর্যন্ত 'বারাহীনে আহমদীয়ার' পরবর্তী অংশের মুদ্রণ মুলতবি রইল। অবশেষে, ১৯০৫ খ্রিষ্টাব্দে এর পঞ্চম ও শেষ খণ্ড প্রকাশিত হল। যদিও এই খন্ডে পূর্ববর্তী খণ্ডের রচনার সাথে ধারাবাহিকতা ছিল না, তথাপি এই দীর্ঘ সময়ে 'বারাহীনে আহমদীয়ার' প্রথম চারটি খণ্ডে বর্ণিত ভবিষ্যদ্বাণীগুলোর পূর্ণতার বিবরণ দিয়ে এক হিসাবে হুজুর পূর্ববর্তী খণ্ডগুলোর সাথে এর সংযোগ রক্ষা করেছেন।

'মুজাদ্দেদিয়ত' ও 'মামুরিয়ত' সম্পর্কিত প্রথম ইল্হামঃ

'বারাহীনে-আহ্মদীয়ার' চার খণ্ড নিয়ে এক সঙ্গে আলোচনায় ব্যাপৃত হওয়ায় আমরা মধ্যবর্তী ঘটনাসমূহ পরিত্যাগ করেছিলাম। সুতরাং, তৎ-সমুদয়ের আলোচনা আবার শুরু করছি।

১৮৮২ সালের কথা। হযরত আকদাস বলেন:

"একবার ইলহাম হল ملاء اعلیٰ کے لوگ خصومت میں ہیں (উর্ধ্বলোকের ফেরেশ্তাগণ আলোচনারত)। অর্থাৎ, ঐশী অভিপ্রায় ধর্ম সঞ্জীবনার্থে উদ্দীপ্ত। কিন্তু উর্ধ্বলোকে এখনও স্থিরীকৃত হয়নি যে, প্রাণ সঞ্চারক কে হবেন?"[২]

অত:পর, পরের পৃষ্ঠায় লিখেছেন :

"এই সময় আমি স্বপ্নে দেখলাম, জনসাধারণ একজন সঞ্জীবনকারীর অন্বেষণ করছে এবং এক ব্যক্তি আমার নিকটে এসে ঈঙ্গিতপূর্বক বললো :

هٰذَا رَجُلٌ يُحِبُّ رَسُوْلَ اللّٰهِ

অর্থাৎ 'ইনি সেই ব্যক্তি যিনি আল্লাহর রসুল (হযরত মোহাম্মদ সা.) কে ভালবাসেন'। এই বাণীর তাৎপর্য ছিল, এই পদের প্রথম শর্ত রসুল (সা.) এর প্রেম। তা এই ব্যক্তির মধ্যে পূর্ণমাত্রায় আছে।"[৩]

সেই সময় আঁ–হযরত (স.) কে এক স্বপ্নে দেখলেন :

"এক রাতে আমি লিখছিলাম। ইতিমধ্যে আমার ঘুম পেল। আমি শুয়ে গেলাম।

(১) 'হাম আওর হামারী কিতাব,' শেষ পৃষ্ঠা, বারাহীনে-আহ্মদীয়া,' চতুর্থ খণ্ড।
(২) 'বারাহীনে-আহ্মদীয়া,' চতুর্থ খণ্ড, ৫০২ পৃ:।
(৩) ওই ৫০৩ পৃ:।

তখন আমি আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে দর্শন করলাম। তাঁর চেহারা পূর্ণ চন্দ্রের ন্যায় উজ্জ্বল ছিল। তিনি আমার নিকটবর্তী হলেন। আমি এমন বোধ করলাম যে, তিনি আমাকে আলিঙ্গন করতে চান। আমি দেখলাম, তাঁর চেহারা থেকে আলোক-রশ্মি স্ফূরিত হয়ে আমার মধ্যে প্রবেশ করছে। আমি এই রশ্মীগুলোকে বাহ্যিক আলোক হিসেবে লাভ করছিলাম এবং নিশ্চিত বুঝছিলাম যে, আমি শুধু অন্তর্দৃষ্টি দিয়েই নয় বরং স্বচক্ষেও দেখছি এবং এই আলিঙ্গনের পর আমি এটা অনুভব করিনি যে, তিনি আমা হতে পৃথক হলেন বা এটাও বুঝিনি যে, তিনি প্রস্থান করলেন। অত:পর, আমার উপর ইলহামে ইলাহীর দরজা খুলে গেল এবং আমার রাব্ব্ আমাকে সম্বোধন করে বললেন :[১]

"يَا أَحْمَدُ بَارَكَ اللّٰهُ فِيْكَ - مَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ رَمٰى - اَلرَّحْمٰنُ
عَلَّمَ الْقُرْاٰنَ - لِتُنْذِرَ قَوْمًا مَّا أُنْذِرَ اٰبَاءُ هُمْ وَلِتَسْتَبِيْنَ سَبِيْلُ
الْمُجْرِمِيْنَ - قُلْ إِنِّيْ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِيْنَ -"[২]

অর্থাৎ 'হে আহমদ, আল্লাহ তাআলা তোমাকে আশিস দিয়েছেন। সুতরাং, তুমি ধর্মের সেবার উদ্দেশ্যে যে আঘাত বিরুদ্ধবাদীদের উপর করেছ, তা তুমি করনি; বরং আল্লাহ্ তাআলা করেছেন। খোদা তোমাকে কুরআন করীমের জ্ঞান দান করেছেন, যাতে তুমি ঐসব লোককে সতর্ক কর, যাদের পূর্ব-পুরুষদেরকে সতর্ক করা হয়নি এবং যাতে অপরাধীদের পথ পরিষ্কার হয়ে যায়। লোকদেরকে বল, 'খোদার পক্ষ থেকে আমাকে আদিষ্ট ('মামুর') করা হয়েছে এবং আমি সর্বপ্রথম ঈমান এনেছি।"[২]

উপরে বর্ণিত ইল্হাম এবং স্বপ্নগুলো থেকে একথা সুস্পষ্ট হয় আকাশে 'মামুরিয়তের' মহান পদে যিনি অভিষিক্ত হওয়ার ছিলেন তার জন্য প্রধান শর্ত এটাই নির্ধারিত ছিল যে, তিনি আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের প্রতি এমন প্রেম ও ভালোবাসা পোষণ করবেন যে, পৃথিবীতে কোথাও তার তুলনা পাওয়া যাবে না। সুতরাং তার মধ্যে এই শর্ত পূর্ণ হওয়ায়, তাঁর পক্ষেই মিমাংসা প্রদত্ত হল। 'আল্লাহুম্মা সাল্লে আলা মুহাম্মাদেও ওয়া আলে মুহাম্মাদ'।

'মামুরিয়ত' সম্পর্কে সর্বপ্রথম তিনি এই ইল্হামই প্রাপ্ত হন। কিন্তু তখন পর্যন্ত বয়আত (দীক্ষা) গ্রহণে আদিষ্ট না হওয়ায়, তিনি দীক্ষা নিয়ে রীতিমত কোনো জামা'তের ভিত্তি স্থাপন করেননি।'

এ সময়েই তিনি এমন কোনো কোনো ইল্হাম প্রাপ্ত হন, যা দ্বারা প্রতিয়মান হয়, "শিগগিরই ওই সময় আসছে, যখন অসংখ্য মানুষ তোমার কাছ থেকে আশিস

(১) 'আয়নায়ে কামালাতে ইসলাম', ৫৫০ পৃঃ।
(২) 'বারাহীনে-আহ্মদীয়া,' তৃতীয় খণ্ড, ২৩৮ পৃঃ, 'হাশিয়া দর হাশিয়া।

লাভ করার জন্য কাদিয়ান আসবে।[১]" "সাবধান, বহু লোকসমাগমে ও সাক্ষাতের ফলে কখনও বিরক্তি বোধ করবে না।[২]" বস্তুত, যতই তাঁর উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে অবহিত করার উদ্দেশ্যে তাঁর উপর ইলহামের পর ইলহাম অবতীর্ণ হতে লাগল, তিনি আঁ হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের প্রেমে ততই উন্নতি করতে লাগলেন। কারণ, তিনি তা উত্তমরূপে উপলব্ধি করেছিলেন যে, এ সব ঐশী জ্যোতি বা 'আন্ওয়ারে ইলাহী' আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের অনুবর্তিতা ও আশীষের ফলেই প্রাপ্ত হচ্ছিলেন। এজন্য তিনি তাঁর গুরু নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের উপরে বহুল পরিমাণে দরুদ পাঠ শুরু করলেন। এমনকি, ১৮৮৩ সালে তাঁর কাছে প্রকাশ করা হল যে, তাঁকে এবং হযরত ঈসা আলাইহেস্ সালামকে একই সত্ত্বা দিয়ে সৃষ্টি করা হয়েছে এবং তাঁরা একই বস্তুর সদৃশ।[৩]

এই সময়েই দরুদ শরীফ পাঠের অনুপ্রেরণাসহ এই ইলহাম হয়েছিল :

صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّاٰلِ مُحَمَّدٍ سَيِّدِ وُلْدِ اٰدَمَ وَخَاتَمِ النَّبِيِّيْنَ

অর্থাৎ "আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম আদম সন্তানদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ পুরুষ এবং তিনি খাতামান্-নাবীয়্যীন। তাঁর উপর এবং তাঁর অনুবর্তীর উপর দরুদ পাঠ কর।[৪]" বস্তুত: তিনি আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের উপর এত অধিক দরুদ পাঠ শুরু করলেন যে, তিনি বলেন:

"এই সময় আমার স্মরণ আছে যে, এক রাতে এই অধম এত অধিক দরুদ পাঠ করল যে, মান-প্রাণ তাদ্বারা, সৌরভময় হয়ে গেল। সেই রাতে স্বপ্নে দেখলাম যে, স্বচ্ছ সুমিষ্ট জলের আকারে জ্যোতির মশক সমূহ ফেরশতাগণ এই অধমের ঘরে আসছেন। তাদের মধ্যে একজন বলল যে, এই আশিসগুলো তাই যা তুমি মুহাম্মদের প্রতি পাঠিয়েছিলে। সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম।[৫]" এসময় তিনি এই ইলহাম প্রাপ্ত হলেন। قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُوْنِيْ يُحْبِبْكُمُ اللّٰهُ

অর্থাৎ, "তুমি লোকদেরকে বল, যদি তোমরা আল্লাহ্ তাআলার সাথে প্রেম করতে চাও, তবে এর একটি মাত্র পথ আছে এবং তা হলো, আমার অনুবর্তিতা কর।"[৬]

(১) 'বারাহীনে-আহ্মদীয়া,' তৃতীয়, খণ্ড, ২৪ পৃঃ হতে অনুদিত।
(২) ওই ২৪২ পৃঃ।
(৩) 'হামামাতুল বুশরা' হতে অনুদিত, ৪২ পৃঃ।
(৪) 'বারাহীনে-আহ্মদীয়া,' চতুর্থ খণ্ড, ৫০২-৫০৩ পৃঃ।
(৫) 'বারাহীনে-আহ্মদীয়া,' চতুর্থ খণ্ড, ৫০২ পৃঃ।
(৬) 'বারাহীনে-আহ্মদীয়া,' চতুর্থ খন্ড, ২৪০ পৃঃ।

আমরা আল্লাহ তাআলার পবিত্রতা ঘোষণা করি। কি আশ্চর্য ঐশী অনুকম্পা! তাঁকে আদেশ করা হল, "যদি তুমি আমার দরবারে উচ্চস্থান লাভ করতে চাও, তা হলে আঁ হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের প্রতি অধিক মাত্রায় দরুদ পাঠ কর," এবং তাঁর যুগের মানুষকে আদেশ করা হল, "এযুগে যদি তোমরা আল্লাহর সাথে প্রেম করতে চাও, তা হলে তোমরা এই ব্যক্তির অনুগামী হও।"

'সুবহানাল্লাহে ওয়া বেহামদেহি, সুবহানাল্লাহিল আযীম। আল্লাহুম্মা সাল্লে আলা মুহাম্মদেও' ওয়া আ'লা আলে মুহাম্মাদ'।

মির্যা গোলাম কাদের সাহেবের মৃত্যু :

হযরত আকদাস এর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা মির্যা গোলাম কাদের সাহেব ১৮৬৮ সলেও একবার অত্যন্ত অসুস্থ হয়ে পড়েন। আল্লাহ তাআলা তাঁকে স্বপ্নযোগে জ্ঞাত করেছিলেন যে, তাঁদের একজন পূর্বপুরুষ তাঁর ভ্রাতাকে আহ্বান করছেন। এই প্রকার স্বপ্নের অর্থ মৃত্যু। এজন্য তিনি অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হলেন। তিনি তার স্বাস্থ্যের জন্য কান্নাকাটি করে খোদা তাআলার কাছে দোয়া করলেন। কিছুদিন পর স্বপ্নে দেখতে পেলেন যে, তাঁর ভ্রাতা সম্পূর্ণ সুস্থ ব্যক্তির ন্যায় কোন কিছুর উপর ভর না দিয়ে বাড়িতে চলাফেরা করছেন। বস্তুত: আল্লাহ তাআলা তাকে আরোগ্য দান করলেন। 'ফাল্-হামদু লিল্লাহে আ'লা যালেকা'।

এ ঘটনার পনের বছর পর, ১৮৮৩ সালে কোনো কার্যোপলক্ষে হুযুর অমৃতসর গমন করেন। তথায় স্বপ্নে দেখলেন, এখন তার ভাইয়ের আয়ু পূর্ণ হয়েছে। শীঘ্রই তিনি ইহধাম পরিত্যাগ করবেন। তিনি এই স্বপ্নটি অমৃতসরেই হাকিম মুহাম্মদ শরীফ সাহেবকে বললেন এবং তার ভাইকেও পত্র দ্বারা সংবাদ দিলেন, "আপনি পারলৌকিক বিষয়ে মনোযোগী হোন। কারণ, আমাকে দেখান হয়েছে যে, আপনার জীবনের আর অল্প দিন মাত্র বাকি আছে।" মির্যা গোলাম কাদের সাহেব ঘরের সবাইকেই এই স্বপ্নে বর্ণিত বিষয়ের খবর দিলেন। অত:পর, কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই তিনি এই নশ্বর সংসার পরিত্যাগ করেন।[১] 'ফা-ইন্না লিল্লাহে ও ইন্না ইলাইহে রাজেউন'।

মির্যা সুলতান আহ্মদের তহশীলদারী পরীক্ষায় কৃতকার্যতা :

আনুমানিক ফেব্রুয়ারি ১৮৮৪ সালে হযরত আকদাসের জেষ্ঠ পুত্র মির্যা সুলতান আহমদ সাহেব তহশীলদার চাকরির জন্য পরীক্ষা দেন এবং পাস হওয়ার জন্য

(১) 'তিরইয়াকুল-কুলুব' ৬৯ পৃঃ।

পিতার কাছে পত্র দ্বারা দোয়ার আবেদন করেন। হুযুর আলাইহেস্ সালাম বলেন:

“সেই পত্র পাঠ করে পার্থিব বিষয়ে তার এত চিন্তা দেখে দয়ার পরিবর্তে আমার রাগ জন্মালো। এই অধম পত্রটি পাঠ করা মাত্র অত্যন্ত ঘৃণা বোধ করলাম এবং পত্রটি ছিঁড়ে ফেললাম। মনে মনে সংকোচ বোধ করছিলাম এই ভেবে যে, একটি পার্থিব বিষয় নিয়ে কিভাবে আমার মালিকের সামনে উপস্থিত হবো? পত্রটি ছিঁড়বার পরক্ষণেই ইলহাম হল “پاس ہو جاوے گا” ‘পাস হবে’।
এই আশ্চর্যজনক ইলহামও অধিকাংশ ব্যক্তিকেই জানান হল। বস্তুত: সেই ছেলে পাস করল। ‘ফাল্‌হাম্‌দুলিল্লাহ।”[১]

হুযুর আকদাসের দ্বিতীয় বিবাহ:

হযরত আকদাসের দ্বিতীয় বিবাহ সম্বন্ধে ১৮৮১ সাল থেকে ইল্‌হাম শুরু হয়। কিন্তু ১৮৮৪ সালে গিয়ে তা সুসম্পন্ন হয়।

১৮৮১ সালে তিনি ইল্‌হাম প্রাপ্ত হলেন।

إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ حَسِيْنٍ [২]

অর্থাৎ “আমি তোমাকে এক সুশ্রী পুত্রের সুসংবাদ দিচ্ছি।[২]

সেই সময়েই আরো একটি ইলহাম হল:

اُشْكُرْ نِعْمَتِيْ رَأَيْتَ خَدِيْجَتِيْ [৩]

অর্থাৎ কৃতজ্ঞ হও, তুমি আমার খদিজাকে লাভ করলে।”[৩]
তেমন আরো একটি ইলহাম প্রাপ্ত হলেন:

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ جَعَلَ لَكُمُ الصِّهْرَ وَالنَّسَبَ [৪]

অর্থাৎ “সম্যক প্রশংসার পাত্র আল্লাহ। তিনি তোমার বৈবাহিক সম্বন্ধ এক ভদ্র পরিবারের সাথে স্থির করেছেন এবং তোমার নিজ বংশকেও সম্ভ্রান্ত করেছেন।”[৪]
তেমন একবার তিনি এই ইল্‌হাম প্রাপ্ত হলেন

”میں نے ارادہ کیا ہے کہ تمہاری ایک اور شادی کروں۔ یہ سب سامان میں خود ہی کروں گا اور تمہیں کسی بات کی تکلیف نہیں ہوگی۔“

(১) ১৮৮৪সনের ১১ মে তারিখে ঝাজযরের নবাব আলী মুহাম্মদ খাঁ সাহেবের কাছে পত্র। (আলহাকাম ৩য় বর্ষ, ৩৪ সংখ্যা, ২৩ সেপ্টেম্বর ১৮৯৯ সাল)।

(২) ‘তিরইয়াকুল-কুলুব’, ৩৪ পৃ:।

(৩) ‘নযুলুল মসিহ’ ১৪৬-৪৭ পৃ:

(৪) ‘তিরইয়াকুল কুলুব’ ৬৪ পৃ:

অর্থাৎ “আমি তোমার আরো একটি বিয়ে করাবার সংকল্প করেছি। যাবতীয় আয়োজন আমি নিজেই করব। কোনো বিষয়ে তোমার অসুবিধা হবে না।”
এ সম্পর্কে ফারসি ভাষাতেও একটি ইলহাম প্রাপ্ত হন:

ہرچہ باید نو عروسے را ہماں ساماں کنم   وآنچہ مطلوبِ شما باشد عطائے آں کنم

অর্থাৎ “পাত্রীর জন্য যা আয়োজনের প্রয়োজন, আমি আয়োজন করব এবং তোমার যাবতীয় প্রয়োজন নির্বাহ করব।”[১]

হুযুর বলেন:

“এই ভবিষ্যদ্বাণী অপরাপর ইল্‌হামে অধিকতর পরিষ্কারভাবে বলা হল। এমন কি, শহরের নাম পর্যন্ত বলা হল। অর্থাৎ দিল্লী। এই ভবিষ্যদ্বাণী বহু ব্যক্তিকে শোনানো হল। যেমন লিখিত হয়েছিল, তেমনি প্রকাশিত হল। কারণ, পূর্ববর্তী কোনো ঘনিষ্টতা বা আত্মীয়তার সম্পর্ক না থাকা সত্ত্বেও দিল্লীতে এক ভদ্র ও প্রসিদ্ধ সৈয়দ পরিবারে আমার বিয়ে হল। যেহেতু খোদা তাআলার ওয়াদা ছিল যে, আমার বংশে ইসলামের সাহায্যার্থে এক বিরাট ভিত্তি স্থাপন করবেন এবং তা থেকে সেই ব্যক্তিকে পয়দা করবেন যার মধ্যে ‘আসমানী রুহ’ থাকবে, তজ্জন্য তিনি এই পরিবারের কন্যার সাথে আমার পরিণয় এবং তার গর্ভে সেই সব সন্তানের জন্ম হওয়া পছন্দ করলেন, যারা আমার হাত দ্বারা বপিত জ্যোতি: পৃথিবীতে অধিক হতে অধিকতর বিস্তার করবে। এটা কাকতালীয় ব্যাপার ছিল যে, সৈয়দগণের দাদীর নাম ‘সহর বানু’ এবং আমার এই বিবি যিনি আমার ভবিষ্যৎ বংশধরের মাতা হবেন তাঁর নাম ‘নুসরৎ জাহান বেগম’। এর মধ্যে এই শুভ লক্ষণের ইঙ্গিত ছিল বলে মনে হয় যে, খোদা সমগ্র বিশ্বের সাহায্যার্থে আমার ভবিষ্যৎ বংশধরের ভিত্তি পত্তন করেছেন। খোদা তাআলার রীতি এই যে, কখনো কখনো নামের মধ্যেও তাঁর ভবিষ্যদ্বাণী অন্তর্নিহিত থাকে।”[২]

উপরের বর্ণিত বিষয়ের বিশদ ঘটনা এই : হযরত মীর নাসের নওয়াব সাহেব রাযিআল্লাহু আন্‌হু দিল্লীর এক সুপ্রসিদ্ধ সৈয়দ পরিবারের উজ্জ্বল রত্ন ছিলেন। তাঁর কাছে পিতৃকূলে মুঘল সেনাপতি আমীরুল উমারা শাম্‌সামুদ্দৌলা নবাব খানে দাওরানে খান বাহাদুর বক্‌শী মন্‌সুর জঙ্গ্‌ নামে এক বুজুর্গ ছিলেন এবং মাতৃকূলে তাঁর সম্পর্ক হযরত খাজা মীর দরদ রহমতুল্লাহে আলাইহের সাথে ছিল। তক্‌ওয়া পরহেজগারীতে তার পরিবার সমগ্র হিন্দুস্থানে প্রসিদ্ধ। তিনি চাকরির জন্য পাঞ্জাবে ছিলেন। গুরুদাসপুর জেলায় কাদিয়ানের নিকটবর্তী

---

(১) ‘শাহ নায়ে-হক্‌, ৫৭-৫৮ পৃ:।
(২) ‘তিরইয়াকুল-কুলুব’, ৬৪-৬৫ পৃ:।

স্থানেই, খাস কাদিয়ানে হযরত আকদাসের গৃহেও কিছু সময় তাকে অবস্থান করতে হয়েছিল। তিনি হযরত আকদাসের পুণ্য চরিত্র, তাক্ওয়া ও পরহেজগারী ভাল মতো জানতেন। তিনি এখান থেকে বদলি হয়ে কিছু স্থানে চাকরির পর ১৮৮৪ সালে যখন মুলতান পৌছলেন তখন তিনি তার কন্যা নুসরত জাহান বেগমের বিয়ের প্রয়োজন অনুভব করলেন। সম্বন্ধ অনুসন্ধানার্থে তিনি দীর্ঘকালীন ছুটি নিয়ে দিল্লী গমন করেন। সৎ ও সাধু জামাতা পাবার উদ্দেশ্যে তিনি বহু দোয়া করলেন এবং হযরত আকদাসের খেদমতেও দোয়ার জন্য লিখলেন। হযরত আকদাসের নিজেরই বিয়ের প্রয়োজন ছিল।

হযরত মীর নাসের নওয়াব সাহেব বলেন:

"আমার পত্রের উত্তরে মির্যা সাহেব আমাকে লিখলেন যে, তাঁর প্রথমা স্ত্রীর সাথে তাঁর সম্পর্ক না থাকার মত। তিনি আরেকটি বিয়ে করতে ইচ্ছা করেন এবং আল্লাহ্ তাআলা ইলহাম দ্বারা তাকে জ্ঞাত করেছেন যে, তার খান্দান যেমন ভাল, তেমনি তাকে সৈয়দদের মহৎ পরিবার থেকে স্ত্রী দান করবেন এবং এই বিয়ে 'বরকত পূর্ণ' হবে। এই বিয়ের যাবতীয় বিষয়ের মিমাংসা ও সামগ্রিক আয়োজন খোদা তাআলা নিজেই করবেন। তাঁর কোনই বেগ পেতে হবে না। এই ছিল তাঁর পত্রের সারমর্ম।

"তিনি এটাও লিখলেন, 'আপনি সরল চিত্তে আপনার কন্যার সাথে আমার বিয়ে দিন। শেষ মিমাংসা না হওয়া পর্যন্ত বিষয়টি গোপনে রাখবেন। প্রত্যাখ্যান করতে ত্বরা করবেন না।"[১]

হযরত মীর নাসের নওয়াব সাহেব আরো বলেন :

"প্রথমে আমি ইত:স্তত করলাম। কারণ, মির্যা সাহেবের বয়স ছিল কিছু বেশি। তাছাড়া, বিবি ও সন্তান বিদ্যমান এবং আমাদের গোত্রেরও নন। তবু হযরত মির্যা সাহেবের পুণ্যময় জীবন এবং সৎপ্রকৃতির প্রতি লক্ষ্য করে আমি মনে মনে এই সাধু পুরুষের সঙ্গেই আমার ভাগ্যবতী কন্যার বিয়ে দান স্থির করলাম। কারণ, পূণ্যময় জীবন ও সৎপ্রকৃতি আমি মনে-প্রাণে খুঁজছিলাম। তাছাড়া, দিল্লীর অধিবাসীদের এবং তথাকার আচার ব্যবহার আমার কাছে অপছন্দনীয় ছিল।"[২]

মীর নাসের নওয়াব সাহেবের স্ত্রীর সাথে এই বিবাহে দ্বিমতের কারণ সমুহ

'নানী আম্মা' নামে পরিচিত, বেগম সাহেবার মতের পথে এই বাধাগুলো ছিল:

(১) 'হায়াতে নাসের', ৭ পৃ:।
(২) 'হায়াতে-নাসের,' ৭-৮ পৃ:।

"প্রথম, মনের প্রবোধ হচ্ছিল না। দ্বিতীয় বয়সের ছিল ভীষণ পার্থক্য। তৃতীয়তঃ পাঞ্জাবীদের প্রতি দিল্লীবাসী অত্যন্ত অশ্রদ্ধা পোষণ করতেন।"[১]

হযরত নানী আম্মা নিজের বিবরণ দিয়েছেন:

"যখন হযরত সাহেব হযরত মীর সাহেবকে তাঁর নিজের জন্য লিখলেন, তখন আমি ভাল বোধ করবো না ভয়ে মীর সাহেব আমার সাথে আলোচনা করেন নাই। এই সময়ে আরও কিছু স্থান থেকে প্রস্তাব এসেছিল। কোথাও আমার মন:পুত হয়নি। অবশেষে, একদিন মীর সাহেব একজন লুধিয়ানার অধিবাসী সম্বন্ধে বললেন, তার পক্ষ থেকে অত্যন্ত আগ্রহপূর্ণ আবেদন এসেছে এবং লোকটিও ভাল। তার সাথেই সম্বন্ধ করা হোক। কিন্তু আমি যখন তার বংশ ইত্যাদি সম্পর্কে অনুসন্ধান করলাম, তখন সম্বন্ধটি সন্তোষজনক মনে হল না। আমি অস্বীকার করলাম। এতে মীর সাহেব একটু অসন্তুষ্ট হয়ে বললেন, 'মেয়ে ১৮ বছরের হয়েছে। সারাজীবনই কি তাকে এইভাবে বসিয়ে রাখবে? আমি বললাম, 'এদের চেয়ে গোলাম আহমদই সহস্র গুণে ভাল'। মীর সাহেব তৎক্ষণাৎ একটি পত্র বের করে আমার সম্মুখে রাখলেন এবং বললেন, 'নাও, মির্যা গোলাম আহমদেরও পত্র এসেছে। যা হয়, এখনি আমাদের মিমাংসা করতে হবে। আমি বললাম, 'আচ্ছা, তবে গোলাম আহমদকে লিখুন'।"[২]

এতে হযরত মীর সাহেব তখনি কলম দোয়াত নিয়ে সম্মতিপত্র লিখলেন। হযরত মীর সাহেবের পত্র প্রাপ্তির আট দিন পর হযরত আকদাস তাঁর সেবক, হযরত হাফেজ হামেদ আলী, লালা মালাওয়ামল এবং আরও দুই ব্যক্তিকে সঙ্গে নিয়ে দিল্লী আগমন করলেন। হযরত মীর সাহেবের জ্ঞাতিবর্গ একথা জানতে পেরে অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হলেন। এক তো বৃদ্ধ, তদুপরি পাঞ্জাবী! তাকে কন্যা দান করছে!" হযরত আকদাস কোন অলঙ্কার বা কাপড় সঙ্গে নিয়ে যাননি। শুধু আড়াইশ' টাকা নগদ ছিল। এতেও আত্মীয় স্বজনেরা বিদ্রুপ করলেন, "ভাল বিয়ে দিয়েছেন! অলঙ্কারও নাই, কাপড় চোপড়ও নাই!"[৩]

যা হোক, ১৮৮৪ সালের ১৭ নভেম্বর তারিখে খাজা মীর দরদ রাহেমাল্লাহ আলাইহের মসজিদে 'আসর এবং মাগরেবের' অন্তর্বর্তী সময়ে এগার শ' টাকা দেন মোহর ধার্যে মৌলবী সৈয়দ নযীর হুসায়েন সাহেব মুহাদ্দেস দেহলবী এই শুভ বিবাহ ঘোষণা করলেন। হযরত মীর সাহেবের আত্মীয়েরা দন্ত নিষ্পেষণ

(১) 'হায়াতে-আহ্মদ', দ্বিতীয় খন্ড, তৃতীয় সংখ্যা, ৭৭পৃঃ।
(২) 'সিরতুল, মাহ্দী,' দ্বিতীয় খণ্ড, ১১০-১১১ পৃঃ।
(৩) 'হায়াতে-আহ্মদ', দ্বিতীয় খন্ড, তৃতীয় সংখ্যা, ৯৬ পৃঃ।

করে রয়ে গেলেন। হযরত মীর সাহেব দিল্লিতেই বিবাহোত্তর 'রুখসাতানার' কাজ সম্পন্ন করেন। পরের দিন হযরত আকদাস কাদিয়ান রওনা হলেন। এইভাবে এই শাদী মুবারক সম্পন্ন হল। 'ফাল্-হামদুলিল্লাহে আ'লা যালেক'।

'লাল কালির অলৌকিক ছিঁটার নিদর্শন':

১৮৮৫ সালের ১০ জুলাই তারিখে সেই অত্যাশ্চর্য ও অলৌকিক নিদর্শন প্রকাশিত হয় যা 'লাল ছিঁটার নিদর্শন' বলে খ্যাত। সেদিন ছিল ২৭ রমযান, শুক্রবার। ফজরের নামাজের পর হযরত আকদাস অভ্যাসানুসারে বিশ্রামার্থে মসজিদ মুবারকের সংলগ্ন পূর্ব দিকস্থ প্রকোষ্ঠে গিয়ে চারপাইর উপর শয়ন করেন। হযরত মৌলবী আব্দুল্লাহ সগনৌরী সাহেব রাযি আল্লাহ আন্হু এ সম্পর্কে বলেন:

"আমি তখন হুযুরের পা দাবাচ্ছিলাম। পূর্বদিকে সূর্যোদয় হল এবং কামরাটি আলোকিত হল। হযরত আকদাস তখন একপার্শ্বে শুয়ে ছিলেন। তিনি তার পবিত্র মুখমণ্ডলের উপর তাঁর হাতের কনুই রেখেছিলেন। তখন আমি আনন্দে বিভোর হয়ে ভাবছিলাম, আমি কত সৌভাগ্যবান! কত উত্তম সুযোগ আল্লাহ সুবহানাহু তাআলা আমাকে দিয়েছেন। রমযান শরীফের ২৭ মুবারক তারিখ। শেষ মুবারক দশ দিনের মধ্যেও শুক্রবার! কতই মুবারক পর্ব। যাঁর পদপ্রান্তে বসেছি তিনিও কত মুবারক! আল্লাহু আকবর! এতগুলি আশিস আজ আমার জন্য একত্রিত হয়েছে। খোদাওন্দ করীম এখন যদি আমাকে হযরত আকদাসের কোন নিদর্শন প্রদর্শন করেন, বিচিত্র কি? আমি পরম সুখময় এই ভাবধারার মধ্যেই নিমগ্ন ছিলাম এবং তাঁর গোড়ালির কাছে টিপছিলাম। হঠাৎ হযরত আকদাসের মুবারক দেহে মৃদু কম্পন অনুভব করলাম। এই কম্পনের সঙ্গেই হুযুর তাঁর হাত মুখমণ্ডল থেকে তুলে নিয়ে আমার প্রতি তাকালেন। তখন তাঁর চক্ষু যুগল অশ্রুতে পরিপূর্ণ ছিল । সম্ভবত অশ্রু গড়িয়েও পড়ছিল। পুনরায় একইভাবে মুখের উপর হাত রেখে তিনি শুয়ে পড়লেন। এমন সময়, আমার দৃষ্টি গোড়ালির উপর পড়ল। সেখানে লাল কালির এক বিন্দু দেখলাম। কালির ফোঁটাটি সদ্য পতিত হয়েছিল এবং তখনও তা বিস্তৃত হয়নি। আমি আমার তর্জনীর অগ্রভাগ ওই বিন্দুর উপর রাখতেই তা ছড়িয়ে পড়ল। কালি আমার আঙ্গুলেও লাগল। তখন আমি অভিভুত হয়ে পড়লাম এবং এই আয়াত আমার মনে উদয় হল:

صِبْغَةَ اللّٰهِ وَمَنْ اَحْسَنُ مِنَ اللّٰهِ صِبْغَةً

('আল্লাহ্ তাআলার রঙ এবং আল্লাহর রঙ অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর কি'?) মনের মধ্যে এই কথাও উদিত হল যে, এটা যদি আল্লাহর রঙ হয় তা হলে সম্ভবত: এতে সুগন্ধিও আছে। বস্তুত: আমি আমার আঙ্গুল দিয়ে ঘ্রাণ নিলাম। কিন্তু কোন গন্ধ

পেলাম না। তারপর, আমি গোড়ালির দিক থেকে কোমরের দিকে টিপতে লাগলাম। তখন হযরত আকদাসের কুর্তার উপরেও লাল কালির কয়েকটি ভিজা দাগ দেখলাম। আমি অত্যন্ত আশ্চর্যান্বিত হলাম। আমি সেখান থেকে উঠে দাঁড়ালাম এবং কামরার প্রত্যেক স্থান খুব ভালমত দেখলাম। কিন্তু আমি রক্তবর্ণের কোনো চিহ্ন কামরার মধ্যে পেলাম না। অবশেষে, আমি হয়রান হয়ে বসে পড়লাম এবং পূর্বের ন্যায় পা টিপতে লাগলাম। হযরত সাহেব মুখের উপর হাত রেখে ঘুমিয়েই থাকলেন। কিছুক্ষণ পরে হুযুর উঠে পরলেন এবং 'মসজিদ মুবারকের' মধ্যে এসে বসলেন। অধম আগের মতোই পুনরায় তার পা, কোমর ইত্যাদি টিপতে লাগলাম।

"তখন আমি হুজুরের কাছে আরজ করলাম, 'হুজুর, এই কালি কোথা হতে পড়ল? প্রথমে তো তিনি কোন উত্তর দেননি। তারপর, অধম পুনরায় অনুরোধ করলে সমস্ত ঘটনাই খুলে বললেন, যা হযরত আকদাস বিস্তৃতভাবে তাঁর কিতাব সমূহে বর্ণনা করেছেন।[১] কিন্তু বলার আগে এই অধমকে রুইয়াতে বারি তাআলা, অর্থাৎ আল্লাহর দিদার এবং দিবালোকে দৃষ্ট বস্তুগুলোর বাহ্য জগতে আকৃতি পরিগ্রহ সম্পর্কে হযরত মহিউদ্দীন ইবনে আরবীর ঘটনাবলী শুনিয়ে উত্তমভাবে বুঝিয়ে দিলেন-এই জগতে সিদ্ধ পুরুষদের মাধুর্য ও মহিমাময়, কিম্বা প্রতাপময় (জামালী কিম্বা জালালী) কোনো কোনো ঐশীগুণ রূপক আকৃতিতে দেখান হয়ে থাকে। তারপর, হযরত আমাকে বললেন, 'আপনার কাপড়েও কোনো বিন্দু পতিত হয়েছে কি? আমি আমার কাপড় এদিকে সেদিকে দেখে নিবেদন করলাম, হযরত, আমার উপর তো কোন বিন্দু পড়ে নাই'। তিনি বললেন, 'আপনার টুপি দেখুন। আমার টুপি সাদা মলমলে ছিল। আমি টুপি নামিয়ে দেখলাম এর উপরে একটি বিন্দু ছিল। তখন আমি অত্যন্ত সন্তুষ্ট হলাম, আমার উপরেও খোদা তাআলার কালির এক বিন্দু পতিত হয়েছে। হুযুরের যে কুর্তার উপর কালির ছিটা নিপতিত হয়েছিল সেটা এই অধম বিশেষ অনুরোধ করে হযরত আকদাস থেকে 'তাবারুক' স্বরূপ চেয়ে নিলাম এই অঙ্গীকারাবদ্ধ হয়ে যে, "আমি ওসীয়্যত করে যাব যেন আমার কাফনের সঙ্গে এই কুর্তা দাফন করা হয়। কেননা, হযরত আকদাস এই জন্য তা দিতে অস্বীকার করছিলেন যে, আমার এবং তার পরে এর দ্বারা 'শিরক' ছড়াবে– লোকে একে দর্শন কেন্দ্রে পরিণত করবে এবং এর পূজা শুরু করবে। বস্তুতঃ বহু বাদানুবাদের পর তা দান করলেন। এটা এখন পর্যন্ত আমার কাছে আছে। লাল কালির দাগ এখনও সম্পূর্ণ অপরিবর্তিত অবস্থায় বিদ্যমান।"[২]

(১) দেখুন, 'সুরমা চশমে আরিয়া', ১৩১-৩২ পৃ: 'নযুলুল-মসিহ্' ইত্যাদি।

(২) 'আল-ফযল', ২৬ ডিসেম্বর ১৯১৬ সাল।

হযরত মিঞা আবদুল্লাহ সাহেব সানৌরী রাযি আল্লাহু আনহু ১৯২৭ সালের ৭ অক্টোবর তারিখে পরলোকগমন করেন।[১] তাঁকে গোসল দেয়ার পর তার ওসীয়্যত অনুসারে তাঁকে এই কুর্তা পরানো হয়। বিনীত গ্রন্থকারও ঐসব সৌভাগ্যশালী ব্যক্তিদের মধ্যে একজন যাদের এই কুর্তা দর্শনের ভাগ্যলাভ হয়েছিল।

বিভিন্ন ধর্মের নেতৃবর্গকে নিদর্শন দেখার আহ্বান এবং মুজাদ্দেদিয়াত ও মামুরিয়াত ঘোষণা :

১৮৮৫ সালের প্রথমদিকে তিনি বিভিন্ন ধর্মের নেতৃবর্গ এবং ইসলামের সারথীদেরকে সদ্য বরকত এবং নিদর্শনসমূহ প্রত্যক্ষ করার জন্য আহ্বান জানান। এই উদ্দেশ্যে তিনি তাঁর দাবি সম্বলিত একটি প্রচার পত্র ইংরেজি এবং উর্দু উভয় ভাষাতেই প্রকাশ করেন। তা থেকে জরুরি উদ্ধৃতি এখানে উপস্থাপন করা হল :

"গ্রন্থকারকে এই কথারও জ্ঞান দেয়া হয়েছে তিনি সমসাময়িক মুজাদ্দেদ এবং রুহানীভাবে তার কামালাত (সৌন্দর্যাবলী)। মসিহ ইবনে মরিয়ামের কামালাতের অনুরূপ এবং পরস্পরে গভীরতম সম্বন্ধ ও সাদৃশ্য বিদ্যমান। শুধু হযরত 'খায়রুল বাশার' ও 'আফযালুর রাসুল' (শ্রেষ্ঠ মানুষ ও শ্রেষ্ঠ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) এর অনুবর্তিতার কল্যাণে এই গ্রন্থকারকে নবী এবং রসুলগণের বৈশিষ্ট্যের নমুনায় শীর্ষস্থানীয় বহু আউলিয়া অপেক্ষা শ্রেষ্ঠত্ব দেয়া হয়েছে এবং তার পদাঙ্ক অনুসারে নাজাত, সৌভাগ্য ও আশিসলাভের উপায় এবং এর বিরুদ্ধাচরণের ফল বিপথগামীতা।"[২]

এই প্রচার পত্র বিশ হাজার প্রকাশিত হয় এবং বিশ্বের সমস্ত বাদশাহ, উজির ও ধর্মীয় নেতাদের পাঠানো হয় এবং তাদেরকে এই বলে আহ্বান জানানো হয় যদি ইসলামের সত্যতা, অথবা আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওসাল্লামের সত্যতা সম্বন্ধে তাঁদের কোনো সন্দেহ থাকে, অথবা ইলহাম অথবা স্রষ্টার অস্তিত্ব সম্বন্ধে কোনো আপত্তি, কিংবা কুরআন করীমের শ্রেষ্ঠত্ব সম্বন্ধে কোনো সন্দেহ থাকে, তবে তাঁর কাছে উপস্থিত হয়ে বা পত্রালাপে সন্তুষ্টি লাভ করতে পারেন। সঙ্গেই "আহ্বান ঘোষণা" নামে একটি পত্রও প্রকাশ করা হয়। এতে তিনি পাঞ্জাব ও হিন্দুস্থানের বিভিন্ন ধর্মের নেতৃবর্গকে নিদর্শন দর্শনের জন্য আমন্ত্রণ করেন। এতে লেখা ছিল:

(১) 'সিরতুল-মাহ্‌দী', দ্বিতীয় খণ্ড, ৪৩৬ নং রেওয়াএত।
(২) 'সুরমা চশমে আরিয়া', 'শাহনায়ে হক', 'আয়নায়ে কমালাতে ইসলাম' ও 'বারকাতুদ-দোয়া'।

"যদি আপনি আসেন এবং এক বছর অবস্থান পূর্বক কোনো 'স্বর্গীয় নিদর্শন' প্রত্যক্ষ না করেন, তবে মাসিক দুইশ' টাকা হিসাবে আপনাকে ক্ষতিপূরণ বা জরিমানা দিব।"[১]

হযরত আকদাস বলেন:

"যদিও আমি সমগ্র হিন্দুস্থান এবং পাঞ্জাবের পাদ্রী সাহেবান এবং আর্য মহোদয়দের কাছে উল্লিখিত পত্র রেজিষ্টারী করে পাঠলাম, কিন্তু কেউ কাদিয়ান আসলেন না। মুনশি ইন্দ্রমন সাহেবের জন্য চব্বিশ শ' টাকা নগদ লাহোরে পাঠান হয়। তখন তিনি ওজর প্রদর্শন করে ফরিদকোট প্রস্থান করেন। অবশ্য, লেখরাম নামক এক পেশওয়ারী পণ্ডিত কাদিয়ানে এসেছিল। তাকে বারবার বলা হয়েছিল যে, তার যোগ্যতা অনুযায়ী অথবা তিনি পেশওয়ারে চাকরির সময় যে বেতন পেতেন, তার দ্বিগুণ আমার কাছ থেকে প্রতি মাসে গ্রহণ করে অবস্থান করুন। অবশেষে তাও বলা হয়েছিল যে, এক বছর না হলে চল্লিশ দিনই থাকুন। কিন্তু এই দুই কথার মধ্যে একটি কথাও তিনি গ্রহণ করলেন না।"[২]

চাচাতো ভাইদের পরিবার পরিজন সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী, ৫ই আগস্ট ১৮৮৫ সাল :

কোনো নির্দশন দেখাবার জন্য তার চাচাতো ভাই মির্যা ইমামুদ্দিন ও নেযামুদ্দিন বারবার বিশেষ ভাবে পীড়াপীড়ি করতে থাকে। এতে হযরত আকদাস ১৮৮৫ সালের ৫ই আগস্ট তারিখে এই ভবিষ্যদ্বাণী করলেন :

'মীর্যা ইমামুদ্দিন ও নেযামুদ্দীন সম্বন্ধে আমি ইলহাম প্রাপ্ত হয়েছি, একত্রিশ মাসের মধ্যে তাদের উপর একটি ভীষণ বিপদ উপস্থিত হবে। অর্থাৎ তাদের পরিবারে কোনো কোনো পুরুষ বা স্ত্রীলোক প্রাণত্যাগ করবে। এতে তাদের ভীষণ কষ্ট হবে এবং গণ্ডগোল হবে। আজকার তারিখ, ২৩ শ্রাবণ ১২৯০ বাংলা, মোতাবেক ৫ই আগস্ট ১৮৮৫ ইং সাল থেকে হিসেব করে এই ঘটনা প্রকাশিত হবে।"

এই ভবিষ্যদ্বাণীর উপর নিম্নলিখিত হিন্দুদের দস্তখত স্বাক্ষীহিসেবে গ্রহণ করা হয়। যথা– পণ্ডিত বীজনাথ, বশনদাস ব্রাহ্মণ ও বশনদাস ক্ষত্রিয়। তারা প্রত্যেকে স্বহস্তে দস্তখত করেন। অত:পর ভবিষ্যদ্বাণীতে যা বলা হয়েছিল, তা

---

(১) 'তবলীগে-রিসালত,' প্রথম খন্ড, ১২ পৃঃ এবং 'হায়াতে আহ্‌মদ', দ্বিতীয় খণ্ড, তৃতীয় সংখ্যা, ১১৬ পৃঃ।

(২) 'সাদাকাতে-আনওয়ার' নামক ইশ্‌তেহার, তবলীগে রিসালত' প্রথম খন্ড, ৭৭ পৃঃ।

পূর্ণ হল। অর্থাৎ ঠিক একত্রিশতম মাসে মির্যা নেযামুদ্দিনের কন্যা অর্থাৎ মির্যা ইমামুদ্দীনের ভ্রাতুস্পুত্রী মাত্র পনের বছর বয়সে একটি অল্প বয়সের শিশু সন্তান রেখে প্রাণত্যাগ করেন।[১]

উল্কাপাতের নিদর্শন:

১৮৮৫ সালের ২৭ ও ২৮ নভেম্বর মধ্যবর্তী রাতে আল্লাহ্ তাআলা হযরত আকদাসের সাহায্যর্থে আকাশে তারকা বিচ্ছুরণের এক অসাধারণ নিদর্শন প্রদর্শন করেন। তিনি বলেন:

“২৮ নভেম্বর ১৮৮৫ সালে দিবাগত রাতে এত বেশি উল্কাপাতের খেলা আকাশে চলছিল যে, আমি আমার সারা জীবন এর দৃষ্টান্ত কখনও দেখিনি এবং আকাশ পথে হাজার হাজার উল্কার অগ্নিময় শিখা এমনভাবে ছোটাছুটি করছিল যে, পৃথিবীতে এর কোন নজির নেই, যা আমি বর্ণনা করতে পারি। আমার স্মরণ আছে, তখন এই ইলহাম বার বার হয়েছিল:

مَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ رَمٰى [২]

এবং এই আয়াতে লিখিত প্রস্তর-বৃষ্টি উক্ত উল্কাপাতের সাথে বহু সাদৃশ্য বিশিষ্ট ছিল। এই উল্কাপাত যা ২৮ নভেম্বর ১৮৮৫ সাল রাতে এত ব্যাপকভাবে সংঘটিত হয়েছিল যে, ইউরোপ, আমেরিকা এবং এশিয়ার সমস্ত সংবাদপত্রে এটাকে অত্যন্ত বিস্ময়কর বলে অভিমত প্রকাশিত হয়েছিলো। লোকে মনে করত যে, তা অনর্থক ছিল। কিন্তু খোদাওন্দ করীম জানেন সর্বাপেক্ষা গভীর মনোযোগের সাথে আমিই এই ঘটনা নিরীক্ষণ করেছি এবং সবচেয়ে অধিক আনন্দ আমিই উপভোগ করেছি। আমার চোখ দীর্ঘ সময় ধরে এই অলৌকিক ব্যাপার দর্শনে ব্যাপৃত ছিল। সেই উল্কাপাত সন্ধ্যার সময় থেকেই শুরু হয়। শুধু ইলহামী সুসংবাদ বশত: আমি অত্যন্ত আনন্দের সাথে এটা দর্শন করতে থাকলাম। কারণ আমার অন্ত:করণে ইলহাম করা হয়েছিল এটা তোমার জন্য নিদর্শনরূপে প্রকাশিত’ হয়েছে।”[৩]

পূর্ববর্তী ইলহামী গ্রন্থসমূহে একে মসীহ প্রকাশিত হওয়ার অত্যন্ত বড় লক্ষণ বলে নির্দেশ করা হয়েছে।[৪]

---

(১) ইশতেহার ২০ মার্চ, ১৮৮৫ সাল, তবলীগে রিসালত, প্রথম, ১০২ পৃ:।

(২) অর্থাৎ যা তুমি নিক্ষেপ করেছিলে, তুমি নিক্ষেপ করনি খোদা ছুড়েছিলেন।” (হাকিতুল-ওহী, ৭০ পৃ:)।

(৩) আয়নায়ে কামালাতে ইসলাম ১১০-১১১ পৃ: (হাশিয়া)

(৪) মথি লিখিত সুসমাচার, ২৪-২৯ পদ।

নক্ষত্র উদয়ের নিদর্শনঃ

'অত:পর, ইউরোপের অধিবাসীরা ওই নক্ষত্রও দেখতে পেয়েছিল, যা হযরত মসীহ্ মাওউদের আবির্ভাবকালে উদয় হয়েছিল। আমার অন্ত:করণে নিক্ষিপ্ত হল, এই নক্ষত্রও আমার সত্যতার অন্যতম নিদর্শন।[১]

স্যার সৈয়দ আহমদ খাঁ সংক্রান্ত ভীতিপ্রদ সংবাদঃ

১৮৮৫ সালের নভেম্বর মাসে হযরত আকদাস স্যার সৈয়দ আহমদ খাঁ মরহুম এবং মহারাজা দিলীপ সিংহ সম্বন্ধে কিছু ভীতিপ্রদ সংবাদ ভবিষ্যদ্বাণীরূপে হিন্দু ও মুসলমানদের শুনিয়েছিলেন। অত:পর, ১৮৮৬ সালের ২০ ফেব্রুয়ারি, এক ইশতেহার প্রকাশ করেন। এতে হযরত আকদাস লিখেছিলেনঃ

"আমার কাছে স্বয়ং আমার সম্বন্ধে, আমার পিতার দিকের কোন কোন আত্মীয় সম্বন্ধে, আমার কোন কোন বন্ধু সম্বন্ধে, ভারতবর্ষের নক্ষত্র স্বরূপ কোন কোন দার্শনিক স্বজাতি ভাইদের সম্বন্ধে এবং এক নবাগত পাঞ্জাবী বংশোদ্ভূত দেশীয় সামন্ত সম্বন্ধে আল্লাহ্ তাআলার কাছ থেকে ভীতিপ্রদ সংবাদ, প্রকাশিত হয়েছে– যা কারও পরীক্ষা, কারও আত্মীয়ের বিয়োগ এবং কারও নিজেরই মৃত্যুর প্রতি নির্দেশ করে। সর্ব-শক্তিমান আল্লাহ্ চাইলে মিমাংসার পর এগুলো লিখিত হবে।"[২]

"ভারতবর্ষের নক্ষত্র" দ্বারা স্যার সৈয়দ আহমদ মরহুমকে বুঝাচ্ছিল এবং "নবাগত পাঞ্জাবী বংশোদ্ভূত" দ্বারা মহারাজা রণজিৎ সিংহের পুত্র দিলীপ সিংকে বুঝায়। হুযুর বলেন, তিনি প্রায় পাঁচশ' হিন্দু ও মুসলমানকে এসব সংবাদ সম্বন্ধে অবহিত করেন।[৩] যা হোক, স্যার সৈয়দ আহমদের ওপর এই বিপদ দেখা দিল যে, শেষ বয়সে তার এক যুবক পুত্রের মৃত্যু হওয়ায় তিনি প্রাণান্তিক শোকে অভিভূত হলেন এবং আলীগড় কলেজ প্রাসাদ নির্মাণ কাজ সমাপ্ত করার জন্য তিনি অতিশয় পরিশ্রম ও চেষ্টার ফলে যে চাঁদা সংগ্রহ করেছিলেন তা থেকে জনৈক দূরাত্মা দেড় লাখ টাকা আত্মসাৎ করে। স্যার সৈয়দ মরহুম এই ক্ষতির কারণে এমন শোকাভিভূত হলেন যে, তিন দিন পর্যন্ত তিনি আহার করেননি এবং কোন কোন সময় অজ্ঞান হয়ে পড়তেন।[৪] তার পুত্র সৈয়দ মাহ্মুদ সাহেব

(১) 'আয়নায়ে কামালাতে ইসলাম,' ১১১ পৃ: পাদটীকা।
(২) ইশতেহার, ২০ ফেব্রুয়ারি, ১৮৮৬ সাল।
(৩) ইশতেহার, ১৩ মার্চ, ১৮৯৭ সাল।
(৪) ইশতেহার, ১৩ মার্চ, ১৮৯৭ সাল।

বলেন, "আমি এই ক্ষতির সময়ে আলীগড় উপস্থিত না থাকলে আমার ওয়ালেদ সাহেব নিশ্চয়ই এই শোকে প্রাণত্যাগ করতেন।"[১]

মহারাজ দিলীপ সিং:

ইংরেজরা যুদ্ধ করে শিখদের হাত থেকে পাঞ্জাব উদ্ধার করেন। এ জন্য তারা ভাবী সিংহাসনের উত্তরাধিকারী অপ্রাপ্ত বয়স্ক দিলীপ সিংকে পাঞ্জাব থেকে অপসারণ করা উচিত মনে করলেন। তারা দিলীপ সিংকে লণ্ডন নিয়ে গিয়ে সেখানে তার শিক্ষার ব্যবস্থা করেন। এদিকে তিনি যৌবনপ্রাপ্ত হলেন। অপর দিকে পাঞ্জাবে ইংরেজ শাসন দূরীভূত হলো। শিখরা মহারাজা দিলীপ সিংকে পাঞ্জাবে আনার জন্য দাবি উপস্থাপন করল। ইংরেজরা ভাবলেন এখন বিপদের কোন আশঙ্কা নেই। তাকে আনা হলে ক্ষতি কি? তারা সম্মতি জ্ঞাপন করলেন এবং তাকে সামুদ্রিক জাহাজে করে দেশে পাঠালেন। শিখরা অত্যন্ত আনন্দ প্রকাশ করল। হযরত আকদাসকে অন্তর্যামী 'আল্লামুল গুয়ুব' খোদা জানালেন যে, মহারাজা দিলীপ সিং পাঞ্জাবে বাস করতে পারবেন না। পক্ষান্তরে, এই সফরে তার সম্মান, শান্তি এবং প্রাণনাশের আশঙ্কা আছে। বস্তুত: তাই হল। তার জাহাজ এড্রেন পৌছলে, ইংরেজরা তার পাঞ্জাব আগমন বিপজ্জনক মনে করে জাহাজটি ফেরত নিলেন এবং এই প্রকারে খোদা তাআলার প্রদত্ত সংবাদ মহাগৌরবে পূর্ণ হল।[২]

হুশিয়ারপুর সফর ও মুসলেহ মাওউদ সংক্রান্ত ভবিষ্যদ্বাণী :

হযরত আকদাসের জীবনের প্রতি মুহূর্ত অত্যন্ত মূল্যবান ছিল। তিনি ধর্মের সেবায় উল্লেখযোগ্য কার্যাবলী সাধন করেছিলেন। আল্লাহ তাআলাও তাঁর প্রশংসায় বলেছেন, أَنْتَ الشَّيْخُ الْمَسِيْحُ الَّذِيْ لَا يُضَاعُ وَقْتُهُ

অর্থাৎ "তুমি সেই মহান মসীহ্, যার সময় নষ্ট করা হবে না।" বস্তুত: তিনি জীবনে যত কাজ করেছেন বিস্তারিতভাবে লিপিবদ্ধ করতে হলে হাজার হাজার পৃষ্ঠা লেখার প্রয়োজন। তাঁর পবিত্র জীবনের প্রত্যেকটি ঘটনায় আমাদের জন্য বহু শিক্ষার বিষয় আছে। ১৮৮৬ সালটি অত্যাশ্চর্য ঘটনাবলী এবং আসমানী সাহায্যের বছর ছিল। ওপরে হযরত আকদাসের একটি ইশতেহারের অংশ বিশেষের উদ্ধৃতিসহ বর্ণিত হয়েছে, এই বছর তিনি আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে

(১) ওই
(২) 'রিয়াযে হিন্দ্' পত্রিকা, অমৃতসর, ৩ মে, ১৮৮৬ সাল।

নানা বিষয়ে ভবিষ্যৎ সম্পর্কিত ঘটনাবলী অবগত হবেন। বিস্তারিতভাবে বিষয়টি বলা হচ্ছে:

“অনেক দিন ধরে হযরত আকদাস সংকল্প করছিলেন, কোথাও গিয়ে হযরত মুসা আলাইহেস সালামের মত ক্রমান্বয়ে চল্লিশ দিন আল্লাহ তাআলার ইবাদতে এবং দোয়ায় রত থাকবেন, যেখানে কেউ তাকে চিনে না, জানে না। ইতিপূর্বে এই উদ্দেশ্যে ১৮৮৪ সালে তিনি গুরুদাসপুর জেলা'র অন্তর্গত সুজানপুর যাওয়ার ইচ্ছা করেছিলেন কিন্তু ঐশী ইচ্ছায় সেই সফর স্থগিত হল এবং আল্লাহ্ তাআলা তাঁকে বললেন: تمہاری عقدہ کشائی ہوشیارپور میں ہوگی ۔

“তোমার সমস্যাবলীর সমাধান হুশিয়ারপুরে হবে।”[১] বস্তুত: ১৮৮৬ সালে তিনি হুশিয়ারপুর যাত্রা করলেন। এই সফরে হযরত মৌলবী আব্দুল্লাহ সনৌরী সাহেব (রাযি.) হযরত শেখ হামেদ আলী সাহেব (রাযি.) এবং মিয়া ফতেহ খাঁ সাহেব তার সেবক হিসেবে সহযাত্রী হলেন। হুশিয়ারপুর পৌঁছে হুযুর শেখ মেহের আলী সাহেব নামক এক সম্ভ্রান্ত রইসের আস্তাবলের উপরস্থ ঘরে অবস্থান করলেন।[২] ‘বারাহীনে আহ্মদীয়া’ প্রকাশিত হওয়ার পর তাঁর খ্যাতি চতুর্দিকে বিস্তৃত হয়ে পড়েছিল। তাই মানুষ তাঁর সাক্ষাৎ লাভের জন্য উদগ্রীব থাকতো। এজন্য হুযুর লিফলেট এর মাধ্যমে ঘোষণা করলেন, “কেউ যেন আমার সাথে ৪০ দিন পর্যন্ত সাক্ষাৎকারের জন্য উপস্থিত না হন। আমি পরে আরও বিশ দিন এখানে অবস্থান করবো। তখন সবাই সাক্ষাৎ করতে পারবেন।” হযরত মৌলবী আব্দুল্লাহ সাহেব রাযি আল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন:

“নিচে আমাদের থাকার ব্যবস্থা ছিল। আমাদেরকে হযরত আকদাস বিশেষ ভাবে আদেশ দিয়েছিলেন, ‘কেউ যেন নিজ থেকে উঠে আমার সাথে কথা না বলে। শুধুমাত্র আমি কোন কথা জিজ্ঞাসা করলে এর উত্তর দেবে। কোনো অতিরিক্ত কথা বলবে না। আমার খাবার ওপরে পৌঁছে দিয়ে দেবে এবং প্লেট ফেরত নেয়ার জন্য অপেক্ষা করবে না। আমি পৃথক নামায পড়ব। অবশ্য, জুমার জন্য কোনো পরিত্যক্ত মসজিদ খুঁজে বের কর। সেখানে আমরা পৃথকভাবে নামাজ পড়ব। শহরের বাইরে একটি ছোট মসজিদ ছিল। আমরা জুম্মার জন্য সেখানে যেতাম। হযরত আকদাস সংক্ষেপে খুৎবা দান করতেন এবং নামাজ পড়িয়ে চলে আসতেন।”

---

(১) ‘সিরাতুল-মাহ্দী’ প্রথম খণ্ড রেওয়াএত নং ৮৮

(২) যে গৃহে হযরত আকদাস অবস্থান করেন, এর বর্তমানে মালিক একজন হিন্দু। ওই হিন্দু মালিক বাড়িটির আমুল পরিবর্তন করিয়েছে। কিন্তু যে প্রকোষ্ঠে হুযুর চল্লিশ দিন ছিলেন, তার কোনো পরিবর্তন না করে আগের মতোই অক্ষুণ্ন রাখা হয়েছে। সেখানে ভদ্রলোকটি কখন কখন নিজের ধর্মমতে প্রার্থনা করে থাকেন।

হযরত মৌলবী সাহেব আরও বলেন, একবার তিনি খাবার পৌঁছানোর জন্য ওপরে যাওয়ায় হযরত আকদাস বললেন, মিয়া আব্দুল্লাহ, ইদানিং আমার কাছে খোদা তাআলা অনেক বড় বড় অনুগ্রহের দরজা খুলেছেন। কোন কোন সময় বহুক্ষণব্যাপী খোদা তাআলা আমার সাথে বাক্যালাপ করেন। তা লিখলে বহু পৃষ্ঠা হবে।"[১]

চল্লিশ দিন অতিবাহিত হওয়ার পর হুযুর ২০ ফেব্রুয়ারি একটি ইশতেহার প্রকাশ করেন। এতে তাঁর সম্বন্ধে, তাঁর সন্তান সম্বন্ধে, তাঁর আত্মীয়স্বজন ও বন্ধুদের সম্পর্কে এবং স্যার সৈয়দ ও মহারাজা দিলীপ সিং সম্বন্ধে কিছু ভবিষ্যদ্বাণী সন্নিবিষ্ট করেন। মুসলেহ মাওউদ সংক্রান্ত মহাভবিষ্যদ্বাণীও এই ইশতেহারেই বর্ণনা করেন। ইনশাআল্লাহ, এখনি এর বিস্তৃত আলোচনা করা হবে। চল্লিশ দিন পর অন্যান্য স্থান থেকে বহু ব্যক্তি উপস্থিত হন। কেউ কেউ তাঁর সাথে ধর্ম বিষয়ে ভাববিনিময়ও করেন। বিশেষত: পণ্ডিত মুরলী ধরের সাথে তর্ক একান্ত প্রসিদ্ধ। এর বৃত্তান্ত হুযুরের কিতাব, 'সুরমা চশমে আরিয়া'তে লিখিত আছে।[২] দুই মাস অতিবাহিত হওয়ার পর হুযুর যে পথে আগমন করেছিলেন সে পথ দিয়েই কাদিয়ান প্রত্যাগমন করলেন। হযরত মৌলবী আব্দুল্লাহ সাহেব (রাযি.) বলেন:

"হুশিয়ারপুরের ৫/৬ মাইল দূরে একজন বুজুর্গের একটি কবর আছে। সেখানে বাগিচার মত কতকটা স্থান আছে। তথায় পৌঁছে হুযুর অল্পক্ষণের জন্য বাহন থেকে অবতরণ করলেন এবং বললেন যে, এটা উত্তম ছায়াদার জায়গা। এখানে কিছুক্ষণ দেরি করতে হবে। অত:পর, হুযুর কবরের দিকে গেলেন। আমিও পিছনে পিছনে গেলাম। শেখ হামেদ আলী এবং ফতেহ মুহাম্মদ খাঁ বাহনের কাছে থাকলেন। সমাধির কাছে পৌঁছে এর দরজা খুলে তিনি ভেতরে গেলেন এবং কবরের মাথার পাশে দাঁড়িয়ে কবরস্থ বুজুর্গের জন্য হাত উঠিয়ে অল্পক্ষণ দোয়া করলেন। তারপর চলে আসলেন এবং আমাকে বললেন:

"আমি যখন দোয়ার জন্য হাত উঠালাম, তখন সমাহিত বুজুর্গ উঠে আমার সামনে হাঁটু পেতে বসলেন। আপনি সঙ্গে না থাকলে আমি তার সাথে আলাপ আলোচনাও করতাম। তার চোখগুলি বড় বড়। দেহ শ্যামবর্ণ।

"অত:পর বললেন, 'এখানে কোন সেবক থাকলে তার কাছে তার অবস্থা

(১) 'সিরাতুল-মাহ্দী,' প্রথম খণ্ড, ৮৮ রেওয়ায়েত।

(২) আর্য ও নাস্তিকগণের মোকাবিলায় এটা একান্তই প্রয়োজনীয় গ্রন্থ। এ কিতাবে হযরত আকদাস প্রাকৃতিক নিয়ম, মুজেযা এবং রুহ তত্ত্ব বিষয়ক অতিশয় সূক্ষ্ম ও সুন্দর যৌক্তিক আলোচনা করেছেন।

জিজ্ঞাসা করুন।' পরে হুযুর সেবককে জিজ্ঞাসা করলেন। সে বলল, সে নিজে তাকে দেখেনি। প্রায় একশ' বছর আগে তিনি পরলোকগমন করেন। অবশ্য, সে তার পিতা ও পিতামহের কাছে শুনেছে তার রঙ শ্যামবর্ণ ছিল এবং চোখগুলো বড় বড় ছিল। সেই অঞ্চলে তার অত্যন্ত প্রভাব ছিল।"[১]

'রহমতের নিদর্শন,' অর্থাৎ 'মুসলেহ মাওউদ':

এখন 'প্রতিশ্রুত পুত্র' সম্বন্ধে হযরত আকদাসের মহাবিখ্যাত ও সর্বজনবিদিত ভবিষ্যদ্বাণীর বিষয়ে আমরা আলোচনা করব। তা ১৮৮৬ সালের ২০ ফেব্রুয়ারির ইশতেহারে প্রকাশিত হয়। হুযুর বলেন:

"পরম করুণাময়, পরম দাতা, মহামহিমান্বিত খোদা, যিনি সর্বশক্তিমান–যাঁর মর্যাদা মহাগৌরবময় এবং নাম অতীব মহান, আপন ইলহাম দ্বারা সম্বোধন পূর্বক বললেন:

'আমি তোমার প্রার্থনানুযায়ী তোমাকে একটি রহমতের নিদর্শন দিচ্ছি। আমি তোমার কান্না শুনেছি এবং তোমার দোয়া সমূহকে অনুগ্রহ করে কবুল করেছি এবং তোমার সফরকে (হুশিয়ারপুর এবং লুধিয়ানার) তোমার জন্য কল্যাণময় করেছি। সুতরাং, শক্তির, দয়ার এবং নৈকট্যের নিদর্শন তোমাকে দেয়া হচ্ছে। বদান্যতা ও অনুগ্রহের নিদর্শন তোমাকে দেয়া হচ্ছে। বিজয়ের চাবি তুমি প্রাপ্ত হচ্ছো। হে বিজয়ী, তোমার প্রতি সালাম। খোদা বলেছেন, যারা জীবন-প্রত্যাশী তারা যেন মৃত্যুর কবল থেকে মুক্তি লাভ করে এবং যারা কবরের মধ্যে প্রোথিত, তারা বের হয়ে আসে, যাতে ইসলাম ধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব এবং আল্লাহ তাআলার কালামের মর্যাদা লোকের কাছে প্রকাশিত হয় এবং সত্যতার যাবতীয় আশিসসহ উপস্থিত হয় এবং মিথ্যা তার যাবতীয় অকল্যাণসহ পলায়ন করে এবং মানুষ বুঝে যে, আমি সর্বশক্তিমান যা ইচ্ছা করি, করে থাকি এবং যেন তাদের প্রতীতি হয় যে, আমি তোমার সঙ্গে আছি এবং যারা খোদার অস্তিত্বে অবিশ্বাসী এবং খোদার ধর্ম এবং কিতাব এবং তাঁর রসূল পাক মুহাম্মদ মুস্তফা (স.) কে অস্বীকার করে এবং অসত্য মনে করে থাকে তারা যেন একটি প্রকাশ্য নিদর্শনপ্রাপ্ত হয় এবং অপরাধীদের শাস্তির পথ পরিষ্কার হয়।

'সুতরাং, তুমি সুসংবাদ গ্রহণ কর, এক সুদর্শন এবং পবিত্র পুত্র সন্তান তোমাকে দেয়া হবে। এক মেধাবী পুত্র তুমি লাভ করবে। সেই ছেলে তোমারই ঔরসজাত, তোমারই সন্তান হবে।"

---

(১) 'সিরাতুল মাহ্‌দী,' প্রথম খণ্ড, ৮৮ নং রেওয়াএত।

সুশ্রী, পবিত্র পুত্র তোমার মেহমান আসছে। তার নাম ইনমানুয়েল এবং সুসংবাদ দাতাও বটে। তাকে পবিত্রাত্মা দেয়া হয়েছে। সে কলুষ থেকে পবিত্র। সে আল্লাহর নূর। ধন্য, যে আকাশ থেকে আসে।

“তার সঙ্গে ‘ফযল’ (বিশেষ কৃপা) আছে, যা তার আগমনের সাথে উপস্থিত হবে। সে জাঁকজমক, ঐশ্বর্য ও গৌরবের অধিকারী হবে। সে পৃথিবীতে আসবে এবং তার সঞ্জিবনী শক্তি এবং ‘পবিত্র আত্মার’ প্রসাদে বহুজনকে ব্যাধি মুক্ত করবে। সে ‘কালিমাতুল্লাহ’ –আল্লাহর বাণী। কারণ, খোদার দয়া ও সূক্ষ্ম মর্যাদাবোধ তাকে পাার্থিব ও আধ্যাত্মিক সম্মানিত বাক্য দ্বারা প্রেরণ করেছেন। সে অত্যন্ত ধীমান, প্রজ্ঞাশীল, হৃদয়বান এবং গাম্ভীর্যশীল হবে। জ্ঞানে তাকে পরিপূর্ণ করা হবে। সে তিনকে চার করবে। (এর অর্থ বুঝিনি) সোমবার, শুভ সোমবার। সম্মানিত, মহৎ, প্রিয়পুত্র।

مَظْهَرُ الْحَقِّ وَالْعَلَاءِ كَأَنَّ اللّٰهَ نَزَلَ مِنَ السَّمَاءِ

অর্থাৎ সত্যের বিকাশ স্থল, উচ্চ যেন আল্লাহ আকাশ থেকে অবতীর্ণ হয়েছেন। তার আগমন অশেষ কল্যাণময় হবে এবং ঐশী গৌরব ও প্রতাপ প্রকাশের কারণ হবে। জ্যোতিঃ আসছে, জ্যোতিঃ। খোদা তাকে তাঁর সন্তুষ্টির সৌরভ নির্যাস দ্বারা সিক্ত করেছেন। আমরা তার মধ্যে নিজ আত্মা দান করব এবং খোদার ছায়া তার মাথায় থাকবে। সে শীঘ্র শীঘ্র বর্ধিত হবে। বন্দীদের মুক্তির কারণ হবে এবং পৃথিবীর প্রান্তে প্রান্তে খ্যাতি লাভ করবে। জাতিরা তার কাছ থেকে আশীর্বাদ লাভ করবে। তখন তার আত্মিক কেন্দ্রের আকাশের দিকে উত্তোলিত হবে।

وَكَانَ اَمْرًا مَّقْضِيًّا۔” [১]

হযরত আকদাসের পরিবার ও অন্তরঙ্গ বন্ধুগণ সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী :

“তারপর, খোদা জাল্লা শানুহু আমাকে সুসংবাদ দিয়ে বলেছেন :

‘তোমার গৃহ আশিসে পরিপূর্ণ হবে। আমি আমার দান সমূহ তোমার উপর পূর্ণ করব এবং ভাগ্যবতী মহিলা, যাদের মধ্যে কয়েক জনকে তুমি পরে পাবে। তোমার অনেক বংশধর হবে। আমি তোমাকে অনেক সন্তান-সন্ততি দান করবো এবং আশিস যুক্ত করব। কিন্তু তাদের কেউ কেউ অল্প বয়সেই লোকান্তরিত হবে। তোমার বংশ ব্যাপকভাবে দেশ বিদেশে বিস্তার লাভ করবে। তোমার পিতৃকুলের প্রত্যেক শাখা কর্তন করা হবে। তারা শীঘ্রই সন্তানহীন হয়ে শেষ হয়ে যাবে। যদি তারা অনুতাপ না করে, তবে খোদা তাদের ওপর বিপদের পর

(১) ইশতেহার, ২০ শে ফেব্রুয়ারি, ১৮৮৬ সাল, ‘তবলীগে-রিসালত,’

বিপদ অবতীর্ণ করবেন। এমন কি, তারা নিশ্চিহ্ন হবে। তাদের গৃহ বিধবাদের দ্বারা পরিপূর্ণ হবে। এবং তাদের দেয়ালগুলির ওপর অভিশাপ অবতীর্ণ হবে। কিন্তু যদি তারা প্রত্যাগমন করে, তবে খোদা তোমার আশিসমূহ চতুর্দিকে বিস্তৃত করবেন এবং এক অনাবাদ গৃহ তোমার দ্বারা আবাদ করবেন। এবং শঙ্কাপূর্ণ গৃহ আশীষপূর্ণ করবেন। তোমার বংশ কখনও বিনষ্ট হবে না এবং শেষ দিন পর্যন্ত সজীব থাকবে। পৃথিবীর প্রলয় কাল পর্যন্ত খোদা তোমার নাম সম্মানের সাথে বজায় রাখবেন এবং তোমার 'আহ্বানকে' পৃথিবীর প্রান্ত সমূহ পর্যন্ত পৌছাবেন। আমি তোমাকে উত্তোলন করব এবং আমার দিকে আহ্বান করব। কিন্তু তোমার নাম ভূ পৃষ্ঠ হতে কখনো অন্তর্হিত হবে না। এটা নির্ধারিত হয়েছে যে, যারা তোমার অবমাননার চিন্তায় রত এবং তোমার অকৃতকার্যতার জন্য চেষ্টা করে এবং তোমার বিলোপ সাধনের ধারণা পোষণ করে, তারা স্বয়ং অকৃতকার্য হবে এবং বিফলতার সাথে প্রাণত্যাগ করবে। কিন্তু খোদা তোমাকে সর্বোতোভাবে কৃতকার্য করবেন এবং তোমার যাবতীয় মনস্কামনা পূর্ণ করবো। আমি তোমার বিশুদ্ধ এবং অন্তরঙ্গ বন্ধু বান্ধবের দলকেও বৃদ্ধি করবো। তাদের ধন-জন আশিসযুক্ত করব এবং এতে আধিক্য দিব। তারা বিদ্বেষপরায়ণ ও শত্রুভাবাপন্ন অপর মুসলমান সম্প্রদায়ের ওপর কেয়ামত পর্যন্ত প্রবল থাকবে। খোদা তাদেরকে ভুলবেন না। তারা আন্তরিকতা অনুযায়ী স্ব স্ব পুরস্কার লাভ করবে। তুমি আমার কাছে বনি ইস্রায়িলের নবীদের ন্যায়। (অর্থাৎ, প্রতিচ্ছায়া স্বরূপে তাদের অনুরূপ)। তুমি আমার কাছে আমার তৌহিদ তুল্য। তুমি আমা হতে এবং আমি তোমা হতে। সেই সময় আসছে, বরং সন্নিকটে, যখন খোদা বাদশাহ এবং ধনকুবেরদের হৃদয়ে তোমার প্রেম সঞ্চার করবেন। এমন কি, তারা তোমার কাপড় হতে আশিস অনুসন্ধান করবে। হে অস্বীকারকারীরা, ওহে সত্যের বিরোধিরা! যদি তোমরা আমার দাসের সম্বন্ধে সন্দেহ পোষণ কর, যদি এই 'অনুগ্রহ ও দয়া' সম্পর্কে তোমাদের কোন অস্বীকৃতি থাকে, যা আমি আমার বান্দার প্রতি করেছি- তবে এই রহমতের নিদর্শনের ন্যায় তোমরাও তোমাদের সম্বন্ধে এমন কোন নিদর্শন উপস্থিত কর, যদি তোমরা সত্যবাদী হও। যদি কখনও উপস্থিত করতে না পার এবং স্মরণ রাখবে কখনও পারবে না, তবে সেই আগুনকে ভয় কর, যা আদেশ লঙ্ঘনকারী, মিথ্যাবাদী এবং সীমা অতিক্রমকারীদের জন্য প্রস্তুত আছে'।"[১]

অত:পর, ১৮৮৬ সালের ২২শে মার্চের ইশতেহারে হযরত আকদাস 'মুসলেহ মাওউদ' (প্রতিশ্রুত ধর্ম সংস্কারক)-এর জন্ম সম্পর্কে আল্লাহ্ তাআলা থেকে

(১) ইশতেহার, ২০শে ফেব্রুয়ারি হইতে উদ্ধৃত। ('তবলীগে-রেসালত'; ৫৮-৬৩ পৃঃ।)

সংবাদ প্রাপ্ত হয়ে 'নয় বৎসর' মেয়াদ ধার্য করেন। বস্তুতঃ ঐশী প্রতিশ্রুতি অনুসারে ১৮৮৯ সালের ১২ই জানুয়ারী তারিখে মুসলেহ মাওউদ জন্মগ্রহণ করেন। 'ফাল-হামদু লিল্লাহে আ'লা যালেক'।

এখানে একথা বলা অপ্রাসঙ্গিক হবে না যে, আল্লাহ্ তাআলা তার কামেল হেকমত অনুসারে 'মুসলেহ মাওউদ' সংক্রান্ত ভবিষ্যদ্বাণীর পর হযরত আকদাসকে প্রথমতঃ এক কন্যা দান করেন। তারপর, প্রথম বশীর নামে খ্যাত এক পুত্রও দান করেন। তিনি দেড় বছর বয়সে পরলোকগমন করেন। 'ফা-ইন্না লিল্লাহে ও ইন্না ইলাইহে রাজেউন'।

এই দু'টি সন্তানেরই জন্ম নিয়ে ক্ষীণপ্রত্যয়ী ও ছিদ্রান্বেষী ব্যক্তিদের গুরুতর পদস্খলন হয়। তারা এই আপত্তি উত্থাপন করলো যে, ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী 'মুসলেহ মাওউদ' জন্মগ্রহণ করেননি। অথচ ১৮৮৬ সালের ২২শে মার্চের প্রকাশিত ইশতেহারে হযরত আকদাস পরিষ্কারকরে বলেন যে, মুসলেহ মাওউদের জন্ম সম্বন্ধে আল্লাহ তাআলা নয় বছর মেয়াদ নির্ধারণ করেছেন। এর অর্থ এই ছিল না যে, নয় বছরের মধ্যে 'মুসলেহ মাওউদ' ব্যতীত হযরত আকদাসের অন্য কোন সন্তানের জন্ম বা মৃত্যু হবে না। কেবল এটাই উদ্দেশ্য ছিল যে, নয় বছরের মেয়াদের মধ্যে মুসলেহ মাওউদ জন্মগ্রহণ করবেন। বস্তুত: তা-ই হয়েছিল।

হযরত আকদাসের সন্তান সন্ততি :

এই প্রসঙ্গে হযরত আকদাসের সব সন্তান নিয়ে এক সঙ্গে আলোচনা করা জরুরি মনে হয়। তাঁর প্রথমা স্ত্রী তাঁর জনৈকা আত্মীয়া ছিলেন। তার গর্ভে তাঁর দুই পুত্র জন্মগ্রহণ করেন-হযরত মির্যা সুলতান আহমদ সাহেব এবং মির্যা ফযল আহমদ সাহেব। প্রথমোক্ত পুত্র ১৮৫৬ সালে জন্মগ্রহণ করেন এবং শেষ বয়সে তিনি কনিষ্ঠ ভ্রাতা হযরত মির্যা বশীরুদ্দীন মাহমুদ আহমদ সাহেব খলীফাতুল-মসীহ্ সানী আইয়েদাহুল্লাহু তাআলার হাতে বয়আত গ্রহণের অল্প কাল পরে ১৯৩১ সালে পরলোকগমন করেন। শেষোক্ত পুত্র, সম্ভবত:, ১৮৬০ সালে জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৯০২ সালে ইহধাম পরিত্যাগ করেন। তিনি হযরত আকদাসের অত্যন্ত আজ্ঞানুবর্তী ছিলেন। কিন্তু শেষ সময়ে অন্যান্য আত্মীয়ের দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়ে পড়েন।

দ্বিতীয়া স্ত্রী হযরত সৈয়দা নুসরৎ জাহান বেগম সাহেবা দিল্লীর হযরত মীর নাসের নওয়াব সাহেবের কন্যা ছিলেন। তার গর্ভে হযরত আকদাসের দশ জন সন্তান জন্মগ্রহণ করেন। পাঁচ ছেলে, পাঁচ মেয়ে। বিস্তারিত বিবরণ নিম্নে প্রদত্ত হল:

(১) আসমত-১৮৮৬ সালের ১৫ই এপ্রিল তারিখে জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৮৯১ সালে মৃত্যুবরণ করেন।

(২) বশীর আওয়াল-১৮৮৭ সালের ১৭ই আগষ্ট তারিখে জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৮৮৮ সালের ৪ নভেম্বর তারিখে মৃত্যুবরণ করেন।

(৩) হযরত সাহেবজাদা মির্যা বশীরুদ্দীন মাহমুদ আহমদ সাহেব-তিনি ১৮৮৯ সালের ১২ই জানুয়ারী তারিখে জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৯১৪ সালে দ্বিতীয় খলীফাতুল মসীহ্ পদে অভিষিক্ত হন।

(৪) শওকত- তিনি ১৮৯১ সালে জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৮৯২ সালে তার মৃত্যু হয়।

(৫) হযরত সাহেবজাদা মির্যা বশীর আহমদ সাহেব, এম এ- তিনি ১৮৯৩ সালের ২০শে এপ্রিল জন্মগ্রহণ করেন।

(৬) হযরত সাহেবজাদা মীর্যা শরীফ আহমদ সাহেব- তিনি ২৪শে মে ১৮৯৫ সালে জন্মগ্রহণ করেন।[১]

(৭) হযরত সাহেবজাদী নবাব মুবারাকা বেগম সাহেবা– তিনি ১৮৯৭ সালের ২ মার্চ তারিখে জন্মগ্রহণ করেন।

(৮) সাহেবজাদী মির্যা মুবারক আহ্মদ সাহেব– ১৮৯৯ সালের ১৪ই জুন তারিখে জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৯০৭ সালের ১৬ই সেপ্টেম্বর তারিখে মৃত্যু বরণ করেন।

(৯) সাহেবজাদী আমাতুন্ নসীর সাহেবা– ১৯০৩ সালের ২৮শে জানুয়ারি তারিখে জন্মগ্রহণ করেন এবং ওই সালের ৩রা ডিসেম্বর তারিখে তার মৃত্যু হয়।

(১০) হযরত সাহেবজাদী আমাতুল্ হাফীয বেগম সাহেবা –১৯০৪ সালের ২৫শে জুন তারিখে তাঁর জন্ম হয়।

উপরে লিখিত বিবরণ থেকে স্পষ্ট জানা যায় যে, হযরত আকদাসের দ্বিতীয়া বিবি হযরত সৈয়দা নুসরৎ জাহান বেগম সাহেবা রাযি আল্লাহু আনহার গর্ভে তাঁর দশ জন সন্তান জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর মধ্যে পাঁচজনের অল্প বয়সে মৃত্যু হয় এবং অন্য পাঁচ জন খোদা-তাআলার অনুগ্রহে এখন পর্যন্ত জীবিত।[২] এই পাঁচ জন সম্বন্ধে হযরত আকদাস্ বলেছেন :

یہ پانچوں جو کہ نسلِ سیّدہ ہے یہی ہیں پنج تن جن پر بِنا ہے

অর্থাৎ, সৈয়দার গর্ভজাত এই পাঁচ সন্তানই 'পঞ্চতন' ভবিষ্যতের জন্য ভিত্তি স্বরূপ।"

---

(১) তিনি ১৯৬১ সালের ২৬ শে ডিসেম্বর তারিখে মৃত্যুবরণ করেন। ফা-ইন্নালিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজেউন। (অনুবাদ)

(২) অবশ্য, এই পরিবর্তন ঘটেছে যে, সাহেবজাদা মুবারক আহ্মদ সাহেবের স্থান সাহেবজাদী আমাতুল্ হাফীয গ্রহণ করেছেন।

মির্যা আহম্‌দ বেগ সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী :

মির্যা আহম্‌দ বেগ হুসিয়ারপুরী হযরত আকদাসের জনৈক আত্মীয় ছিলেন। তিনি ও তাঁর শ্যালকরা আল্লাহ্ তাআলা এবং রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের কথা নিয়ে হাসি বিদ্রুপ করতেন এবং হযরত আকদাসের কাছে সর্বদা নিদর্শন চাইতেন। হুযুর তাদের সম্বন্ধে আল্লাহ তাআলার কাছে প্রার্থনা করলেন। তখন তাঁকে বলা হল যে, তিনি মীর্যা আহমদ বেগের জ্যেষ্ঠ কন্যা মুহাম্মদী বেগমের সাথে বিয়ের প্রস্তাব করুন। যদি মির্যা আহমদ বেগ এই বিয়ে দেন, তবে তিনি ও তার পরিবার আশিস লাভ করবেন এবং যদি তিনি কন্যার অন্যত্র বিয়ে দেন, তবে আল্লাহ তাআলার বাক্য মিথ্যা প্রতিপন্ন করার চেষ্টার অপরাধে এবং খোদা তাআলার বাক্য ও নিদর্শন নিয়ে হাসি তামাশা করার ফলে তার ওপর আল্লাহ তাআলার শাস্তি অবতীর্ণ হবে। মির্যা আহম্‌দ বেগ ও তার জামাতা উভয়েই তিন বছরের মধ্যে নিপাত হবে এবং মুহাম্মদী বেগম সাহেবা বিধবা হয়ে তাঁর সাথে পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ হবেন।

মির্যা আহমেদ বেগ এই ভবিষ্যদ্বাণীর পর পাঁচ বছর পর্যন্ত মুহাম্মদী বেগমের কোথাও বিয়ে দেন নাই এবং এই সময় পর্যন্ত তিনি জীবিত থাকেন। পাঁচ বছর পরে কন্যার বিয়ের লাহোর জেলাস্থ পাট্টী নিবাসী মির্যা সুলতান মুহাম্মদের সাথে সম্পন্ন করেন। মুহাম্মদী বেগম সাহেবার এই বিয়ের পর ছয় মাস তখনও অতিবাহিত হয় নাই, মির্যা আহ্‌মদ বেগ ভীষণ জ্বরাক্রান্ত হয়ে হুশিয়ারপুর চিকিৎসালয়ে প্রাণত্যাগ করেন।[১] তার প্রাণ বিয়োগে তার জামাতা এবং আত্মীয়রা ভীত হয়ে পড়লেন। কারণ ভবিষ্যদ্বাণী অনুসারে এখন মির্যা সুলতান মুহাম্মদের মৃত্যুর পালা। কিন্তু তারা সবাই অনুশোচনায় মনোনিবেশ করলেন। হযরত আকদাসের খেদমতে দোয়ার জন্য বহু পত্র লিখলেন। ফলে, আল্লাহ-তাআলা মুহাম্মদী বেগম সাহেবার স্বামীর মৃত্যু মুলতবী করলেন।

যদি মুহম্মদী বেগম সাহেবার প্রতি ভবিষ্যদ্বাণী মিথ্যা হওয়ার দাবি করতেন, অথবা হাস্য বিদ্রূপে যোগদান করতেন, তবে নিশ্চয়ই মুহাম্মদী বেগম বিধবা হয়ে হযরত আকদাসের সাথে বিয়ে হতো। কিন্তু তিনি অনুতাপ, অনুশোচনা করায় মৃত্যু হতে রক্ষা পান। এজন্য মুহাম্মদী বেগম সাহেব তাঁর সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হননি। 'ইযা ফাতাশ্ শার্তু, ফাতাল্ মাশরুতু।[২]

---

(১) ১৮৯২ সালের ৩০ শে সেপ্টেম্বর।

(২) বিস্তৃত জানার জন্য দেখুন, 'পেশগুয়ী দরবার মির্যা আহমদ বেগ, কাজী মুহাম্মদ সাহেব লায়েলপূরী প্রণীত।

তৃতীয় অধ্যায়

‘বয়আতের ঘোষণা’ থেকে ‘মসজিদ মোবারকের’ সম্প্রসারণ পর্যন্ত

বয়আতের ঘোষণা :

ইতিপূর্বে আমরা বলেছি মুসলেহ্ মাওউদের জন্মের আগে ও হযরত আকদাসের একপুত্র জন্মগ্রহণ করেন। তিনি প্রথম বশীর নামে খ্যাত। অনেকের ধারণা ছিল যে, এই পুত্রই মূসলেহ্ মাওউদ সংক্রান্ত ভবিষ্যদ্বাণীর পূর্ণতায় জন্মগ্রহণ করেছেন। কিন্তু তার এক বছর তিন মাস বয়সে মৃত্যু হওয়ায় বিরুদ্ধবাদীরা বহু আপত্তিকর প্রশ্ন উত্থাপন করল। তখন খোদা তাআলার অসীম প্রজ্ঞা এই চাইলো যে, হযরত আকদাস এখন দীক্ষা গ্রহণের ঘোষণা করুন। বস্তুত:, তিনি ১৮৮৮ সালের ১ ডিসেম্বর তারিখ প্রথম বশীরের মৃত্যু উপলক্ষে যে ইশতেহার প্রকাশ করেন, এর শেষভাগে “তবলীগ” শিরোনামে লিখলেন :

“আমি এখানে আরও একটি বার্তা সাধারণভাবে সকল মানুষকে এবং বিশেষভাবে মুসলমানদের পৌঁছাচ্ছি। আমাকে আদেশ করা হয়েছে, যাঁরা সত্যের অনুসন্ধান করেন তাঁরা প্রকৃত ঈমান ও ঈমানের প্রকৃত পবিত্রতা এবং ঐশী প্রেমার্জনের পথ শিক্ষার উদ্দেশ্যে এবং পাপী, অলস এবং বিদ্রোহী জীবন পরিত্যাগের জন্য আমার কাছে দীক্ষা (বয়আত) গ্রহণ করবেন। সুতরাং, যাঁরা তাঁদের আত্মার মধ্যে কোন প্রকার শক্তি অনুভব করেন, তাঁদের কর্তব্য তাঁরা আমার কাছে উপস্থিত হন। আমি তাঁদের জন্য চিন্তা করব এবং তাঁদের ভার হাল্কা করার চেষ্টা করবো। যারা মনেপ্রাণে ঐশী শর্তাবলী প্রতিপালন করতে প্রস্তুত থাকবেন, খোদা তাআলা আমার দোয়া এবং আমার মনোনিবেশে তাঁদের জন্য ‘বরকত’ দিবেন। এটা বিশ্ব প্রতিপালকের আদেশ। তা আজ আমি পৌঁছালাম। এ সম্পর্কে আরবিতে এই ইলহাম হয়েছে :

ے إِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللهِ - وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا - اَلَّذِيْنَ
يُبَايِعُوْنَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُوْنَ اللهَ - يَدُ اللهِ فَوْقَ أَيْدِيْهِمْ - وَالسَّلَامُ عَلَى مَنِ اتَّبَعَ

অর্থাৎ, “তুমি যখন সংকল্প কর, তখন আল্লাহ তাআলার ওপর নির্ভর কর। আমাদের সামনে আমাদের ওহী অনুযায়ী নৌকা নির্মাণ কর। (এর আদেশ তোমাকে করা হয়েছে)। যারা তোমার হাতে ‘বয়আত’ (দীক্ষা) গ্রহণ করবে, প্রকৃত পক্ষে তারা খোদা তাআলার হাতে ‘বয়আত’ করবে। আল্লাহ তাআলার

হাত তাদের হাতের ওপর থাকবে এবং যারা হেদায়েত পালন করে, তাদের ওপর শান্তি বর্ষিত হোক। "প্রচারক বিনীত গোলাম আহ্‌মদ আফা আনহু"।

'বয়আতের দশটি শর্তাবলী :

এই ঘোষণা পত্রে দীক্ষা গ্রহণের যে সব শর্তের কথা বলা হয়েছিল, তা হুযুর ১৮৮৯ সালের ১২ জানুয়ারি তারিখে প্রচারিত "তকমীলে-তবলীগ" নামক ইশতেহারে বিশদভাবে প্রকাশ করেন এবং তা এই:

প্রথম : বয়আত গ্রহণকারী সরল অন্ত:করণে এই প্রতিজ্ঞা করবে যে, এখন থেকে কবরে প্রবেশ পর্যন্ত 'শির্‌ক' থেকে দূরে থাকবে।

দ্বিতীয় : মিথ্যা, ব্যভিচার, কামলোলুপ দৃষ্টি, সকল প্রকার পাপাচার, সীমা লংঘন, অত্যাচার, বিশ্বাসঘাতকতা, অশান্তি ও বিদ্রোহের সকল পথ থেকে আত্মরক্ষা করবে এবং প্রবৃত্তির উত্তেজনা যতই প্রবল হোক না কেন, এর শিকারে পরিণত হবে না।

তৃতীয় : বিনা ব্যতিক্রমে খোদা তাআলা এবং রসুলের আদেশ অনুসারে পাঁচ ওয়াক্ত নামায পড়বে এবং সাধ্যানুসারে তাহাজ্জুদ নামায পড়বে, রসূল করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের প্রতি দরূদ পড়বে, প্রত্যহ নিজের গুণাহ গুলোর ক্ষমার জন্য আল্লাহ তাআলার কাছে প্রার্থনা করবে এবং ইস্তেগফার পড়বে, ভক্তিপ্লুত হৃদয়ে খোদা তাআলার অপার অনুগ্রহসমূহ স্মরণ করে তাঁর 'হামদ'ও তারিফ করাকে প্রতিদিনের নিত্যকর্মে পরিণত করবে।

চতুর্থ : সাধারণভাবে সকল প্রকার সৃষ্ট জীবকে এবং বিশেষভাবে মুসলমানগণকে ইন্দ্রিয়ের উত্তেজনা বশে কোন প্রকার অন্যায় কষ্ট দিবে না। মুখে, হাতের দ্বারা, বা অপর কোন উপায়েই নয়।

পঞ্চম : সুখে, দু:খে, কষ্টে, শান্তিতে, সম্পদে, বিপদে সকল অবস্থায় খোদা তাআলার সাথে বিশ্বস্ততা রক্ষা করবে। সকল অবস্থায় আল্লাহ তাআলার কাজে সন্তুষ্ট থাকবে এবং তার পথে যাবতীয় অপমান ও দুঃখ বরণ করতে প্রস্তুত থাকবে। কোন প্রকার বিপদ উপস্থিত হলে পশ্চাদপদ হবে না, বরং সামনে অগ্রসর হবে।

ষষ্ঠ : সামাজিক কদাচার পরিহার করবে এবং প্রবৃত্তির দাসত্ব করবে না। কুরআন শরীফের আধিপত্যকে সম্পূর্ণরূপে শিরোধার্য করবে এবং আল্লাহ ও তাঁর রসুলের বাক্যগুলোকে সকল ক্ষেত্রে অনুসরণ করে চলবে।

সপ্তম : অহঙ্কার ও ঔদ্ধত্য সর্বোতোভাবে পরিহার করবে। দীনতা, বিনয়,

শিষ্টাচার ও গাম্ভীর্যের সাথে জীবনযাত্রা নির্বাহ করবে।

অষ্টম : ধর্ম ও ধর্মের সম্মান রক্ষা এবং ইসলামের সাথে আন্তরিক সমবেদনাকে নিজ ধন, মান, প্রাণ, সম্ভ্রম, সন্তান সন্ততি ও সকল প্রিয়জন অপেক্ষা অধিক প্রিয় জ্ঞান করবে।

নবম : সকল সৃষ্ট জীবের প্রতি সকল সময় শুধু আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে সহানুভূতিশীল থাকবে এবং সকলের উপকারার্থে খোদা প্রদত্ত যাবতীয় শক্তি, সামর্থ্য ও দানগুলো যথাসাধ্য নিয়োজিত করবে।

দশম : ধর্মানুমোদিত সকল কাজে আমার (হযরত আকদাসের) আদেশ পালন করার প্রতিজ্ঞায় আমার সাথে যে ভ্রাতৃবন্ধনে আবদ্ধ হলে, মৃত্যুর শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত তা অটল থাকবে এবং এই ভ্রাতৃবন্ধন সকল প্রকার আত্মীয় সম্পর্ক ও সকল প্রকার প্রভু ভৃত্য সম্বন্ধ থেকে এত অধিক ঘনিষ্ঠ ও পবিত্র হবে যে পৃথিবীতে তার তুলনা পাওয়া যাবে না।

বয়আতের শর্তাবলী ঘোষণায় বিলম্বের কারণ :

বয়আতের শর্তাবলী প্রকাশে বিলম্ব করার কারণ সম্পর্কে হযরত আকদাস বলেন;

"বয়আত গ্রহণকারীর জন্য এই শর্তাবলী অত্যাবশ্যক। ১৮৮৮ সালের ১লা ডিসেম্বরের ইশতেহারে বিস্তারিতভাবে এগুলো লিখিত হয়নি। প্রকাশ থাকে যে, প্রায় দশ মাস ধরে খোদা তাআলার পক্ষ থেকে বয়আতের জন্য আহবান করার আদেশ হয়েছে। কিন্তু তা বিলম্বে প্রকাশ করার কারণ, অধমের অরুচি হচ্ছিল যে ভাল-মন্দ সকল প্রকার লোক না এই সিলসিলায় প্রবেশ করে যায়। অন্তর এটাই চাচ্ছে যে, এই মুবারক সিলসিলায় কেবল ওই সকল মুবারক ব্যক্তি প্রবেশ করুন, যাঁদের প্রকৃতিতে বিশ্বস্ততা রক্ষার বীজ আছে, যাঁরা অপরিপক্ব নয়, যাঁরা সহজেই বিকৃত ও সংশয়াবিষ্ট হয়ে পড়েন না। এই কারণে এমন একটি উপলক্ষের অপেক্ষা করছিলাম, যা ভাল ও মন্দ এবং মুখলেস ও মুনাফেকের মধ্যে প্রভেদ করে দেয়। সুতরাং আল্লাহ্ জাল্লা শানুহু তাঁর প্রজ্ঞা ও অনুগ্রহের দ্বারা সেই উপলক্ষে বশীর আহমদের[১] মৃত্যুকে নির্দিষ্ট করে খাম-খেয়ালি, অপরিপক্ব, সংশয়পরায়ণ এবং কু-ধারণাপন্ন ব্যক্তিদের পৃথক করেছেন। শুধু তাঁরাই আমার সাথে রয়েছেন, যাঁদের প্রকৃতি আমার সাথে থাকার যোগ্য। যারা স্বভাবত: দৃঢ় প্রত্যয়ী নয়, যারা ক্লান্ত, শ্রান্ত, তারা সবাই ধ্বংস হয়েছে এবং নানা

(১) 'বশীর আহমদ' দ্বারা 'প্রথম বশীর' (প্রথম সুসংবাদ বাহক) বুঝায়। ইনি মুসলেহ মাওউদ সংক্রান্ত ভবিষ্যদ্বাণীর পর জন্মগ্রহণ করে ১৮৮৮ সালের ১লা ডিসেম্বর ওফাত প্রাপ্ত হন।

হযরত মির্যা বশীরুদ্দীন মাহমুদ আহমদ
খলীফাতুল মসীহ্ সানী ও মুসলেহ মাওউদ (রা.)

প্রকার সন্দেহ সংশয়ে নিপতিত হয়েছে। সুতরাং, এই জন্য এই উপলক্ষে বয়আতের আহবান সংক্রান্ত বিষয় প্রকাশ সমীচীন বিবেচিত হয়েছে, যেমন :

خس کم جہاں پاک (আবর্জনা যত অল্প বিশ্ব তত পবিত্র) প্রবাদোক্তির ফল দ্বারা লাভবান হতে পারি এবং অবিশ্বাসীদের মন্দ পরিণামের তিক্ততা ভোগ করতে না হয়, এবং যে সকল লোক এই পরীক্ষার অবস্থায় বয়আতের আহবানে সাড়া দিয়ে এই শুভ আন্দোলনে যোগদান করেন, শুধু তাঁরাই আমার 'জামাআত' বিবেচিত হবেন, শুধু তাঁরাই আমার অকৃত্রিম বন্ধুরূপে গণ্য হবেন। তাঁদের সম্বন্ধে খোদা তাআলা আমাকে সম্বোধনপূর্বক বলেছেন যে, তিনি তাদের বিরুদ্ধবাদিদের ওপরে কিয়ামত পর্যন্ত শ্রেষ্ঠত্ব দান করবেন– বরকত, রহমত, আশিস ও কৃপা তাঁর সঙ্গে সঙ্গে বিরাজ করবে। তিনি আমাকে বলেন, "তুমি আমার অনুমতিক্রমে আমার চোখের সামনে এই নৌকা নির্মাণ কর। যাঁরা তোমার কাছে বয়আত করবে, তারা খোদার কাছে বয়আত গ্রহণ করবে। খোদার হাত তাদের হাতের ওপরে থাকবে।" আরও বলেছেনঃ 'খোদা তাআলার সমীপে তোমাদের যাবতীয় শক্তিসহ উপস্থিত হও এবং তোমাদের দয়াময়, দানশীল পালনকর্তাকে একাকী ত্যাগ কোরো না- যে ব্যক্তি তাকে একাকী ছাড়বে, তাকে একাকী ছাড়া হবে।"[১]

সিলসিলার ভিত্তি স্থাপন ও মুসলেহ মাওউদের জন্মগ্রহণ একীভূত হওয়ায় ঐশী-সংকেত :

আশ্চর্যের কথা নয়, বরং এটা খোদা তাআলার অন্যতম হেকমত যে, ১৮৮৯ সালের ১২ জানুয়ারি হযরত মির্যা বশীরুদ্দীন মাহ্‌মুদ আহমদ, আল -মুসলেহুল্‌ মাওউদ জন্মগ্রহণ করেন এবং সেই দিনই হযরত আকদাস 'বয়আতের শর্ত সমূহ' ঘোষণাপূর্বক সিলসিলার ভিত্তি সংস্থাপন করেন এবং আন্তরিকতা সম্পন্ন 'মুখলেস' ব্যক্তিদের বয়আত গ্রহণের জন্য আহবান করেন। প্রকৃত পক্ষে, এই উভয় বিষয়ের সম্মিলনে এই সঙ্কেতই নিহিত ছিল যে, এই সিলসিলার প্রচারের ব্যাপারে হযরত মির্যা বশীরুদ্দীন মাহমুদ আহমদ আইয়্যেদাহুল্লাহু তাআলার বিশেষ অধিকার থাকবে।

বস্তুত:, ঘটনাবলির দ্বারাও অত্যন্ত স্পষ্টাক্ষরে এই সাক্ষ্য পাওয়া যায় যে, এই কথা সত্য ছিল। সত্য হবে না কেন? নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম আগমনকারী মসীহের জন্য ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন: يَتَزَوَّجُ وَيُولَدُ لَهُ

(১) ইশতেহার, ১৮৮৯ সালের ১২ জানুয়ারি।

অর্থাৎ "তিনি একজন উচ্চ গুণবতী মহিলাকে বিয়ে করবেন এবং তাঁর সন্তানরা গুরুত্বপূর্ণ ধর্ম কার্য সম্পাদন করবেন।"

স্মরণ রাখতে হবে, এখানে শুধু কোন সাধারণ স্ত্রীলোকের সাথে বিয়ে, কোন সাধারণ সন্তান জন্ম গ্রহণের প্রতি ইঙ্গিত ছিল না। কারণ, এর উল্লেখ দ্বারা কোন উপকার হওয়ার চিন্তা করা যায় না। বিশেষতঃ, রসূল করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের মত মহানবী এই ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন এবং হযরত আকদাসের প্রত্যেক সন্তান জন্মগ্রহণের আগে তার বৈশিষ্ট্যপূর্ণ গুণরাজি সর্বসাধারণ্যে ঘোষণা করেছেন এবং এক পুত্রকে বিশেষ সুসংবাদের বাহন নির্দেশ করে বারবার তাঁর প্রশংসা ও গুণ প্রকাশ করেছেন।[১] এ সব ব্যাপার একত্রে এটাই নির্দেশনা করে যে, মসীহ মাওউদের সন্তানরা ধর্ম প্রচারে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ কাজ সম্পাদন করবেন। বস্তুত: তাঁরা তাই করছেন। সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ তাআলার।

লুধিয়ানা ও হুশিয়ারপুরের সফর :

হযরত আকদাস ১৮৮৯ সালের শুরুতে লুধিয়ানা যাত্রা করেন এবং একটি ইশতেহারের মাধ্যমে ঘোষণা করেন:

"আজ ১৮৮৯ সালের ৪ মার্চ থেকে ২৫ শে মার্চ পর্যন্ত এই অধম লুধিয়ানা শহরে অবস্থান করবে। এই সময়ের মধ্য যদি কেউ আসতে চান, তবে লুধিয়ানায় ১০ তারিখের পর উপস্থিত হবেন এবং যদি এখানে আসা ক্ষতি বা কষ্টকর মনে করেন, তবে ২৫শে মার্চের পর যখন কেউ চান কাদিয়ানে আগে সংবাদ দিয়ে 'বয়আত' গ্রহণের জন্য উপস্থিত হবেন।"[২]

প্রথম বয়আত গ্রহণ, ২৩ শে মার্চ, ১৮৮৯ সাল :

লুধিয়ানায় বয়আত নেয়ার জন্য তিনি হযরত মুনশি সুফি আহমদ জান রাযি আল্লাহু আনহুর বাড়ি পছন্দ করেন। হযরত মুনশি সাহেব মরহুম একজন অত্যন্ত পবিত্রচিত্ত মুত্তাকী পুরুষ ছিলেন। সেই অঞ্চলে তাঁর শত শত মুরীদ ছিল। তারা তাঁর প্রতি প্রগাঢ় ভক্তি পোষণ করতেন। হযরত আকদাসের মশহুর কিতাব

---

(১) হুযুর বলেন;

"এক কাশ্‌ফী জগতে আমাকে চারটি ফল দেখানো হয়। তারমধ্যে তিনটি আম ফল ছিল। কিন্তু একটি ফল সবুজ বর্ণ এবং অত্যন্ত বৃহদাকার ছিল। তা এই জগতের ফল গুলোর ন্যায় ছিল না........কোন সন্দেহ নাই যে, ফল দ্বারা সন্তান বুঝায়।" -হযরত খলীফাতুল মসীহ আওওয়াল রাযিআল্লাহ আনহুর নামে ১৮৮৬ সালের ৮ই জুনের পত্র।

(২) পাদটীকা, ইশতেহার তাং ৪ঠা মার্চ, ১৮৮৯ সাল।

'বারাহীনে-আহমদীয়া পাঠের পর তিনি মনেপ্রাণে হযরত আকদাসের 'ফিদাহ' হয়ে পড়েন এবং নিজ পীর মুরীদীর সিলসিলা পরিত্যাগ করে হুযুরের কাছে বয়আত গ্রহণের আগ্রহ প্রকাশ করেন। বস্তুত:, তিনি হযরত সাহেবকে লক্ষ্য করে এই কবিতা পাঠ করেন।

ہم مریضوں کی ہے تمہیں پہ نظر   تم مسیحا بنو خدا کے لیے

"আমরা ব্যধিগ্রস্থ– আমাদের দৃষ্টি শুধু তোমার ওপর নিবদ্ধ। খোদার উদ্দেশ্যে তুমি মসীহ হও।"

তখন হযরত আকদাস তাকে এই উত্তর প্রদান করেন যে, তিনি এখনও 'বয়আত' গ্রহণের জন্য আদিষ্ট হননি। কিন্তু হযরত আকদাস যখন বয়আত নেয়ার ঘোষণা করলেন, তখন হযরত মুনশি সাহেব এই ধরাধম ত্যাগ করেছেন। 'ফা-ইন্না লিল্লাহ ও ইন্না ইলাইহে রাজেউন'।[১] হযরত মাওলানা হাকীম নূরুদ্দীন সাহেব রাযি আল্লাহু আনহুর সাথে কন্যা সুগরা বেগম সাহেবার বিয়ে হযরত আকদাস বিশেষ চেষ্টা করে করিয়েছিলেন।

"দারুল বয়আত"

হযরত মুনশি সুফি আহমদ জান সাহেব মরহুমের বাড়ির যে ঘরে হযরত আকদাস সর্বপ্রথম 'বয়আত' গ্রহণ করেন,তা দারুল-বয়আত" নামে অভিহিত হয়। হযরত মুনশি সাহেব মরহুমের সন্তানগণ খোদার ফযলে সবাই আহমদীয়তে যোগ দান করেছেন। তাঁরা এই বাড়ি সিলসিলার জন্য ওয়াকফ করেন। দু:খের বিষয়, তা ১৯৪৭ সালের মহাবিপ্লবের সময় সাময়িকভাবে জামাআতের হস্তচ্যুত হয়েছে। কিন্তু আল্লাহ্ চান তো শীঘ্রই ফেরৎ পাওয়া যাবে।

"বয়আতের দিন"

১৮৮৯ সালে ২৩ মার্চ তারিখে 'বয়আত' শুরু হয়। হযরত আকদাসের ইচ্ছা ছিল বয়আত গ্রহণকারীদের নাম ও সম্পূর্ণ ঠিকানা একটি রেজিষ্টারে সংরক্ষণ করা। এজন্য হযরত আকদাস আদেশ করলেন, প্রত্যেক দীক্ষা গ্রহণকারী আপন আপন নাম–ঠিকানা পৃথক পৃথক কাগজে লিখে দেবেন। হুযুরের হুকুম প্রতিপালিত হল। কিছুদিন পরে, একটি রেজিষ্টার প্রস্তুত হলো। এর ওপরে লেখা হয়েছিল অর্থাৎ "তাকওয়া ও পবিত্রতা লাভার্থে বয়আত।"

بیعت توبہ برائے حصول تقویٰ و طہارت

(১) হযরত আকদাস তাকে বয়আত গ্রহণকারীদের মধ্যে গণনা করেছেন এবং ৩১৩ জন সাহাবার মধ্যে তাকে গণ্য করেছেন। 'বয়আতের রেজিষ্টার' এবং 'আঞ্জামে আথম' দ্রষ্টব্য।

বয়আত গ্রহণকারীদের ক্রমিক নম্বর :

এই রেজিষ্ট্রারে প্রথম কিছু নাম হযরত আকদাস নিজ হাতে লিপিবদ্ধ করেন। কিন্তু পরে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ব্যক্তি উল্লেখিত কাগজ খন্ডগুলো থেকে নিয়ে এই রেজিষ্ট্রারে নাম লিখতে থাকেন। খন্ড কাগজগুলো থেকে নামগুলো লিখতে হয়েছিল বলে বয়আত গ্রহণকারীদের বয়আতের ক্রম রক্ষা সম্ভব হয়নি। এজন্যই প্রকৃত ক্রমিক নম্বর সম্পর্কে সামান্য মতভেদ ঘটে। যা হোক কোনই সন্দেহ নাই যে, সর্বপ্রথম বয়আত গ্রহণ করেন হযরত হাজী-উল হারামাঈন মাওলানা হাকিম নূরুদ্দীন সাহেব ভেরুবী রাযি আল্লাহু আনহু। দ্বিতীয় নম্বরে ছিলেন লুধিয়ানার মীর আব্বাস আলী সাহেব। পরে তিনি হযরত আকদাসের 'মসীহ্ মাওঊদ' দাবির সময় পৃথক হয়ে গিয়েছিলেন। তারপর যাঁরা বয়আত গ্রহণ করেন, তাদের মধ্যে প্রসিদ্ধ ব্যক্তিবর্গের নাম বিনাক্রমে নিম্নে প্রদত্ত হল:

হযরত মিঞা মুহাম্মদ হুসেন সাহেব মুরাদাবাদী খুশ্‌নবীশ, হযরত মৌলবী আবদুল্লাহ্ সনৌরী সাহেব, হযরত কাজী খাজা আলী সাহেব, হযরত মীর এনায়েত আলী সাহেব, চৌধুরী রুস্তম আলী সাহেব, হযরত মৌলবী আবদুল্লাহ সাহেব সাকিন তঙ্গী (চারসদাহ), হযরত মুনশি আরোড়ে খাঁ সাহেব, হযরত মুনশি মুহাম্মদ খাঁ সাহেব, হযরত মুন্‌শি হাবিবুর রহমান সাহেব, হযরত কাজী যিয়াউদ্দীন সাহেব, হযরত শেখ আবদুল আযীয সাহেব নও-মুসলিম সাবেক রাম সিংহ– রেয্‌ওয়ানুল্লাহে আলাইহিম আজ্‌মায়ীন।

হযরত মৌলবী আবদুল করীম সাহেব সেই দিন বয়আত গ্রহণ করেছিলেন কিনা, এ বিষয়ে মতভেদ আছে। কিন্তু হযরত শেখ ইয়াকুব আলী সাহেব তুরাবের মতে হযরত মৌলবী সাহেব প্রথম দিনই বয়আত গ্রহণ করেন। শেখ সাহেব তাঁর নিজের সম্বন্ধেও বলতেন যে, তিনি প্রথম দিন বয়আত না করলেও ওই সময়ই বয়আত গ্রহণ করেন। এই সামান্য বিলম্বের কারণ ছিল তিনি তখনও হযরত আকদাসের 'মসিলে মসীহ' হওয়া সম্পূর্ণ হৃদয়ঙ্গম করতে পারেননি। এই জন্যে 'ফতেহ ইসলাম' কিতাব পাঠ করে তিনি লাহোরে পুনরায় বয়আত গ্রহণ করেন।

দু:খের বিষয়, মূল রেজিষ্ট্রার যা হযরত সাহেবজাদা মির্যা বশীর আহমদ রাজিআল্লাহু আনহুর কাছে রক্ষিত ছিল, এর যে পৃষ্ঠায় প্রথম আট নাম সন্নিবিষ্ট ছিল, তা নষ্ট হয়েছে। নতুবা বয়আত গ্রহণকারীদের ক্রমিক নম্বর সংক্রান্ত ইতিহাস আরও কতকটা সংরক্ষিত হত।

বয়আতের শব্দাবলী :

হযরত মৌলবী আবদুল্লাহ্ সনৌরী সাহেব বলেন, প্রথম দিন যখন হুযুর বয়আত

নেন, তখন বয়আত এর শব্দগুলো এই ছিলঃ

“আজ আমি আহমদের হাতে আমার ওই সব তাবৎ গুনাহ্ ও কু-অভ্যাস থেকে তাওবা করছি, যার মধ্যে আমি নিপতিত ছিলাম। আমি পবিত্র হৃদয় ও সর্বান্ত:করণে দৃঢ়রূপে প্রতিজ্ঞা করছি যে, আমার সকল শক্তি ও সকল বুদ্ধি দিয়ে আমার জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত যাবতীয় গুনাহ থেকে আত্মরক্ষা করব। আমি দ্বীনকে দুনিয়ার আরাম এবং প্রবৃত্তির কামনা-বাসনার ওপর অগ্রগণ্য রাখবো। ১২ই জানুয়ারীর দশ শর্ত যথাসাধ্য পালন করব এবং এখনও আমার পূর্ববর্তী গুনাহ্ গুলির জন্য খোদা-তাআলার কাছে ক্ষমা চাচ্ছি।”

أَسْتَغْفِرُ اللهَ رَبِّيْ۔ أَسْتَغْفِرُ اللهَ رَبِّيْ۔ أَسْتَغْفِرُ اللهَ رَبِّيْ مِنْ كُلِّ ذَنْبٍ وَّأَتُوْبُ إِلَيْهِ۔ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ۔ رَبِّ إِنِّيْ ظَلَمْتُ نَفْسِيْ وَاعْتَرَفْتُ بِذَنْبِيْ فَاغْفِرْ لِيْ ذُنُوْبِيْ فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ إِلَّا أَنْتَ۔

আলীগড় সফর :

১৮৮৯ সালের মার্চের শেষ পর্যন্ত হুযুর লুধিয়ানায় অবস্থান করেন। এপ্রিলের শুরুতে সৈয়দ তাফায্যুল হুসায়েন সাহেব (সেরেশ্তাদার কালেক্টরেট, আলীগড়) নিমন্ত্রণ করায় হুযুর আলীগড় যাত্রা করেন। আলীগড়ে একটি আশ্চর্য ঘটনা ঘটে। সেখানকার মৌলবী মুহাম্মদ ইসমাঈল সাহেব তাঁকে ওয়ায করার জন্য আবেদন জানালেন। হুযুর সন্তুষ্ট চিত্তে তা কবুল করলেন। কিন্তু পরে খোদা তাআলার পক্ষ থেকে ইলহামের মাধ্যমে তাঁকে নিষেধ করা হল। এতে মৌলবী ইসমাঈল সাহেব হুযুরের বিরুদ্ধে প্রচারণার সুযোগ পেলেন। তিনি জুমুআর পর তাঁর বিরুদ্ধে একটি বক্তৃতা করলেন এবং বক্তৃতা ইশতেহার আকারে মুদ্রিত করে বিতরণ করলেন। হযরত আকদাস তাঁর প্রশ্ন গুলোর প্রত্যুত্তর ‘ফতেহ ইসলাম’ কিতাবে প্রদান করলেন। তা দেখবার জিনিস। যা হোক, ঐশী বাধার

(১) ‘সিরতুল-মাহদী,’ প্রথম খন্ড ৯৮ নং রেওয়ায়েত।
আরবি অংশের অনুবাদ :

“আমি আমার প্রভু আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাচ্ছি। আমি আমার প্রভূ আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাচ্ছি। আমি আমার যাবতীয় পাপের ক্ষমা আমার প্রভু আল্লাহর কাছে চাচ্ছি। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ব্যতীত কোন উপাস্য নাই, তিনি এক, তাঁর কোন অংশীদার নাই এবং আমি আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি যে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাহম তাঁর বান্দা ও রসূল। প্রভু, আমি আমার প্রাণের ওপর অত্যাচার করেছি আমার পাপ স্বীকার করছি। আমার পাপ ক্ষমা কর। কারণ তুমি ব্যতীত পাপের ক্ষমাকারী আর কেউ নেই। (অনুবাদক)

মোকাবিলায় মৌলবী মুহাম্মদ ইসমাঈল সাহেব এবং অন্যান্য ব্যক্তির উপহাসকে তিনি কিছুই মনে করলেন না। তিনি বক্তৃতা করা অস্বীকার করলেন। মৌলবী মোহাম্মদ ইসমাঈল সাহেব যে ইশতেহার প্রকাশ করেন, এতে হযরত আকদাসের বিরুদ্ধে জ্যোতিষ শাস্ত্র ব্যবহারের অভিযোগ এনে বলা হল, যে তিনি জ্যোতিষী যন্ত্রপাতি ব্যবহারের মাধ্যমে ভবিষ্যদ্বাণী করে থাকেন এবং এটাকেই তিনি 'ইলহাম' বলে প্রকাশ করেন। তার এই অপবাদ খণ্ডনের উদ্দেশ্যে হযরত আকদাস 'ফতেহ ইসলাম' কিতাবে 'মুবাহালার' (প্রার্থনা যুদ্ধের) আয়াত উপস্থিত করেন। মৌলবী ইসমাঈল সাহেব তখন একটি পুস্তক রচনা করছিলেন। সেই পুস্তকেই তিনি এই 'মুবাহালা' মঞ্জুর করলেন। কিন্তু সেই পুস্তক প্রণয়ন সমাপ্ত হওয়ার পূর্বেই মৌলবী সাহেব মৃত্যুবরণ করলেন এবং ভবিষ্যতে আগমনকারিদের জন্য একটি নিদর্শন রেখে গেলেন।[১]

লুধিয়ানা প্রত্যাগমন :

প্রায় এক সপ্তাহ আলীগড় অবস্থানের পর হযরত আকদাস লুধিয়ানা যাত্রা করেন এবং কয়েক দিন অবস্থানের পর ১৮৮৯ সালের এপ্রিলের দ্বিতীয় সপ্তাহের শুরুতে কাদিয়ানে ফিরে যান। ১৮৮৯ সালের অক্টোবর মাসে হযরত উম্মুল মুমেনীনের ওয়ালেদা সাহেবা অসুস্থ হওয়ায় তাঁকে সেখানে দেখার জন্য লুধিয়ানায় যাত্রা করেন। তাঁর শ্বশুর হযরত মীর নাসের নওয়াব সাহেব ওই সময়ে লুধিয়ানাতেই চাকরি উপলক্ষে অবস্থান করছিলেন। অত:পর সেখান থেকে ১৮৮৯ সালের ১২ই নভেম্বর তারিখে কাদিয়ানে ফিরে আসেন।

হযরত সাহেবজাদা পীর সিরাজুল হক সাহেব নু'মানীর বয়আত ২৩ শে ডিসেম্বর, ১৮৮৯ :

হযরত পীর সিরাজুল হক নু'মানী জামালী সাহেব চাহার কুতুব হানসবীর বংশধর ছিলেন। তিনি নিজেও লোকের দীক্ষা গ্রহণ করতেন এবং 'সাহেব-এ-ইরশাদ' ছিলেন। তিনি হযরত আকদাসের সত্যতা শুরুতেই উপলব্ধি করেছিলেন। কিন্তু লুধিয়ানায় বয়আত না করে কাদিয়ানের 'মসজিদ মুবারকে' বয়আত নেয়া পছন্দ করছিলেন বলে তিনি কাদিয়ান আসেন এবং ১৮৮৯ সালের ২৩শে ডিসেম্বর তারিখে কাদিয়ানের 'মসজিদ মুবারকে' বয়আত গ্রহণ করেন।[২]

---

(১) 'হায়াতে আহমদ,' তৃতীয় খণ্ড, ৩৬ পৃ; ।
(২) 'হায়াতে আহমদ,' তৃতীয় খণ্ড, ৪১ পৃ; ।

হযরত নবাব মুহাম্মদ আলী খাঁ সাহেবের বয়আত, ১৯ শে নভেম্বর, ১৮৯০ :

হযরত নবাব মুহাম্মদ আলী খাঁ সাহেব মলিরকোটলার নবাব পরিবারের একজন প্রধান ব্যক্তি। তিনি 'তফযিলী শিয়া' ছিলেন। অর্থাৎ হযরত আলীকে প্রথম তিন খলিফার চেয়ে শ্রেষ্ঠতর মনে করতেন। তিনিও এই সময়েই বয়আত করেন। একটি রিয়াসত বা সামন্ত রাজ পরিবারে প্রতিপালিত, তদুপরি শিয়া মতাবলম্বী হওয়া সত্ত্বেও জগদ্বাসীর তিরস্কারের কোনই পরোয়া না করে হযরত আকদাসের আনুগত্যকারী হওয়া আল্লাহ তাআলার একটি বিশেষ অনুগ্রহ ছিল। এটা তাঁর পবিত্রতা ও ধর্মশীলতার পরিচায়ক।

নবাব সাহেব ১৮৯০ সালের শুরুতে কাদিয়ানে আসেন। ১৮৯০ সালের সেপ্টেম্বর ও অক্টোবরে লুধিয়ানায় গিয়ে হযরত আকদাসের সাথে সাক্ষাত করেন। তারপর, ১৮৯০ সালের ১৯ নভেম্বর চিঠির মাধ্যমে হযরত আকদাসের কাছে বয়আত করে সিলসিলায় যোগদান করেন। 'ফাল-হামদু লিল্লাহে আ'লা যালেকা'। বয়আত-এর রেজিষ্ট্রারে তাঁর বয়আতের ক্রমিক নম্বর ২১০ বটে।

'মসীহ মাওউদ' দাবি, ১৮৯০ সালের শেষাংশে :

১৮৯০ সালের শেষদিকে আল্লাহ তাআলা হযরত আকদাসের কাছে প্রকাশ করলেন, আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম যে মসীহ ইবনে মরিয়মের আগমন সংবাদ প্রদান করেন, সেই প্রতিশ্রুত মসীহ তিনিই, অর্থাৎ হযরত আকদাস। প্রথম মসীহ আকাশে জড় দেহসহ কিছুতেই জীবিত নেই। তিনি অন্য নবীদের ন্যায় ওফাত প্রাপ্ত হয়েছেন। যদিও ইতিপূর্বেও কোন কোন ইলহাম এবং সুসংবাদের মাধ্যমে তাঁকে মসীহ মাওউদ বা প্রতিশ্রুত মসীহ নির্দেশ করা হয়েছিল, কিন্তু যে পর্যন্ত তাঁর কাছে বিষয়টি পরিস্কার হয়নি, তিনি তাঁর পুরাতন বিশ্বাসে স্থির ছিলেন এবং সাধারণ মুসলমানের মত হযরত মসীহ নাসেরী দেহসহ আকাশে আছেন বলে মনে করতেন এবং এটাই বিশ্বাস করতেন। কিন্তু যখন প্রকৃত বিষয় তাঁর কাছে উদঘাটিত হল, তখন তা প্রকাশ করতে সামান্য সময়ও দেরি করেননি।

'ফতেহ্ ইসলাম' ও 'তৌযিহে মরাম' প্রকাশ :

মসীহিয়তের দাবি ঘোষণার্থে তিনি 'ফতেহ ইসলাম' নামে একটি সংক্ষিপ্ত পুস্তিকা প্রকাশ করেন। এর টাইটেল পেজে এই ইলহামী ছত্র চারটি লিখিত আছে :

کیا شک ہے ماننے میں تمہیں اس مسیح کے جس کی مماثلت کو خُدا نے بتا دیا
حاذق طبیب پاتے ہیں تم سے یہی خطاب خوبوں کو بھی تو تُم نے مسیحا بنا دیا

অর্থাৎ, "এই মসীহকে মানতে তোমাদের সংশয় কি? তার সাদৃশ্য খোদা তাআলা জানিয়েছেন। বিচক্ষণ চিকিৎসক তোমাদের কাছে এই উপাধিই লাভ করেন। তোমরা ভাল লোকদেরকে মসীহ্ বলেছ।"

এই পুস্তিকা এবং এমন আরও একটি কিতাব, 'তৌযিহে মরাম' ১৮৯০ সালের শেষদিকে লেখা হয় এবং ১৮৯১ সালের প্রথম তিন মাসের মধ্যেই প্রকাশিত হয়। এই পুস্তিকাগুলো প্রকাশ হওয়া মাত্র বিরুদ্ধাচরণের আগুন জ্বলে উঠলো।

শত্রু শিবিরে মৌলবী মুহাম্মদ হুসায়েন সাহেব বাটালবী :

মৌলবী মুহাম্মদ হুসায়েন সাহেব বাটালবী তাঁর বিখ্যাত কিতাব 'ইশাআতুস-সূন্নাহ-তে হযরত আকদাসের বিশ্ব-বিশ্রুত কিতাব 'বারহীনে আহমদীয়া' সম্বন্ধে একটি অতিশয় দীর্ঘ সমালোচনা লিখে তাঁর মহান আধ্যাত্মিক মর্যাদা স্বীকার করেছিলেন। তিনিও তাঁর বিরুদ্ধে প্রবন্ধের পর প্রবন্ধ প্রকাশ শুরু করলেন। লুধিয়ানার মৌলবী আবদুল আযীয এবং মৌলবী মুহাম্মদ প্রভৃতি দীর্ঘদিন ধরে হযরত আকদাসের সাথে শত্রুতা পোষণ করছিলেন এবং তাঁর বিরুদ্ধে সর্বদাই প্রশ্ন করতেন। কিন্তু মৌলবী মুহাম্মদ হুসায়েন বাটালবীর আত্মরক্ষামূলক আক্রমণ গুলোর কারণে নতি স্বীকার করে থাকতেন। এখন তারাও সুযোগ লাভ করলেন। তারাও খোলাখুলিভাবে বিরুদ্ধাচরণ শুরু করলেন। যখন 'ফতেহ ইসলাম' পুস্তিকা অমৃতসরের 'রিয়াযে হীন্দ' নামে একটি প্রেসে মুদ্রিত হচ্ছিল, মৌলবী মুহাম্মদ হুসায়েন সাহেব হযরত আকদাসের মসীহিয়তের দাবি তখনই অবগত হয়েছিলেন। তিনি কোন উপায়ে পুস্তিকাটির প্রুফ হস্তগত করে দর্শন করেন এবং তৎক্ষণাৎ তাঁর পত্রিকা 'ইশাআতুস্ সুন্নাহ-তে' হযরত আকদাসকে সম্বোধন করে লিখলেন :

"এখন আমি আপনার কাছে জানতে চাই, এই দাবির মাধ্যমে আপনার এটাই বলা উদ্দেশ্য যে প্রতিশ্রুত মসীহ সেই মরিয়ম পুত্র নন, কিয়ামতের আগে যার আসার কথা কুরআন ও হাদীসে ওয়াদা করা হয়েছে এবং তিনি কি আপনিই? এর প্রত্যুত্তর শুধু 'হাঁ' বা 'না' দ্বারা করবেন।[১]"

(১) ইশাআতুস-সুন্নাহ' দ্বাদশ খন্ড, দ্বাদশ সংখ্যা, ৩৫৪ পৃঃ। নোটঃ কোন কোন জীবনী লেখক লিখেছেন যে, হযরত আকদাস 'ফতেহ ইসলামের আগে একটি ইশতেহার ও প্রকাশ করেন। যা তাঁর দাবির ঘোষণা পত্র স্বরূপ ছিল। 'ওল্লাহু আ'লামু বিস-সাওয়াব।'

মৌলবী সাহেবের এই প্রশ্নের উত্তরে হযরত আকদাস লিখলেন :

“আপনার প্রশ্নের জবাব, শুধু ‘হাঁ’ যথেষ্ট মনে করি।[১]”

হুযুরের এই জবাবের পর পুনরায় রীতিমত পত্রালাপ শুরু হল। কোথায় মৌলবী সাহেবের সেই অবস্থা, যখন হযরত আকদাসের জুতা বহন গৌরবের বিষয় মনে করতেন এবং কোথায় এখনকার অবস্থা যে তাঁর অপেক্ষা অধিক বিরুদ্ধাচারণকারী আর কেউ ছিল না।

মৌলবী মুহাম্মদ হুসায়েন সাহেবের ‘মুনাযারার’ আকাঙ্ক্ষা :

১৮৯১ সালের ফেব্রুয়ারির শেষে বা মার্চের প্রথমে হযরত আকদাস লুধিয়ানা অবিরত চলছিলেন। মৌলবী সাহেব তাঁর সাথে ‘মুনাযারা’ বা তর্ক-যুদ্ধ করতে চাইলেন। হযরত আকদাস তা পছন্দ করেনি। কারণ হুযুরের মতে ‘মুনাযারা’ দ্বারা তেমন ফল লাভ সম্ভবপর ছিল না। কিন্তু হয়তো উপস্থিত জনসাধারণের মধ্যে কারও উপকার হতে পারে ভেবে তিনি এই শর্তে ‘মুনাযারা’ মঞ্জুর করলেন যে, ‘লিখিত মুনাযারা ’ হওয়া চাই। কারণ মৌখিক কথায় অবশেষে অশান্তির সৃষ্টি হয়। একটি শর্ত হুযুর এটাও নির্ধারণ করলেন :

“এই বাহাসের সভায় ওই সব ইলহাম প্রাপ্তির দাবিদারদের উপস্থিত হতে হবে, যারা তাদের ইলহামের মাধ্যমে এই অধমকে ‘জাহান্নামী’ সাব্যস্ত করেছেন এবং এমন ‘কাফের’ বলে নির্ধারণ করেছেন যে সাধারণত হেদায়েত পেতে পারে না। তারা ‘মুবাহালা’ (প্রার্থনা যুদ্ধ) চেয়েছেন। ইলহাম অনুযায়ী মিয়াঁ আবদুর রহমান লেক্ষুকেওয়ালা আমাকে ‘কাফের ও মুলহাদ’ প্রতিপন্ন করেছেন এবং মিয়াঁ আবদুল হক গজনবী ‘জাহান্নামী ’ নিরূপণ করেছেন। মৌলবী আবদুল জাব্বার তাদের ইলহাম তসদিকও অনুসরণ করেন। সুতরাং, তাঁদের তিনজনেরই সভাস্থলে উপস্থিত থাকা অত্যাবশ্যক, যাতে ‘মুবাহালা’ সম্বন্ধেও মিমাংসা একই সঙ্গে হয়ে যায়।[২]

হযরত আকদাসের চিঠির এই উদ্ধৃতি থেকে জানা যায় যে, অমৃতসরের গজনবীর দলও হুযুরের ভীষণ বিরোধিতায় অবতীর্ণ হয়েছিল এবং মোকাবেলা করার জন্য প্রস্তুত ছিল। এর ফলে, মৌলবী মুহাম্মদ হুসায়েন সাহেবের সাথে হুযুরের পত্রালাপ দীর্ঘ হতে থাকে। ঐসব পত্র থেকে কিছু কথা পাঠক-পাঠিকার উপকারার্থে উল্লেখ করা হল।

---

(১) মৌলবী মুহাম্মদ হুসায়েন বাটালবীর নামে হযরত আকদাসের পত্র, তাং ৫ই ফেব্রুয়ারি, ১৮৯১, সাল। (‘হায়াতে আহমদ’ তৃতীয় জেল্‌দ, ৬১পৃঃ)।

(২) মৌলবী মুহাম্মদ হুসায়েন বাটালবী নামীয় পত্র তাং ৮ইং মার্চ, ১৮৯১ সাল।

পত্রালাপের কিছু কথাবার্তা :

মৌলবী মোহাম্মদ হুসায়েন বাটালবী সাহেব আপত্তি স্বরূপ তাঁর একটি পত্রে 'বারাহীনে আহমদীয়ায়' হযরত আকদাসের লিখিত ওই উক্তিও উপস্থিত করেন, যেখানে মুসলমানদের কথা ও প্রচলিত ধর্ম বিশ্বাস অনুসারে তিনি লিখেছিলেন যে, হযরত মসীহ যখন পুনর্বার পৃথিবীতে আগমন করবেন, তখন তাঁর হাতে ইসলাম ধর্ম সর্বত্র বিস্তার লাভ করবে। এর জবাব হযরত সাহেব অত্যন্ত বিস্তৃত ভাবে প্রদান করেন। এর সারমর্ম হুযুরের নিজ কথায় প্রদত্ত হল :

"এই অধম খোদা তাআলা থেকে ইলহাম প্রাপ্ত হয়ে 'বারাহীনে-আহমদীয়ায় 'ইবনে-মরীয়ম' এর প্রতিশ্রুত বা অপ্রতিশ্রুত হওয়া সম্বন্ধে কোন কিছুই উল্লেখ করিনি। শুধু একটা প্রচলিত আকিদা স্বরূপে আলোচিত হয়েছিল। আপনি এখানে তা উপস্থিত করায় কোনই ফল হবে না।"

"আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামও কোন কোন কাজ ওহী নাযেল না হওয়া পর্যন্ত বনী ইস্রায়িলের নবীদের মশ্‌হুর প্রচলিত নিয়মানুযায়ী চলতেন এবং ওহী পাওয়ার পর যখন নিষেধ করা হত, তখন তা পরিত্যাগ করতেন। তা একজন শিশুও বুঝতে পারে। আপনার মত বিজ্ঞ ব্যাক্তি বুঝবেন না কেন"[১]

"মৌলবী মুহাম্মদ হুসায়েন সাহেব চাচ্ছিলেন মুনাযারায় তাঁর দাবির সমর্থন এবং মসীহের মৃত্যু প্রতিপন্ন করার জন্য হযরত আকদাস প্রথমে যুক্তি লিপিবদ্ধ করবেন। কিন্তু হযরত আকদাসের যুক্তির ভিত্তি ছিল :

"আমি 'ফতেহ ইসলাম' তৌযিহে মরাম" দ্বারা এবং 'কাওলে ফসীহ"[২] পত্রিকায় 'ইযালায় আওহামের' যে অংশ প্রকাশিত হয়েছে তার মাধ্যমেও আমার দাবি উত্তমভাবে বর্ণনা করেছি এবং সেই দাবি এই যে আমি ইল্‌হামের ভিত্তি মূলে 'মসীলে-মসীহ' (মসীহের অনুরূপ) হওয়ার দাবি করি এবং সঙ্গে সঙ্গে একথাও বলি যে হযরত মসীহ ইব্‌নে মরিয়ম বস্তুতঃ পরলোকগমন করেছেন।

"সুতরাং, এই অধমের 'মসীলে-মসীহ' হওয়া আপনি 'ইশা-আতুস্ সুন্নাহতে সম্ভবপর বলে স্বীকার করেছেন। আমি সত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত হয়ে থাকলে আল্লাহ্ জাল্লা-শানুহু আমার সাহায্য করবেন এবং তাঁর শক্তিশালী আক্রমণসমূহ দ্বারা আমার সত্যতা প্রকাশিত করবেন।

"বাকি থাকলো 'ইবনে মরিয়ম' হওয়া। মৃত্যুর প্রমাণ লেখার কোন দায়িত্ব

---

(১) হযরত আকদাসের পত্র, তাং ১৪ই মার্চ, বনাম মৌলবী মুহম্মদ হুসায়েন সাহেব বাটালবী।

(২) এই সাময়িক পত্রটি শিয়ালকোট থেকে মুনশি গোলাম কাদের সাহেবের সম্পাদনায় প্রকাশিত হতো।

আমার ওপর নেই। কারণ, আমি এমন কোন দাবি করিনি, যা খোদা তাআলার চিরাচরিত নিয়মের বিরোধী। ধারাবাহিকভাবে হযরত আদম থেকে শুরু করে এই নিয়মই প্রচলিত আছে যে, যে জন্মগ্রহণ করে অবশেষে একদিন যৌবনে বা প্রৌঢ়ে তার মৃত্যু হয়। আল্লাহ্ জাল্লা-শানুহু বলেন :

وَمِنْكُمْ مَّنْ يُّتَوَفّٰى وَمِنْكُمْ مَّنْ يُّرَدُّ اِلٰٓى اَرْذَلِ الْعُمُرِ لِكَيْلَا يَعْلَمَ مِنْۢ بَعْدِ عِلْمٍ شَيْـًٔا۔[1]

"সুতরাং, যখন আমার কর্তব্যই নয় যে, আমি মসীহের মৃত্যুর দলিল দেই, তখন তা আপনার কর্তব্য যে আপনি আমার বর্ণনা মিথ্যা প্রতিপন্ন করবার জন্য প্রথমে কলম ধরেন এবং কুরআন ও আ-হাদীস থেকে প্রমাণিত করুন যে সবাই ইহলোক পরিত্যাগ করে যায় এবং আমাদের নবী করীম (সা.)ও ওফাত লাভ করেছেন। কিন্তু মসীহর এখন পর্যন্তও ওফাত পেতে বাকি আছেন। কোন মুনাযারাকারীকে জিজ্ঞাসা করুন যে মুনাযারার নিয়ম কি?

"এখন এটাও স্মরণ রাখবেন, আপনার অন্যান্য তর্কও মসীহের স্বশরীরে উত্তোলিত হওয়ারই শাখা প্রশাখা মাত্র। যদি আপনি তা প্রমাণ করে দেন যে, মসীহ জীবিতাবস্থায় জড়-দেহ নিয়ে আকাশের দিকে উত্তোলিত হয়েছিলেন, তা হলে আপনি সব কিছুই প্রমাণ করলেন। সুতরাং প্রথমে লেখা আপনার দায়িত্ব। যদি এখনও আপনি স্বীকার না করেন, তবে অন্য জাতি থেকে কিছু ব্যক্তিকে মীমাংসাকারী মেনে দেখুন। যদি আপনি এখনও স্বীকার না করেন, তবে অন্য জাতি থেকে কিছু ব্যক্তিকে মিমাংসাকারী মেনে দেখুন।

"অবশেষে একটি উপমাও শুনুন। জায়েদ নিরুদ্দেশ। তার নিরুদ্দেশের পর দুই শ' বছর পার হয়ে গেছে। খালেদ ও অলিদের মধ্যে তার জীবন এবং মৃত্যু নিয়ে বিবাদ চলল। খালেদকে এক সংবাদদাতা সংবাদ দিল যে, প্রকৃতপক্ষে জায়েদের মৃত্যু হয়েছে। কিন্তু অলিদ এই সংবাদ অস্বীকার করে। এখন আপনার অভিমত কি? প্রমাণের ভার কার ওপর? খালেদকে কি তার দাবি অনুযায়ী জায়েদের মৃত্যু প্রমাণ করতে হবে, অথবা এখন পর্যন্ত জীবিত থাকা অলিদ সাব্যস্ত করবে? বিধি কি?"[২]

---

(১) অর্থাৎ, "তোমাদের মধ্যে কেউ কেউ প্রাপ্ত বয়সে প্রাণত্যাগ করে এবং তোমাদের কেউ কেউ অত্যাধিক বার্ধক্যে পৌঁছে, যাতে বহু কিছু জ্ঞান লাভ করার পর সম্পূর্ণ জ্ঞানহারা হয়ে পড়ে।" 'সুরা হজ', আয়েত ৬ (অনুবাদক)

(২) 'হায়াতে-আহমদ,' তৃতীয় খণ্ড, ৭৯ পৃঃ।

মৌলবী মুহাম্মদ হুসেনের সাথে পত্র আদান-প্রদান বন্ধ :

যখন হযরত আকদাস, দেখতে পেলেন মৌলবী সাহেব অপ্রয়োজনীয় পত্রালাপ ও লাফ-ঝাঁপ ছাড়া কোন যুক্তিসঙ্গত কথার দিকে আসেন না, তখন ১৮৯১ সালের এপ্রিল মাসের শেষে নিম্নলিখিত পত্রের মাধ্যমে তাঁর সাথে ভবিষ্যৎ চিঠিপত্রের আদান প্রদান বন্ধ করলেন।

"বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহীম। নাহ্‌মাদুহু ওয়ানুসাল্লি আলা রাসুলিহিল করীম। প্রিয় ভাই মৌলবী সাহেব সাল্লামাহু,

আসসালামু আলাইকুম ও রাহ্‌মাতুল্লাহে ও বারাকাতুহু।
আপনার অনুগ্রহলিপি পৌঁছেছে। এই অধম কোন নতুন কথা দেখছি না, যার জবাব লেখা প্রয়োজন। এই অধমের দাবির ভিত্তি ইল্‌হাম। যদি আপনি প্রমাণ করতে পারতেন যে কুরআন ও হাদিস এই দাবির বিরোধী-তারপর যদি এই অধম আপনার দলিলগুলো তার লেখনী দ্বারা খণ্ডন করতে না পারত, তবে উপস্থিত সকল ব্যক্তির কাছে আপনি সত্যবাদী হতেন এবং আপনার কথামত অধম এই ইল্‌হাম হতে তওবা করত। যাহোক, এখন আপনি 'এযালায়ে-আওহাম' পুস্তকের প্রতিবাদ লিখতে শুরু করুন। মানুষ আপনিই দেখে নিবে। 'ওয়াসসালাম'। খাকসার-গোলাম আহ্‌মদ আফা আন্‌হু।"[১]

মৌলবী মুহাম্মদ হুসায়েনের ছদ্মনামে ছদ্মাবরণ :

যখন মৌলবী মুহাম্মদ হুসায়েন সাহেব দেখতে পেলেন তাঁর অযৌক্তিকতার ফলে হযরত আকদাস মির্যা সাহেব পত্র আদান-প্রদান বন্ধ করেছেন। তখন তিনি লুধিয়ানার জনৈক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি মৌলবী মুহাম্মদ হাসান সাহেবকে ছদ্মাবরণে ব্যবহার করতে চাইলেন। পত্র নিজেই লিখতেন। কিন্তু মৌলবী মুহাম্মদ হাসান সাহেব লিখেছেন বলে প্রকাশ করবার জন্য তাঁর দস্তখত গ্রহণ করতেন। যদিও হযরত আকদাস প্রকৃত ব্যাপার অবহিত ছিলেন, তবু এসব পত্রের জবাব না দেয়া পছন্দ করেননি। সুতরাং, প্রকারন্তরে চিঠিপত্র আদান-প্রদান চলতে লাগল। কিন্তু আলোচনার বিষয়বস্তু একই ছিল, যা আগে বর্ণিত হয়েছে। এজন্য ওই সব চিঠিপত্রের আলোচনা অনাবশ্যক।

---

(১) ১৮৯১ সালের ২০ শে এপ্রিল তারিখে মৌলবী মুহাম্মদ হুসায়েন সাহেব বাটালবীর নামীয় হযরত আকদাসের পত্র। ('হায়াতে আহ্‌মদ', তৃতীয় খণ্ড, ৭৮-৭৯ পৃ:)।

একটি জরুরি বিজ্ঞপ্তি :

হযরত আকদাস যখন দেখতে পেলেন মৌলবী সাহেব মুনাযারার জন্য আহ্বান করেন কিন্তু সামনে উপস্থিত হন না, পক্ষান্তরে জনসাধারণের মধ্যে প্রচারণা দ্বারা তাদেরকে তাঁর বিরুদ্ধে উত্তেজিত করছেন, তখন তিনি "জরুরী ইশতেহার" শীর্ষ দিয়ে সমগ্র উলামা সম্প্রদায় ও জনসাধারণের ওপর চূড়ান্ত যুক্তির প্রাধান্য উপস্থাপনের মানসে একটি ইশতেহার প্রকাশ করলেন। এর সারমর্ম এই :

"উলামাগণ আমার বিরুদ্ধে এই অভিযোগ করেন আমি 'ফেরেশতাহ', 'লাইলাতুল-কদর' এবং 'মসীহর মুজেযা' সমূহ অস্বীকার করি। তাঁরা কেন একটি প্রকাশ্য জনসভায় আমার সাথে লিখিত মুনাযারা করেন না? তাহলে তো সর্বসাধারণের কাছে সত্য প্রকাশ হয়ে যায়"।

এই ইশতেহারের শেষাংশে হুযুর লিখলেন :

"আমি উচ্চ:স্বরে বলছি আমার কাছে খোদা তাআলা তাঁর ইল্হাম ও ইল্কা দ্বারা সত্য প্রকাশ করেছেন। আমার কাছে যে সত্য প্রকাশিত হয়েছে তা এই, প্রকৃতপক্ষে হযরত মসীহ ইবনে মরীয়ম ওফাত প্রাপ্ত হয়েছেন এবং তাঁর রুহ তাঁর মসীহ পুত্র ইয়াহ্ইয়ার আত্মার সঙ্গে দ্বিতীয় আসমানে আছে। এই জামানার জন্য রুহানীভাবে যে মসীহের আসবার কথা ছিল–যাঁর সংবাদ সত্য হাদিস সমূহে বর্ণিত আছে, তিনি আমি। এটা খোদা তাআলার কাজ। লোকের চোখে তা আশ্চর্যজনক ও ঘৃণিত বলে পরিদৃষ্ট হয়। আমি পরিস্কার লিখছি, আমার দাবি শুধু ইল্হামের ওপরই প্রতিষ্ঠিত নয় বরং সমগ্র কুরআন শরীফ এর সমর্থন করে। সব সহীহ্ হাদিস এর সত্যতার সাক্ষী। খোদা-প্রদত্ত বুদ্ধিবৃত্তিও এরই সমর্থন করে। যদি মৌলবী সাহেবানের কাছে বিরুদ্ধ শরীয়তি দলিল মজুদ থাকে, তবে তাঁরা প্রকাশ্য জনসভায় উপরে বর্ণিত উপায়ে আমার সাথে মিমাংসা করুন। নিঃসন্দেহে সত্যেরই জয় হবে। বারবার বলি যে, আমি সত্যের ওপর আছি। যখন মৌলবী সাহেবগণ বলেন যে, এই দাবি কুরআন ও হাদিসের বিরোধী, তখন তাঁরা পূর্ণ নির্বুদ্ধিতার পরিচয় দেন।

"মহোদয়গণ, আল্লাহ জাল্লা শানুহু আপনাদের হৃদয়কে ঈমানের জ্যোতি: দ্বারা আলোকিত করুন। এই দাবি কখনও আল্লাহ্র এবং তার রসুলের বাক্যের বিরোধী নয়। আপনাদের বুদ্ধি বিপর্যয় ঘটেছে। যদি আপনারা সভা ডেকে স্থান ও তারিখ ঠিক করে একটি প্রকাশ্য জনসভায় আমার সাথে লিখিত বাহাস না করেন, তবে আপনারা খোদা তাআলার কাছে এবং সত্যপরায়ণ ব্যক্তিদের কাছেও বিরুদ্ধবাদী প্রতিপন্ন হবেন। এটাই সমীচীন যে আমার সাথে সামনে বসে লিখিতভাবে বাহাস না করা পর্যন্ত জনসাধারণকে বিপথগামী করার কাজ

থেকে এবং বিরুদ্ধ মত প্রকাশ করা থেকে মুখ বন্ধ রাখুন। ভয় করুন খোদা তাআলার এই সম্মানিত আয়াতকে : وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ [১]

অন্যথায়, এই সব কার্যকলাপ লজ্জা, ঈমান, খোদার ভয় এবং ন্যায়পরায়ণতার বিরোধী বলে গণ্য হবে। প্রকাশ থাকে যে এই ইশতেহারে সর্বজনীনভাবে সকল মৌলবী সাহেবানকেই সম্বোধন করা হচ্ছে যারা বিরুদ্ধ মত প্রকাশ করেছেন। বিশেষত: তাদের সবার নেতৃবর্গ, – অর্থাৎ মৌলবী আবু সায়ীদ মুহাম্মদ হুসায়েন সাহেব বাটালবী, মৌলবী রশিদ আহ্মদ গাঙ্গোহী, মৌলবী আবদুল জাব্বার সাহেব গজনবী, মৌলবী আব্দুর রহমান সাহেব লেক্ষুকেওয়ালা, মৌলবী শায়খ্ উবায়দুল্লাহ্ সাহেব তিব্বতী, মৌলবী আব্দুল আযীয সাহেব লুধিয়ানবী মায় ভাইরা এবং মৌলবী গোলাম দস্তগীর কসৌরী আমার সম্বোধনের লক্ষ্যস্থল।[২]

মৌলবী মুহাম্মদ হাসানের সাথেও পত্র আদান-প্রদান বন্ধ :

আমরা উপরে বলেছি মৌলবী মুহাম্মদ হুসায়েন সাহেবের পর মৌলবী মোহাম্মদ হাসানের সাথে পত্রালাপ শুরু হয়। কিন্তু এর অন্তরালেও মৌলবী মুহাম্মদ হুসায়েনই কাজ করছিলেন। তার জন্য এসব পত্র আদান-প্রদানের ফলে কোনই মিমাংসা হল না। এই পত্র ব্যবহারও ১৮৯১ সালের ১৩ই জুন বন্ধ করা হল। কিন্তু জনসাধারণের মধ্যে মুনাযারা শোনার ও দেখার তীব্র আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ পাচ্ছিল এবং হযরত আকদাসও চাচ্ছিলেন কোন প্রকারে 'মসীহের মৃত্যু' এবং 'প্রতিশ্রুত মসীহের' বিষয় নিয়ে তর্ক হোক।

লুধিয়ানায় মুবাহাসার কারণ :

এর জন্য আল্লাহ তাআলা এমন উপকরণ সৃষ্টি করলেন যে, ফলে মৌলবী মুহাম্মদ হুসায়েন সাহেব বাটালবী মুবাহাসা করতে বাধ্য হলেন। তা এই প্রকারে হল, ১৩ই জুন মৌলবী মুহাম্মদ হাসানের সাথে পারস্পরিক পত্র বিনিময় বন্ধ হলে হযরত আকদাস ১৮৯১ সালের জুলাইর প্রথম ভাগে অমৃতসরের কোন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি আগ্রহ করায় সেখানে যান। অমৃতসরের আহলে-হাদিস দু'টি দলে বিভক্ত হয়েছিল। এক দলের নেতা ছিলেন মৌলবী আহমদুল্লাহ সাহেব।[৩]

(১) "তোমার যে বিষয়ের কোন জ্ঞান নেই, তার পশ্চাতে ছুটিও না।" 'সূরা বনি ইসরাঈল,' ৩৭ আয়াত। (অনুবাদক)

(২) ২৬ শে মার্চ ১৮৯১ সালের 'জরুরী ইশ্তেহার' হলে উদ্ধৃত (হায়াতে-আহম্মদ, তৃতীয় খন্ড, ৮৪-৯০ পৃ:।)

(৩) 'মৌলবী আহমদুল্লাহ' সাহেব মৌলবী মুহাম্মদ হুসায়েন সাহেব বাটালবীর ছাত্র এবং ও মৌলবী সানাউল্লাহ্ অমৃতসরীর শিক্ষক ছিলেন।

অন্য দলের নেতা ছিলেন গজনবীগণ। হযরত আকদাস ১৮৯১ সালের ৭ই জুলাই, মৌলবী আহ্মদুল্লাহ্ সাহেবকে শান্তি রক্ষার শর্তে লিখিত মুনাযারার জন্য আহবান করেন। মৌলবী সাহেব এতে অগ্রসর হলেন না। ফলে, মৌলবী আহ্মদুল্লাহ্ সাহেবের দলের কিছু ব্যক্তি হযরত আকদাসের কাছে বয়আত গ্রহণ করে সিলসিলায় দাখেল হলেন। তাঁদের মধ্যে হযরত মৌলবী মুহাম্মদ ইস্মাঈল সাহেব, হযরত মিয়াঁ নবী বখ্শ বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই মহোদয়গণ সিল্সিলায় যোগদান করায় মৌলবী মুহাম্মদ হুসায়েন সাহেব মুবাহাসা করতে বাধ্য হলেন।

লুধিয়ানার মুবাহাসা :

হযরত আকদাস অমৃতসর থেকে লুধিয়ানা যান । ১৮৯১ সালের ২০ জুলাই, হযরত আকদাসের বাসস্থানেই মুবাহাসা শুরু হল। এই মুবাহাসায় হযরত মৌলবী আবদুল করীম সাহেব এবং মুনশি গোলাম কাদের সাহেব ফসীহ্ শিয়ালকোটসহ কপুরথলা এবং লুধিয়ানা জেলার জামা'ত গুলোর বন্ধুগণ বিশেষভাবে যোগদান করেছিলেন।

হযরত পীর সিরাজুল হক নোমানী সাহেবের বিবৃতি :

হযরত পীর সিরাজুল হক সাহেব নো'মানী রাযি আল্লাহ আনহু এই মুবাহাসার নিম্ন প্রদত্ত বিবরণ লিপিবদ্ধ করেছেন:

"আমি হযরত আকদাসের লিখিত মযমুন সঙ্গে সঙ্গে নকল করে যেতাম। যখন মৌলবী মুহাম্মদ হুসায়েন সাহেব বাটালবী, মৌলবী মুহাম্মদ হাসান সাহেব, সাআ'দুল্লাহ নও মুসলিম এবং আরও পাঁচ-সাত ব্যক্তি সমভিব্যবহারে হযরতের বাসায় আগমন করলেন, তখন তিনি একটি প্রশ্ন লিখে হযরত আকদাসের সামনে রাখলেন। হযরত আকদাস এর উত্তর লিখে দিলেন এবং আমাকে কয়েকটি কলম প্রস্তুত করে তাঁর পাশে রেখে দেয়ার জন্য বললেন এবং আদেশ দিলেন যে, তিনি যা লেখেন সঙ্গে সঙ্গে আমি যেন তার নকল করে যাই। সুতরাং, আমি প্রতিলিপি প্রস্তুত করতে লাগলাম এবং তিনি লিখতে লাগলেন। যখন সেদিনকার প্রশ্ন ও উত্তর লেখা হয়ে গেল, তখন মৌলবী মুহাম্মদ হুসায়েন সাহেব অঙ্গীকার ভঙ্গ করে মৌখিক ওয়াজ শুরু করলেন। তিনি বললেন যে, মির্যা সাহেবের মতে কুরআন করীম হাদিসের ওপর অগ্রগণ্য, এই বিশ্বাস করতে হবে। কুরআন শরীফ সংক্রান্ত বিষয় সমূহ হাদিসের দ্বারা উদঘাটিত হয় এবং এটাই মিমাংসা। মৌলবী সাহেবের বক্তৃতার এটাই সারমর্ম ছিল। অত:পর, হযরত আকদাস আলাইহেস

সালাম বললেন, 'পূর্বে এই চুক্তি সম্পাদিত হয় যে, মৌখিক বক্তৃতা কেউ করবে না। মৌলবী সাহেব এই চুক্তিভঙ্গ পূর্বক বক্তৃতা করেছেন। সুতরাং, আমারও কিছু মৌখিক বক্তৃতা করার অধিকার জেগেছে। তারপর, হযরত আকদাস আলাইহেস সালাম বললেন: 'মৌলবী সাহেবের এই ধর্মমত কোনভাবেই শুদ্ধ নয় যে, হাদিস কুরআন শরীফের ওপর অগ্রগণ্য। কুরআন শরীফ পঠনীয় ওহী। সমগ্র কুরআন শরীফ রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের সময়ে একত্রে সংরক্ষণ করা হয় এবং তা ছিল আল্লাহর কালাম। হাদিস সম্পর্কে এই ধরনের কোন ব্যবস্থা অবলম্বিত হয়নি এবং আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের সময়ে লিপিবদ্ধ হয়নি। কুরআন শরীফের যে মর্যাদা ও স্থান তা হাদিসের নেই। কারণ এগুলো 'রেওয়ায়েত দর-রেওয়ায়েত'- একজনের বিবৃতি পুনরায় অন্যজন দ্বারা বর্ণিত হয়ে সংগৃহীত হয়েছে। পক্ষান্তরে, যদি কেউ হাদিস সম্বন্ধে এমন কসম করে যে, কুরআন শরীফের প্রতি অক্ষরই 'কালামে-এলাহী' এবং যদি তা আল্লাহর কালাম না হয়ে থাকে, তবে তার 'স্ত্রী তালাক,' তবে শরীয়ত অনুসারে তার স্ত্রীর ওপর তালাক বর্তিবে না। পক্ষান্তরে, যদি কেউ হাদিস সম্বন্ধে কসমপূর্বক বলে, হাদিসের প্রতি শব্দ ও অক্ষর রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের মুখ নি:সৃত বাণী, যদি তা না হয়, তার স্ত্রী তালাক, তবে নি:সন্দেহে তার স্ত্রীর ওপর তালাক বর্তিবে। হযরত আকদাস আলাইহেস সালামের বক্তৃতার এই ছিল সারমর্ম। বক্তৃতা এবং লিখিত প্রবন্ধ পাঠ করে উল্লেখিত বিবৃতি হযরত আকদাস আলাইহেস সালাম যখন শুনাচ্ছিলেন, তখন চর্তুদিক থেকে শুধু 'উত্তম' 'উত্তম' 'সুবাহানাল্লাহ' 'সুবহানাল্লাহ, ধ্বনি উত্থিত হচ্ছিল। এমন হতো যে, কেবলমাত্র সাআ'দুল্লাহ্ ও মৌলবী সাহেব ব্যতীত তাঁদের পক্ষের ব্যক্তিরা অজ্ঞাতসারে 'সুবহানাল্লাহ্' বলতেন। দু' তিন জন ব্যক্তি বললেন, তাদের ধারণা ছিল মির্যা সাহেব বক্তৃতা করতে পারেন না বলে মৌখিক বাহাস না করে লিখিত বাহাস করেন। কিন্তু আজ তারা জানতে পারলেন যে মির্যা সাহেব অতি উত্তম বক্তৃতাও করতে পারেন এবং লিখিত বক্তব্য পছন্দ করার কারণ বক্তৃতার অক্ষমতা নয়, বরং এর কারণ যাতে লেখার দ্বারা সত্যমিথ্যার মধ্যে ভাল মিমাংসা হয় এবং সবাই সম্পূর্ণভাবে সত্য ও মিথ্যার মধ্যে পার্থক্য উপলব্ধি করতে পারেন এবং উপস্থিত ও অনুপস্থিত সবার কাছে সত্য মিথ্যা পুরোপুরি প্রকাশিত হয়। মৌলবী সাহেব এতে অসন্তুষ্ট হয়ে বললেন 'তোমরা শুনতে এসেছো না, 'বাহবা', 'বাহবা' এবং সুবহানাল্লাহ্ বলতে এসেছো?' উভয় পক্ষের লিখিত বক্তব্যগুলো মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়েছে। তা লেখার প্রয়োজন নেই।[১]

---

(১) এই মুবাহাসা 'আল্-হক্কে লুধিয়ানা' নামে প্রকাশিত হয়।

“এই মুবাহাসায় হযরত আকদাস আলাইহেস্ সালাম হাদিস এবং কুরআন শরীফের সম্বন্ধ সম্পর্কে চূড়ান্ত আলোচনা করেন এবং ভবিষ্যতের জন্য যাবতীয় তর্কের অবসান করেন। ছয়-সাত দিন পর্যন্ত এই মুবাহাসা হযরত আকদাস আলাইহেস্ সালামের অবস্থানালয়ে অনুষ্ঠিত হল। মৌলবী সাহেব্ তখন কোন ভাবে অব্যাহতি লাভের জন্য ব্যস্ত হলেন এবং এই বাহানার অবতারণা করলেন যে, ‘এত দিন তাঁর বাড়িতে মুবাহাসা হয়েছে, এখন তার অর্থাৎ মৌলবী মুহাম্মদ হাসানের বাড়িতে মুবাহাসা হওয়া উচিত।’ হযরত আকদাস আলায়হেস্ সালাম তা মঞ্জুর করলেন। অবশিষ্ট কয়েক দিনব্যাপী মৌলবী মুহাম্মদ হাসানের বাড়িতেই মুবাহাসা হল। হযরত আকদাস আলায়হেস সালাম সেখানে যাওয়ার সময় আমি উপস্থিত থাকতাম। না হয়, তিনি আমাকে ডেকে নিতেন এবং আমি না আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করতেন। পরিণাম এই দাঁড়ালো যে মৌলবী মুহাম্মদ হুসায়েন সাহেব বহু চালাকি করলেন। কোন চাতুরিই টিকলো না। তবু একটি প্রবন্ধ তিনি অপহরণ করেন। মুবাহাসায় এ বরাত ছিল ।

মৌলবী মুহাম্মদ হাসানের বাড়িতে মাত্র দু’ চার জন লোক হত। তের দিন পর্যন্ত এই মুবাহাসা চলছিল। লোকজন অত্যন্ত ধৈর্যচ্যুত হয়ে পড়লো। চারদিক থেকে পত্র আসতে লাগল। খাস লুধিয়ানার অধিবাসীরা গোলমাল শুরু করলো। উল্লেখিত নীতি নিয়ে মুবাহাসা আর কত কাল চলবে? মসীহের জীবন বা মৃত্যু তর্কের মূল বিষয়বস্তু নির্ধারিত হয়েছিল। ওই বিষয়ে মুবাহাসা হওয়া চাই। নীতি সম্পর্কিত এই বিবাদে মৌলবী সাহেব ধ্বংস হোন। এদিকে হযরত আকদাস আলাইহেস সালামও বার বার বলছিলেন, মুবাহাসা মসীহ কি জীবিত না মৃত এই বিষয়ে হওয়া অত্যাবশ্যক, যাতে এক সঙ্গে সব বিষয়েরই মিমাংসা হয়ে যায়। কিন্তু মৌলবী সাহেব এই মূল বিষয়ের দিকে কোন মতেই আসলেন না। মৌলবী সাহেবের কাছে মসীহের জীবন সম্বন্ধে দলিল ছিল না। এই জন্য তিনি কেবলই এড়াতে চাইলেন। যাই হোক, তের দিন মুবাহাসা হলো। শেষ দিন খ্রিষ্টান, মুসলমান, হিন্দু ইত্যাদি সম্প্রদায়ের বহু লোকের সমাগম হল। হযরত আকদাস আলাইহেস সালাম লিখিত বক্তব্য পাঠের আগে বললেন, এই মুবাহাসা দীর্ঘ হয়ে পড়েছে। এখন এর কোনই প্রয়োজন নেই। মসীহ কি জীবিত–না মৃত, এই মূল বিষয় বহাল হওয়া সমীচীন। কিন্তু মৌলবী সাহেব, কোন ক্রমেই স্বীকার করলেন না। তাঁর হাতে হযরত ঈসা আলাইহেস সালাম জীবিত থাকার কোন প্রমাণ ছিল না। হযরত আকদাস আলাইহেস সালাম বক্তব্য পাঠ শুরু করলে মৌলবী সাহেবের চেহারা কালো হয়ে পড়লো। তিনি এমন ব্যাকুল-চিত্ত ও শঙ্কিত হয়ে পড়লেন যে, তাঁর বুদ্ধি লোপ পেল। নোট করার জন্য তিনি কলম নিয়ে কয়েকবার মাটির ওপর আঘাত করতে লাগলেন। দোয়াত যেখানে ছিল, সেখানে

থাকলো মাটির উপর কয়েক বার আঘাত করায় কলম ভেঙ্গে গেল। যখন এই হাদিস শুনতে পেলেন যে, রসুল করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম বলেছেন যে হাদিস কুরআনের বিরোধী তা পরিত্যাগ করতে হবে এবং কুরআনকে গ্রহণ করতে হবে, তখন মৌলবী সাহেব অতিশয় ক্রোধান্বিত হয়ে বলতে লাগলেন এই হাদিস বুখারীতে নেই। এই হাদিস বুখারীতে থাকলে মৌলবী সাহেবের 'উভয় বিবিরই তালাক'। এই 'তালাক' শব্দ শুনে উপস্থিত জনতা হেসে উঠল। মৌলবী সাহেবের লজ্জার সীমা থাকলো না। অত:পর, কয়েক দিন ধরে মৌলবী সাহেব লোকদের কাছে বলতে লাগলেন, না না তার দু' বিবির ওপর 'তালাক' বর্তেনি এবং তিনি তালাক' শব্দ উচ্চারণ করেননি। তখন দশ-বিশ জন বা শ' দুই শ' লোক যা জানতো, এখন মৌলবী সাহেব সহস্র সহস্র ব্যক্তিকে তা জানালেন। মৌলবী সাহেব ক্রোধান্ধ হয়ে, খোদা জানেন, মুখ থেকে কত কি নিঃসৃত করছিলেন।"[১]

এ মুবাহাসা ১৮৯১ সালের ২০শে জুলাই হতে ৩১শে জুলাই পর্যন্ত বার ধরেদিন হয়েছিল। হযরত আকদাস আলাইহেস্ সাল্লাম 'এযায়–আওহামের' শেষাংশে এই মুবাহাসার অমূল বৃত্তান্ত প্রকাশ করেন। এই মুবাহাসা 'আল–হক্কে লূধিয়ানা' নামে স্বতন্ত্র কিতাবরূপেও প্রকাশিত হয়।

মৌলবী মুহাম্মদ হুসায়েন সাহেবের ক্রোধান্ধ উত্তেজনা ও লুধিয়ানা ডেপুটি কমিশনারের নির্দেশ :

মৌলবী মুহাম্মদ হুসায়েন সাহেব যখন মুবাহাসা দ্বারা কিছু করতে পারলেন না, তখন তিনি ক্রোধের বশবর্তী হয়ে উত্তেজনামূলক ক্রিয়াকলাপ শুরু করলেন। এতে শহরের শান্তি বিঘ্নিত হওয়ার আশঙ্কা হল। লুধিয়ানার ডেপুটি কমিশনার মৌলবী সাহেবের এই সব কাজ-কর্মের রিপোর্ট পেয়ে মৌলবী সাহেবকে শহর পরিত্যাগের আদেশ প্রদান করলেন। তিনি লাহোর চলে গেলেন। হযরত আকদাস মনে করলেন, হতে পারে, উভয় পক্ষ থেকেই লুধিয়ানা পরিত্যাগের আদেশ হয়েছে। এজন্য প্রকৃত বিষয় অবগত হওয়ার জন্য ৫ই আগষ্ট লুধিয়ানার ডেপুটি কমিশনারকে একটি পত্র লিখলেন। ৬ই আগষ্ট ডেপুটি কমিশনারের কাছ থেকে হযরত আকদাসের পত্রের উত্তর আসল:[২]

"মি: ডব্লিউ চোট্স বাহাদুর ডেপুটি কমিশনার লুধিয়ানার বাংলো থেকে মীর্যা গোলাম আহমদ, চীফ অফ্ কাদিয়ান। সালামত। গতকালের আপনার পত্র

(১) 'তাযকেরাতুল্-মাহদী', সিরাজুল হক সাহেবনু'মানী প্রণীত।

(২) 'হায়াতে-আহ্মদ', তৃতীয় খন্ড, ১০৯-১১০পৃ:।

পেয়ে, দেখে ও শুনে লিখতে হচ্ছে যে, সরকারি আইন মোতাবেক আপনার লুধিয়ানা থাকার ওই সমস্ত অধিকারই রয়েছে, যেমন ইংরেজ সরকারের আইন মান্যকারী অপর সাধারণের আছে।" তাং ৬ই আগষ্ট, ১৮৯১ সাল।

(দস্তখত, ডেপুটি কমিশনার বাহাদুর)

মৌলবী নিযামুদ্দিন সাহেবের বয়আত :

মুবাহাসার পর দিন একটি আশ্চর্যজনক ঘটনা ঘটলো। মৌলবী নিযামুদ্দিন সাহেব একজন কুরআনভক্ত মৌলবী ছিলেন। তিনি ২/৪ জন আরও লোকের সাথে মৌলবী মোহাম্মদ হুসায়েন সাহেবকে বললেন "কুরআন মজীদে কি হযরত ঈসা আলাইহেস্ সালামের জীবিত থাকার সম্বন্ধে কোন আয়াত নেই? " মৌলবী সাহেব বললেন, "হ্যাঁ, বিশটি আয়াত কুরআন মজীদে বিদ্যমান আছে। মৌলবী সাহেবের এই জবাব শুনে মৌলবী নিযামুদ্দিন সাহেব হযরত আকদাসের খিদমতে উপস্থিত হয়ে বললেন, 'মীর্যা সাহেব, আপনার কাছে হযরত মসীহের মৃত্যুর দলিল আছে কি ?" হযরত আকদাস বললেন, "যদি কুরআন মজীদ থেকে বিশটি আয়াত বের করে দেখাতে পারি, তবে?" হুযুর বললেন, "মৌলবী সাহেব, আপনি একটি আয়াতই নিয়ে আসুন। আমার জন্য এটাই যথেষ্ট।" মৌলবী নিযামুদ্দিন সাহেব বললেন, "দেখবেন, ঠিক থাকবেন। আমি বিশটি আয়াত দিচ্ছি।" এই বলে মৌলবী নিযামুদ্দিন সাহেব মৌলবী মুহাম্মদ হুসায়েন সাহেব বাটালবীর কাছে গিয়ে বললেন. "মৌলবী সাহেব, আমি মির্যা সাহেব থেকে স্বীকৃতি নিয়ে এসেছি। আমি তাঁকে বলেছিলাম যে, আমি "বিশটি আয়াত" বের করে নিয়ে আসছি। কিন্তু তিনি কেবল এতটুকুই বললেন যে, শুধু একটি আয়াতই যেন নিয়ে উপস্থিত করি। এখন আপনি মসীহ জীবিত থাকা সম্বন্ধে আয়াতগুলো বের করে দিন। আমি এখনই মির্যা সাহেবের কাছে গিয়ে তাকে তওবা করিয়ে আসব।" শ্রোতাগণ মৌলবী সাহেবের এই সাফল্যের কথা শুনে বড়ই প্রীত হলেন। কিন্তু মৌলবী মুহাম্মদ হুসায়েন সাহেব অগ্নিশর্ম হয়ে বললেন, "তুই মির্যাকে পরাজিত করে আসিস নাই। আমাদের লজ্জিত করেছিস। বহু দিন থেকে মির্যাকে হাদিসের দিকে আনার চেষ্টা করছি এবং তিনি আমাকে কুরআর শরীফের দিকে টানছেন। কুরআন শরীফে মসীহ জীবিত থাকা সম্বন্ধে কোন আয়াত থাকলে, আমি কবেই উপস্থিত করতাম। এই জন্যেই আমি হাদিসের ওপর জোর দিয়ে থাকি। কুরআন শরীফ দ্বারা আমরা 'সজীব' হতে পারিন না। কুরআন শরীফ তো মির্যার দাবিকে 'তাজা' করে।"

'তায্ কিরাতুল-মাহদী' প্রণেতা পীর সিরাজুল হক সাহেব নু'মান লিখেন, তিনি আল্লাহ জাল্লা শানুহুর সাক্ষী করে বলেছেন, "মৌলবী মুহাম্মদ হুসায়েন বাটালবী

এই কথাগুলো বলেছিলেন এবং এতে বিন্দুমাত্র মিথ্যার অংশ নেই।” যা হোক, মৌলবী মুহাম্মদ হুসায়েন সাহেবের এই কথাগুলো শুনে নিযামুদ্দিন সাহেবের চোখ খুলে। তিনি বললেন :

“কুরআন শরীফ তোমার সঙ্গে নেই। তবে এত বড় দাবি করেছিলে কেন? এখন আমি কোন্ মুখে মির্যা সাহেবের কাছে যাব? যদি কুরআন শরীফ তোমার সঙ্গী নয় এবং তোমাকে সঙ্গ না দেয়, বরং মির্যা সাহেবের সাথী এবং তার সহায়তা করে, তবে আমি তোমার সঙ্গ করতে পারি না। এমতাবস্থায়, আমি মির্যার সঙ্গী হব। এটা পার্থিব বিষয় নয়। ধর্মের ব্যাপার। যে দিকে কুরআন শরীফ, সে দিকে আমি।” এতে মৌলবী মুহম্মদ হুসায়েন সাহেব বাটালবী তাঁর সঙ্গের মৌলবী সাহেবের দিকে তাকিয়ে বললেন “মৌলবী সাহেব, নিযামুদ্দিন নির্বোধ। তাকে আবু হুরায়রাহ্‌র আয়াত বের করে দেখিয়ে দিন।” মৌলবী নিযামুদ্দিন সাহেব বললেন, আবু হুরায়রাহ্‌র আয়াতের আমার প্রয়োজন নেই। আমি শুধু আল্লাহ তাআলার আয়াত গ্রহণ করবো।” উভয় মৌলবী বললেন, “নির্বোধ, আয়াত তো আল্লাহ তাআলার। কিন্তু আবু হুরায়রাহ্ এর তফসীর করেছেন।” মৌলবী নিযামুদ্দিন সাহেব বললেন, “কোন তফসীরের প্রয়োজন নেই। সে তো এক ব্যক্তির অভিমত মাত্র। যা তার অভিমত বা অনুমানের সাথে আমার কোন সম্পর্ক নেই। মির্যা চান কুরআন করীমের আয়াত। সুতরাং,মসীহের জীবিত থাকা সম্বন্ধে কুরআনে স্পষ্ট আয়াতের আমার প্রয়োজন।”

যখন কোন আয়াত পাওয়া গেল না, তখন মৌলবী মুহম্মদ হুসায়েন বাটালবী নিশ্চিতভাবে বুঝতে পারলেন, এই ব্যক্তি তোহাত ছাড়া হল। এজন্য তিনি মৌলবী মুহম্মদ হাসানকে – যিনি পরের মুকাল্লিদ ও লুধিয়ানার একজন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি ছিলেন– বললেন, “আপনি তার রুটি বন্ধ করে দিন” কারণ, মৌলবী নিযামুদ্দিন সাহেব লুধিয়ানার প্রভাবশালী মৌলবী মুহাম্মদ হাসান সাহেবের বাড়িতে আহার করতেন। মৌলবী মুহাম্মদ হুসায়েন সাহেবের এই ধমক শুনে মৌলবী নিযামুদ্দিন সাহেব কৌতুক স্বরূপ জোড় হাতে বললেন, “মৌলবী সাহেব, আমি কুরআন শরীফ ছাড়লাম। রুটি ছাড়াবেন না।” এই কথা শুনে বাটালবী সাহেব অত্যন্ত লজ্জিত হলেন। অবশেষে, মৌলবী নিযামুদ্দীন সাহেব হযরত আকদাসের খেদমতে হাজির হয়ে লজ্জাবনত মস্তকে বসে থাকলেন। হযরত বললেন, “বলুন, বিশ, ঊনিশ, দশ, পাঁচ, দুই, চার বা একটি আয়াত উপস্থিত করুন। মৌলবী সাহেব প্রথমে চুপ থাকলেন। তারপর পূর্বের ব্যাপার বিবৃত করে বললেন, “এখন যেদিকে কুরআন শরীফ, সেদিকে আমি।” এই বলে হুযুরের কাছে বয়আত গ্রহণ করলেন। তার বয়আত গ্রহণে মৌলবীদের

মধ্যে ধুম শোরগোল উপস্থিত হল এবং মুবাহাসার প্রস্তুতি পূর্বাপেক্ষা অধিকতর তীব্রতর ভাবে চলতে লাগল।[১]

সাঁই গুলাব শাহ্ মজযুবের সাক্ষ্য :

আল্লাহ তাআলার মামুরদের আগমনের সময় যখন নিকটবর্তী হয়, তখন তাঁর কাছ থেকে তাঁর ফেরেশ্তারা সদাত্মাদেরকে একত্রিত করার জন্য আদিষ্ট হন। এইসব পুণ্যাত্মাদের মধ্যেই একজন ছিলেন মিয়াঁ করীম বখশ সাহেব মরহুম। তিনি পরম সাধু, মুত্তাকী , সুন্নতের অনুবর্তী এবং সত্যবাদী পুরুষ ছিলেন। তিনি যখন হযরত আকদাসের কাছে 'বয়আত' গ্রহণ করেন, তখন তাঁর বয়আতের প্রেরণাকে সাধু আত্মা গুলাব সাহেব সাক্ষ্য বলে প্রকাশ করেন। এই মজযুবের কিছু ভবিষ্যদ্বাণী বর্ণনা করবার পর তিনি বলেন :

"এই বুজুর্গ ত্রিশ বছর আগে একবার আমাকে বলেছিলেন, ঈসা এখন যৌবনে পদার্পণ করবেন। তিনি লুধিয়ানায় এসে কুরআনের ভ্রান্তিসমূহ প্রকাশ করবেন এবং কুরআনের দ্বারা মিমাংসা করবেন।" আরও বললেন 'মৌলবী তাঁকে অস্বীকার করতেই থাকবে। তখন আমি আশ্চর্যান্বিত হয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, 'কুরআনেও ভুল আছে? কুরআন তো আল্লাহর কালাম।' তখন তিনি বললেন, 'তফসীরের পর তফসীর হয়েছে এবং কবিত্বমূলক ভাষা বিস্তার লাভ করেছে (অর্থাৎ, বহু অতিরঞ্জন দ্বারা বহু সত্য ঢাকা পড়েছে যেমন, কবিরা অত্যুক্তির দ্বারা প্রকৃত সত্যকে গোপন করে দেয়।) তারপর বললেন, 'সেই ঈসা এসে কুরআন দ্বারা ফয়সালা করবেন।' তারপর, এই মজযুব (ঐশী প্রেমে আত্মহারা) পুনর্বার বললেন, 'কুরআন দ্বারা মিমাংসা করেন এবং মৌলবীরা তা অস্বীকার করবে। তারপর আরও বললেন, 'অস্বীকার করবে। যখন তিনি লুধিয়ানায় আসবেন, তখন ভীষণ দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হবে। তখন আমি বললাম, 'ঈসা এখন কোথায়? তিনি বললেন 'কাদিয়ানে।' আমি বললাম, 'কাদিয়ান তো লুধিয়ানা হতে মাত্র তিন ক্রোশ দূর অবস্থিত। সেখানে ঈসা কোথায়?"

(লুধিয়ানার কাছে একটি গ্রাম আছে। তার নামও কাদিয়ান)। এই কথার তিনি কোন উত্তর দিলেন না। আমি একটুও জানতাম না যে, গুরুদাসপুরেও 'কাদিয়ান' নামে গ্রাম আছে। তারপর আমি তাকে বললাম, ঈসা আলাইহেস্ সালাম আল্লাহর নবী। তাকে আকাশে উঠান হয়েছে। তিনি কা'বার ওপর অবতরণ করবেন। ' তখন তিনি বললেন, 'ঈসা ইবনে মরীয়ম নবী উল্লাহ্ তো মৃত্যুবরণ

(১) 'তাযকিরাতুল-মাহদী', পীর সিরাজুল হক সাহেব নু'মানী প্রণীত।

করেছেন। এখন তিনি আর আসবেন না। আমি ভালোভাবে গবেষণা করেছি তিনি মৃত্যু লাভ করেছেন। আমরা বাদশাহ্ । মিথ্যা বলবো না।' আরও বললেন, 'আকাশ গুলোর অধিবাসীগণ কারও কাছে পদব্রজে আসেন না।'

বিজ্ঞাপক – মিয়া করীম বখশ, লুধিয়ানা, একবালগঞ্জ মহল্লা , ১৪ই জুন ,১৮৯১, শনিবার।"১

এই বিবৃতি দানের পর করীম বখশ্ সাহেব বললেন, একটি কথা বলা হয়নি। সেই মজযুব তাকে পরিস্কার বলেছিলেন, "এই ঈসার নাম, 'গোলাম আহমদ'।"

এই বিবৃতির নীচে প্রায় পঞ্চাশ জন এমন সাক্ষী দস্তখত করেছেন, যারা জোর দাবির সাথে বলেছেন যে, মিয়া করীম বখশ একজন সত্যবাদী পুরুষ এবং নামায রোযা নিষ্ঠার সাথে পালন করেন।

'ইযালায়ে আওহাম' প্রণয়ন ও প্রকাশ :

'হযরত আকদাসের দাবি প্রমাণের জন্য 'ফতেহ্ ইসলাম' ও'তৌযিহে-মারাম' নামে দুটি পুস্তক আগেই প্রকাশিত হয়েছিল। এখন ১৮৯১ সালের শেষ ভাগে 'এযালাএ আওহাম'- এর মত অকাট্য যুক্তিসম্পন্ন পুস্তক দুই খন্ডে প্রকাশিত হলো। এই গুরুত্বপূর্ণ পুস্তকে তিনি মসীহের মৃত্যু এবং তার দাবির এমন সর্ববিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করলেন যে, সমস্ত আঁধার ঘুচে উজ্জ্বল দিবসের উদয় হল। তারপর মসীহ (আ.) এর জীবিত থাকা বিশ্বাসে দোষসমূহ বিস্তৃত আলোচনা পূর্বক হযরত মসীহ আলাইহেস সালামের মৃত্যুর উপকারিতা বর্ণনা প্রসঙ্গে তিনি তার বন্ধুগণকে এক মূল্যবান উপদেশ দান করেছেন যে তা স্বর্ণাক্ষরে লিখিত হওয়ার যোগ্য । তিনি বলেন :

"হে আমার বন্ধুগণ, এখন আমার একটি শেষ উপদেশ বাণী শ্রবণ করুণ। আরও একটি গোপন তত্ত্ব বলছি। তা উত্তমভাবে স্মরণ রাখবেন, খ্রিষ্টানদের সাথে আপনাদের যে সব তর্ক উপস্থিত হয়, তাতে পার্শ্ব পরিবর্তন করুন এবং খ্রিষ্টানদের কাছে তা প্রমাণিত করুন যে, বাস্তবিকই মসীহ ইবনে মরীয়ম চির দিনের জন্য মৃত্যুবরণ করেছেন। এই একটি মাত্র তর্কে বিজয় লাভ করলে আপনারা খ্রিষ্টান ধর্মকে ধরা পৃষ্ঠ থেকে মুছে ফেলতে পারবেন। আপনাদের মূল্যবান সময়ও অপরাপর বিষয়ের দীর্ঘ বিতর্কে নষ্ট করার প্রয়োজন নেই। শুধু মসীহ ইবনে মরীয়মের মৃত্যুর ওপর জোর দিন এবং খ্রিষ্টানদেরকে শক্তিশালী যুক্তির দ্বারা নির্বিকার করে দিন। যখন আপনারা মসীহর মৃত ব্যক্তিদের অন্তর্ভূক্ত

(১) 'ইযালায়-আওহাম, দ্বিতীয় খন্ড, ২৮৮ পৃঃ।

হওয়া প্রমাণ করবেন এবং খ্রিষ্টানদের হৃদয়ে তা অঙ্কিত করে দিবেন, তখন জানবেন যে সেদিন থেকে খ্রীষ্টধর্ম পৃথিবী থেকে বিদায় গ্রহণ করেছে। নিশ্চিত জানবেন যে, যে পর্যন্ত তাদের খোদার মৃত্যূ হইবে না তাহাদের ধর্মও মরিবে না। অন্য যাবতীয় তর্ক তাদের সাথে অনাবশ্যক । তাদের ধর্মের একটি মাত্র স্তম্ভ এবং তা এই যে, এখন পর্যন্ত ঈসা ইবনে মরীয়ম আকাশে জীবিত অবস্থান করছেন। এই ভিত্তি চুরমার করুন। তারপর তাকিয়ে দেখুন, খ্রিষ্টান ধর্ম পৃথিবীতে কোথায়? যেহেতু খোদা তাআলা এই ভিত্তিকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করতে এবং ইউরোপ ও এশিয়ায় তৌহিদের সমিরণ প্রবাহিত করতে চান, সে জন্য তিনি আমাকে প্রেরণ করেছেন এবং আমাকে বিশেষভাবে ইলহাম দ্বারা প্রকাশ করেছেন যে, মসীহ ইবনে মরীয়মের মৃত্যু হয়েছে। দৃষ্টান্ত স্থলে , তার ইলহাম এই :

مسیح ابن مریم رسول اللہ فوت ہو چکا ہے اور اسکے رنگ میں ہو کر وعدہ کے موافق تُو آیا ہے وَكَانَ وَعْدُ اللّٰهِ مَفْعُوْلًا - اَنْتَ مَعِیْ وَاَنْتَ عَلٰی حَقِّ الْمُبِيْنِ - وَاَنْتَ مُصِيْبٌ وَّ مُعِيْنٌ لِلْحَقِّ ۔" ؎

অর্থাৎ "আল্লাহর রসুল মসীহ ইবনে মরীয়ম মৃত্যুবরণ করেছেন এবং তার রঙে রঙিন হয়ে আল্লাহ তাআলার ওয়াদা অনুযায়ী তুমি এসেছো। আল্লাহর ওয়াদা পূর্ণ হবেই হবে। তুমি আমার সঙ্গে আছ, তুমি উজ্জ্বল সত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত। তুমি ঠিক পথে আছ, সত্যের সহায়তাকারী।'[১] হায় যদি আমাদের উলামা সাহেবান এই তত্ত্বটি হৃদয়ঙ্গম করতে পারতেন এবং এই বিশ্বাস -এই ধর্মমত প্রচার করে সহস্র সহস্র নয়, লক্ষ লক্ষ তৌহিদ স্বীকারকারীকে খ্রিষ্টান মতবাদ ও খ্রিষ্টান ফেৎনা থেকে উদ্ধার করতেন।

হে মুসলমান জাতি, তোমরা কত হতভাগা। তোমাদের মধ্যে ক্রুশ সৃষ্ট ফেৎনা চুরমার করার জন্য আল্লাহ-তাআলার পক্ষ থেকে যথাসময়ে এক আধ্যাত্মিক সেনাধ্যক্ষ আগমন করেছেন। তিনি ইসলামের মাথা উঁচু এবং খ্রিষ্টান মতবাদগুলোর মাথা অবনত করার জন্য তোমাদের সামনে রাশি রাশি মহাশক্তিশালী যুক্তি ও প্রমাণ প্রস্তুত করেছেন। কিন্তু তোমাদের উলামারা তবু তাদের জেদের ওপর কায়েম রয়েছেন। তারা মসীহের দেদীপ্যমান মৃত্যুর ঘোষণা করেননি এবং এইভাবে তারা প্রকারান্তরে খ্রিষ্ট পূজার সহায়তা করেন এবং মুসলমানদের খ্রিষ্টান মতবাদের গর্তে ঠেলে ফেলার উপলক্ষ হোন। 'ফা-ইন্না লিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজেউন।'

---

(১) 'ইযালায়-আওহাম,' প্রথম সংস্করণ ৫৬১-৬২ পৃঃ।

হে খোদা, হে হাদী, হে পথ প্রদর্শক। তুমি মুসলামান জাতিকে জ্ঞান দাও। তারা যেন এখনও রক্ষা লাভ করে এবং খ্রিষ্টানদের সাহায্য থেকে হাত ধুয়ে ইসলামের সাহায্যার্থে দণ্ডায়মান হয়। আমীন, আল্লাহুম্মা আমিন।

এখানে একথা বলা অত্যাবশ্যক যে, হযরত আকদাস 'ইযালায়ে-আওহামে' কুরআন করীমের ত্রিশটি আয়াত দিয়ে মসীহের মৃত্যু প্রমাণ করেন। এছাড়াও বহু হাদিস এবং প্রবল শাস্ত্রীয় সমর্থন ও যৌক্তিকতার মাধ্যমে তা প্রমাণ করেছেন। তারপর, ইঞ্জিল পুস্তকাবলী এবং ইতিহাস থেকেও অনেক পরিস্কার প্রমাণ উপস্থাপন করে সুনিশ্চিতভাবে প্রমাণিত করেছেন যে, মসীহ ইবনে মরীয়ম অন্য প্রত্যাদিষ্টদের মত এই নশ্বর জগত ছেড়ে নিঃসন্দেহে বেহেশতে গমন করেছেন, এতে সন্দেহ নেই। তিনি এই জড়দেহে আকাশে গমন করেননি এবং প্রত্যাগমনও করবেন না। আক্ষেপ মুসলমানদের জন্য , তারা এখনও সেই পুরাতন পথেরই অনুসরণ করছে।

এই বিষয়ে এই সব উলামা তাদের পরমাদৃত মৌলিক উপাদান, যার ওপর ভিত্তি স্থাপন পূর্বক তারা মসীহ জীবিত থাকার সৌধ নির্মাণ করেছিলেন, তা দুটি শব্দ মাত্র ছিল–'রাফা'ও 'নযুল' । এদের প্রকৃত তত্ত্ব হযরত আকদাস যথাবিহিত উপায়ে স্বচ্ছ স্ফটিকের মত প্রদর্শন করেছেন। এখন উলামাদের সেই কাল্পনিক সৌধ ভূমিস্মাৎ হয়েছে।

'তাওয়াফফি' শব্দের অর্থ সম্বন্ধে চ্যালেঞ্জ ও এক হাজার টাকা পুরস্কার ঘোষণা :

কুরআন করীম এবং হাদিস সমূহে 'তাওয়াফফা, শব্দ বিচার বুদ্ধিসম্পন্ন প্রাণীর জন্য শত শত বার ব্যরহৃত হয়েছে। উলামারা ওই সব স্থানে সর্বত্রই এর অর্থ 'আত্মা গ্রহণ' এবং 'মৃত্যু' অর্থই করেন। কিন্তু যখন এই শব্দ হযরত মসীহের জন্য ব্যবহৃত হয়, তখন এর অর্থ জীবিতাবস্থায় জড়-দেহে আকাশে উঠিয়ে নেয়া করেন। হযরত আকদাস এই শব্দ নিয়ে চক্ষু উন্মোচনকারী পরম জ্ঞানগর্ভ গবেষণাসহ উলামাদের প্রতিযোগিতামূলক আহবান দিয়েছেন :

"যদি কোন ব্যক্তি কুরআন করীম থেকে, অথবা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের হাদিস থেকে, অথবা শের ও কাসিদা- প্রাচীন বা নবীন আরবি পদ্য বা গদ্য থেকে প্রতিপন্ন করতে পারেন যে, কোথাও 'তাওয়াফফি' শব্দ খোদা তাআলার ক্রিয়া স্বরূপ আত্মা বিশিষ্ট প্রাণীর জন্য ব্যবহৃত হয়ে তা আত্মা-গ্রহণ' (রুহ কবয) এবং মুত্যুদান ব্যতীত অন্য কোন অর্থেও গৃহীত হয়েছে অর্থাৎ 'দেহ গ্রহণ অর্থেও ব্যবহৃত হয়েছে, তা হলে আমি আল্লাহ জাল্লা শানুহুর দিব্যসহ

সত্যিকার ধর্মীয় অঙ্গীকার করছি যে, এমন ব্যক্তিকে আমার সম্পত্তির কিছু অংশ বিক্রয় করে হাজার টাকা নগদ দিব এবং ভবিষ্যতে তার হাদিস কুরআনের জ্ঞান স্বীকার করে নিব।"[১]

'ইযালায়ে আওহাম' কিতাবে হযরত আকদাস উলামাদের যে চ্যালেঞ্জ দেন, তা ১৮৯১ সালে লিখিত হয়। আজ এই অনুবাদ আমরা ১৯৬১ সালের ১৮ই মার্চ করছি। (মূল পুস্তকে এই ছত্রগুলি ২২শে মে, ১৯৫৯ সাল রচিত হয়) অন্য কথায় ৭০ বছর হল এই চ্যালেঞ্জ করা হয়। এপর্যন্ত বিশ্বের কোন আরব বা অনারব আলেম এই চ্যালেঞ্জটি গ্রহণকরে হুযুরের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে একটি দৃষ্টান্তও উপস্থিত করতে পারেননি। কিন্তু উলামাগণ শুধু এই ভয়ে হযরত ঈসা আলাইহেস সালামের মৃত্যু স্বীকার করেন না যে, তা স্বীকার করলে জনসমাজ হযরত মির্যা সাহেবের মসীহ মাওউদ (প্রতিশ্রুতি মসীহ) হওয়ার দাবি সহজেই স্বীকার করে ফেলবে। এজন্য তারা হযরত মসীহ্ জীবিত থাকার ওপরেই জোর দিচ্ছেন, যদিও হযরত আকদাস প্রদত্ত মসীহের মৃত্যু দলিল সমূহ প্রচারিত হওয়ার পর বহু খ্যাতনামা উলামা, যারা রওশন -খেয়াল হওয়া বশতঃ অতি উচ্চস্থানীয় বলে গণ্য, ওফাতে মসীহ্ স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছেন। নিম্নে শেষোক্ত উলামাদের কয়েকজনের নাম প্রদত্ত হলো :

মৌলবী ইনশা আল্লাহ খাঁ মরহুম – সম্পাদক, 'ওতান'পত্র, লাহোর; মৌলবী সানাউল্লাহ্ অমৃতসরী; মৌলনা আবুল কালাম আজাদ; মৌলানা গোলাম মুরশেদ– খতিব শাহী মসজিদ, লাহোরঃ আল্লামা মুহাম্মদ আদু মিসরী,; আল্লামা সৈয়দ রশীদ রেযা মিসরী; আল্লামা মাহমুদ শিলতুত – প্রফেসর জামেয়া আযহার, মিসর প্রভৃতি।

'ইযালায়ে আওহামের অন্যান্য গবেষণা :

'ইযালায়ে আওহামে' হুযুর 'দাজ্জাল' এবং ইয়াজুজ মাজুজ' সম্বন্ধেও চূড়ান্ত সমালোচনা করেছেন। তিনি বলেছেন যে, 'দাজ্জাল' দ্বারা খ্রিষ্টান ফিৎনাকে বুঝায় এবং 'ইয়াজুজ ও মাজুজ হল রাশিয়া ও ইংরেজ। প্রতিশ্রুত মাহদীর কোন স্বতন্ত্র অস্তিত্ব থাকলে হাদিসের শ্রেষ্ঠতম দুই কিতাব বুখারী ও মুসলিমে নিশ্চয়ই তা বর্ণিত হত। দুইজন শ্রেষ্ঠ ইমাম -হযরত মুহাম্মদ ইসমাঈল বুখারী রহমাতুল্লাহে আলাইহে এবং হযরত ইমাম মুসলিম রহমাতুল্লাহে আলাইহে –তাদের সহীহদ্বয়ে ইমাম মাহদী সংক্রান্ত কোন হাদিসই না লেখা পরিস্কাররূপে এটাই নির্দেশ করে যে, তাদের কাছে ঐসব হাদিস সহীহ ছিল না। অবশ্য তিনি 'ইবনে মাজা' এবং

(১) 'ইযালায়ে আওহাম , ' নতুন সংস্করণ, ৩৭৫ পৃঃ।

‘হাকেম’ বর্ণিত এই হাদিসকে ‘সহীহ’ নির্ধারণ করেছেন যে, لَا مَهْدِيَ إِلَّا عِيْسٰى অর্থাৎ ঈসা ব্যতীত অন্য কোন মাহদী হবেন না।’[১]

হযরত মীর নাসের নাওয়াবের ঘোষণা :

লুধিয়ানার মুবাহাসার অন্যতম বিশেষ ফল এই হয়েছিল যে, আরও বহু সদাত্মা ব্যক্তির হেদায়েত পাওয়ার মত হযরত আকদাসের শ্বশুর মীর নাসের নাওয়াব সাহেব তার সম্বন্ধে যাবতীয় কু-ধারণা পোষণ পরিত্যাগ করেন। হযরত মসীহ মাওউদ দাবি করাতে মীর সাহেবের মন সন্দেহান্বিত ও নড়বড়ে হয়ে পড়েছিল।

এখন তিনি একটি ঘোষণাপত্র দ্বারা তার পূর্ব-কৃতকর্মের অনুশোচনা প্রকাশ করলেন এবং ভবিষ্যতের জন্য তওবা করে লিখলেন :

“অত:পর, যদি কোন ব্যক্তি আমার কোন লেখা বা বক্তৃতা প্রকাশ করে এবং তাদ্বারা লাভবান হতে চায়, তবে আমি আল্লাহ তাআলার কাছে মুক্ত থাকব। যদি কখনও আমি মির্যা সাহেবের কুৎসা করে থাকি বা কোন বন্ধুর কাছে তাঁর সম্বন্ধে অন্যায় কিছু বলে থাকি, তাহলে আল্লাহ তাআলার হুযুরে ক্ষমা ভিক্ষা করছি।”[২]

হযরত মৌলবী গোলাম নবী সাহেব খেশোবী (রাযি.) এর বয়আত গ্রহণ :

হযরত মৌলবী গোলাম নবী সাহেব খোশাবী একজন মুত্তাকী ও পরহেজগার ব্যক্তি হওয়া ছাড়াও একজন বড় আলেম ছিলেন। এই সময়ে তিনি লুধিয়ানা আগমন করেন। লুধিয়ানার মুবাহাসা বশতঃ বিরোধিতা তুমূল আকার ধারণ করেছিল। লুধিয়ানার আলেম সমাজের তোড়জোড় দেখে তিনিও অগ্নিস্ফুলিঙ্গ হয়ে পড়লেন। তিনি একজন ভাল ওয়ায়েয ছিলেন। তার আহমদীয়াত গ্রহণ প্রসঙ্গে হযরত সাহেবজাদা পীর সিরাজুল হক সাহেব নু’মানী রাযি আল্লাহু আনহু লিখেছেন :

“যা হোক, লুধিয়ানা শহরে মৌলবী গোলাম নবী সাহেবের খুব সাড়া পড়লো। সর্বত্র তার জ্ঞানের গভীরতা বিষয় নিয়ে চর্চা হতে লাগলো। মৌলবী গোলাম নবী সাহেবও হযরত আকদাসের বিরুদ্ধবাদিতায় কিছু বাকি রাখলেন না। তিনি প্রত্যেক ওয়াজে আয়াত এবং হাদিসের পর হাদিস মসীহ আলায়হেস সালাম সম্বন্ধে পাঠ করতে লাগলেন। খোদার কুদরতের জন্য কুরবান হই! হযরত উমর রাযি আল্লাহু আনহু আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওসাল্লামকে হত্যা করতে

---

(১) ‘ইযালায়ে আওহাম,’ বড় সাইজ, ৩৭৫ পৃঃ।
(২) ‘তবলীগে রিসালত,’ দ্বিতীয় খন্ড, ৮ পৃঃ।

গিয়ে নিজেই প্রাণ দান করেন। অত:পর তিনি আল্লাহর জ্বলন্ত নিদর্শন হয়ে পড়লেন। তিনি 'ফারুকে আযম' বা সত্য মিথ্যার শ্রেষ্ঠ পার্থক্যকারী' আখ্যায় ভূষিত হলেন। আল্লাহর পরম প্রিয়জন (সা.) তাঁর সম্বন্ধে বলেছেন :

اَلشَّيْطٰنُ يَفِرُّ مِنْ ظِلِّ عُمَرَ اللّٰه

'শয়তান উমরের ছায়া দর্শনে পলায়ন করে'। স্বয়ং আল্লাহু তাআলা বলেছেন, রাযি আল্লাহু আনহুম ও রাযু আনুহুম্ ' رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ اور رَضُوْا عَنْهُ

'আল্লাহ্ তাঁদের প্রতি সন্তষ্ট এবং তাঁরা আল্লাহর প্রতি সন্তুষ্ট।'

একদিন ঘটনাক্রমে হযরত আকদাস যে মহল্লায় বাস করছিলেন মৌলবী গোলাম নবী সাহেব সেস্থানে ওয়াজ করেন। হাজার হাজার ব্যক্তি সমবেত হয়েছিল। এই ওয়াযে তিনি তার সমস্ত জ্ঞানভান্ডার নি:শেষ করেন। শ্রোতারা তাঁর গুণগ্রাহিতা বশতঃ ধন্যবাদ সূচক উচ্চ নিনাদ করছিলেন। 'মারহাবা 'সাল্লেআলা'; ধ্বনি চতুর্দিক মুখরিত করছিল। মৌলবী মুহাম্মদ হাসান, মৌলবী সাহেদ দ্বীন, মৌলবী আবদুল আযীয, মৌলবী মুহাম্মদ, মৌলবী আবদুল্লাহ এবং আরও দু' চার জন মৌলবী–যারা বাইরের নানা স্থান থেকে মৌলবী গোলাম আলী সাহেবের জ্ঞানের সুখ্যাতি, প্রতিভা ও খোদা-দত্ত যোগ্যতা দর্শনের আগ্রহে আগমন করেন, সবাই উপস্থিত ছিলেন। কারণ, তা বিশেষ ওয়াজ ছিল। ওপরে বর্ণিত ধ্বনি এবং চিৎকারগুলো আমাদের কর্ণগোচর হচ্ছিল। আমরা চার পাঁচজন গোপনে বসেছিলাম। আমাদের কোনই শক্তি ছিল না। হযরত আকদাস অন্দর মহলে ছিলেন এবং 'ইযালায়ে আওহাম' কিতাব প্রণয়ন করছিলেন। মৌলবী সাহেব ওয়াজ করে এবং বিরুদ্ধাচরণে পুরোপুরি জোর দিয়ে প্রস্থান করছিলেন। সঙ্গে এক বিপুল জনতা ও মৌলবী সাহেবগণ ছিলেন। এদিকে হযরত আকদাস আলাইহেস সালাতু ওয়াস সালাম অন্তঃপুর থেকে বহির্বাট পুরুষালয়ে যাওয়ার জন্য বাহির হওয়া মাত্র মৌলবী সাহেবের সাথে সাক্ষাৎ হল। হযরত আকদাস আলাইহেস সালাতু ওয়াস সালাম নিজেই 'আস সালামু আলাইকুম বলে মুসাফাহার ' জন্য হাত প্রসারিত করলেন। মৌলবী সাহেব 'ওয়াআলাইকুমুস-সালাম' বলে করমর্দন করলেন। খোদা জানেন, এই মুসাফাহাতে কি বৈদ্যুতিক শক্তি ছিল। এতে কোন আকর্ষণীয় শক্তি ছিল ! এতে কেমন আধ্যাত্মিক আকর্ষণ ছিল! 'ইয়াদুল্লাহ, তথা 'আল্লাহর হাতে' হাত দেয়া মাত্র মৌলবী সাহেব এমন আত্মহারা হলেন যে, কোনই বাক্য উচ্চারণ করতে পারলেন না। সোজা হাত হাতে দিয়ে হযরত আকদাস আলাইহেস সালাতু ওয়াস সালামের সাথে পুরুষ বৈঠকখানায় আগমন করলেন এবং হযরত আকদাসের সামনে হাঁটু পেতে দু'জানু হয়ে বসলেন। বাইরে মৌলবী ও ওয়াজ শ্রোতাগণ আশ্চার্যান্বিত হয়ে

দাঁড়িয়ে থাকলেন এবং পরস্পর এইরকম বাক্যালাপ চললো :

প্রথম : মিঞা, একি হল? মৌলবী সাহেব কেমন নিবুর্দ্ধিতার কাজ করলেন। মির্যা সাহেবের সাথে সাথে চলে গেলেন।

দ্বিতীয় জন : মির্যা যাদুকর। জানা নাই, কি যাদু করেছে। সাথে যাওয়া উচিত হয়নি।

তৃতীয় জন : মৌলবী সাহেব নতি স্বীকার করেছেন। মীর্যার মহা প্রভাব। তিনি প্রভাবান্বিত হয়েছেন।

চতুর্থ জন : ওহে, মির্যা সাহেব যে, এত বড় দাবি করেছেন। মির্যা শূন্য নয়। এ্ই দাবি কি যার তার কাজ?

পঞ্চম জন : মনে হয়, ব্যাপার এই মির্যা ধনশালী। মৌলবীরা লালসাপরায়ণ ও লোভী হয়ে থাকেন। মির্যা কোন লালসা দিয়েছেন।

আরও কিছু ব্যক্তি : মৌলবী সাহেব আলেম, ফাযেল। মির্যাকে প্রবোধ এবং উপদেশ দান করতে গিয়ে মির্যাকে বুঝিয়ে তওবা করিয়ে আসবেন। নসিহত করার এবং সাক্ষাৎকারের জন্য এমন সুযোগ বার বার হয় না। এখন সুযোগ ঘটেছে। মির্যা সাহেবকে তওবা করিয়ে ছাড়বেন।

জনগণ : মৌলবী আবদ্ধ হয়েছে। লালসা দ্বারা বা জ্ঞান দ্বারা, অথবা অন্য কোন প্রকারে। মির্যা বড়ই চতুর ও বিদ্বান ব্যক্তি। তিনি মৌলবীদের কবচের মধ্যে নন।

মৌলবীরা : (সমস্বরে) মৌলবী সাহেব মির্যার খবর নেয়ার জন্য গিয়েছেন। দেখবে সত্যই মির্যার কি দশা হয়। মৌলবী মির্যার চেয়ে অল্প বিদ্বান নন। লোভী নন। উপার্জনশীল। খোদা এবং রসুলকে চিনেন। জ্ঞানী - 'ফাযেল'। মির্যাকে নত করে আসবেন।

এতদ্ব্যতীত, যার মুখে যা আসলো, তা বলাবলি করতে লাগল। এদিকে খোদার কুদরতের কি লীলা ও অভিপ্রায় ছিল! মৌলবী গোলাম সাহেব গৃহের অভ্যন্তরে গিয়ে চুপচাপ বসে থাকলেন।

মৌলবী সাহেব : হযরত, আপনি মসীহের মৃত্যুর বিষয় কোথায় পেয়েছেন?

হযরত আকদাস : কুরআন শরীফ, হাদিস শরীফ এবং 'উলামায়ে রাব্বানীদের' (ঐশীজ্ঞান প্রাপ্ত আলেমদের) বাক্য থেকে।

মৌলবী সাহেব : কোন আয়াত কুরআন শরীফে মসীহের মৃত্যু সম্বন্ধে থাকলে বলুন।

হযরত আকদাস : নিন, এই তো কুরআন শরীফ। এই বলে তিনি কুরআন শরীফের দুই স্থানে কাগজের নিশান করে মৌলবী সাহেবের হাতে সমর্পণ করলেন। একটি স্থান ছিল 'সুরা আলে ইমরান' তৃতীয় পারার তৃতীয়াংশে। দ্বিতীয় স্থানটি ছিল 'সুরাহ্ মায়েদার' শেষ রুকু, সপ্তম পারা। প্রথম স্থানে ছিল,

يَا عِيسَىٰ إِنِّي مُتَوَفِّيكَ

'হে ঈসা নিশ্চয়ই আমি তোমাকে মৃত্যু দিব' দ্বিতীয় স্থানে ছিল :

فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنتَ أَنتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ

'যখন তুমি আমাকে মৃত্যু দিলে, তুমি তাদের পর্যবেক্ষক ছিলে'। মৌলবী সাহেব উভয় স্থানে উভয় আয়াত দর্শনে অবাক হলেন। তারপর বললেন,

يُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ

'তাদের পুরোপুরি প্রতিফল দিব' বাক্যও তো কুরআন শরীফে আছে। এর অর্থ কি?

হযরত আকদাস : আমি যে সব আয়াত উপস্থিত করেছি ওই সবই এক অর্থ এবং আপনি যে আয়াত পেশ করেছেন তার-ই অন্য অর্থ। কথা হল, এগুলোর এক 'বাব' এবং তার অন্য 'বাব'। একটু চিন্তা করুন। ভাবুন।

মৌলবী সাহেব : দুই চার মিনিট মনোনিবেশ করবার পর বললেন: ক্ষমা করুন। আমারই ভুল। আপনি যা বলেছেন, তা সত্য। কুরআন শরীফ আপনার সাথে আছে।

হযরত আকদাস আলাইহেস সালাম বললেন : কুরআন মজীদ আমার সঙ্গে আছে। আপনি কার সঙ্গে আছেন? মৌলবী সাহেবের কান্না এসে গেলো। অশ্রুপাত হতে লাগলো। জোরে কাঁদতে লাগলেন। নিবেদন করলেন: এই অপরাধী, গুণাহ্গারও হুযুরের সঙ্গে। অত:পর মৌলবী সাহেব কেবলই ক্রন্দন করছিলেন এবং অত্যন্ত আদবের সাথে বসে থাকলেন।

"যখন দেরি হতে লাগল, তখন লোকেরা ফরিয়াদ শুরু করল এবং 'মৌলবী সাহেব তাদের কোন কথারই জবাব দিলেন না। যখন অনেকক্ষণ হয়ে গেলো, তখন তারা অধিক চিৎকার শুরু করল। মৌলবী সাহেব বলে পাঠালেন, তোমরা যাও, আমি সত্য দেখেছি, সত্য পেয়েছি। এখন তোমাদের সাথে আমার কিছু করার নেই। যদি তোমরা চাও, এবং তোমাদের ঈমান সালামত রাখার ইচ্ছা থাকে, তবে আস, অনুতাপ কর। খোদার কাছে পরিস্কার হও এবং এই ইমামকে গ্রহণ কর। আমি এই সত্য ইমাম থেকে কিভাবে বিচ্ছিন্ন হতে পারি? ইনি আল্লাহর প্রতিশ্রুত এবং আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আ্লাইহে ওয়া সাল্লামের প্রতিশ্রুত ব্যক্তি। তাঁকে আঁ–হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম 'সালাম'

পাঠিয়েছেন। সেই হাদিসটি এই :

مَنْ اَدْرَكَ مِنْكُمْ عِيْسَى ابْنَ مَرْيَمَ فَلْيُقْرِئْهُ مِنِّي السَّلَامَ۔

'তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি ঈসা ইবনে মরীয়মের সাক্ষাত লাভ করে, সে যেন আমার পক্ষ থেকে তাঁকে সালাম দেয়।'

"মৌলবী সাহেব এই হাদিস পাঠের পর হযরত আকদাসের প্রতি মনোনিবেশ করলেন এবং তার সামনে এই হাদিস আবার উচ্চঃস্বরে পাঠ করে নিবেদন করলেন : আমি এখন আঁ হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের আদেশ অনুসারে আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের 'সালাম' জানাচ্ছি এবং আমিও আমার পক্ষ থেকে সালাম প্রেরক যে পর্যায়ের 'সালাম' বলেছেন ও যাঁকে পর্যায়ে বলা হয়েছে 'সালাম' বলছি। হযরত আকদাস আলায়হেস সালাম তখন এক প্রকার আশ্চর্যজনক কণ্ঠে 'ও-আলাইকুমুস সালাম' বললেন। হৃদয় তা শ্রবণের ক্ষমতা পেল না! মৌলবী সাহেব জবেহ করা মোরগের মত ছটফট করতে লাগলেন। তখন হযরত আকদাসের চেহারা মুবারকও ভিন্ন রূপ ধারণ করল। আমি তা ভাষায় বর্ণনা করতে পারি না। উপস্থিত শ্রোতাগণেরও এক আশ্চর্য সুখময় অবস্থা হল। অত:পর, মৌলবী সাহেব বললেনঃ আউলিয়া কেরাম এবং উম্মতের উলামাগণও সালাম পাঠিয়েছেন এবং এঁরা অপেক্ষায় থেকে ইহধাম পরিত্যাগ করেছেন। আজ আল্লাহ্ তাআলার লিখন ও প্রতিশ্রুতি পূর্ণ হয়েছে। এই গোলাম নবী তাকে কিভাবে ত্যাগ করবে? ইনি মসীহ মাওউদ! ইনিই ইমাম মাহ্দী মাওউদ। ইনিই সেই , ইনিই সেই। মুশীয় মসীহ ইবনে মরীয়ম যথাসময়ে মৃত্যুলাভ করেছেন। তিনি মৃত্যুবরণ করেছেন। তিনি মৃত্যুবরণ করেছেন। কোন সন্দেহ নেই, মৃত্যুবরণ করেছেন। তিনি আর আসবেন না। যিনি আসার ছিলেন, তিনি এসেছেন। তোমরা এসো। আমার মত তাঁর মুবারক কদমে পতিত হও, যেন নাজাত পাও। আল্লাহ তাআলা তোমাদের প্রতি সন্তুষ্ট এবং রসুল তোমাদের দেখে আনন্দিত হোন।

"মৌলবী সাহেবের এই বার্তা যখন দরজার বাইরে পৌঁছালো , তখন অপেক্ষমাণ মৌলবী মোল্লা, বিশিষ্ট লোক, সাধারণ লোক, সবারই মুখ থেকে 'কাফের', 'কাফের', 'কাফের'–উচ্চ কলরব শ্রুত হল। অজস্র গালি বর্ষণ হতে লাগল। জনতা ছত্রভঙ্গ হল্ সবাই ভাল মন্দ বকতে বকতে বিভিন্ন গালি দিয়ে চলে গেল। শোনা যাচ্ছিল 'মির্যা যাদুকর, তার চর গোলাম নবী"[১]

(১) 'তাযকিরাতুল মাহ্দী' হতে উদ্ধৃতি, 'হায়াতে -আহ্মদ' তৃতীয় খন্ড, ১৩৭-১৩৯ পৃঃ।

দিল্লীর সফর, ১৮৯১ সালের ২৮ সেপ্টেম্বর :

১৮৯১ সালের ২৮ সেপ্টেম্বর কিছু শিষ্যসহ হুযুর ভারতবর্ষের কেন্দ্রীয় শহর দিল্লী নগরীতে যাত্রা করেন। দিল্লী তখন ইসলামী শিক্ষা দীক্ষারও প্রধান কেন্দ্র ছিল। হুযুর নওয়াব লোহারুর কুঠিতে গিয়ে অবস্থান করেন। তার উদ্দেশ্য ছিল দিল্লীতে তার দাবির প্রচার হলে সমগ্র ভারতবর্ষে তার পয়গাম পৌঁছাবে। ক্রমান্বয়ে তিনটি ইশতেহার দিল্লীর উলামাদের নামে, বিশেষ করে মৌলবী সৈয়দ নাজির হুসায়েন সাহেবের নামে প্রকাশ করেন যিনি "শেখুল কুল" বলে অভিহিত হতেন। "সমস্ত সুধী মুসলমান ও ভক্তিভাজন উলামাদের উদ্দেশ্যে এক বিনীত প্রবাসীর নিবেদন" শিরোনামে হুযুর ১৮৯১ সালের ২ অক্টোবর, প্রথম ইশতেহার প্রকাশ করেন। এই ইশতেহারে হযরত আকদাস তার আকায়েদ (ধর্ম বিশ্বাস) বর্ণনার পর মৌলবী সৈয়দ নাজির হুসায়েন সাহেব এবং মৌলবী আবু মুহাম্মদ আবদুল হক সাহেবকে মসীহের জীবন ও মৃত্যু সম্পর্কে মুবাহাসার জন্য আহ্বান করেন এবং তাদের লিখলেন, এই মুবাহাসার জন্য তিনটি শর্ত পালন করতে হবে :

(১) শান্তি রক্ষার ব্যবস্থা তাঁরা করবেন। অর্থাৎ, একজন ইংরেজ অফিসার বাহাসের সভায় উপস্থিত থাকবেন।

(২) এই বাহাস লিখিতভাবে হবে। প্রশ্ন ও উত্তর বাহাসের সভায় লিখতে হবে।

(৩) বাহাস মসীহের মৃত্যু ও জীবন সম্বন্ধে হবে এবং কুরআন ও হাদিসের বাইরে কেউ যেতে পারবে না।

তারপর আকদাস এটাও লিখেছিলেন, যে, তিনি হলফপূর্বক স্বীকার করছেন যদি বাহাসে তাঁর ভ্রান্ত বলে প্রমাণিত হয়, তবে তিনি তাঁর (মসীহ, মাওউদ হওয়ার) দাবি নিজেই পরিত্যাগ করবেন এবং এই ইশ্‌তেহার প্রকাশিত হওয়ার পর এক সপ্তাহ পর্যন্ত উল্লিখিত মৌলবী সাহেবদের যথা উত্তরের জন্য অপেক্ষা করবেন।

এই ইশ্‌তেহার প্রচারিত হওয়ার পর মৌলবী আবু মুহাম্মদ আবদুল হক হযরত আকদাসের খেদমতে উপস্থিত হয়ে ক্ষমা চেয়ে বললেন, "আমি একজন 'গোষা-নশীন' নিভৃতচারী ব্যক্তি। এই ধরনের সভায় উপস্থিত হতে আমি অস্বস্তিবোধ করি।" মৌলবী মুহাম্মদ হুসায়েন সাহেবও তখন দিল্লীতে পৌঁছেছিলেন। তিনি হযরতের ইশতেহারের বিরুদ্ধে একটি ইশ্‌তেহার প্রকাশ করলেন এবং হযরত আকদাস সম্বন্ধে লিখলেন :

"এ তো আমার শিকার। দুর্ভাগ্যক্রমে আবার দিল্লীতে আমার হাতে পড়েছে। আমি ভাগ্যবান। পলাতক শিকার আমি আবার প্রাপ্ত হলাম।"

তিনি খুবই উত্তেজনার বহ্নি উদ্‌গীরণ করলেন। এজন্য হযরত আকদাস ১৮৯১ সালের ৬ই অক্টোবর আবার একটি ইশতেহার প্রকাশ করলেন। এর শিরোনাম ছিল "আহলে-হাদিস সম্প্রদায়ের প্রধান নেতা মৌলবী সৈয়দ নযির হুসায়েন সাহেবের মোকাবেলায় ইশতেহার।" হযরত আকদাস এই ইশতেহারে মৌলবী সৈয়দ নযির হুসায়েন সাহেব এবং সৈয়দ মুহাম্মদ হুসায়েন সাহেব বাটালবী উভয়কেই সম্বোধন করে লিখলেন :

"যদি এই দু'জন মৌলবী সাহেব হযরত মসীহ ইবনে মরীয়মকে জীবিত বলা সত্যের সমর্থন মনে করে থাকেন, তাহলে আমার সথে ১৮৯১ সালের ২ অক্টোবরের ইশতেহারে বর্ণিত শর্তাবলী অনুযায়ী যুক্ত-সম্মতিক্রমে বাহাস করুন।"

বরং চরম মিমাংসার্থে শর্ত শিথিলপূর্বক এটাও লিখলেন, "মৌলবী সৈয়দ নাযির হুসেন সাহেব কোন ইংরেজ অফিসারকে বাহাসের সভাস্থলে নিযুক্ত করানোর ব্যাপারে যদি অসমর্থ হন, তাহলে এই অবস্থায় ইশতেহার দ্বারা হলফপূর্বক তিনি স্বীকার করুন যে তিনি নিজেই শান্তি রক্ষার জন্য দায়ী থাকিবেন এবং যদি সভাস্থলে উপস্থিত জনগণের মধ্যে কেউ সভ্যতা ও ভাষার শ্লীলতা বিরুদ্ধ কোন কথা উচ্চারণ করে, তবে তিনি তাকে তৎক্ষণাৎ সভা থেকে বের করে দিবেন। এমন অবস্থায়ও মৌলবী সাহেবের মসজিদে বাহাসের জন্য আমরা উপস্থিত হতে পারি।

এই দ্বিতীয় ইশতেহার প্রকাশিত হওয়ার পর মৌলবী সৈয়দ নাযির হুসায়েন সাহেবের সাগরিদরা নিজে নিজেই একটা তারিখ ধার্য করে এই ইশতেহার প্রচার করল যে, অমুক তারিখে মির্যা সাহেবের সাথে বাহাস হবে। কিন্তু হযরত আকদাসের সাথে যথাসময়ের আগে কোনই মিমাংসা না করে ঠিক জলসার সময়ে হযরত আকদাসের কাছে এক ব্যক্তিকে পাঠাল। সে এসে বলল, "বাহাসের জন্য চলুন। মৌলবী নাজির হুসায়েন সাহেব মুবাহাসার জন্য আপনার অপেক্ষা করছেন। অপর দিকে একটি উত্তেজিত জনতা হযরত আকদাসের গৃহ অবরোধ করল। হযরত আকদাস প্রস্তুত হওয়া সত্ত্বেও বের হতে পারলেন না। এতে জনসমাজে ঘোষণা করা হল যে, মির্যা সাহেব শেখুল-কুলকে ভয় পেয়েছেন।

এতে হযরত আকদাস ১৮৯১ সালের ১৭ই অক্টোবর একটি তৃতীয় ইশতেহার প্রকাশ করলেন। এর শিরোনামে লিখিত হয়েছিল, "আল্লাহ্ জাল্লা শানুহুর কসম দিয়ে মৌলবী সৈয়দ নাযির হুসায়েন সাহেবের খেদমতে মসীহ ইবনে মরীয়মের জীবন ও মৃত্যু সম্পর্কে বাহাসের আবেদন।" এই ইশতেহারে যে সভায় তিনি

যেতে পারেননি, সে প্রসঙ্গে লিখলেন :

“এক পক্ষীয় সভায় যোগদান করা যদিও আমার কর্তব্য ছিল না, কারণ আমার সম্মতিক্রমে ওই সভা স্থির করা হয়নি এবং আমার পক্ষ থেকে কোন নির্দিষ্ট তারিখে উপস্থিত হওয়ার কোন অঙ্গীকারও ছিল না, তথাপি আমি উপস্থিত হওয়ার জন্য প্রস্তুত হই। কিন্তু জনসাধারণের অতর্কিত দুষ্ট আক্রমণ দ্বারা ওই দিন আমাকে সভায় যোগদান করার পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করা হয়েছিলো। শত শত ব্যক্তি একথার সাক্ষী আছেন যে, সেই সভায় নির্ধারিত সময়ে দুষ্ট লোকের এক ক্ষিপ্ত জনতা আমার গৃহের চারিদিকে ভিড় করেছিল। আমি তাদের হিংস্র অবস্থা দেখে ওপর তলার অন্দর মহলে চলে গেলাম। তারা সে দিকেও গেল এবং গৃহের কপাট ভেঙ্গে ফেলার চেষ্টা করলো। এমন কি, কোন কোন ব্যক্তি অন্দর মহলে প্রবেশ করলো। এক বিরাট জনতা নিচের গলিতে দাঁড়িয়ে রইল। তারা গালাগালি করছিল। ভীষণ উত্তেজনার বশে তারা নোংরা ভাষার বিষোদগিরণ করছিল। বড় মুশকিলের সাথে খোদা তাআলার অনুগ্রহে ও কৃপায় তাদের হাত থেকে মুক্তি পাই।” অত:পর হুযুর বলেন :

“সুতরাং, একদিকে জনসাধারণকে ভ্রান্ত করে, তাদেরকে উত্তেজনাময় বক্তৃতা শুনিয়ে আমার বাড়ির চর্তুদিকে ঘেরাও করানো হয়। অন্য দিকে, আমাকে বাহাসের জন্য ডাকা হয় এবং বর্ণিত বাধার কারণে আমি যেতে না পারায় শোর করা হল যে, আমি পালিয়েছি।

“এখন আমি আল্লাহ তাআলার কৃপায় আমার হেফাজতের ব্যবস্থা করেছি এবং বাহাসের জন্য প্রস্তুত। সফরের কষ্ট স্বীকার এবং দিল্লীবাসীর প্রাত্যহিক গালিগালাজ, উপহাস ও বিদ্রূপ সহ্যপূর্বক শুধু আপনার সাথে বাহাস করার জন্য, হে শেখুল-কুল সাহেব, আমি উপবিষ্ট আছি। হযরত বাহাসের জন্য আসুন। আমি বাহাসের জন্য প্রস্তুত। আবার, আপনাকে আল্লাহ্ জাল্লা শানুহুর কসম দিয়ে বাহাসের জন্য আহবান করছি। আপনি যেখানে চান, উপস্থিত হব। কিন্তু বাহাস লিখিতভাবে হবে। ”

অবশেষে, হুযুর এটাও লিখলেন :

“যদি আপনি কোন প্রকারেই বাহাস করতে না চান তবে একটি সভায় মসীহের মৃত্যু সম্বন্ধে আমার সকল যুক্তি শুনে তিনবার আল্লাহ জাল্লা শানুহুর শপথ করে বলে দিন যে, এই সব দলিল ঠিক নয় এবং সঠিক ও সুনিশ্চিত বিষয় এটাই যে, হযরত মসীহ ইবনে মরীয়ম জীবিত অবস্থায় ভৌতিক দেহসহ আকাশের দিকে উত্তোলিত হয়েছেন-কুরআনের আয়াত গুলোর স্পষ্ট উক্তি ও রসুল (সা.) থেকে নিঃসন্দেহে প্রাপ্ত মরফু সহীহ হাদিসগুলো থেকে এর পরিস্কার সাক্ষ্য পাওয়া যায়

এবং এটাই আপনার ধর্ম-বিশ্বাস বটে, তবে আমি আপনার এই ঔদ্ধত্য, সত্য গোপন, অসততা ও মিথ্যা সাক্ষ্যের মিমাংসার জন্য আল্লাহ তাআলার হুযুরে সকাতরে কাঁদবো। আমার ধ্যানের ফলে আমাকে আদেশ দেয়া হয়েছে, اُدْعُوْنِیْٓ اَسْتَجِبْ لَکُمْ ('আমার কাছে দোয়া কর, আমি কবুল করবো,) এবং আমাকে নিশ্চিতভাবে প্রত্যয় করান হয়েছে যে আপনি যদি 'তাকওয়ার' পথ পরিত্যাগ করে এই প্রকার অন্যায়াচরণ ও আয়াত لَا تَقْفُ مَا لَیْسَ لَکَ بِہٖ عِلْمٌ (যে বিষয়ে তোমার 'জ্ঞান নাই, তার অনুবর্তিতা কর না) উপেক্ষা করেন, তা হলে এক বছরের মধ্যে অন্যায়াচরণের ফলে আপনার ওপর এমন দেদীপ্যমান প্রতিক্রিয়া প্রদর্শিত হবে যে, অন্যদের জন্য তা নিদর্শন স্বরূপ হবে। সুতরাং ঘোষণা করছি, বাহাস করতে পরাম্মুখ হলে এভাবেই মিমাংসা করুন, যাতে ওই সব ব্যক্তি যারা 'নিদর্শন' 'নিদর্শন' বলে বেড়ায় তাদেরকে খোদা তাআলা নিদর্শন দেখান। وَھُوَ عَلٰی کُلِّ شَیْءٍ قَدِیْرٌ۔ وَاٰخِرُ دَعْوٰنَا اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰہِ رَبِّ الْعَالَمِیْنَ۔ ('এবং তিনি সর্বশক্তিমান এবং আমাদের শেষ প্রার্থনা বিশ্ব প্রতিপালক আল্লাহরই যাবতীয় প্রশংসা')।

কুরআন ও হাদিস থেকে ঈসা মসীহের জীবিত থাকা প্রমাণের জন্য পুরস্কার ঘোষণা :

এই ইশতেহারে এটাও লেখা হয়েছিল :

"অবশেষে, মৌলবী সৈয়দ নাযির হুসায়েন সাহেবের কাছে এটাও প্রকাশ থাকে যে, যদি তিনি হযরত মসীহ ইবনে মরীয়ম জড় দেহের সাথে জীবিত আকাশে উত্তোলিত হওয়ার সম্বন্ধে তার আকিদার সমর্থনে অকাট্য প্রমাণ, স্পষ্ট আয়াত 'এবং 'মরফু', 'মুত্তাসাল,' 'সহীহ,' হাদিস মুবাহাসার সভায় উপস্থিত করেন এবং কোন বিষয়কে 'আকিদা' (ধর্ম-বিশ্বাস) নির্ধারণের জন্য যেমন অত্যাবশ্যক তেমনি মসীহ ইবনে মরীয়মের দৈহিক পুনরাগমন সম্বন্ধে নিশ্চিত ও অকাট্য প্রমাণ প্রকাশ্য সভায় তার পবিত্র মুখে বর্ণনা করেন, তা হলে আমি আল্লাহ জাল্লা শানুহুর কসম করে ধর্মীয় অঙ্গীকার করছি যে, প্রত্যেক আয়াত ও প্রত্যেক হাদিসের জন্য তাকে পঁচিশ টাকা করে নজরানা দিব।"[১]

১৮৯১ সালের ২০ অক্টোবরের মুবাহাসা সভার সংক্ষিপ্ত কার্যবিবরণী :

যদিও হযরত আকদাস উল্লিখিত ইশতেহারগুলো দ্বারা এ বিষয়ের ওপর শেষ সীমানার জোর দিয়েছিলেন মৌলবী নাযির হুসায়েন সাহেব তার সাথে হযরত

(১) ১৮৯১ সালের ১৭ই অক্টোবরের ইশ্‌তেহার হতে উদ্ধৃত।

মসীহ্ আলাইহেস সালামের জীবন ও মৃত্যু সম্বন্ধে লিখিতভাবে মুবাহাসা করুন এবং দিল্লীর অধিবাসীগণও ঐকান্তিকভাবে এই আগ্রহই পোষণ করছিলেন, তবু মৌলবী সৈয়দ নাযির হুসায়েন সাহেব মসীহের জীবন ও মৃত্যুর দলিল বর্ণনা করলে মৌলবী সাহেব হলফপূর্বক ঘোষণা করবেন এই সব যুক্তি প্রমাণ (বা দলিল) কুরআন করীমের আয়াত ও সহীহ্ হাদিস গুলোর দিক থেকে ঠিক নয়। তখন হযরত আকদাস একটি পত্র হযরত মুনশি সাহেব কপুরথলবী এবং হযরত খাঁ মুহাম্মদ খাঁ সাহেব কপুরথলবীকে দিয়ে মৌলবী সৈয়দ নাযির হুসায়েন সাহেবের কাছে প্রেরণ করেন। এ সম্পর্কে হযরত মুনশি জাফর আহমদ বলেন :

"এই পত্রে হুযুর লিখেছেন, আগামীকাল তিনি জামে মসজিদে উপস্থিত হবেন। যদি মৌলবী সাহেব না আসেন, তবে খোদার লানৎ হবে। যখন আমি এই পত্র নিয়ে পৌঁছালাম, তখন মৌলবী সৈয়দ নাযির হুসায়েন সাহেব বললেন, 'আপনারা বাইরে গিয়ে মৌলবী মুহাম্মদ হুসায়েন বাটালবীর কাছে বসুন। চিঠিটা তাকে দিন! আমি আসছি।' মৌলবী মুহাম্মদ হুসায়েন চিঠিটি খুললেন। তারপর, মৌলবী সৈয়দ নাযির হুসায়েন সাহেবও আসলেন। তিনি মৌলবী মুহাম্মদ হুসায়েনকে জিজ্ঞাসা করলেন চিঠিতে কি লেখা আছে? মৌলবী মুহাম্মদ হুসায়েন বললেন, 'আমি শুনাতে পারবো না্ আপনাকে অনেক গালি দেয়া হয়েছে। তখন দিল্লীর এক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিও সেখানে উপস্থিত ছিলেন। তিনি বললেন, 'পত্রে তো কোন গালি নাই'। মৌলবী সৈয়দ নাযির হুসায়েন সাহেব তাঁকে বললেন, আপনিও কি মির্যায়ী হয়েছেন? তিনি চুপ রইলেন। আমি মৌলবী সৈয়দ নাযির হুসায়েন সাহেবকে বললাম, 'উত্তর যা দেয়ার দেন'। মৌলবী মুহাম্মদ হুসায়েন বললেন, 'আমরা কোন উত্তর দেব না। তোমরা চলে যাও। তোমরা পত্রবাহক মাত্র। তোমরা পত্র পৌঁছিয়ে দিয়েছো।' আমি বললাম, 'আমি উত্তর নিয়ে যাবো'। তারপর, লোকেরা বলল, 'যানে দো'। বস্তুত:, তারা কোন উত্তর দেননি। আমরা ফিরে এসে সমস্ত ব্যাপার হযরত আকদাসের কাছে ব্যক্ত করলাম। পরদিন আমরা সবাই জামে মসজিদে গেলাম। হযরত সাহেবের সঙ্গে আমরা 'বারজন'[১] ছিলাম। আমরা গিয়ে জামে মসজিদের ভেতরে মধ্যবর্তী দরজায় বসলাম।[২]

---

(১) তাদের কয়েক জনের নাম এই:

১) মুহাম্মদ খাঁ সাহেব, ২) শেখ রহমতুল্লাহ সাহেব, ৩) মুনশি আরোড়া খান সাহেব, ৪) হাফেজ হামেদ আলী সাহেব, ৫) মৌলবী আবদুল করিম সাহেব, ৬) মুহাম্মদ সায়িদ সাহেব (ইনি মীর নাসের নাওয়াব সহেবের ভ্রাতুস্পুত্র ছিলেন, ৭) মুনশি জাফর আহমেদ সহেব, এই রেওয়াত বর্ণনাকারী। বর্ণনাকারী বলেন যে, মনে পড়ে ৮) সৈয়দ আমীর আলী সাহেব এবং ৯) সৈয়দ খাসিয়ত আলী সাহেব শিয়ালকোটিও ছিলেন।

(২) 'আস্হাবে- আহ্মদ', চতুর্থ খণ্ড, ১২৮-১২৯পৃ:।

পরবর্তী ঘটনা হযরত পীর সিরাজুল হক সাহেব নু'মানীর মুখে শুনুন :

“ইতিমধ্যে মৌলবী নাযির হুসায়েন সাহেব এবং তাঁর সাথে মুহাম্মদ হোসেন এবং মৌলবী আব্দুল মজীদ সাহেব প্রমুখ উলামাগণ উপস্থিত হলেন এবং মৌলবী সৈয়দ নাযির হুসায়েন সাহেবকে একটি পৃথক দালানে নিয়ে বসালেন। হযরত সাহেবের সম্মুখে আনা হল না। তারপর, আসরের নামায হল। উপস্থিত ব্যক্তিরা চাইলেন আমরা নামাযে যোগদান করি। কেউ বললো, ‘আসুন, নামায পড়ুন। মৌলবী আবদুল করীম সাহেব বললেন আমরা নামায ‘জমা পাঠ’ (একত্রে পাঠ) করে এসেছি। নামায শেষ হওয়া মাত্র মৌলবীরা মৌলবী সৈয়দ নাযির হুসায়েনকে ঘেরাও করে আবার দালানের উত্তর দিকের দরজার কাছে নিয়ে বসালেন। মৌলবী আবদুল মজীদও কয়েকজন মৌলবী এসে পুলিশ অফিসারের সাথে কথা বলতে লাগলেন। এদিকে (মুনশি) গোলাম কাদের (সাহেব ফসীহ্) অনেক ‘সওয়াল জবাব’ করলেন এবং যা বলা প্রয়োজন ছিল বললেন। মৌলবী আবদুল মজীদ সাহেব পুলিশ অফিসারকে বললেন, ‘এই ব্যক্তি প্রতিশ্রুত মসীহ হওয়ার দাবি করে। আমরা ও আপনারা ভুল পথে আছি বলে মনে করে। হযরত মসীহ্ ইবনে মরীয়মকে আমরা ও আপনারা উভয়েই আকাশে জীবিত আছে বলে বিশ্বাস করি। এ মনে করে তিনি মৃত ব্যক্তিদের মধ্যে একজন মাত্র। বলে যে, মসীহের জীবন ও মৃত্যুর বিষয় নিয়ে মৌলবী নাযীর হুসায়েন সাহেব আলাপ করুন। আমরা বলি, শুধুমাত্র তাঁর ‘মসীহ্ মাওউদ’ হওয়ার দাবি সম্বন্ধে বিতর্ক হোক। গোলাম কাদের সাহেব ফসিহ্ অনেক কথার মধ্যে পুলিশ অফিসারকে বললেন, ‘দেখুন, হুযুর! পদ খালি না হওয়া পর্যন্ত কেউ ওই পদের প্রাপ্তির যোগ্য হতে পারে না। প্রথমে মসীহ'র জীবন ও মৃত্যুর সম্বন্ধে কথাবর্তা হোক। পরে তার মসীহ হওয়া সম্বন্ধে আলোচনা হবে। এখন তো এরা মসীহকে জীবিত মনে করেন। যদি মসীহ জীবিত থাকা প্রমাণিত হয়, তবে তাঁর মসীহ মাওউদ দাবি সম্বন্ধে কথাবার্তা বলা নিস্প্রয়োজন। এই দাবি আপনা আপনিই পণ্ড হয়ে যাবে। যদি মসীহের মৃত্যু হয়েছে বলে প্রমাণিত হয়, তবে তার মসীহ মাওউদ (প্রতিশ্রুত মসীহ) হওয়া নিয়ে আলোচনা করা জরুরি হতে পারে। পুলিশ অফিসার বললেন, ‘নিশ্চয়ই, এটা ঠিক কথা। তোমরা কেন এই বিষয়ে বিতর্ক কর না? সেই অফিসার তো এই বিষয়ের উপর জোর দিলেন। তারপর, ‘কসম’ সম্বন্ধে আলোচনা হল। তারা এই ব্যাপারেও অস্বীকৃতি জানালেন। এবং বললেন, ‘মৌলবী সাহেব বৃদ্ধ হয়েছেন। দুর্বল। অনেক বয়স হয়েছে। আমরাও ‘কসম’ করব না এবং মৌলবী সাহেবকে ও ‘কসম’ করবার জন্য অগ্রসর হতে দেব না।’[১]

(১) ‘তাযকিরাতুল-মাহ্দী’ ৩৪৮-৩৫০ পৃঃ।

হুযুর বলেন, "এই সভায় ঘটনাক্রমে আলীগড়ের অবৈতনিক ম্যাজিষ্ট্রেট খাজা মুহাম্মদ ইউসুফ সাহেবও উপস্থিত ছিলেন। তিনি প্রতিপক্ষের অযথা ওজর আপত্তি শুনে আমাকে বললেন, 'একি সত্য কথা যে, আপনি আহলে সুন্নাৎ-ওয়াল জামাআতের ধর্ম মতের বিরুদ্ধাচরণ করে 'লায়লাতুল-কদর,' 'মুজেযা' মালায়েকা' এবং 'মেরাজ' প্রভৃতি অস্বীকার করেন এবং নবুওতের দাবি করেন?' আমি বললাম :

এসব কথাই আমার ওপর মিথ্যা আরোপ মাত্র। এসব বিষয়েই আমি প্রত্যয় রাখি। এসব ব্যক্তিরা আমার কিতাবগুলো উদ্দেশ্য বুঝতে পারেনি এবং ভুল বুঝার ফলে আমাকে আহ্‌লে-সুন্নতের আকায়েদ অস্বীকারকারী বলে মনে করে।"

যখন তিনি বললেন, আচ্ছা, প্রকৃতই যদি এই ব্যাপার, তবে আমাকে একটি কাগজে তা লিখে দিন। আমি তা সুপারিন্‌টেন্‌ডেন্ট অব্ পুলিশ এবং জন সাধারণকে পাঠ করে শুনাব এবং এর এক কপি আলীগড়েও নিয়ে যাব আমি। তখন বিস্তারিতভাবে এসম্বন্ধে একটি কাগজে লিখে দিলাম। নোট স্বরূপ তা নিম্নে প্রদত্ত হল।[২] খাজা সাহেব তা আদ্যোপান্ত সিটি পুলিশ সুপারিন্‌টেন্‌ডেন্ট সাহেবকে উচ্চ কণ্ঠে পাঠ করে শুনালেন এবং নিকটে যে সমস্ত গণ্যমান্য ব্যক্তিরা ছিলেন, তাঁরাও শুনতে পেলেন।

অত:পর খাজা মুহাম্মদ ইউসুফ সাহেব একথার ওপর জোর দিলেন যে প্রকৃতপক্ষে এইসব ধর্ম-বিশ্বাসে কোন মতবিরোধ নেই। উভয় পক্ষেই এগুলো স্বীকার করেন। সুতরাং এগুলো সম্বন্ধে বাহাসের কোনই প্রয়োজন নেই। উভয়পক্ষ যে বিষয়ে মত-বিরোধ করেন, তাই শুধু তর্কের বিষয়। অর্থাৎ মসিহর জীবিত থাকা বা মৃত্যু হওয়ার মিমাংসা হলে সমস্ত গোলযোগ চুকে যায়। মসিহের জীবিত থাকা প্রমাণিত হলে প্রতিশ্রুত মসীহ্ হওয়ার দাবীও আপনা আপনিই লোপ পায়। বার বার এই অধমের নাম নিয়ে এটাও বললেন,'তিনি নিজেই অঙ্গীকার করেছেন যে, কুরআন ও হাদিসের স্পষ্ট যুক্তি দ্বারা মসীহ জীবিত থাকা প্রমাণিত হলে তিনি মসীহ মাওউদ হওয়ার দাবি ত্যাগ করবেন।"

হযরত আকদাস আরো লিখেছেন :

"যদিও খাজা সাহেব এ বিষয়ের ওপর জোর দিতে লাগলেন যে, প্রতিপক্ষ জেদ,

---

হযরত আকদাসের লিখিত বিবৃতি :

"বিস্‌মিল্লাহির রাহমানির রাহিম-নাহমাদুহু ওয়া নুসাল্লি আলা রসুলিহিল কারিম। প্রকাশ থাকে যে, মতানৈক্যের বিষয়, যার সম্বন্ধে আমি বাহাস করতে চাই তা শুধু এইটুকু যে, মসীহ্ ইব্‌নে মরিয়ম আলাইহেস সালাম জীবিত সশরীরে আকাশে উত্তোলিত হওয়ার দাবি আমার মতে প্রমাণিত কথা নয়। *(চলমান)*

হঠকারিতা ও একচোখামি ছেড়ে মসীহের মৃত্যু সম্পর্কিত বিষয় নিয়ে বাহাস করুন, কিন্তু তার সকল যাবতীয় প্রচেষ্টা ব্যর্থ হল। বাহাসের দিকে আসা শেখুল কুল সাহেবের জন্য মৃত্যুবৎ ছিল। তিনি তা পরিস্কার অস্বীকার করলেন। উপস্থিত শ্রোতাদের মন ভেঙ্গে গেল। আমি শুনেছি, এক ব্যক্তি গভীর দু:খের সাথে বলছিলেন যে, আজ শেখুল কুল দিল্লীর সম্মান বিনষ্ট করলেন। দিল্লী বাসীর মস্তক লজ্জায় ধূলায় লুণ্ঠিত হল। কেউ কেউ বলছিলেন, তাদের এই মৌলবী সত্যের পক্ষে থাকলে নিশ্চয়ই বাহাস করতেন।”

হযরত মুনশি জাফর আহ্‌মদ সাহেব কপুরথলানিবাসি :

“এদিকে এই সব কথাবার্তা চলছিল। অপরদিকে জনতার অসন্তোষ ও বিক্ষোভ বেড়েই চলছে। ইতিমধ্যে ইংরেজ পুলিশ ক্যাপ্টেন হযরত আকদাসকে জিজ্ঞাসা করলেন, আপনার এখানে আসার উদ্দেশ্য কি? শেখ রাহ্‌মতুল্লাহ সাহেব তাকে ইংরেজিতে উত্তর করলেন যে, হযরত আকদাস মির্যা সাহেব মসীহর মৃত্যুর প্রমাণ বর্ণনা করবেন এবং মৌলবী নাযির হুসায়েন সাহেব হলফপূর্বক বলবেন

কুরআন ও হাদিসের স্পষ্ট উক্তি গুলোর মধ্যে স্পষ্ট প্রমাণকারী ও অকাট্য যুক্তি সম্পন্ন কোন একটি আয়াতও নেই এবং সহীহ,মুত্তাসাল্ ও মরফু কোন একটি হাদিসও পাওয়া যায় না, যা দ্বারা মসীহ্ আলাইহেস্ সালামের জীবিত থাকা প্রমানিত হয়। বরং স্থানে স্থানে কুরআন করীমের স্পষ্ট আয়াত সমূহ এবং সহীহ, মুরফু, মুত্তাসাল আহাদিস থেকে তাঁর মৃত্যুই প্রতিপাদিত হয়। আমি এখানে সত্যিকার শরীয়তানুমোদিত একরার করছি যে, যদি হযরত মৌলবী সৈয়দ নাযির হুসায়েন সাহেব মসীহ্ আলাইহেস্ সালামের জীবিত থাকা স্পষ্ট মীমাংসক ও অকাট্য যুক্তি প্রদায়ক আয়াত এবং সহীহ্, মরফু মুত্তাসাল হাদিস দ্বারা প্রমাণিত করেন, তবে আমি ‘প্রতিশ্রুত মসীহ্ হওয়ার অপর দাবি নিজেই পরিত্যাগ করব এবং মৌলবী সাহেবের সামনে ‘তওবা’ করব। বরং এই সংক্রান্ত আমার কিতাবগুলো দগ্ধ করব। আমার বিরুদ্ধে অপর যে সব অভিযোগ করা হয় যে, এই ব্যক্তি‘লাইলাতুল কদর’ অস্বীকার করে, মোজেযা সমূহ স্বীকার করে না এবং নবুওতের দাবি করে ও খাত্‌মে নবুওত অস্বীকার করে এই সমস্তই মিথ্যা অপবাদ ও ছলনা মাত্র। এই সব বিষয়ে আমার ধর্ম-মত তাই, যা অন্য ‘আহ্‌লে সুন্নত ওয়াল জমাতের’ ধর্মমত, আমার কিতাব ‘তৌযিহে মরাম’ ও ‘ইযালায় আওহাম’ থেকে যে সব আপত্তি উত্থাপন করা হচ্ছে, ওই ছিদ্রান্বেষণগুলো সম্পূর্ণ ভ্রান্তিমূলক। এখন আমি নিম্নলিখিত বিষয়গুলো মুসলমানদের সামনে পরিষ্কারভাবে এই ‘খোদার গৃহ’–মসজিদে স্বীকার করছি যে আমি জনাব খাতামুল্ আম্বিয়া সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের ‘খতমে-নবুওত’ বিশ্বাস করি, এবং যে ব্যক্তি ‘খতমে-নবুওয়াত’ অস্বীকার করে, তাকে বেদ্বীন, এবং ইসলামের গন্ডীর বহির্ভূত বলে জ্ঞান করি। সে ভাবেই আমি ‘মালায়েকা’ (ফেরেশতাহ), মুজেযা (অলৌকিক ক্রিয়া) সমূহ এবং ‘লাইলাতুল্ কদর’ প্রভৃতি বিষয়ও মানি।

তার কাছে এখনও মসীহ আলাইহেস সালাম আকাশে জীবিত থাকার প্রমাণ আছে। অত:পর তিনি মৌলবী নাযির হুসায়েন সাহেবের কাছে গিয়ে তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, তিনি কি ওই প্রকার হলফ করতে প্রস্তুত আছেন? তখন তিনি বললেন যে, তিনি কোন প্রকারের হলফ করবেন না। পুলিশসুপার এসে হযরত আকদাসকে বললেন : 'তিনি আপনার যুক্তি, প্রমাণ ও দলিল শুনে হলফ করতে প্রস্তুত নন। এজন্য আপনার চলে যাওয়া উচিত। হযরত আকদাস তা শুনে যাওয়ার জন্য উঠে দাঁড়ালেন। আমি (অর্থাৎ, মুনশি জাফর আহ্মদ কপুরথলবী) হুযুরের হাত ধরে নিবেদন করলাম, 'হুযুর এখন একটু অপেক্ষা করুন।' আমি শেখ রহমতুল্লাহ সাহেবকে বললাম, আপনি পুলিশের সুপার সাহেবকে বলুন, প্রতিপক্ষ প্রথমে বের হোক। আমরা পরে যাব। অত:পর, পুলিশ সুপার সাহেব তাদেরকে যাওয়ার জন্য তাগিদ দিলেন। তারা জেদ ধরলেন যে প্রথমে আমাদের যেতে হবে। যা হোক, এই ব্যাপার নিয়ে কিছু কথাবার্তা চলল। অত:পর সুপার সাহেব উভয় পক্ষকেই এক সঙ্গে যাওয়ার জন্য বললেন। যা হোক, এই প্রকারে আমরা উঠলাম। আমরা 'বার জন' হযরত সাহেবের চতুষ্পার্শে চক্রাকারে দাঁড়ালাম। আমাদের চারপাশে পুলিশ চক্রাকারে দাঁড়াল। আমরা যখন দরজা থেকে বের হলাম, তখন দিল্লীবাসীরা আমরা যে গাড়িতে এসেছিলাম, সেটিকে কোথাও সরিয়ে নিয়েছে। পুলিশ সুপার অনেক কষ্ট করে আমাদেরকে একটি ঘোড়ারগাড়িতে উঠিয়ে দিলেন। কোচওয়ানের বাক্সের ওপর পুলিশ ইন্সপেক্টর, দুটি পাদানিতে দুজন সাব-ইন্সপেক্টর এবং সিপাহীগণ পিছনে একটি গাড়িতে ছিলেন। গাড়ির ভিতরে হযরত আকদাস, খাঁ মুহাম্মদ খাঁ সাহেব, মুনশি আরোড়া খান সাহেব এবং হাফেজ হামেদ আলী ছিলেন। এই খাকসারও ছিলাম। আমাদের গাড়ির ওপর পাথর নিক্ষিপ্ত হচ্ছিল। মৌলবী আবদুল করীম সাহেব আমাদের রওনা হওয়ার সময়ে পিছনে রয়ে যাওয়ায় মুহাম্মদ খাঁ সাহেব গাড়ি থেকে লাফ দিয়ে বের হয়ে পড়লেন। মৌলবী সাহেবের চারপাশে যে সমস্ত লোক ভিড় করছিল, তারা মুহাম্মদ খাঁ সাহেবকে দেখে সরে পড়ল এবং মুহাম্মদ খাঁ সাহেব মৌলবী সাহেবকে নিয়ে গাড়িতে ফিরে আসলেন।"[১]

দিল্লীর উলামাদের কুফরী ফতোয়ার অস্ত্রধারণ এবং উত্তেজনা সৃষ্টি :

দিল্লীর উলামাদের সৃষ্ট উত্তেজনায় শহরের গুণ্ডা ও বদমাশ প্রকৃতির লোকেরা এমন উত্তেজিত হল যে, তাদের শত শত লোক একত্রিত হয়ে হযরত আকদাসের বাড়ি আক্রমণ করল। অন্ত:পুরের দরজা প্রায় ভেঙ্গে যাওয়ার

(১) 'আসহাবে-আহমদ' ১২৯-১৩০ পৃ: (সার সংকলিত)।

উপক্রম হলো। কিন্তু হযরত আকদাসের বিশ্বস্ত মুরিদগণ যথাসময়ে বাধা দেয়ায় তারা কিছু করতে পারলো না। শহরের অলিগলিতে এক প্রকার শিষ্টাচার বর্জিত শোরগোল চলতে লাগল। অশ্লীল ও কুরুচিপূর্ণ বহু ইশতেহার, বৃথা আস্ফালন এবং নির্জলা মিথ্যার বহুল প্রচার হতে লাগল। উলামাদের পক্ষ থেকে হযরত আকদাসের বিরুদ্ধে কুফরের ফতোয়া দিল্লীর বাজারে এবং পথেঘাটে প্রচুর বিতরণ করা হল।

মৌলবী মুহাম্মদ বশীর সাহেব ভুপালবীর সাথে মুবাহাসা ১৮৯১ সালের ২৩ অক্টোবর :

মৌলবী সৈয়দ নাযির হুসায়েন সাহেব দাহ্‌লবী হযরত আকদাসের মোকাবেলায় উপস্থিত হয়ে যে ভীষণভাবে পরাজিত হয়েছিলেন, তা দিল্লীবাসীরা মর্মে মর্মে উপলব্দি করছিল। বিশেষত: আহলে-হাদিস সম্প্রদায় চেষ্টা করতে লাগল, যেভাবে হোক মসীহের জীবন বা মৃত্যুর বিষয় নিয়ে মির্যা সাহেবের সাথে বাহাস করতে হবে। এই উদ্দেশ্যে টুপীর ব্যবসায়ী আলীজানওয়ালাগণ মৌলবী মুহাম্মদ বশীর সাহেব ভুপালীকে মনোনীত করেন। প্রকৃতপক্ষে মৌলবী বশীর সাহেব বদায়ুন জেলাস্থ সাহ্‌ সাওয়ানের বাসিন্দা ছিলেন এবং নবাব সিদ্দিক হাসান খাঁ সাহেবের 'উলামা পরিষদে' চাকরি উপলক্ষে ভুপালে অবস্থান করতেন। সেখানে হযরত সৈয়দ মুহাম্মদ আহসান সাহেব আমরৌহীও চাকরি করতেন। এ দুজনের মধ্যে গভীর বন্ধুত্ব ছিল। হযরত আকদাস মসীহ মাওউদ দাবি করলে তারা দুই জন মিলিত হয়ে পরস্পর মতবিনিময় করতেন। হযরত মৌলবী সৈয়দ মুহাম্মদ আহসান সাহেব দাবির সমর্থনমূলক দিক গ্রহণ করতেন এবং মৌলবী মুহাম্মদ বশীর সাহেব জেরা করতেন। অবশেষে উভয়েই এবিষয়ে একমত হলেন যে, হযরত আকদাসের দাবি সত্য। এতে মৌলবী মুহাম্মদ আহসান সাহেব আমরৌহী সাহসী হয়ে হযরত আকদাসের 'বয়াত' গ্রহণ করলেন। চাকরি শেষ হওয়ায় তিনি ভুপাল থেকে দিল্লী আগমন করেন। এখানে আহলে-হাদিস সম্প্রদায়ের ইমামতি লাভ করেন। দু:খের বিষয়, এ ইমামতি তার পক্ষে সত্য ঐশী-সিলসিলায় দাখিল হওয়ার পথে প্রতিবন্ধক হল। তার পক্ষ থেকে মোবাহাসার আন্দোলন করা হলে হযরত আকদাস তা সানন্দে গ্রহণ করলেন। মৌলবী মুহাম্মদ বশীর সাহেবের এই প্রকারে অগ্রসর হওয়া বাস্তবিক অনেক শ্রদ্ধার বিষয় ছিল। তিনি মৌলবী মুহাম্মদ হুসায়েন সাহেব বাটালবী এবং মৌলবী সৈয়দ নাযির হুসায়েন দাহলবী সাহেবের নীতি ছেড়ে মসীহের জীবন ও মৃত্যু সংক্রান্ত মূল বিষয় সম্বন্ধে বাহাস করা মঞ্জুর করলেন এবং যদিও তিনি 'নুনে সকীলা'র বাহাসেই হাবুডুবু খাচ্ছিলেন, তবু সত্যান্বেষীদের জন্য চিন্তার খোরাক দিলেন।

এই মুবাহাসা ১৮১১ সালের ২৩ অক্টোবর, জুমার নামাজের পর শুরু হয়। তিনটি প্রবন্ধ মৌলবী মুহাম্মদ বশীর সাহেব লিখেছিলেন এবং তিনটি প্রবন্ধ হযরত আকদাসও লিখেছিলেন। উভয় পক্ষের প্রবন্ধগুলো 'মুবাহাসা আল-হক্কে দাহলী' নামে প্রকাশিত হয়। এই কেতাব মসীহের জীবন–মৃত্যু সংক্রান্ত সমস্যার সমাধানে গবেষণার জন্য পথপ্রদর্শকের কাজ করতে পারে।

মৌলবী মুহাম্মদ বশীর সাহেবকে হযরত আকদাসের সম্বোধন :

হযরত পীর সিরাজুল হক সাহেব নু'মানী রাযি আল্লাহু আনহু বলেন যে, মৌলবী মুহাম্মদ বশীর সাহেব তাঁদের বন্ধুদের নিয়ে যখন মুবাহাসা করবার উদ্দেশ্যে হযরত আকদাসের বাসস্থানে পৌঁছে হুযুরের সামনে বসেন, তখন হযরত আকদাস আলাইহেস সালাম মৌলবী সাহেব ও তাঁর সাথীদের সম্বোধন করে বলেন :

"মৌলবী সাহেব, আমি আল্লাহ তাআলার দিব্যসহ বলছি, আমার মসীহ মাওউদ হওয়ার দাবি সত্য, যেমন অন্য নবীদের নবুওয়াত ও রেসালতের দাবি সত্য ছিল। এই দাবির ভিত্তি এই যে, কয়েক মাসব্যাপী আমি বারবার ওহী পেতে লাগলাম, আল্লাহর রসুল মসীহ ইবনে মরীয়ম ওফাত প্রাপ্ত হয়েছেন এবং যে প্রতিশ্রুত মসীহ আসা নির্ধারিত ছিল, তিনিই আমি। আমাকে কাশফ দ্বারা, ইলহাম দ্বারা, রুইয়া দ্বারা ক্রমাগত জানানো হল, বুঝানো হল। তবু আমি একে নিশ্চিত মনে করিনি। কিন্তু কয়েক মাস পর যখন এই বিষয় ধারাবাহিকতা, পুরোপুরি প্রত্যয় এবং 'হক্কুল একীনে'র পর্যায়ে পৌছিল, তখন আমি কুরআন শরীফ খুললাম এবং মনে করলাম যে, আমার এই ইলহামগুলোকে আল্লাহ্র কিতাবের সম্মুখে উপস্থিত করতে হবে। কুরআন শরীফ খোলা মাত্র সুরাহ্ মায়েদার আয়াত فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِيْ বের হলো। আমি তা নিয়ে চিন্তা শুরু করলে আমার ইলহাম, কাশফ ও রুইয়া সমূহকে সত্য বলে পেলাম এবং আমার কাছে সম্পূর্ণ পরিস্কার হয়ে বোধগম্য হল যে, নিশ্চয়ই মসীহ ইবনে মরীয়ম আলাইহেস সালাম ওফাত লাভ করেছেন। তারপর আমি কুরআন শরীফ শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত গভীর মনোনিবেশে অধ্যয়ন করলাম। তখন মসীহের মৃত্যু হওয়া ছাড়া মসীহ আলাইহেস সালাম জীবিত থাকার কোনই প্রমাণ পেলাম না। তারপর , আমি সহীহ বুখারী খুললাম। খোদার কুদরত তার মহিমা! খোলা মাত্র 'কিতাবুৎ-তফসীরে' দুই আয়াত বের হল। একটি اِنِّيْ مُتَوَفِّيْكَ এবং অন্যটি فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِيْ একটির ভাষ্যানুবাদ ইবনে আব্বাস থেকে مُمِيْتُكَ এবং অন্যটির ভাষ্যানুবাদ স্বয়ং আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম থেকে

মজুদ ছিল। অন্য কথায়, বুখারী উভয় আয়াতই যা দু'টি ভিন্ন ভিন্ন স্থানে ছিল এক স্থানে সংকলন করে তাঁর মত প্রকাশ করেছেন যে, এ উভয় আয়াত দিয়ে অন্য কিছু নয় কেবলই মসীহ্র মৃত্যু প্রতিষ্ঠিত হয়। তারপর সমগ্র সহীহ বুখারী প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত এক একটি করে শব্দ পাঠ করলাম। এতেও মৃত্যু ছাড়া সংকেত বা প্রকারান্তরে জীবিত থাকার কোন শব্দ বের হলো না। তারপর আমি সহীহ্ মুসলিম প্রভৃতি হাদিসের সমস্ত কিতাবগুলো প্রতিটি দেখলাম এবং গভীরতর অভিনিবেশ সহকারে এক একটি শব্দ ও একটি অক্ষর পাঠ করলাম। কিন্তু কোথাও মসীহের মৃত্যু ছাড়া জীবিত থাকার লক্ষণ বের হলো না। থাকলো, 'নজুল' সংক্রান্ত হাদিস সমূহ। এসবে কোথাও 'নযুলুম্ মিনাস্ সামা' (আকাশ হতে অবতরণ) নেই। 'নযুলের' সাথে তাঁর জীবিত থাকার সম্বন্ধ কি? যখন তাঁর জীবন এবং 'রাফা ইলাস্-সামা' (আকাশের দিকে উত্তোলন) কোথাও প্রমাণিত হয় না, তখন 'নযুল' (অবতরণ) আবার কিভাবে হয়? 'নযিল' মুসাফেককেও বলে, যেমন এখন আমি দিল্লীতে নযুল (অবতরণ) করেছি।

হযরত আকদাস তখনও বক্তৃতা শেষ করেননি, মৌলবী মুহাম্মদ বশীর সাহেব অস্থির হয়ে বললেন, 'অনুমতি পেলে, আমি এ দালানের দূরবর্তী কোণে বসে কিছু লিখতে পারি'। হযরত আকদাস আলাইহেস সালাম বললেন, 'বেশ তো, আপনি যেখানে ইচ্ছা বসুন'। মৌলবী সাহেব দূরবর্তী এক কোণে গিয়ে বসলেন এবং মুজাদ্দেদ আলী খাঁ দ্বারা প্রবন্ধ লেখা শুরু করলেন। হযরত আকদাস আলাইহেস্ সালাম বললেন, 'কাছে বসে স্বহস্তে নিজ কলমে সঙ্গে সঙ্গে প্রশ্ন ও উত্তর লেখার শর্ত নির্ধারিত হয়েছিল। কিন্তু মৌলবী সাহেব দূরে গিয়ে অন্য কারও মাধ্যমে লেখাচ্ছেন।' আমি বললাম, 'মৌলবী সাহেবকে কিছু বলবো? তিনি বললেন, 'থাক, লিখতে দাও বা লেখাতে দাও।[১]

কপুরথলা নিবাসি হযরত মুনশি জাফর আহ্মদ সাহেব বলেন :

"তারপর, যখন মৌলবী মুহাম্মদ বশীর সাহেব প্রবন্ধ লেখালেন, তখন আমি তা হযরত সাহেবের কাছে পৌঁছালাম। হুযুর আমাকে সেখানেই দাঁড়াতে বলে দু' পৃষ্ঠা লেখা হলে নকল করার জন্য বন্ধুদেরকে দিতে বললেন। আমি দেখলাম হুযুর সেই প্রবন্ধের ওপর একবার চোখ বুলিয়ে গেলেন। তারপর আঙ্গুল রেখে পৃষ্ঠাগুলোর ওপর দৃষ্টিপাত করে তা পৃথক রেখে দিলেন। আমার মনে হচ্ছিল তিনি পাঠ করেননি। শুধু এক নজর সরাসরি দেখেছেন মাত্র। যা হোক, হুযুর তখনই জবাব লেখা শুরু করেন। দু' পৃষ্ঠাকে এক এক পৃষ্ঠা করে একটি মৌলবী

(১) 'হায়াতে-আহমদ', তৃতীয় খন্ড, ১৮২-৮৩ পৃঃ।

আবদুল করীম সাহেব অনুলিপি শুরু করলেন এবং অন্যটি আবদুল কুদ্দুস সাহেব অনুলিপি করতে লাগলেন। এ প্রকারে যখন দু'পৃষ্ঠা প্রস্তুত হত, আমি ওপর থেকে নিয়ে আসতাম এবং তারা অনুলিপি করতে থাকতেন। হযরত সাহেব এত দ্রুত লিখতেন যে, দুই এক পাতা অনুলিপিকারীদের কাছে অবশিষ্ট থাকত। আবদুল কুদ্দুস সাহেব অত্যন্ত দ্রুত লিখতেন। তিনি হয়রান হলেন এবং হাত দিয়ে লেখার কালি দেখে পরখ করতে লাগলেন, তা কি পূর্বেকার লেখা? আমি বললাম, 'যদি তাই হয় তবে তো তা একটি অপূর্ব মোজেযা।'

যা হোক, এভাবে দ্রুত লেখা এবং সঙ্গে সঙ্গে অনুলিপি হতে লাগলো। আমি হযরত আকদাসের জবাবের অনুলিপি মৌলবী মুহাম্মদ বশীর সাহেবকে দিয়ে প্রত্যুত্তর লিখতে বললাম। তিনি হযরত সাহেবের সাথে সাক্ষাৎ চাইলেন। আমি নই, অন্য কেউ হযরত সাহেবকে খবর দিল, মৌলবী মুহাম্মদ বশীর সাহেব সাক্ষাৎ করতে চান। হুযুর তৎক্ষণাৎ আগমণ করলেন। মৌলবী মুহাম্মদ বশীর সাহেব বললেন যে, অনুমতি পেলে তিনি পর দিন জবাব লিখে আনবেন। হুযুর সন্তুষ্ট চিত্তে অনুমতি দান করলেন। মুবাহাসার শেষ পর্যন্ত মৌলবী সাহেবের এটাই রীতি রইলো। তিনি কখনও সামনে বসে লিখতেন না, অনুমতি নিয়ে চলে যেতেন।"[১]

ফেরার পথে পাটিয়ালা গমন :

এই মুবাহাসার পর হুযুর কাদিয়ান ফেরার সংকল্প করলেন। হযরত নাসের নবাব সাহেব এই সময়ে চাকরি উপলক্ষে পাটিয়ালা ছিলেন। এই জন্য হুযুর দিল্লী থেকে পাটিয়ালা যান এবং সেখানে কয়েকদিন অবস্থান করেন। ১৮৯১ সালের ৩০শে অক্টোবর পাটিয়ালার জনৈক মৌলবী মুহাম্মদ ইসহাক সাহেবের সাথে মসীহের জীবন-মৃত্যু সম্বন্ধে আলাপ আলোচনা হয়। মৌলবী সাহেব বললেন, "হাদিসে লিখিত আছে, হযরত মসীহ ইব্‌নে মরিয়ম কয়েক ঘন্টার জন্য নিশ্চয়ই মৃত্যু লাভ করেন। কিন্তু চিরদিনের জন্য নয়। অত:পর, তিনি পুরুজ্জীবিত হয়ে আকাশে গমন করেন।" হযরত আকদাস তাঁকে বুঝালেন যে, কোন ব্যক্তিরই দু'বার মৃত্যু ঘটে না। হযরত মসীহ্ আলাইহেস্ সালাম সম্বন্ধেও কুরআন ও হাদিস থেকে প্রমাণিত হয় না যে, তাঁর দু'বার মৃত্যু ঘটেছিল। তাঁকে আরও বহু দলিল দিয়ে এই কথা বুঝানো হয়েছিল। কিন্তু তিনি জনসাধারণের কাছে গিয়ে তাঁর বিজয় ডঙ্কা বাজাতে শুরু করলেন। এতে হযরত আকদাস একটি

(১) 'আসহাবে আহমদ' চতুর্থ খণ্ড, ১২৪-২৬ পৃ:।

ইশতেহারের মাধ্যমে পাটিয়ালার জনসাধারণের কাছে ঘোষণা করলেন, "যদি মৌলবী সাহেবের বিবৃতি সত্য এবং আমার এই বিবৃতি মিথ্যা হয়ে থাকে, তাহলে মৌলবী সাহেবের কর্তব্য একটি প্রকাশ্য জনসভা করে আমার সাথে বাহাস করেন।" এতে মৌলবী সাহেব নীরব হয়ে গেলেন এবং মোকাবেলায় উপস্থিত হলেন না।[১]

আস্‌মানী ফয়সালা গ্রহণের জন্য আহ্‌বান :

হযরত আকদাস যখন দেখলেন যে, দেশের শীর্ষ স্থানীয় উলামাদের কাছে বিশেষ করে দিল্লীর মত কেন্দ্রীয় শহরে গিয়ে 'ইৎমামে হুজ্জৎ' বা পরিপূর্ণ যুক্তি প্রদান করা হয়েছে এবং উলামাগণ যুক্তি দিয়ে প্রতিযোগিতা ক্ষেত্রে উপস্থিত হতে টাল-বাহানা করছেন। কেউ কেউ মোকাবেলায় উপস্থিত হলেও পার্থিব সম্মান ও প্রভাব-প্রতিপত্তি বিসর্জন দিতে প্রস্তুত নন, তখন তিনি এমন একটি পথ অবলম্বন করলেন, যা ধর্মের প্রাণ এবং যা ব্যতীত কেউ 'আস্‌মানী আত্মার অধিকারী' দাবি করতে পারে না। তিনি উলামাদেরকে আহ্‌বান জানালেন যে, তাঁরা যদি খোদা তাআলার হুযুরে প্রকৃত ধর্ম বিশ্বাসী হয়ে থাকেন, অথবা আসমানের সাথে তাঁদের আধ্যাত্মিক যোগসূত্র থাকে তাহলে তাঁরা যেন উপস্থিত হয়ে স্বর্গীয় সাহায্য প্রাপ্তি বিষয়ে আকদাসের সাথে প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হন। যদি তাঁরা কামেল মুমেন ও মুত্তাকী হয়ে থাকেন, যদি তাঁরা সত্যিকার বিশ্বাসী, পরহেজগার ও ধর্মপরায়ণ হয়ে থাকেন, তাহলে আল্লাহ্‌তাআলা নিশ্চয়ই তাঁদেরকে সাহায্য করবেন। তা না করে, যদি খোদা তাআলা তাঁদেরকে অপমানিত করেন, তাঁদের সঙ্গ পরিত্যাগ করেন এবং ঐশী সাহায্যাবলী হুযুর আকদাসের সাথী হয়, তবে তাঁরা যেন চিন্তা করে দেখেন যে সত্য কার সাথে আছে এবং কে মিথ্যার আশ্রয় গ্রহণ করেছে। তিনি এ প্রসঙ্গে কামেল মু'মিনের চারটি লক্ষণ বর্ণনা করেন :

(১) কামেল মু'মিন আল্লাহ্-তাআলার কাছে থেকে প্রায়ই সুসংবাদ প্রাপ্ত হয়ে থাকেন। অর্থাৎ, তাঁর বা তাঁর বন্ধুদের মনোবাঞ্ছা সম্বন্ধে ঘটনা প্রকাশিত হবার আগে তাঁকে জানান হয়।

(২) কামেল মু'মিনের কাছে এমন সব অদৃশ্য বিষয়সমূহ প্রকাশিত হয় যে, ওই সমুদয়ের সম্বন্ধ শুধু তাঁর নিজের বিষয়ে বা তাঁর সাথে সম্বন্ধ বিশিষ্ট ব্যক্তিদের জন্যই নয় বরং পৃথিবীতে যে সব 'কাযা ও কদর', অর্থাৎ ঐশী মিমাংসা ও বিধান অবতীর্ণ হবার জন্য নির্দিষ্ট হয় বা পৃথিবীর কোন কোন

(১) ১৮৯১ সালে ৩১ অক্টোবর, তারিখের ইশতেহার 'তবলীগে-রিসালত', দ্বিতীয় খন্ড, ৫৬-৫৭ পৃ:।

বিখ্যাত ব্যক্তির ওপর যে সব বিপর্যয় ঘটা নির্ধারিত হয়, তৎ-সম্বন্ধে মনোনীত মু'মিন সংবাদ লাভ করে থাকেন।

(৩) কামেল মু'মিনের অধিকাংশ দোয়া গৃহীত হয় এবং প্রায়ই দোয়া কবুল হওয়ার সংবাদ সময়ের আগে জানানো হয়।

(৪) কামেল মু'মেনের কাছে কুরআন করীমের নিত্য নতুন সুক্ষ্ম তত্ত্ব এবং অন্তর্নিহিত অপূর্ব গুপ্ততাত্ত্বিক বিশেষত্ব সর্বাপেক্ষা অধিক উদ্‌ঘাটিত হয়ে থাকে।

এই চারটি লক্ষণই অন্য সাধারণের তুলনায় কামেল মু'মিনের মধ্যে বেশি থাকে।[১]

এই 'আসমানী ফয়সালা গ্রহণের' জন্য তিনি মৌলবী সৈয়দ নাযির হুসায়েন দাহলবী সাহেব, মৌলবী মুহাম্মদ হুসায়েন বাটালবী সাহেব, মৌলবী আবদুল জব্বার গজনবী অমৃতসরী সাহেব, মৌলবী আবদুর রহমান লেক্ষুকেওয়ালা, মুহাম্মদ বশীর সাহেব ভুপালী, মৌলবী রশীদ আহমদ সাহেব গাঙ্গোহীর নাম বিশেষরূপে এবং ভারতবর্ষের সমগ্র মৌলবী, সাজ্জাদানশীন, সুফি এবং পীরজাদাকে সাধারণভাবে আহ্‌বান জানিয়ে বললেন :

"যদি আপনারা কামেল মু'মিন হয়ে থাকেন এবং আমি নাউযুবিল্লাহ্- 'কাফের', 'মুল্‌হাদ' এবং 'দাজ্জাল' হয়ে থাকি, তবে নিশ্চয় এসব আসমানী, স্বর্গীয় সাহায্যের ব্যাপারে আল্লাহ্-তাআলা আপনাদের সাথী হবেন এবং আমাকে কখনো সাহায্য করবেন না। অথচ, এতে একটি বড় লাভ হবে। আপনারা দিন-রাত চিৎকার করছেন, 'প্রথমে ঈমানের পরিচয় দাও, পরে বাহাস কর'। সুতরাং, আসুন, আমি আমার ঈমান সাব্যস্ত করছি এবং সেই প্রকারে করছি, যা কুরআন ও হাদিসের সম্পূর্ণ অনুমোদিত। অতএব এই তুলাদন্ড বা মাপকাঠি দ্বারাই আপনাদের ঈমানও সাব্যস্ত করতে হবে।" কিন্তু এই চ্যালেঞ্জ কেউ গ্রহণ করলো না।

'কুফরের ফতোয়া' :

উলামারা যখন দেখলেন, তাঁরা হযরত আকদাসের মোকাবেলায় কোনভাবেই কিছু করতে পারছেন না। যুক্তি ও দলিলের ক্ষেত্রেও না, আসমানী সাহায্যের ব্যাপারেও না এবং এর ফলে প্রতিদিন জনগণ তাঁর কাছে বয়আত গ্রহণ করছেন,

(১) 'আসমানী ফয়সালা' দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৪ পৃঃ।

তখন তাঁরা সম্মিলিভাবে ষড়যন্ত্রমূলক এই মিমাংসায় উপনীত হলেন যে, একটি কুফরের ফতোয়া প্রস্তুত করতে হবে। এর ওপর তৎকালীন অখন্ড পাক-ভারত উপমহাদেশের সমস্ত প্রধান প্রধান উলামার সমর্থনমূলক সিলমোহর সংযুক্ত করা হবে। তারপর, তা বহুল প্রচার করা হবে। ফলে যখন মানুষ দেখতে পাবে যে, সমস্ত মৌলবীগণ এক বাক্যে তাঁকে "কাফের" বলে নির্ধারিত করেছেন, তখন কেউ তাঁর কথায় কর্ণপাত করবে না। বস্তুতঃ মৌলবী মুহাম্মদ হুসায়েন বাটালবী সাহেবকে এই কাজের ভার দেয়া হলো। তিনি তৎকালীন সমগ্র অখন্ড পাক-ভারত ভ্রমণ করে দুই শ' মৌলবীর কাছ থেকে 'কুফরের ফতওয়া' সংগ্রহ করলেন। সম্ভবত:, আরবি ও ঊর্দু অভিধান গুলোর এমন কোন জঘন্যতর গালি ছিল না, যা এই সব "উলামায় কেরাম", হযরত আকদাসের জন্য ব্যবহার করেননি। এমন বললে কোন অত্যুক্তি হবে না যে, তাঁরা এমন কিছু কিছু গালিও আবিস্কার করেছিলেন যেগুলো ইতিপূর্বে কোন ভাষায় কোথাও পাওয়া যায় নি। আমরাও এই ফতওয়ার কোন কোন অংশ দেখেছি। কোন ভদ্রলোকের তা পাঠযোগ্য নয়।

মৌলবী মুহাম্মদ হুসায়েন বাটালবী সাহেব এই ভ্রান্ত ধারণার বশবর্তী হয়েছিলেন যে, হযরত আকদাস মির্যা সাহেব যে খ্যাতি ও উন্নতি লাভ করেছিলেন, তা তাঁরই 'বারাহীনে-আহমদীয়ার সমালোচনা এবং উচ্ছ্বিত প্রশংসার ফলেই ঘটেছিল। সে জন্য তিনি দর্প করে বললেন : 'আমিই তাঁকে ওপরে উঠিয়েছিলাম এবং এখন আমিই তাঁকে নিচে নামাব'।[১]

হযরত আকদাস তাঁর কিতাব 'নিশানে-আসমানীতে' উলামাদের এই সব ফতোয়া এবং আল্লাহ্-তাআলার অনুগ্রহরাজি আলোচনা প্রসঙ্গে লিখেছেন :

"এই অধম আল্লাহ্ তাআলার অনুগ্রহসমূহের কৃতজ্ঞতা প্রকাশে অক্ষম। কুফরী ফতওয়ার এমন সময়ে যখন চতুর্দিক থেকে এই জামানার উলামাদের কন্ঠে لَسْتَ مُؤْمِنًا ('তুমি মু'মিন নও) ধ্বনিত হচ্ছে, তখন আল্লাহ্ জাল্লা শানুহুর পক্ষ থেকে বাণী আসছে যে قُلْ اِنِّیْ اُمِرْتُ وَاَنَا اَوَّلُ الْمُؤْمِنِیْنَ ('বল, আমি মামুর' আমি প্রত্যাদিষ্ট হয়েছি এবং আমি সর্ব প্রথমে ইমান এনেছি)। এক দিকে, হযরত মৌলবী সাহেবগণ বলছেন যে কোন প্রকারে এই ব্যক্তির ধবংস সাধন কর। অন্য দিকে ইলহাম হচ্ছে, يَتَرَبَّصُوْنَ عَلَيْكَ الدَّوَائِرَ عَلَيْهِمْ دَائِرَةُ السَّوْءِ ("তারা তোমার ওপর দৈব বিপদ অবতরণের প্রত্যাশায় অপেক্ষা করছে, তারাই দৈব বিপদগ্রস্থ হবে')। একদিকে, তাঁরা আমাকে লাঞ্ছিত, অপমানিত করার চেষ্টা

(১) 'নূর আহমদ;, ১৭ পৃ:।

করছেন। অন্যদিকে খোদা ওয়াদা করছেন,

اِنِّیْ مُهِیْنٌ مَّنْ اَرَادَ اِهَانَتَكَ۔ اَللّٰهُ اَجْرُكَ۔ اَللّٰهُ یُعْطِیْكَ جَلَالَكَ۔

('যারা তোমার অপমান চায়, আমি তাদেরকে অপমানিত করব। আল্লাহ্ই তোমার প্রতিদান। আল্লাহ্ তোমাকে গৌরবমন্ডিত করবেন।') একদিকে মৌলবীরা ফতোয়ার পর ফতোয়া লিখছেন : এই ব্যক্তির সাথে ঐকমত পোষণ এবং এর অনুবর্তিতার দ্বারা মানুষ কাফের হয়। অপর দিকে আল্লাহ্ তাআলা তাঁর এই ইল্হামের ওপর ক্রমাগত জোর দিচ্ছেন যে,

قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُوْنِیْ یُحْبِبْكُمُ اللّٰهُ۔

'বল, যদি তোমরা আল্লাহ্কে ভালবাস, তবে আমার পদাঙ্কানুসরণ কর। তাহলে তিনিও তোমাদের ভালবাসবেন। বস্তুতঃ এই, সকল মৌলবী সাহেবরা খোদা তাআলার সাথে যুদ্ধে অবতীর্ণ হচ্ছে। অচিরেই দেখবে, কার জয় হয়।"[১]

এ স্থলে, তা বিশেষ উল্লেখযোগ্য যে, "ইন্নি মুহিনুম্ মান্ আরাদা ইহানাতাকা" ("আমি তাকে অপমানিত করব, যে তোমার অপমান চাইবে")। এই ইলহাম হযরত আকদাস লাহোরে প্রাপ্ত হন। এটা যদিও সার্বিক, কিন্তু তখন মৌলবী মুহাম্মদ হুসায়েন সাহেব বাটালবীকে উপলক্ষ করেই তা অবতীর্ণ হয়। এই ইল্হাম বার বার কিভাবে পূর্ণ হয়েছে-বর্ণনা করতে হলে দীর্ঘ আলোচনার প্রয়োজন। সংক্ষেপে এর কিছু কিছু বৃত্তান্ত পরবর্তী পৃষ্ঠাসমূহেও পাওয়া যাবে।

বস্তুতঃ বাটালবী সাহেব আল্লাহ্ তাআলার যে 'মামুর' - অর্থাৎ, যে প্রত্যাদিষ্ট ধর্ম-সংস্কারক'তাকে মানহানির অভিপ্রায় করছিলেন, আজ তাঁর প্রতি বিশ্বের দিক্দিগন্ত থেকে দরূদ পাঠ হচ্ছে। পৃথিবীর বিখ্যাত পুরুষরা তাঁর নাম উচ্চারণে তাঁর সম্মানার্থে মস্তক অবনত করেন এবং সে দিন বেশি দুরে নয়, বরং দ্বার প্রান্তে উপস্থিত, যখন পৃথিবীর বাদশাহ্রা তাঁর পরিধেয় বস্ত্র থেকে আশিস অন্বেষণ করবেন। কিন্তু বাটালবী সাহেবের নাম উচ্চারণ করে, এমন কাউকেও পাওয়া যাবে না। কোথায় ছিল সে দিন যখন পাক-ভারত উপমহাদেশের সমস্ত জাতি তাঁর নাম সম্মানের সাথে উচ্চারণ করতো এবং যেদিক দিয়ে তিনি যেতেন, তাঁর সম্মানার্থে মানুষ দাঁড়িয়ে যেত আর কোথায় এই অবস্থা যে আজ তাঁর জীবদ্দশাতেই (হযরত আকদাসকে, নাউযুবিল্লাহ্, অবমাননা করবার অভিপ্রায়ে দাঁড়ানোর পরেই) তাঁর সম্মান ক্রমশঃ কমতে থাকলো। তার সন্তানরা সবাই বরবাদ হলো। সম্পত্তি সমস্তই বিনষ্ট হলো। যখন তিনি বাটালায় প্রাণ ত্যাগ করলেন, তখন বাটালার মুসলমানরা তাঁকে তাঁদের কবরস্থানে দাফন

(১) 'নিশানে-আসমানী' ৩৮-৩৯ পৃঃ।

করতে সম্মতি দেননি এবং তিনি এমন এক কবরস্থানে সমাহিত হন, যার উল্লেখ করতে চাইলেও মুখ থেকে কথা সরে না।[১]

কুফরের ফতোয়া সম্বন্ধে হযরত আকদাসের অভিমত :

যে কুফরীর ফতওয়ার কথা ওপরে বর্ণিত হলো, এই ফতোয়া যখন হযরত আকদাসের কাছে পৌঁছল, তখন তিনি নিম্নলিখিত ঘোষণা প্রকাশ করলেন :

"এই ফতোয়া আদ্যোপান্ত দেখেছি। যে সব অভিযোগ দিয়ে এই ফতোয়া লিখিত হয়েছে, 'ইন্‌শা আল্লাহ্', অতি শীঘ্রই ওই সব অভিযোগ মিথ্যা ও ঘটনা বিরুদ্ধ হওয়া সম্বন্ধে একটি কিতাব এই অধমের পক্ষ থেকে প্রকাশিত হবে। তার নাম হবে, "দাফে'-উল্-ওস্-ওয়াস'।[২] তা সত্ত্বেও এই ব্যক্তিদের অভিসম্পাত ও হাস্য বিদ্রূপ আমার কোনই আক্ষেপ নেই এবং কোন আশঙ্কাও নেই। আমি বরং সন্তুষ্ট হয়েছি, মিয়াঁ নযির হুসায়েন সাহেব, শেখ বাটালবী এবং তাঁদের অনুবর্তিরা আমাকে কাফের,' 'মালাউন', 'দাজ্জাল', 'যাল', 'বেঈমান', 'জাহান্নামী' এবং 'আক্‌ফর' বলে তাঁদের চিত্তের ওই সব আগুন বের করেছেন, যা সততা, সাধুতা এবং খোদাভীরুতার প্রতি লক্ষ্য রাখলে কখনো বের হত না। আমার দাবির পূর্ণ প্রমাণ দেখে এবং সত্যতার তিক্ত স্বাদে এই মহোদয়গণ যতটুকু আহত হয়েছেন, সেই ভীষণ মর্ম ক্ষতের ব্যথা উপশমের জন্য আমাকে অভিসম্পাত করা ছাড়া তাঁদের অন্য কোন উপায়ও ছিল না। আমি এতেও আনন্দ লাভ করছি যে, ইহুদী ফকীহ্ ও মৌলবীরা অবশেষে হযরত মসীহ্ আলাইহেস সালামকে যে উপহার দিয়েছিল, যেমন নাকি আহলে্-কেতাবের ইতিহাস এবং চার ইঞ্জিল থেকে স্পষ্ট জানা যায়। সুতরাং, আমি 'মসীলে-মসীহ্' (মসীহের অনুরূপ) হওয়া অবস্থায় এই সব অভিসম্পাতের কলরব শোনায় আমার বহু আনন্দিত হওয়া উচিত। কারণ, খোদা-তাআলা আমাকে যেমন দাজ্জালিয়তের মূল উৎপাটন ও বিলোপ সাধনের জন্য মসিহী সত্ত্বা দ্বারা গুণান্বিত করেছেন, তেমনি তিনি এই বিষয় সংক্রান্ত যে যে আপদ-বিপদ অবতীর্ণ হওয়ার ছিল, তা থেকেও মুক্ত রাখেননি। কিন্তু যদি কোন দু:খ থাকে, তবে শুধু এটুকু যে, বাটালবী সাহেব এই ফতোয়া প্রস্তুত করতে ইহুদী ফকিহ্ বা ধর্মযাজকদের অপেক্ষাও অধিকতর মিথ্যাচার কাজ করেছেন এবং সেই মিথ্যাচার তিন প্রকারের যেমন :

প্রথমত : কোন কোন ব্যক্তি, যাদের কোন মৌলবীয়ত বা ফতোয়া দানের

(১) 'বিস্তৃত বিবরণের জন্য পাঠ করুন, 'বাতালুবী কা আঞ্জাম,' হযরত মীর মুহাম্মদ কাসেম সাহেব রাযিআল্লাহু আনহু) প্রণীত।

(২) এর অপর নাম, 'আয়নায়ে কামালাতে ইসলাম' (গ্রন্থকার)।

পদাধিকার নেই শুধু কুফুর নির্ধারণকারীদের সংখ্যা বৃদ্ধির জন্য তাদের 'মুফ্তি' বা 'ফতোয়া-দাতা' বলে প্রকাশ করা হয়েছে।

দ্বিতীয়ত : কোন কোন ব্যক্তি- যাদের কোনই ধর্মীয় জ্ঞান নেই এবং প্রকাশ্যতঃ শরীয়ত লঙ্ঘন ও পাপাচারে নিমগ্ন, বরং অত্যন্ত দুষ্ট পাপ কাজ করে–তাদেরকে অত্যন্ত বড় আলেম ও শরীয়তের পাবন্দ বলে ধরে নিয়ে তাদের মোহর সংযুক্ত করা হয়েছে।

তৃতীয়ত : যাঁদের জ্ঞান ও সততা- ইল্ম ও দ্বিয়ানতদারী আছে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে যাঁরা এই ফতোয়ার ওপর মোহরাংকিত করেননি, বাটালবী সাহেব পূর্ণ মাত্রায় চাতুরি ও মিথ্যাচারিতার দ্বারা তাঁদের নামও এতে সংযোজিত করেছেন।

এই তিন প্রকার লোকের সম্বন্ধে আমাদের কাছে লিখিত প্রমাণ বিদ্যমান আছে। যদি বাটালবী সাহেব বা অন্য কোন সাহেবের এতে সন্দেহ থাকে, তবে লাহোরে একটি সভার অনুষ্ঠানপূর্বক আমার কাছে প্রমাণ তলব করুন, যাতে যে-ই মিথ্যাবাদী প্রতিপন্ন হয়, তার মুখ কলিমালিপ্ত হয়। এমনিতে 'তক্ফীর' বা কাউকেও কাফের প্রতিপন্ন করা কোন নতুন কথা নয়। এই মৌলবীদের পিতা, পিতামহাদি পূর্ব-পুরুষধরে এই নীতিই প্রচলিত আছে। এরা কোন সূক্ষ্ম কথা শুনলে তৎক্ষণাৎ বোধশূন্য হয়ে পড়েন। খোদাতাআলা তাঁদেরকে এই বুদ্ধি দেননি যে, কথার গোড়ায় পৌঁছতে পারেন এবং লুক্কায়িত তত্ত্বাবলীর গভীর তথ্য অবগত হতে পারেন। এই জন্য সেগুলো না বুঝেই অন্যকে তাঁরা কাফের নির্ধারণ করবার দিকে ছুটে পড়েন। আউলিয়া কেরামের মধ্যে এমন একজনও নেই, যিনি এদের দেয়া কাফের ফতোয়া থেকে মুক্ত ছিলেন। এমন কি, তাঁরা নিজ মুখে বলেন যে, যখন প্রতিশ্রুত মাহ্দী আসবেন, তখন তাঁকেও মৌলবীরা কাফের নির্ধারণ করবেন। তেমন হযরত ঈসা যখন অবতীর্ণ হবেন, তখন তাঁকেও কাফের প্রতিপন্ন করা হবে। এই সব কথার জবাব শুধু এই: হে হযরতরা, হে মহোদয়রা, আপনাদের কি খোদার কথা স্মরণ হয় না। আল্লাহ্ সুবহানুহু নিজেই তাঁর বান্দাদেরকে এ অনিষ্ট থেকে রক্ষা করে আসছেন। নতুবা, আপনারা তো পিশাচ ডাইনির মত মুহাম্মদীয় উম্মতের তাবৎ মহামান্য আউলিয়াদেরকে ভোজ্য ও পানীয় বস্তুর মত উদরস্ত করতেন। আপনাদের কুবাচ্য থেকে পূর্ববর্তীদেরকেও অব্যাহতি দেননি, পরবর্তীদেরকেও ছাড়েননি। নিজ হাতে আপনারা ওই সব আলামত পূর্ণ করেছেন– যা নিজেরা শিক্ষা দিয়ে আসছেন। আশ্চর্যের বিষয়, আপনারা একজন অন্য জনের প্রতিও সুধরনো পোষণ করেন না। অল্প দিনের কথা, মুয়াহিদরা বে-দ্বীন হওয়া সম্বন্ধে 'মাদারুল্ হক' নামক কিতাবে যথাসম্ভব প্রায় তিন শ' ব্যক্তির সীলস্বাক্ষর সংযুক্ত করা

হয়েছে। সুতরাং, কাফের নির্ধারণ এত সস্তা বলে এই সব কুফর নির্দেশে কেউ ভীত হবে কেন? কিন্তু দু:খের বিষয়, মিয়াঁ নযির হুসায়েন ও শেখ বাটালবী এই কাফের নির্ধারণের ব্যাপারে বহু জালিয়াতি করেছেন এবং নানা প্রকার মিথ্যাচারিতা ও মিথ্যা আরোপ দ্বারা পারলৌকিক মঙ্গল অর্জন করেছেন।”[১]

প্রথম সালানা জল্‌সা, ডিসেম্বর ১৮৯১ সাল :

মসীহ্ দাবির পরবর্তী সময়কালটি হযরত আকদাসের অত্যন্ত কর্মব্যস্ততার মধ্যে কেটেছে। বিরুদ্ধবাদী উলামারা চতুর্দিকে বিরোধিতার আগুন প্রজ্জ্বলিত করে ছিলেন। কিন্তু হযরত আকদাস মহা ধৈর্য ও সাহসিকতায় অটল পর্বতের ন্যায় দন্ডায়মান থেকে বিরোধিতার অগ্নি নির্বাপণে ব্যাপৃত ছিলেন এবং এই উদ্দেশ্যে তিনি দূর দূরান্ত সফর করেছিলেন। আকায়েদ (বা ধর্ম বিশ্বাস) প্রযুক্ত এই যুদ্ধে হুযুর যেমন উন্মুক্ত তরবারি হাতে দন্ডায়মান ছিলেন, তেমনি ‘মুবায়ীন’ বা শিক্ষা দীক্ষা গ্রহণকারীদের দীক্ষার বিষয়েও তিনি অমনোযোগী হননি। ঐশী নির্দেশে হুযুর কাদিয়ানে একটি সালানা জল্‌সার বুনিয়াদ রাখলেন এবং ২৭ থেকে ২৯শে ডিসেম্বর এই জলসার তারিখ নির্ধারণ করেছিলেন। ১৮৯১ সালে সর্বপ্রথম যে জল্‌সা হলো তাতে পঁচাত্তর জন বন্ধু যোগদান করেন। জল্‌সার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে হুযুর আকদাস ৩০শে ডিসেম্বর ১৮৯১ সালে নিম্নলিখিত ঘোষণা প্রদান করেন :

“এই অধমের বয়আতের সিল্‌সিলায় যে সব অকপট চিত্ত মুখ্‌লেসীনরা যোগদান করেছেন, তাঁরা অবহিত হোন যে, ‘বয়আত’ করবার উদ্দেশ্য, যাতে পার্থিব মোহ ভঙ্গ হয়, স্বীয় মাওলা করীম ও রসুল মকবুল সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের প্রেম হৃদয়ে প্রাধান্য লাভ করে এবং এমন নির্লিপ্ত অবস্থার সৃষ্টি হয়, যার মাধ্যমে আখেরাতের সফর অপছন্দনীয় বলে মনে না হয়। কিন্তু এই উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য সংসর্গ লাভ এবং জীবনের একাংশ এ পথে ব্যয় করা অত্যাবশ্যক, যাতে খোদা-তাআলা যদি চান, কোন নিশ্চিত জ্ঞানমূলক প্রমাণ দর্শনের ফলে দুর্বলতা ও আলস্য দূরীভূত হয় এবং পূর্ণাঙ্গীন বিশ্বাস জন্মে, আগ্রহ ও প্রেমাবেগের সৃষ্টি হয়। সুতরাং, এই বিষয়ের প্রতি সর্বদা মনোযোগী থাকা কর্তব্য এবং দোয়া করতে হবে, যেন খোদা তাআলা এই সামর্থ্য দেন। এই সামর্থ্য লাভ না করা পর্যন্ত কখনো কখনো অবশ্যই আমার সাথে সাক্ষাৎ করতে হবে। কারণ, বয়আতের সিলসিলায় প্রবেশপূর্বক সাক্ষাতের জন্য যত্নবান না হলে এমন বয়আত একেবারে বরকত শূন্য এবং শুধু একটা প্রথা বা বাহ্যিক অনুষ্ঠান মাত্র

(১) ‘নিশানে-আসমানী’ হতে উদ্ধৃত। ৪২-৪৪ পৃ:।

হবে। স্বাভাবিক দুর্বলতা, ক্ষমতার অভাব, অথবা দূরের পথ বশতঃ প্রত্যেকের পক্ষে সঙ্গে এসে বাস করা অথবা বছরে কয়েকবার কষ্ট সহ্য করে সাক্ষাতের জন্য আসা সহজ নাও হতে পারে। কারণ, অনেকেরই প্রাণে এখনো এমন আগ্রহ জন্মেনি যে, সাক্ষাতের জন্য কঠিন কষ্ট ও বড় ক্ষতি স্বীকার করতে পারেন। সুতরাং এজন্যই বছরে তিন দিন জলসার জন্য নির্ধারিত করা সমীচীন বলে মনে হয়। যদি আল্লাহ্ তাআলা চান এতে সমস্ত মুখলেস ব্যক্তিরা স্বাস্থ্য ভালো ও ফুরস থাকলে এবং কোন কঠিন বাধা বিঘ্ন উপস্থিত না হলে নির্দিষ্ট তারিখ অনুসারে উপস্থিত হবেন। সুতরাং, আমার বিবেচনায় সে তারিখ ২৭শে ডিসেম্বর থেকে ২৯ শে ডিসেম্বর, আজকের দিনের পর ভবিষ্যতে যদি আমাদের জীবনে ২৭শে ডিসেম্বর তারিখ আসে, তবে শুধু আল্লাহ্র উদ্দেশ্যে রব্বানী বাক্য শ্রবণ এবং দোয়ায় যোগদানের জন্য এই তারিখে যথাসাধ্য উপস্থিত হওয়া প্রত্যেক বন্ধুর কর্তব্য হবে। এই জলসায় এমন গভীর এবং সূক্ষ্ম তত্ত্ব শোনানো হবে, যা ঈমান, একীন ও মারেফাতের তরক্কীর জন্য অত্যাবশ্যক। এছাড়াও ওই সব বন্ধুর জন্য বিশেষভাবে দোয়া করা হবে, বিশেষভাবে মনোযোগ দেয়া হবে এবং পরম দয়ালু আরহামুর রাহেমীনের দরগাহে যথাসাধ্য চেষ্টা করা হবে, যেন খোদা-তাআলা নিজের দিকে তাঁদের আকর্ষণ করেন, তাঁকে গ্রহণ করেন এবং তাঁদের মধ্যে পবিত্র পরিবর্তন সৃষ্টি করেন।[১]

এই সম্মেলন কাদিয়ানের 'মসজিদে-আকসায়' অনুষ্ঠিত হয়। এর কার্য বিবরণী হযরত আকদাসের কিতাব 'ফয়সালা আসমানিতে' সন্নিবিষ্ট আছে। এই সময় লোক সমাগমকে তখনকার অবস্থানুসারে 'জ্বাম্মে-গফীর' বা 'বিপুল জনতা' বলে নির্ধারণ করা হয়। কিন্তু হযরত মসীহে পাক তাঁর পবিত্র হাতে যে জলসার ভিত্তি স্থাপন করেছিলেন, সহস্র সহস্র একাগ্র চিত্ত আশেকগণ বিশ্বের প্রান্ত থেকে আজও এতে সমবেত হন। সহস্র সহস্র স্বেচ্ছাসেবক জলসার ব্যবস্থাপনার কাজে নিয়োজিত থাকেন। বিগত ১৯৫৮ সালের জলসায় প্রায় ৮০ হাজার লোকের সমাগম হয়েছিল। সেই সময় বেশি দূরে নয়, যখন আহ্মদীয়তের প্রেরণায় অনুপ্রাণিত হয়ে লক্ষ লক্ষ ব্যক্তি পরম আগ্রহ ও উদাত্ত চিত্তে বিশ্বের প্রত্যেক দেশ থেকে এই জলসায় যোগদান করবেন। ইন্‌শাআল্লাহ।

১৮৯০-৯১ সালে প্রণীত কিতাব :

'ফতেহ্ ইসলাম' ও 'তৌযিহে মরাম' রচিত হয়ে ১৮৯০ সালের শেষ ভাগে এবং ১৮৯১ সালে প্রকাশিত হয়। এই বছরে সর্বমত-কোষ স্বরূপ একটি কিতাব

(১) 'এই ঘোষণা "আসমানী ফয়সালা' কিতাবের সঙ্গে প্রকাশিত হয়।

'ইযালায়ে আওহাম'ও প্রকাশিত হয়। এর সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা ওপরে করা হয়েছে। 'আস্‌মানী ফয়সলা'ও এই বছরই রচিত ও প্রকাশিত হয়। এই কিতাবের পরিচয় পূর্বের পরিচ্ছদগুলোতে দেয়া হয়েছে।

একজন ইংরেজের ইসলাম গ্রহণ, ১৮৯২ সালের ১৩ই জানুয়ারি :

১৮৯২ সালের ১৩ জানুয়ারি মাদ্রাজ এলাকার একজন সৎহৃদয় ইংরেজ মিঃ ভাইট জন, পিতা- মিঃ জন ভাইট কাদিয়ান দারুল্‌ আমান উপস্থিত হয়ে বয়আত গ্রহণ করেন। এতে হযরত আকদাস অত্যন্ত আনন্দিত হন। কারণ, কিছুকাল পূর্বেই তিনি একটি স্বপ্নে দেখেছিলেন :

"আমি দেখলাম, আমি লন্ডন শহরে একটি বক্তৃতা মঞ্চে দাঁড়িয়েছি। ইংরেজি ভাষায় একটি অত্যন্ত যৌক্তিক ভাষণের মাধ্যমে ইসলামের সত্যতা প্রকাশ করছি। অত:পর, আমি অনেক পাখি ধরলাম। তারা ছোট ছোট গাছের ওপর বসা ছিল। তারা সাদা বর্ণের ছিল। যথাসম্ভব, তিতিরের দেহের মত তাদের দেহ ছিল।

অতএব, আমি স্বপ্নের এই তাৎপর্য মনে করেছি যে, আমি না হলেও আমার লেখাগুলো তাদের মধ্যে প্রভাব বিস্তার করবে এবং বহু সাধু ইংরেজ সত্য গ্রহণ করবেন।[১]

মিঃ ভাইট ইসলাম গ্রহণ করায় এই স্বপ্নের তাৎপর্য কার্যত: পূর্ণ হলো। এতে হুযুর আকদাসের সন্তুষ্ট হওয়া যথার্থ ছিল।

লাহোরের সফর, ২০শে জানুয়ারি ১৮৯২ সাল :

'আস্‌মানী ফয়সালায়' হযরত আকদাস ঘোষণা করেন, উলামা, পীর, ফকির এবং গদ্দীনশীনদের মধ্যে কোন সাহেব যদি 'আসমানী সাহায্য' ব্যাপারে তাঁর সাথে মোকাবেলা করতে চান তবে লাহোর তার জন্য সর্বাপেক্ষা উপযোগী স্থান। এই ওয়াদা পূর্ণ করার উদ্দেশ্যে তিনি জানুয়ারির তৃতীয় সপ্তাহে লাহোর যান এবং মুনশি মীরান বখ্‌শ মরহুমের চুনামন্ডির বাড়িতে অবস্থান করেন।

"১৮৯২ সালের ৩১শে জানুয়ারি, মুনশি মীরান বখ্‌শ সাহেবের বাড়ির সামনে তিনি একটি প্রকাশ্য বক্তৃতা প্রদান করেন। কোন অতিরঞ্জিত কথা নয়, হাজার হাজার ব্যক্তি এই বক্তৃতার সময় উপস্থিত ছিলেন। শিক্ষিত, অশিক্ষিত, শহরের গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ, সরকারি কর্মচারীবস্তুত: সব শ্রেণীর লোকেরা এই বক্তৃতা

(১) 'ইযলায়ে আওহাম', ৫১৫-১৬ পৃ:।

শোনার জন্য সভাস্থলে আসেন। পুলিশ শান্তি রক্ষায় নিয়োজিত ছিল। হযরত আকদাস তাঁর দাবির যুক্তি বর্ণনা করেন। অবশেষে হুযুর বলেন, উলামারা তাঁর সামনে কুরআনের দলিল উপস্থিত করতে না পেরে তাঁর বিরুদ্ধে কুফরের ফতোয়া দিয়েছেন। একজন মু'মিনকে কাফের বলা সহজ। কিন্তু নিজের ঈমান প্রমাণ করা সহজ নয়। কুরআন করীম মু'মিন গয়ের-মু'মিনের কোন কোন লক্ষণ নির্দেশ করেছে। তিনি এই সব 'কাফের' আখ্যাদাতাদেরকে আহ্‌বান করে বলেন, তারা যেন এই লাহোর শহরেই তার এবং তাঁদের ঈমানের মিমাংসা কুরআনে বর্ণিত ফয়সলা অনুযায়ী করে নেন।"[১]

হযরত হাজী-উল্-হারামাইন মৌলানা হাফেজ হাকীম নূরুদ্দীন সাহেব ভেরুবীর বক্তৃতা :

হযরত হাজী-উল্-হারামাইন মৌলানা হাফেজ হাকীম নূরুদ্দীন সাহেব ভেরুবী রাযি আল্লাহ্ আন্হু যিনি পরে হযরত আকদাসের প্রথম খলিফা মনোনীত হয়েছিলেন। তিনি এই সভায় উপস্থিত ছিলেন। হুযুর বক্তৃতা করার পর তাঁকে কিছু বলার জন্য বললেন। এতে হযরত মৌলানা দাঁড়িয়ে বক্তৃতা করলেন :

"আপনারা মির্যা সাহেবের দাবি ও এর দলিল তাঁর মুখে শুনেছেন। আল্লাহ্-তাআলার ওই সমস্ত প্রতিশ্রুতি ও সুসংবাদ শুনেছেন, যা সম্পূর্ণ প্রতিকূল পরিস্থিতির মধ্যে আল্লাহ্ তাআলা তাঁকে দিয়েছেন। আপনাদের এই শহরের অধিবাসীরা আমাকে চেনেন এবং আমার পরিবারকে জানেন। উলামারাও আমার সম্বন্ধে অপরিচিত নন। আল্লাহ্ তাআলা আমাকে কুরআনের জ্ঞান দিয়েছেন। আমি মির্যা সাহেবের দাবি সম্বন্ধে বহু চিন্তা করেছি। তাঁর ইসলামী খেদমতসমূহ লক্ষ্য করেছি অবশ্য, তাঁর বিরুদ্ধবাদিদের অবস্থাও ভেবেছি। কুরআন করীম আমাকে পথ প্রদর্শন করেছে। আমি দেখেছি, তাঁর পূর্ববর্তী আগমনকারীদের যেভাবে মোকাবেলা করা হয়েছিল, এখন তাই করা হচ্ছে। অন্য কথায়, সেই প্রাচীন ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি ঘটে চলছে। আমি 'কলেমা শাহাদত' পাঠ করে বলছি, মির্যা সাহেব সত্যের ওপর আছেন। এই সত্যের সাথে সংঘর্ষকারীরা চূর্ণ বিচুর্ণ হবে। মু'মিন সত্যকে গ্রহণ করে। সত্য বলে বিবেচিত হওয়ায় আমি তা গ্রহণ করেছি এবং হযরত নবী করীমের পুণ্যময় নির্দেশ হচ্ছে, মু'মিন যা নিজের

(১) 'হায়াতে আহমদ,' হযরত শেখ ইয়াকুব আলি সাহেব ইরফানী (রাযিআল্লাহু আনহু) প্রণীত, তৃতীয় খন্ড, ২০৮ পৃঃ।

জন্য পছন্দ করে, তার ভ্রাতার জন্যও তা পছন্দ করে।' সে অনুসারে আমি আপনাদের এই সত্যের প্রতি আহ্বান করছি। 'ওমা আলাইনা ইল্লাল্ বালাগ'- সত্য প্রচার ব্যতীত আমাদের কোনই দায়িত্ব নেই। 'আস্-সালামু আলাইকুম।"

এই বলে তিনি মঞ্চ পরিত্যাগ করলেন। সভা শেষ হলো।"[১]

হযরত আকদাসের চরম আত্মসংযম :

"বহুলোক সমাগম এবং সারাদিন ব্যাপী ভিড় হচ্ছে দেখে মুনশি মীরান বখস সাহেবের বাড়ি ছেড়ে হযরত আকদাস মাহ্বুব রাইয়ানদের এক বিশাল আয়তন ও সুপ্রশস্ত বাড়িতে যান।[২] যদিও হুযুরের লাহোরে অবস্থানের সময়েও লোকেরা বিরোধিতা করেছিল, তবুও তা দিল্লীবাসীদের ন্যক্কারজনক বিরোধিতার মত ছিল না। অবশ্য, একটি ঘটনার উদ্ভব হয়েছিলো। তা হযরত আকদাসের ধৈর্য ও গাম্ভীর্যের পূর্ণাবয়ব চিত্র প্রদর্শন করে।

হযরত শেখ ইয়াকুব আলী সাহেব তুরাব লিখেছেন :

"হযরত আকদাস মজ্লিসে বসে উপস্থিত ব্যক্তিদেরকে শোনাবার জন্য জেনারেল সেক্রেটারী মুনশি শাম্সুদ্দিন সাহেব 'আস্মানী ফয়সালা' পাঠ করতে আদেশ দিলেন। তখনকার পুরাপুরি চিত্র আমার চোখের সামনে ভাসছে। এই মজলিসে তদানীন্তন ব্রাহ্ম ধর্মাচার্য মজুমদার বাবু উপস্থিত ছিলেন। তিনি এগ্জামিনার অফিসের প্রধান কর্মচারী ছিলেন। সদাচার শিষ্টাচারের জন্য তাঁর খুব খ্যাতি ছিল। তিনি জনসেবার কাজে অগ্রণী ভূমিকা রাখতেন। তথাকথিত একজন মুসলমান উপস্থিত হয়ে নেহাৎ অনুপযোগী ভাষা প্রয়োগ ও অশ্লীল গালিগালাজ দ্বারা তার ক্ষিপ্ততার পরিচয় দিল। হযরত তাঁর পাগড়ির বর্ধিত অংশ মুখের ওপর রেখে শুনতে থাকলেন এবং সম্পূর্ণ চুপ থাকলেন। মনে হচ্ছিল তিনি কিছুই শোনেননি। তাঁর চেহারায় কোন প্রকার ঘৃণা বা বিরক্তির চিহ্নমাত্র দেখা গেল না। অবশেষে, ওই ব্যক্তি শ্রান্ত হয়ে আপনিই চুপ করল এবং চলে গেল। উপস্থিত প্রায় সবাই রাগান্বিত হচ্ছিলেন। কিন্তু হযরতের আদব বশতঃ কেউ তাকে বাধা দেয়ার সাহস করেনি। লোকটি চলে যাওয়ার পর মজুমদার বললেন, "আমরা মসীহের সহনশীলতা সম্বন্ধে অনেক কথা পাঠ করেছি এবং শুনেছি। কিন্তু আমরা এখন এই মহান চরিত্রের বিশেষত্ব স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করলাম। তিনি এই প্রসঙ্গে অনেক কিছু বললেন। তাঁর অফিসে আমাদের জামাতের বহু ব্যক্তি

(১) 'হায়াতে-আহমদ', তৃতীয় খন্ড, ২০৯ পৃঃ।
(২) 'মাহবুব রাইয়ান', হিন্দু ক্ষত্রিয় বর্ণের কুল বিশেষের উপাধি ছিল।

ছিলেন। তিনি তাঁদের সবাইকে সমাদর করতেন এবং হযরত মুনশি নবী বখশ সাহেব রাযি আল্লাহু আন্‌হুকে তো বিশেষ শ্রদ্ধার চোখেই দেখতেন। তিনি প্রায়ই এই ঘটনার উল্লেখ করতেন এবং হযরতের চরম আত্মসংযমের প্রশংসা করতেন।[১]"

লাহোরের কোন কোন বন্ধুর বয়আত গ্রহণ :

হযরত শেখ ইয়াকুব আলী সাহেব তুরাব্ (রাযি আল্লাহু আন্‌হু) ও আরো বর্ণনা করেন :

"লাহোরের অধিকাংশ বন্ধুই সে বাড়িতে বয়আত গ্রহণ করেন। আমিও নতুনভাবে বয়আত তাজা করছিলাম। হযরত ডাক্তার মীয়াঁ ইয়াকুব বেগ সাহেব, হযরত মির্যা আইয়ুব বেগ সাহেব, হযরত আবদুল আযীয সাহেব মুঘল ও তাঁর পরিবারের[২] প্রায় সবাই এই সময়ে বয়আত গ্রহণ করেন। এই সব নাম ওই রেজিষ্ট্রারে আছে, যার অধিকাংশ হযরত নিজ কলমে লিখেছিলেন। এর এক কপি আমার কাছেও আছে।"[৩]

মাহ্‌দুবিয়তের দাবীকারীর আক্রমণ :

"এই সময়ে হুযুর আকদাস হযরত মৌলবী রহিমুল্লাহ সাহেবের মস্‌জিদের (লঙ্গেমন্ডিতে হযরত মুনশি চেরাগ দীন সাহেবের বাড়িগুলোর সামনে অবস্থিত ছিল) নামায পড়তেন। একদিন তিনি যোহর অথবা আসরের নামায শেষ করে মসজিদ থেকে বের হয়ে বাড়ির দিকে যাচ্ছেন, এমন সময় পিছন দিক থেকে এসে এক ব্যক্তি সে নিজেকে মাহ্‌দী বলত[৪] এবং 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্ মাহ্‌দী রাসুলুল্লাহ্' কলেমা পাঠ করত- হযরত আকদাসের কোমরে হাত দিল, কিন্তু তাঁকে তুলতে বা ফেলতে পারেনি। হযরত সৈয়দ আমীর আলী শাহ্ সাহেব

---

(১) 'হায়াত আহমদ,' তৃতীয় খন্ড, ২১০ পৃঃ।

(২) হযরত মিয়া আবদুল আযীয সাহেবের কয়েক দিন আগে হযরত মিয়া মে'রাজ উদ্দীন উমর সাহেব বয়আত গ্রহণ করেন। হযরত মিয়া চেরাগ দীন সাহেব হযরত মুঘল সাহেবের পিতা এবং মেরাজ উদ্দীন উমর সাহেবের পিতৃব্য পুত্র ছিলেন। তিনি পরিবারের অধি-কাংশ ব্যক্তিগণের সঙ্গে হযরত মুঘল সাহেবের পরে বয়আত গ্রহণ করেন।

(৩) 'হায়াতে আহমদ,' তৃতীয় খন্ড ২১০ পৃঃ।

(৪) হযরত মৌলবী রহিমুল্লাহ্ সাহেব (রাযি আল্লাহ্ আনহু) লাহোর শহরের সর্বপ্রথম আহমদী ছিলেন। তাঁর প্রচারের ফলে মিয়াঁ পরিবারে সর্বপ্রথম হযরত মিয়াঁ মে'রাজ উদ্দীন উমর সাহেব বয়আত গ্রহণ করেন।

শিয়ালকোটী তাঁকে ধরে আলাদা করলেন। তিনি তাকে মারতে চাইলেন। হযরত মৃদু হাসিসহ বললেন, কিছু বলবে না। সে তো মনে করে যে, আমি তাঁর পদ কেড়ে নিয়েছি। বরাবর বাড়ি পোঁছা পর্যন্ত কিছুক্ষণ পর পর হযরত বার বার ঘুরে ঘুরে দেখছিলেন, কেউ তাকে কষ্ট দেয় না তো! সে সঙ্গে সঙ্গে আসতে লাগল এবং বাড়ির বাইরে থেকে তার বক্তৃতা শুরু করল। এই ব্যক্তি গুজরানওয়ালার এক গ্রামের অধিবাসী ছিল। পয়গম্বরা সিংহ নামে তার ভাই আমাদের জামা'তের একজন প্রসিদ্ধ অকপট বিশ্বাসী ব্যক্তি ছিলেন। অবশেষে তিনি আহ্মদী হন। তিনি লাহোরেই এক মজলিসে হযরত আকদাসের ওপর পুষ্প বর্ষণ করেন এবং তাঁর ওই ভাইয়ের দু:স্কর্মের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করেন। পয়গম্বরা সিংহও এক সময়ে শিখদের গুরু রাম সিংহের অবতার হওয়ার দাবি করতেন। পরে আল্লাহ্-তাআলা তাঁর কাছে ইসলামের সত্যতা প্রকাশ করলে, তিনি একজন মুত্তাকী ও মুখলেস আহ্মদী হয়েছিলেন।"[১]

হযরত মৌলবী সৈয়দ মুহাম্মদ আহ্সান সাহেব আমরোহীর আগমণ-ফেব্রুয়ারি ১৮৯২ সাল :

১৮৯২ সালের ফেব্রুয়ারির প্রথম দিকে হযরত মৌলবী সৈয়দ মুহাম্মদ আহ্সান আমরোহী সাহেব লাহোরে আগমন করেন। সৈয়দ সাহেব মরহুমের কথা ইতিপূর্বে একবার বর্ণিত হয়েছে। তিনি নবাব সিদ্দিক হাসান খাঁ সাহেব ভুপালীর একজন অন্তরঙ্গ বন্ধু এবং আহ্লে-হাদিস সম্প্রদায়ের সুপ্রসিদ্ধ আলেম ছিলেন। তিনি আহমদি সিল্‌সিলায় দাখেল হয়ে প্রথম জীবনে প্রশংসনীয় খেদমত করেন। তাঁরই সম্বন্ধে হযরত আকদাসের ইল্‌হাম হয়েছিল :

از پے آں محمد احسنؓ را تارک روزگارے بینم

"তার সেবায় মুহাম্মদ আহ্সানকে চাকরি থেকে পরিত্যাগ করতে দেখছি"। বস্তুত: মৌলবী মুহাম্মদ আহ্সান আম্‌রোহী এই উদ্দেশ্যেই ভুপালস্থ তাঁর চাকরি পরিত্যাগকরে খোদার মসীহের কাছে উপস্থিত হলেন।"[২]

মৌলবী আবদুল হাকীম কালানুরী সাহেবের সাথে মুবাহাসা :

'ফতেহ্-ইসলাম', 'তৌযিহে মরাম' এবং 'ইযালায়-আউহাম'এ হযরত আকদাস

(১) 'হায়াত আহমদ,' তৃতীয় খন্ড, ২১০ পৃ:।

(২) দ্বিতীয় খেলাফতের সময় মৌলবী মুহাম্মদ আহসান আমরোহী সাহেব পারিবারিক বিপর্যয়ে গয়ের মুবাইনগণের সঙ্গে যোগদান করেন! পরে, তিনি তওবা করেছিলেন।

লিখেছিলেন যে, “মুহাদ্দাস এক অর্থে নবী হয়ে থাকেন।” মৌলবী আবদুল হাকীম কালানুরী সাহেব এই উক্তি নিয়ে তর্ক শুরু করলেন এবং হযরত আকদাসের সাথে তাঁর মুনাযারা হয়। মৌলবী সাহেবের মতে এই বাক্য দ্বারা প্রকৃত নবুওয়াতের দাবি প্রকাশ পায়। কিন্তু হযরত আকদাস বললেন, এই বাক্যের এই অর্থ নয় এবং এর দ্বারা তাঁর প্রকৃত নবুওয়াতের দাবি প্রতিপাদ্য করা অভিপ্রেত নয়। হযরত আকদাস এ প্রসঙ্গে নিম্নবর্ণিত ঘোষণা লিখে দেয়ায় এই মুনাযারা শেষ হলো :

“এই অধমের কেতাব ‘ফতেহ্ ইসলাম’, ‘তৌযিহে মরাম’ এবং ইযালায়-আউহামে’র যে যে স্থানে এই শব্দগুলো পাওয়া যায় যে, ‘মুহাদ্দাস এক অর্থে নবী’ কিংবা ‘মুহাদ্দাসিয়ত আংশিক নবুওয়াত’,-সব স্থানে তা ‘হকিকী বা মৌলিক অর্থে ব্যবহৃত হয়নি। সরলভাবে শব্দগুলো আভিধানিক অর্থে লিখিত হয়েছিল। নতুবা হঠাৎ, কখনো আমি ‘হকিকী’ বা ‘প্রকৃত’ নবুওয়াতের দাবি করিনি; বরং ‘ইযালায়ে-আউহাম’ ১৩৭ পৃষ্ঠায় আমি লিখেছি, ‘এ বিষয়ে আমার ঈমান আছে যে, আমাদের সৈয়দ ও মাওলা-নেতা ও কর্তা-মুহাম্মদ মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম হচ্ছেন ‘খাতামুল্-আম্বিয়া’। সুতরাং, আমি সব মুসলমান ভাইদের কাছে স্পষ্ট বলতে চাই, যদি উল্লিখিত শব্দগুলোর ফলে তারা অসন্তুষ্ট হয়ে থাকেন–তাদের অন্তরে যদি এই শব্দগুলো কষ্ট দেয়, তবে তারা এই শব্দগুলোকে ‘তরমীম’ (সংশোধিত) মনে করে সেই স্থানে আমার পক্ষ থেকে ‘মুহাদ্দাস’ শব্দ থাকা মনে করবেন এবং একে (অর্থাৎ, ‘নবী’ শব্দ) কর্তিত মনে করবেন।[১]

মৌলবী মুহাম্মদ হুসায়েন সাহেব বাটালবীর প্রতি জনশ্রদ্ধার অবনতি শুরু :

ইতিপূর্বে বলা হয়েছে, মৌলবী মুহাম্মদ হুসায়েন সাহেব যখন হযরত আকদাস সম্বন্ধে লিখেছিলেন, ‘আমিই তাঁকে ওপরে উঠিয়েছিলাম এবং এখন আমিই তাঁকে নিচে নামাব’, তখন সেই ‘মুয়িয্-মুযিল্’, সম্মান-দাতা ও লাঞ্ছনা প্রদান, কারী খোদার ক্রোধের আগুন প্রজ্জ্বলিত হলো। তিনি হযরত আকদাসকে সম্বোধনপূর্বক বললেন :

إِنِّي مُهِينٌ مَنْ أَرَادَ إِهَانَتَكَ وَإِنِّي مُعِينٌ مَنْ أَرَادَ إِعَانَتَكَ[২]

অর্থাৎ, “যে ব্যক্তি তোমার অবমাননা করতে চাইবে, আমি তাকে অবমানিত

(১) ‘ইশতেহার, ৩ ফেব্রুয়ারি, ১৮৯২।

করবো এবং যে তোমাকে সাহায্য করার অভিপ্রায় করবে, আমি তাকে সাহায্য করবো"।

অন্য কথায়, এ ইলহামে তাৎপর্য এই ছিলো যে মুহাম্মদ হুসায়েন সাহেবের লাঞ্ছনা শুরু হলো। প্রথম লাঞ্ছনা লুধিয়ানার মুবাহাসাতেই তাকে ভুগতে হয়েছিল। তারপর, তিনি লাহোর পৌঁছালে চিনিওয়ালী মস্‌জিদের ইমামতি থেকে অপসারিত হলেন।[১]

লাহোরে মৌলবী সাহেব হযরত আকদাসের মোকাবেলা করেননি। অবশ্য, উজির খাঁ মস্‌জিদে একটি সভা করেন এ প্রসঙ্গে হযরত শেখ ইয়াকুব সাহেব তুরাব রাযি আল্লাহু আন্‌হু বলেন :

"আমি এই সভায় উপস্থিত ছিলাম। হানাফীরা তো তাঁর প্রতি বীতশ্রদ্ধ ছিলেনই, আহ্‌লে-হাদিসরাও তাঁকে পছন্দ করত না। এই জন্য মৌলবী সাহেবের এই সভায় কাশ্মিরী বাজার এবং উজির খাঁ চকের কিছু লোক সমবেত হয়েছিল। মৌলবী সাহেব মিম্বরের ওপর দাঁড়িয়ে 'তৌযিহে মারাম' প্রভৃতির ওপর আপত্তি করতে থাকেন। লোকেরা কোনই মনোযোগ দেয়নি এবং প্রকাশ্যে বলাবলি করছিল, 'লুধিয়ানা থেকে মুবাহাসায় পরাজিত হয়ে এসে এখন কুফরীর ফতোয়া দিচ্ছে।" এই জনসভা খুব বেশি হলে আধ ঘন্টা পর্যন্ত ছিল। তারপর, বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়ে।"

শিয়ালকোট সফর :

হুযুর আকদাস তখন লাহোরেই ছিলেন। শিয়ালকোটের জামা'ত তাঁকে শিয়ালকোট যাওয়ার জন্য নিমন্ত্রণ করলেন। এ উদ্দেশ্যে তাঁরা বিশেষভাবে হযরত মৌলবী আবদুল করীম সাহেবকে প্রতিনিধি স্বরূপ প্রেরণ করেন। হুযুর তাঁদের নিমন্ত্রণ গ্রহণ করলেন। ১৮৯২ সালের ফেব্রুয়ারি মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে হুযুর শিয়ালকোট যাত্রা করেন এবং হাকীম মীর হুসামুদ্দীন সাহেবের বাড়িতে অবস্থান করেন। শিয়ালকোটের প্রতি তাঁর স্বাভাবিক অনুরাগ ছিল। কারণ, তিনি ১৮৬৪ সাল থেকে ১৮৬৮ সাল পর্যন্ত চাকরি উপলক্ষে সেখানে বাস করেছেন। শিয়ালকোটের অধিবাসীরাও তাঁর পবিত্র জীবন ও ইসলামী উত্তম আচরন

(১) 'হায়াতে আহমদ,' তৃতীয় খন্ড, ২১১ পৃঃ।

নোটঃ- চিনিওয়ালী মসজিদের মুতওয়াল্লী তখন মোল্লা গাউস ছিলেন। তিনি আমাদের প্রসিদ্ধ আহমদী সৈয়দ দেলাওয়ার শাহ সাহেবের মাতামহ ছিলেন। মোল্লা সাহেব যথাসম্ভব ১৯০৪ সালে বয়আত গ্রহণ করেন।

দৃশ্যাবলী দেখে মুগ্ধ ছিলেন। আমরা হুযুরের বাল্যজীবনের আলোচনা প্রসঙ্গে লিখেছি, মৌলবী ফযল আহ্‌মদ মরহুম সাহেব হুযুরের প্রথম শিক্ষকদের মধ্যে একজন শিক্ষক ছিলেন। তাঁর সুযোগ্য পুত্র হযরত আবু ইউসুফ মুবারক আলী সাহেব শিয়ালকোটের উলামাদের মধ্যে এক বিশেষ উচ্চ স্থান লাভ করেন। তিনি সদর বাজার মসজিদের ইমাম ছিলেন। বয়আত গ্রহণপূর্বক তিনি সিলসিলায় প্রবেশ করেন। হযরত মৌলবী আবদুল করীম সাহেব শিয়ালকোটী শিয়ালকোটের মশহুর খতিব এবং ইসলামী গয়রতের মুর্ত প্রতীক ছিলেন। তিনি পূর্বেই হযরত আকদাসের দাবি স্বীকার করেছেন। হযরত হাকীম মীর হুসামুদ্দিন সাহেবের ব্যক্তিত্বের পরিচয় দেয়া অনাবশ্যক। এই তিনজন বুজুর্গের কারণেও শিয়ালকোটবাসী তাঁর প্রতি বিশেষ শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। হযরত হাকীম সাহেবের সকল পরিবার সিল্‌সিলায় প্রবেশ করেন। হুযুর শিয়ালকোটে অবস্থানকালে তাঁরা বিশেষ খেদমত করার পরম সৌভাগ্য লাভ করেন।

হযরত ডাক্তার মীর মুহাম্মদ ইসমাঈল সাহেব বর্ণনা করেন, মীর হামেদ শাহ্ সাহেব শিয়ালকোটী হযরত আকদাসের মসীহিয়তের দাবির শুরুতেই বয়আত গ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু তার পিতা হাকিম মীর হুসামুদ্দিন সাহেব একজন উচ্চাভিমানী ব্যক্তি ছিলেন। তিনি ভাল এতেকাদ (আস্থা) পোষণ করতেন। কিন্তু বয়আতে দাখিল হতেন না। তিনি হযরত মসীহ্ মাওউদ আলাইহেস্ সালাম এর চেয়ে বয়োজ্যেষ্ঠ এবং শিয়ালকোটে চাকরির সময়কার বন্ধু ছিলেন। মীর হামেদ শাহ্ সাহেব সবসময় তাঁকে বয়আত করার জন্য বলতেন। কিন্তু তিনি এড়িয়ে যেতেন। তাঁর বড়ই আত্ম-গৌরব বোধ ছিল। একবার শাহ্ সাহেব তাঁকে কাদিয়ান নিয়ে গিয়েছিলেন। বন্ধু-বান্ধবেরা সবাই জোর দিলেন তিনি সব কিছু বুঝেন। অতএব, বয়আত গ্রহণ করুন। যা হোক, তিনি রাজি হলেন। কিন্তু বললেন, তিনিই এক ধরনের মানুষ। লোকজনের সামনে তিনি বয়আত গ্রহণ করবেন না। গোপনে তাঁর বয়আত নেয়া হোক। মীর হামেদ শাহ্ সাহেব এটিকে বিশেষ ঐশী কৃপা মনে করলেন। তিনি হযরত আকদাসকে অনুরোধ করলে, হুযুর মঞ্জুর করলেন এবং নির্জনে তাঁর বয়আত গ্রহণ করলেন।[১]

মৌলবী মুহাম্মদ হুসায়েন বাটালবীর শিয়ালকোট আগমন :

মৌলবী মুহাম্মদ হুসায়েন বাটালবী সাহেবও তার গর্হিত অভিপ্রায় চরিতার্থের উদ্দেশ্যে, শিয়ালকোট উপস্থিত হলেন। কিন্তু তিনি তখন পৌঁছলেন, যখন হুযুর

(১) 'সিরাতুল-মাহদী,' তৃতীয় খন্ড, ২৫৭-২৫৮ পৃঃ।

ফিরে আমার ইচ্ছা পোষণ করেন। মৌলবী সাহেব লুধিয়ানায় তাঁর পরাজয়ের প্রতিশোধ নেয়ার উদ্দেশ্যে কিছু ব্যক্তিকে হযরত আকদাসের কাছে মুবাহাসার বার্তা দিয়ে পাঠালেন। যারা এই পয়গাম নিয়ে উপস্থিত হন, তাদের মধ্যে রাজস্ব বিভাগের উচ্চপদস্থ কর্মচারী শ্রদ্ধেয় শেখ গোলাম হায়দার সাহেবও ছিলেন। তাদের সামনে লুধিয়ানার মুবাহাসা এবং দিল্লীর ঘটনাবলী উল্লেখ করে হযরত আকদাস বললেন, এখন তো মৌলবী সাহেব তাঁর ওপর কুফরের ফতোয়া দিয়েছেন। এখন মুনাযারায় লাভ কি? এখন মৌলবী সাহেবের কর্তব্য কুরআন করীমের নির্দেশিত মাপকাঠি অনুযায়ী 'আসমানী ফয়সালার' জন্য তার সাহায্যকারী উলামার জামাআতসহ ময়দানে উপস্থিত হওয়া। তারপর দেখুন ঐশী সাহায্য ও আসমানী নিদর্শন কার সঙ্গ দেয়। হুযুর আরও বললেন, "যদি আমি মিথ্যাবাদী বা ভন্ড হয়ে থাকি, তবে খোদাতাআলা নিজেই আমাকে ধ্বংস করবেন। কিন্তু আমি সত্যবাদী হয়ে থাকলে, এই সব উলামারা তাঁদের মনোবাসনা পূর্ণ করতে ব্যর্থ হবেন। আল্লাহ্ তাআলা প্রতি পদক্ষেপে আমার সাহায্য করবেন এবং বিশ্বের কোণে কোণে আমার সত্যতা প্রকাশিত করবেন।"

কপুরথলা সফর :

কপুরথলার বন্ধুদের সাথে হুযুর আকদাসের বিশেষ প্রকারের একান্ত সম্বন্ধ ছিল- বরং বলা উচিত, তারা তার ফিদাহ্ ছিলেন। হযরত আকদাস লাহোর অবস্থানের সময়েও তারা কোন প্রতিনিধি পাঠিয়ে হুযুরের কাছ থেকে কপুরথলা যাওয়ার ওয়াদা গ্রহণ করেন। ইতিপূর্বে আরো দু' বার হযরত আকদাস কপুরথলা গিয়েছিলেন। এবার কপুরথলা যাত্রায় লোকদের আচরণ পূর্ব থেকে ভিন্ন দেখা দিল। এবার সামান্য বিরোধিতা হলো। মৌলবী মুহাম্মদ হুসায়েন বাটালবী সাহেব 'বদ-দোয়ানামা' শিরোনামে একটি ইশ্তেহার সেখানকার মৌলবীদের কাছে প্রেরণ করেন। ওই ইশতেহার হযরত আকদাসের কাছে পৌঁছালে হুযুর দেখলেন, এতে মুবাহাসার চ্যালেঞ্জও আছে। হুযুর বললেন, এ ব্যক্তি লুধিয়ানা মুবাহাসার অনুতাপ মুছবার জন্য এ সমস্ত চাল চালছে। 'আস্মানী ফয়সালার' দিকে আসেন না কেন?"

কপুরথলার জামা'তের বিশেষত্ব :

এখানে অপ্রাসঙ্গিক হবে না, যদি কপুরথলার জামা'তের কোন কোন দেদীপ্যমান বিশেষত্বের কথা আলোচনা করা হয়। এই জামা'ত হুযুরের প্রেমে-তাঁর এশ্কে বিলীন ছিলো। এঁদের কুরবানীও অতুলনীয় ছিল। এই জামা'তেরই সম্বন্ধে

হযরত আকদাস লিখিতভাবে সুসংবাদ দিয়েছিলেন :

“কপুরথলার জামা’ত পৃথিবীতেও আমার সঙ্গে আছে এবং কিয়ামতেও (বা জান্নাতেও) আমার সঙ্গে থাকবে।[১]

অধিক না হলেও এই জামা’তের অন্তত: দুইজন বুজুর্গ অর্থাৎ, হযরত মুনশি জাফর আহমদ সাহেব এবং হযরত মুনশি আরোড়া খাঁ সাহেবের আন্তরিকতা ও প্রেমের একটি ঘটনা পাঠকদের সামনে উপস্থিত না করে পারছি না। লায়েলপুরের আহ্‌মদীয়া জামা’তের আমীর, এ্যাডভোকেট জনাব শেখ মুহাম্মদ আহমদ সাহেবের মহামান্য পিতা হযরত মুনশি জাফর আহ্‌মদ সাহেব রাযি আল্লাহু আন্‌হু বলেন :

“একবার হুযুর লুধিয়ানায় ছিলেন। আমি তার খেদমতে হাজির হলাম। হুযুর বললেন, ‘আপনাদের জামা’ত কি একটি ইশতেহারের খরচ ষাট টাকা বহন করতে পারবে? আমি নিবেদন করলাম ‘পারবে’ এবং কপুরথলা এসে আমার স্ত্রীর স্বর্ণের চুড়ি বিক্রি করলাম। জামা’তের বন্ধুদের মধ্যে কাউকে কিছু বললাম না। ষাট টাকা নিয়ে আমি দ্রুত গেলাম।[২] লুধিয়ানায় পৌঁছে হুযুরের খেদমতে তা হাজির করলাম। কয়েকদিন পর, মুনশি মুহাম্মদ আরোড়া সাহেবও লুধিয়ানা পৌঁছলেন। আমি সেখানেই ছিলাম। তাঁর কাছে হযরত আকদাস বললেন, আপনাদের জামা’ত বড়ই উত্তম পরিস্থিতিতে সাহায্য করেছেন। মুনশি আরোড়া সাহেব বললেন তিনি বা জামাআতের কেউ কিছু জানেন না। তখন মুনশি সাহেব মরহুম জানতে পারলেন আমি (অর্থাৎ, জাফর আহমদ) ওই টাকা শুধু নিজের কাছ থেকে উপস্থিত করেছিলাম। এতে মুনশি সাহেব আমার প্রতি বড়ই অসন্তুষ্ট হলেন এবং হুযুরের কাছে আরজ করলেন, ‘আমাদেরকে না জানিয়ে ইনি আমাদের সাথে ঘোরতর অন্যায় করেছেন। মুনশি আরোড়া খাঁ সাহেবকে হুযুর বললেন, ‘খেদমত করার বহু সুযোগ উপস্থিত হবে। আপনি অস্থির হবেন না।’ তারপর থেকে, মুনশি সাহেব দীর্ঘকালব্যাপী আমার প্রতি অসন্তুষ্ট ছিলেন।”[৩]

এখন হযরত মুনশি আরোড়া খাঁ সাহেবের এশ্‌ক- তাঁর প্রেমের বিষয় শুনুন। হযরত আকদাস খলিফাতুল মসীহ্ সানী আইয়্যেদাহুল্লাহু বেনাস্‌রিহিল আযীয তাঁর খুৎবায় বহুবার বলেছেন, হযরত মসীহ্ মাওউদ আলাইহেস্ সালাতু ওয়াস্ সালামের খেদমতে কিছু স্বর্ণ উপস্থিত করার একান্ত আগ্রহ মুনশি আরোড়া খাঁ

(১) ‘হায়াতে আহমদ’, তৃতীয় খন্ড, ২২৫ পৃঃ।

(২) ‘মাননীয় শেখ মুহাম্মদ আহমদ সাহেব মযহার বলেন যে, তার ওয়ালেদ সাহেব এই শব্দগুলোই ব্যবহার করেছিলেন।

(৩) ‘হায়াতে আহমদ,’ তৃতীয় খন্ড, ২২৩ পৃঃ।

সাহেবের ছিল। তাঁর বেতন ছিল অল্প। এজন্য হযরত আকদাসের জীবদ্দশায় এই আগ্রহ পূর্ণ করতে পারেননি। হুযুরের মৃত্যুর পর একবার তিনি কিছু স্বর্ণ মুদ্রা নিয়ে উপস্থিত হয়ে কাঁদতে কাঁদতে বললেন, আজীবন তিনি হযরত আকদাসের খেদমতে কিছু স্বর্ণ পেশ করার চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু দিতে পারেননি। এখন "আশরাফি" তো পেয়েছেন, কিন্তু হুযুর তো ইহজগতে আর নেই। এখন তিনি অবিরাম কাঁদতে লাগলেন। এত অধিক কাঁদলেন যে, হেঁচকি আসতে লাগলো। আল্লাহ্, আল্লাহ্, কি ইশ্ক-কি প্রেম! হায়, যদি তার পরবর্তী বংশধরের মধ্যেও এই প্রকার দৃষ্টান্ত কায়েম থাকে।

জলন্ধর সফর :

কপুরথলায় দুই সপ্তাহ অবস্থানের পর হুযুর জলন্ধর যাওয়ার সঙ্কল্প করলেন। জলন্ধরে তখন ভীষণ বিরোধিতা চলছিল। এই জন্য হুযুর এই শহরের অধিবাসীদের কাছে সত্যের বার্তা না পৌঁছিয়ে ফিরে যেতে চাইলেন না। হুযুর জলন্ধর পৌঁছে আপন কাজে নিমগ্ন হলেন। কোন কোন ব্যক্তি পুলিশ সুপারের কাছে গিয়ে অভিযোগ করল, একজন মসীহিয়তের দাবিকারী কাদিয়ান থেকে এসে লোকের মধ্যে বড়ই জোরেসোরে প্রচার করছে। তাঁকে বাধা না দিলে শহরে গোলমাল হওয়ার আশঙ্কা আছে। তাঁকে শহর থেকে চলে যাওয়ার আদেশ করা হোক। পুলিশ সুপার একজন ইংরেজ ছিলেন। তিনি অভিযোগ সম্বন্ধে অনুসন্ধান করার জন্য হুযুরের বাসায় উপস্থিত হলেন এবং জলন্ধর আসার কারণ জিজ্ঞাসা করলেন। হুযুর এই জিজ্ঞাসার জবাবে একটি দীর্ঘ বক্তৃতা দিলেন। বক্তৃতা শুনে বিমোহিত হয়ে পুলিশ সুপার তাঁর মুখের দিকে তাকালেন এবং বক্তৃতার শেষে এই বলে সালাম করে চলে গেলেন, 'যত দিন ইচ্ছা এখানে থাকুন, কেউ কোন গোলমাল করতে পারবে না।'[১]

লুধিয়ানা সফর :

জলন্ধরে তিনি বার কি তের দিন অবস্থান করেছিলেন। সেখান থেকে লুধিয়ানায় যাত্রা করেন। সেখানে তিনি 'নিশানে আস্মানী' পুস্তক রচনা করেন। এর অপর নাম 'শাহাদাতুল্-মুল্হামীন'। তারপর, কাদিয়ান ফিরে যান। ১৮৯২ সালের ২৬ মে এই রিসালাহ প্রকাশিত হয়। এর মধ্যে তিনি তাঁর দাবির সমর্থনে উম্মতের আওলিয়াদের কাশ্ফ ও ইলহামসমূহ নিয়ে আলোচনা করেন।

---

(১) 'হায়াতে আহমদ', তৃতীয় খন্ড, ২২৮ পৃঃ।

সফরগুলোর ফল :

(১) এই সব সফরের দ্বারা হুযুর আকদাসের মিশন 'আজীমুশশ্বান' ফল লাভ করলো। লুধিয়ানা ও দিল্লী সফরের ফলে মৌলবী মুহাম্মদ হুসায়েন বাটালবী এবং সৈয়দ নযির হুসায়েন সাহেবের সৃষ্ট উত্তেজনায় দুইশ' মৌলবী তার ওপরে কুফরের ফতোয়া প্রয়োগ করে। তাদের এই ফতোয়ার প্রচার এবং বিরোধিতামূলক বক্তৃতা হুযুর আকদাসের দাবি দেশের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে পৌছে দিলো।

(২) কুরআনের বাণী -

يٰحَسْرَةً عَلَى الْعِبَادِ مَا يَأْتِيهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ [১]

"আক্ষেপ, আমার বান্দাদের প্রতি! যে রসুলই তাদের মধ্যে এসেছেন, তাঁর প্রতি তারা হাসি ও বিদ্রূপাত্মক আচরণ করেছে।" এই চিরাচরিত রীতি অনুসারে জনসাধারণের হাঙ্গামা, চিৎকার, গোলমাল সৃষ্টি ও গালিগালাজ থেকে এটাই প্রমাণিত হলো, তাঁর প্রতিও যে এমন ব্যবহার করা হয়েছিল, তা আল্লাহ্ তাআলার চিরন্তন বিধান অনুসারেই হয়েছিলো এবং তাঁর প্রেরিত ও প্রত্যাদিষ্ট হওয়ার দাবি বাস্তবিকই সত্য।

(৩) এই সব সফরের সময় দেশের কোন কোন ক্ষমতাশালী ব্যক্তি, যাঁরা তাঁদের 'তাক্ওয়া-তাহারত', পবিত্রতা ও পুণ্যশীলতার জন্য বিখ্যাত ছিলেন-তাঁর কাছে বয়আত গ্রহণের সৌভাগ্য লাভ করেন। এইভাবে এই সব সফরের মাধ্যমে অনেক জামা'ত কায়েম হয়।

(৪) হাজার হাজার ব্যক্তি তাঁর দর্শন লাভ করল এবং তাঁর পবিত্র মুখ থেকে তাঁর দাবির দলিল সমূহ শুনল।

সত্যান্বেষণকারীদের জন্য 'রুহানী তবলীগ' :

ইতিপূর্বে ওপরে আমরা বর্ণনা করেছি, হুযুর তাঁর দাবি সম্বন্ধে জনসমাজকে অবহিত করার জন্য মৌখিক বক্তৃতা প্রদান করেন, ইশতেহার প্রকাশ করেন, মুনাযারা ও মোকাবেলা করেন, 'আস্মানী ফয়সালার' জন্য আহ্বান করেন এবং উম্মতের আউলিয়া ও মুলহামদের সাক্ষ্যসমূহও তাঁর সত্যতার প্রমাণস্বরূপ উপস্থাপন করেন। এছাড়াও, এমন একটি মিমাংসার পন্থাও তিনি পেশ করলেন, যা পবিত্র হৃদয়ের অধিকারীদের জন্য অধিকতর লাভজনক হতে পারে। তাহলো

(১) 'সুরাহ ইয়াসীন', রুকূ ২।

এস্তেখারা'র মাধ্যমে সোজাসুজি খোদা তাআলা থেকে হুযুরের দাবির সত্যতা সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করা। হুযুর বলেন :

এখানে এটাও তবলীগ রূপে লিখছি, সত্যান্বেষণকারীরা, যাঁরা খোদা তাআলার জিজ্ঞাসাকে ভয় করেন, তাঁরা তহ্কীক না করে এই জামানার মৌলবীদের কাছে যাবেন না। আখেরী জামানার মৌলবীদের সম্বন্ধে পয়গম্বরে খোদা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম যেমন ভয়ের নিদর্শন উপস্থিত করেছেন, তেমনই ভয় করতে থাকবেন এবং তাদের ফতোয়াগুলো দেখে অস্থির হবেন না। কারণ, এই ফতোয়া কোন অভিনব বস্তু নয়। যদি এই অধমকে সন্দেহ করেন, বা যে দাবি এই অধম করেছি, সেই সম্বন্ধে মনে সন্দেহ উপস্থিত হয়, তবে আমি একটি সহজ উপায় সন্দেহ দূর করার স্বার্থে বলছি, যার মাধ্যমে একজন প্রকৃত সত্যান্বেষণকারী ইন্শাআল্লাহ্ সান্ত্বনা লাভ করতে পারেন এবং তাহলো এই :

"প্রথমত:, 'তাওবা নসুহা' করে রাতে দুই রাকাআত নফল নামায পড়বেন। প্রথম রাকাআতে 'সুরা ইয়াসীন' এবং দ্বিতীয় রাকাআতে একুশ বার 'সুরা ইখলাস' পাঠ করবেন। তারপর, তিনশ' বার 'দরুদ শরীফ' এবং তিনশ' বার ইস্তেগফার' পাঠ করে খোদা তাআলার কাছে দোয়া করবেন, "হে কাদির করীম, সর্বশক্তিমান, দয়ালু খোদা! তুমি গুপ্ত বিষয় জান। আমি জানি না। মরদুদ মিথ্যাবাদী ভন্ড, কিংবা সত্যবাদী কেউ তোমার দৃষ্টি থেকে আত্মগোপন করে থাকতে পারে না। সুতরাং, আমি মিনতি করি, এই যে ব্যক্তি প্রতিশ্রুত মসীহ্ মাহ্দী এবং জমানার ইমাম হওয়ার দাবি করেছেন–তাঁর অবস্থা কি? তিনি কি সত্যবাদী, না মিথ্যাবাদী? 'মকবুল', না 'মরদুদ'? তোমার দরগাহে গৃহীত, না পরিত্যক্ত? তোমার অনুগ্রহের দ্বারা এই অবস্থা স্বপ্ন, কাশ্ফ বা ইল্হাম দ্বারা আমার কাছে প্রকাশিত কর, যাতে যদি সে মিথ্যা হয়ে থাকে তাকে গ্রহণ করে গুমরাহ্ না হই এবং 'মকবুল' হয়ে থাকলে এবং তোমার পক্ষ থেকে হয়ে থাকলে, তাঁকে অস্বীকার করে এবং তাঁর অবমাননা করে যেন ধ্বংস না হই। আমাদেরকে সর্ব প্রকার ফিৎনা ও অশান্তি থেকে রক্ষা কর। যাবতীয় শক্তি তোমারই। আমিন!

"এই 'ইস্তেখারা' অন্তত: দুই সপ্তাহ করবেন। কিন্তু উন্মুক্ত মন নিয়ে। কারণ, হিংসা এবং কু–ধারণার বশবর্তী ব্যক্তি যদি ওই ব্যক্তির অবস্থা জানতে চায়–যাকে সে অত্যন্ত মন্দ বলে জ্ঞান করে, তবে শয়তান উপস্থিত হয়ে তার হৃদয়ে অবস্থানরত অন্ধকার অনুযায়ী নিজ থেকে আরো অন্ধকারাচ্ছন্ন ভাবধারা তার হৃদয়ে উদ্রেক করে। এইভাবে তার অবস্থা পূর্বাপেক্ষাও অধিকতর শোচনীয় হয়ে পড়ে। সুতরাং, যদি আপনি আল্লাহ তাআলার কাছ থেকে কোন খবর জানতে চান, তবে হিংসা ও শত্রুতা আপনার হৃদয় থেকে সম্পূর্ণভাবে দূরীভূত

করুন এবং সর্ব প্রকার কু–ধারণা থেকে মনকে পরিষ্কার করে - হিংসা ও প্রেম উভয় দিক থেকেই পৃথক হয়ে তাঁর কাছে হেদায়াতের আলো প্রার্থী হোন। নিশ্চয়ই তিনি তাঁর প্রতিশ্রুতি অনুসারে তাঁর কাছ থেকে আলো অবতীর্ণ করবেন। এতে নাফসানী বা প্রবৃত্তিমূলক কোন ধোঁয়া থাকবে না।"

"সুতরাং, হে সত্যান্বেষণকারী! এই সব মৌলবীদের কথায় পড়বেন না! উঠুন, কিছু 'মুজাহাদা' দ্বারা সেই সর্বশক্তিমান, পরম পথপ্রদর্শকের কাছে সাহায্যপ্রার্থী হোন। দেখুন, আমি এখন এই 'রুহানী তবলীগ'ও করলাম। ভবিষ্যৎ আপনাদের ইচ্ছাধীন। 'যে হেদায়েত পালন করে তার ওপর শান্তি বর্ষিত হোক'- 'ওয়াস্-সালামু আলা মানিত্ তাবাআল্-হুদা'। প্রচারক- গোলাম আহ্মদ, আফা আন্হু।"[১]

হযরত মৌলবী আবদুল করীম সাহেবের হিজরত :

হযরত মৌলবী আবদুল করীম সাহেব শিয়ালকোটী প্রায়ই হযরত আকদাসের খেদমতে হাজির হতেন। কিন্তু ১৮৯২ সালের শেষ ভাগে তিনি জন্মভূমি শিয়ালকোট থেকে হিজরত করে স্থায়ীভাবে কাদিয়ান আগমন করেন। হযরত মৌলবী সাহেব বহু সদ্গুণের অধিকারী ছিলেন। উর্দু, ফারসি ও আরবি এই তিন ভাষায় তাঁর শুধু বুৎপত্তিই ছিল না, এই তিন ভাষাতেই মাতৃভাষার ন্যায় বক্তৃতা করার মত পুরোপুরি দক্ষতাও তাঁর ছিল। ইংরেজি ভাষাতেও তাঁর যথেষ্ট দখল ছিল। কুরআন করীম এমন সুকণ্ঠে পাঠ করতেন, অমুসলমান পথিকও তাঁর চিত্তাকর্ষক ললিতকণ্ঠ শোনার জন্য দাঁড়িয়ে যেত। কুরআন করীমের অন্তর্নিহিত জ্ঞান ও আধ্যাত্মিক তত্ত্বসমূহ বর্ণনায় তাঁর নৈপুণ্য ছিল অসাধারণ। ধর্মের প্রতি তাঁর বিশেষ মর্যাদাবোধ ছিল। লেখা ও বক্তৃতা উভয় ব্যাপারেই সুনিপুণ ছিলেন। অতিশয় মধুর অথচ বলিষ্ঠ কণ্ঠস্বর ছিল। হযরত মসীহ্ মাওউদ তাঁর প্রতি একান্ত অনুরক্ত ছিলেন। হযরত আকদাসের কোন কোন কিতাব ফারসি ভাষায় অনুবাদ করার সৌভাগ্যও তিনি লাভ করেন। দৃষ্টান্ত স্বরূপ, 'আয়নায়ে-কামালাতে ইসলামের' আরবি অংশের ফারসিতে 'আততবলীগ' অনুবাদ তিনিই করেছিলেন। উর্দু 'আইয়ামুস সুলাহ্' ফারসিতে অনুবাদ তিনিই করেছেন। বহু জলসায় হযরত আকদাসের লিখিত বক্তব্য তিনি পাঠ করার সুযোগ লাভ করেছিলেন। লাহোরের বিখ্যাত ধর্মীয় সর্বধর্ম সম্মেলনে হযরত আকদাসের বক্তৃতা যা ধর্ম সংক্রান্ত মৌলিক পাঁচটি প্রশ্নের উত্তর স্বরূপ লিখিত হয়েছিল এবং

(১) 'নিশানে আসমানী,'রিয়াযে হিন্দ প্রেস, অমতসরে মুদ্রিত ৩৮-৪১ পৃ:।

'ইসলামী ওসুল কি ফিলসফি' নামে প্রসিদ্ধি লাভ করেছে, তিনিই ওই প্রবন্ধ পাঠ করে শুনিয়েছিলেন। তাঁর স্বভাবে পৌরুষভাব পূর্ণমাত্রায় পরিস্ফুট ছিল। আজীবন জামাআতের 'ইমামুস্ সালাত' ও 'খতীব' ছিলেন। আল্লাহ্ তাআলা ইলহাম দ্বারা তাঁকে "مسلمانوں کے لیڈر" "মুসলমানদের নেতা" বলে অভিহিত করেছে।

اللّٰھم ارحمہ و نوّر مرقدہٗ۔

১৮৯২ সালের রচিত গ্রন্থাবলী :

(১) 'নিশানে-আসমানী' প্রণয়ন ও প্রকাশ। এই কিতাবের বিষয়াবলীর গুরুত্ব পূর্ববর্তী পৃষ্ঠার বর্ণনা থেকেই বুঝা যায়।

(২) 'আয়নায়ে-কামালাতে-ইস্‌লাম' প্রণয়ন শুরু হয়।

১৮৯২ সালের জলসা সালানা :

১৮৯২ সালেও দেশের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত তাঁর বিরুদ্ধে তুমুল বিরোধিতা চলতে থাকে। কিন্তু তাঁর শিষ্যদের সংখ্যা খোদা তাআলার ফযলে দিনে দিনে বাড়তে থাকে। ফলে ১৮৯২ সালের সালানা জলসায় ৩২৭ (তিনশ' সাতাশ) জন বন্ধু যোগদান করেন। হযরত আকদাস ছাড়াও এই জলসায় হযরত হাকিম হাফেজ মৌলানা নূরুদ্দীন সাহেব বক্তৃতা করেন। সেই সময়ে ইদানিং কালের মত 'মজলিসে মশাওরত' বা আহমদিয়া পরামর্শ সভা সম্মেলন পৃথক তারিখে হত না। যে জন্য উপস্থিত ধর্মীয় প্রয়োজনগুলো নির্বাহের জন্য এক প্রকার পরামর্শ সভাও জলসার দিনগুলোতেই অনুষ্ঠিত হত। ১৮৯২ সালের ২৮শে ডিসেম্বর তারিখে ইউরোপ ও আমেরিকার প্রতি ধর্মীয় সহানুভূতি প্রকাশ করে নিম্নলিখিত প্রস্তাবগুলো গৃহীত হলো :

"ইসলামের প্রধান প্রধান জরুরি বিষয় ও ইসলামের আকায়েদগুলোর আলোকোজ্জ্বল চেহারা যৌক্তিকভাবে প্রদর্শনার্থে একটি পুস্তক রচনা ও মুদ্রণ করে ইউরোপ ও আমেরিকায় এর বহু কপি প্রেরণ করা হোক। তারপর, কাদিয়ানে নিজস্ব ছাপাখানা স্থাপনের প্রস্তাব উত্থাপিত হলো। ওই সব বিশিষ্ট আহমদীদের একটি তালিকা উপস্থাপন করা হলো, যাঁরা এই প্রেস স্থাপনের উদ্দেশ্যে অর্থ সাহায্য পাঠাতে থাকবেন। এই সিদ্ধান্তও গৃহীত হলো যে, হযরত মৌলবী সৈয়দ মুহাম্মদ আহ্‌সান সাহেব আমরোহী এই সিলসিলার ওয়ায়েয নিযুক্ত হবেন এবং পাঞ্জাব ও আর্যবর্তের সফর করবেন। তারপর মঙ্গল কামনাপূর্বক দোয়া করা হলো।"[১]

---

(১) '১৮৯২ সালের সালানা জলসার রিপোর্ট, 'আয়নায় কামালাতে ইসলাম' হতে গৃহীত।

১৮৯২ সালের সালানা জলসায় হযরত মীর নাসের নওয়াব সাহেবের যোগদান :

হযরত মীর নাসের নওয়াব সাহেব এ যাবত পুরোপুরিভাবে সিলসিলার সাথে সংযুক্ত হননি। তিনি বরং কোন কোন বিষয়ে সন্দিহান ছিলেন। জলসায় যোগাদনের জন্য তাঁকে হযরত আকদাস পত্রযোগে আমন্ত্রণ জানান। এর ফলে, খোদা তাআলার অনুগ্রহে তাঁর যাবতীয় সন্দেহ দূরীভূত হলো এবং সন্দেহ মুক্ত হয়ে বিশুদ্ধ চিত্তে হুযুরের কাছে বয়আত গ্রহণ করলেন।"[১] فالحمد لله على ذالك

'আয়নায়ে কামালাতে ইসলাম' প্রকাশ, ফেব্রুয়ারি ১৮৯৩ সাল :

হযরত আকদাস বিভিন্ন সফরে লোকদের কাছে ওয়াদা করেন যে, শীঘ্রই তিনি 'দাফে-উল্ ওয়াস্ওয়াস্' নামক একটি পুস্তক লিখবেন এবং এতে ওই সমস্ত আপত্তির জবাব দেয়া হবে, যা স্বল্পবুদ্ধি, সংকীর্ণচেতা ইসলামের দাবিদাররা তাঁর বিরুদ্ধে করছিল। এই প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করার জন্য হুযুর ১৮৯২ সালের শেষদিকে এই পুস্তক প্রণয়ন শুরু করেন এবং ১৮৯৩ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে তা প্রকাশিত হয়। এই পুস্তকে ইসলামের সৌন্দর্য এবং কুরআন করীমের মাহাত্ম্য বর্ণিত হয়েছিল বলে তা সম্পূর্ণ প্রস্তুত হওয়ার পর এর নাম হুযুর রাখলেন 'আয়নায়ে কামালাতে ইসলাম', যদিও এর অপর নাম 'দাফে-উল্-ওয়াস্ওয়াস্'ও থাকলো।

এই পুস্তকের ঘোষণার্থে হুযুর ১৮৯২ সালের ১০ আগস্ট একটি ইশতেহার প্রকাশ করেন। এই ইশ্তেহারে পুস্তকের বিষয়বস্তুর সুবিস্তৃত পরিচিতি দানের পর হুযুর লিখেন :

"বস্তুত: এই পুস্তকে ঐসব দুর্লভ এবং অতিশয় সূক্ষ্ম গবেষণা রয়েছে, যা প্রতিটি মুসলমান সন্তানের জন্য একান্ত প্রয়োজনীয় এবং বর্তমান সময়কালের আধ্যাত্মিক বিষুচিকার যে বিষাক্ত জীবাণু জগতকে ধ্বংস করে চলেছে, তা থেকে রক্ষা করার জন্য এই কিতাবটি আরোগ্যদায়িনী সুধা স্বরূপ। এই কিতাব মানব হৃদয়ের বাইরের এবং ভেতরের উভয় প্রকার বিপ্লবেরই সংশোধন করবে বলে যতটুকু আমার ধারণা–আমি নিশ্চিতভাবে প্রত্যয় রাখি যে এই পুস্তক ইসলাম, কুরআন করীম এবং হযরত সৈয়দনা ও মাওলানা খাতামুল আম্বিয়া সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের কল্যাণসমূহ বিশ্বের কাছে প্রকাশের একটি উৎকৃষ্ট আশিস সমৃদ্ধ উপায় বটে।"[২]

(১) বিস্তৃত জানার জন্য 'হায়াতে-নাসের' এবং 'আয়নায়ে-কামালাতে ইসলাম' দ্রষ্টব্য।
(২) 'তবলীগে রিসালত,' দ্বিতীয় খণ্ড, ১১৬ পৃঃ।

এই পুস্তক প্রণয়নে দুইবার রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের জিয়ারত :

এই পুস্তক এতই বরকতময় ও আশিসযুক্ত তা প্রমাণের আবশ্যকতা নেই। এ প্রসঙ্গে হুযুর বলেন যে :

"এই পুস্তক প্রণয়নের সময় আমি দু'বার রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের 'জিয়ারত' (দর্শন) প্রাপ্ত হই এবং তিনি এই পুস্তক প্রণয়নে অত্যন্ত প্রীতি প্রদর্শন করেন। এক রাতে এটাও দেখেছি যে একজন ফেরেশতা উচ্চস্বরে লোকদেরকে এই পুস্তকের দিকে আহ্বান করে বলছেন -

هٰذَا كِتَابٌ مُّبَارَكٌ فَقُوْمُوْا لِلْإِجْلَالِ وَ الْإِكْرَامِ-

অর্থাৎ, 'এই পুস্তক কল্যাণময়, এর সম্মানার্থে দাঁড়াও" ।১

'আত-তাব্লীগ :

এই পুস্তকের সাথে হযরত মৌলবী আব্দুল করীম সাহেব শিয়ালকোটী তাহ্রীক করায় হুযুর ইসলামের আধ্যাত্মিক সম্প্রদায়- ফকির ও পীরজাদাদের প্রতি আহ্বান করেন এবং তাদের জন্য ইৎমামে হুজ্জতের উদ্দেশ্যে একটি পত্র প্রকাশ করেন। প্রথমত: পত্রটি ঊর্দুতে লেখার খেয়াল হুযুরের ছিল। কিন্তু কোন কোন ইলহাম-সঙ্কেত থেকে জানা গেল যে, এই পত্র আরবিতে রচিত হওয়া উচিত এবং এতে ইলহাম হলো যে, এই সব ব্যক্তির ওপর এর সামান্যই ক্রিয়া প্রকাশিত হবে। তবে, 'ইৎমামে হুজ্জৎ' বা প্রতিযোগিতামূলক প্রবল সম্পূর্ণিক যুক্তি দানের কার্য সম্পাদিত হবে। এতে হুযুর সেই পত্র লিখলেন। তা 'আত্-তাব্লীগ' নামে 'আয়নায় কামালাতে ইস্লামের' সাথে সংযোজিত হলো। পুস্তকের এই অংশ আরবি ভাষায় হযরত আকদাসের সর্বপ্রথম রচনা। পদ্য ও গদ্য উভয় প্রকার রচনা নিয়ে এই মহাতত্ত্ব বিশিষ্ট পুস্তকটি প্রকাশিত হলো।

মহারাণী ভিক্টোরিয়াকে ইসলামের প্রতি আহ্বান :

ফকির এবং মাশায়েখদেরকে ইৎমামে হুজ্জৎ করার সঙ্গে সঙ্গে হুযুর মহারাণী ভিক্টোরিয়াকেও আরবিতে একটি তবলিগী পত্র লিখলেন। এই পত্রে মহারাণীকে ইসলাম গ্রহণ করার জন্য আহ্বান জানানো হয়। মহারাণী বহু ধন্যবাদসহ এই

---

(১) 'যিমিমা, আয়নায় কামলাতে ইসলাম,' প্রথম সংস্করণ, ৪ পৃ:।

পত্রের প্রাপ্তি স্বীকার করেন এবং হযরত আকদাসের আরো গ্রন্থাবলী চেয়ে পাঠান।

পাদ্রীদের উদ্বেগ :

আল্লাহ্‌র মহিমা এই সময়েই ইংল্যান্ডের পাদ্রী মহলেও চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হলো। খ্রিষ্টান ধর্মের বিরুদ্ধে ভারতবর্ষে উত্থিত এই অভূতপূর্ব আন্দোলনের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি দেয়ার প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হলো। কারণ এই আন্দোলনের প্রবর্তক যেভাবে ইসলামকে পেশ করেন, তাতে খ্রিষ্টান ধর্ম-কর্তারা মহাবিপদের আশংকা করতে লাগলেন। ১৮৯৪ সালে লন্ডনে পাদ্রীরা একটি বিশ্ব কনফারেন্স আহ্বান করলেন। এই কনফারেন্সে গ্লোসেষ্টারের লর্ড বিশপ রেভারেন্ড চার্লস জোন একিকোট গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করে বললেন :

“ইসলামে এক প্রকার নবজাগরণের আবির্ভাব ঘটেছে। অভিজ্ঞ ব্যক্তিরা আমাকে বলেছেন, বৃটিশ শাসিত ভারতে আমাদের সামনে এক প্রকার নতুন ইসলামী অভ্যুত্থান শুরু হয়েছে। এই দ্বীপপুঞ্জেও কোথাও কোথাও এর প্রতিক্রিয়া পরিলক্ষিত হচ্ছে। এই জাগরণ ওই সকল অভিনব বিষয়বস্তুর ভীষণ বিরোধী, যেগুলোর ওপর ভিত্তি করে আমরা মুহাম্মদের (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) ধর্মকে ঘৃণা করি। এই নতুন ইসলামের ফলে মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) আবার সেই প্রাথমিক সময়কার গৌরব অর্জন করছেন। এই সব নতুন পরিবর্তন সহজেই ধরতে পারা যায়। তারপর, এই নতুন ইসলাম শুধু রক্ষণমূলকই নয় আক্রমণাত্মকও বটে। বড়ই দু:খের বিষয়, আমাদের কারো কারো মন এই ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট হচ্ছে।”[১]

গ্লোসেস্টরের লর্ড বিশপ তাঁর বক্তৃতায় আশঙ্কা প্রকাশ করেন যে, নিশ্চয়ই হযরত আকদাসের পুস্তক ‘ইযালায়ে আওহাম’, ‘আয়নায়ে কামালাতে ইসলাম’ এবং উল্লিখিত খ্রিষ্টান মিশনারী বিশ্ব কনফারেন্সের প্রাক্কালে প্রকাশিত ১৮৯৩ সালে অমৃতসরে অনুষ্ঠিত মুবাহাসার কার্যবিবরণী ‘জঙ্গে মুকাদ্দাস’,- (শীঘ্রই যার আলোচনা করা হবে) পাঠের ফলে বুদ্ধিমান খ্রিষ্টান মাত্রই অনুরূপ আশঙ্কার উদ্রেক হওয়া স্বাভাবিক। কারণ, এই সব পুস্তকে মসীহ্‌র মৃত্যু ঘোষিত হওয়ায় মসীহ্‌র ঈশ্বরত্ব, মসীহ্‌র ঈশ্বর-পুত্রত্ব, ত্রিত্ববাদ এবং প্রায়শ্চিত্তবাদ সম্পূর্ণভাবে খন্ডিত হয়। তারপর, এই পুস্তকগুলোতে ইসলামের প্রকৃত বিশুদ্ধ রূপ এমনই সুস্পষ্টাকারে বর্ণিত হয়েছে যে, তাতে অমুসলমান সমালোচকদের যুক্তিসঙ্গত

(১) ‘পাদ্রীদের কনফারেনস অফিসিয়াল রিপোর্ট, ১৮৯৪ সাল, ৬৪ পৃঃ।

আপত্তি করার কোনই কারণ নেই। সত্যি কথা, যদি প্রাচ্যবিদরা ন্যায়পরায়ণভাবে হযরত আকদাসের প্রদর্শিত ইসলাম পাঠ করেন, তবে ইসলাম গ্রহণ ব্যতীত তাঁদের কারো গত্যন্তর থাকে না।

হযরত সাহেবজাদা মির্যা বশীর আহমদ সাহেবের জন্ম, ২০শে এপ্রিল ১৮৯৩ সাল :

১৮৯৩ সালের ২০ এপ্রিল, হযরত আকদাসের এক পুত্র হযরত সাহেবজাদা মির্যা বশীর আহ্মদ সাহেব (সাল্লামাহু রাব্বুহু) জন্মগ্রহণ করেন। হযরত সাহেবজাদা সাহেবের জন্মের চার মাস আগে হযরত আকদাস আলাইহেস্ সালাম আল্লাহ তাআলার এই ইলহামগুলো ভবিষ্যদ্বাণী স্বরূপ প্রকাশ করেন :

يَاتِیْ قَمَرُ الْاَنْبِیَآءِ وَ اَمْرُكَ یَتَاَتّٰی۔ یَسُرُّ اللّٰهُ وَجْهَكَ وَیُنِیْرُ بُرْهَانَكَ۔
سَیُوْلَدُ لَكَ الْوَلَدُ وَیُدْنٰی مِنْكَ الْفَضْلُ۔ اِنَّ نُوْرِیْ قَرِیْبٌ۔

অর্থাৎ, “নবীদের চাঁদ আসছে এবং তোমার কাজ হবে। আল্লাহ্ তাআলা তোমার মুখমন্ডল আনন্দে পূর্ণ করবেন এবং তোমার যুক্তিসমূহকে আলোকমালায় সুশোভিত করবেন। শীঘ্রই তোমার একপুত্র জন্মগ্রহণ করবে এবং ফযল (বিশেষ অনুগ্রহ) তোমার নিকটবর্তী হবে। অবশ্যই আমার আলোক সন্নিকট।”[১]

মৌলবী মুহাম্মদ হুসায়েন সাহেব বাটালবীকে আরো একটি জ্ঞানমূলক ও আধ্যাত্মিক মোকাবেলার জন্য আহ্বান :

ইতিপূর্বে বলা হয়েছে, হযরত আকদাস ইসলামের আধ্যাত্মিকতা সংরক্ষণের দাবিদার পীর ফকির সাহেবানের ওপর ‘ইৎমামে হুজ্জতের’ জন্য আরবি ভাষায় ‘আত-তাবলীগ’ শীরোনামে একটি পত্র প্রকাশ করেন। মৌলবী মুহাম্মদ হুসায়েন সাহেব বাটালবী এই পত্র পেয়ে তাঁর জ্ঞানের গভীরতা প্রকাশার্থে এই চিঠিকে একটি বৃথা বাজে জিনিস বলে নির্দেশ করলেন। তাঁর ‘ইশাআতুস্ সুন্নাহ্’ পত্রিকায় তিনি হযরত আকদাসকে “আরবী বিদ্যাশূন্য”, “কুরআনের জ্ঞান সম্বন্ধে অপরিচিত” এবং নাউযু বিল্লাহ্ মিন্ যালেকা “দাজ্জাল”, “কায্যাব” বলে নির্ধারণ করলেন। হযরত আকদাস তো সত্যের প্রচারের জন্য সর্বদা সুযোগের অপেক্ষা করতেন। তিনি তৎক্ষণাৎ একটি ইশ্তেহার প্রকাশ করে মৌলবী সাহেবকে আরবি ভাষায় প্রতিযোগিতাপূর্বক তফসীর লিখার জন্য আহ্বান

(১) ‘আয়নায়ে কামালাতে ইসলাম,’ ২৬৬-৬৭ পৃঃ, ‘তিরয়াকুল-কুলব, ‘নযুলুল মসিহ’

হযরত সাহেবজাদা মির্যা বশীর আহমদ (রা.)

করলেন এবং ভাষা জ্ঞান প্রতিযোগিতা স্বরূপ আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের মর্যাদা বিষয়ক একটি ফসিহ্ ও বলীগ কাসিদা লেখার জন্য আহ্বান করে ঘোষণা করলেন, "যদি মৌলবী মুহাম্মদ হুসায়েন সাহেব কুরআন করীমের সূক্ষ্মতত্ত্ব বর্ণনা, ফসিহ্ বলীগ আরবি লেখা এবং 'না'তে' কবিতা রচনায় বিচারকদের মতে তাঁর ওপর প্রাধান্য লাভ করেন, বা তাঁর সমকক্ষ হন, তবে তিনি তৎক্ষণাৎ তাঁর অন্যায় স্বীকার করবেন এবং তাঁর রচিত গ্রন্থগুলো পুড়িয়ে ফেলবেন। কিন্তু যদি মৌলবী সাহেব তাঁর সাথে প্রতিযোগিতা করতে অক্ষম হন, তবে তাঁর কর্তব্য হবে তাঁর পুস্তকগুলো পুড়ে ফেলে হযরত আকদাসের হাতে বয়আত করা।[১]

হযরত আকদাসের এই ইশতেহারের উত্তরে মৌলবী মুহাম্মদ হুসায়েন বাটালবী সাহেব যদিও মহাজ্ঞান গৌরব প্রকাশপূর্বক লিখলেন তিনি প্রত্যেক বিষয়ে তাঁর সাথে প্রতিযোগিতা করতে প্রস্তুত, কার্য্যতঃ কোন বিষয়েই মোকাবেলার জন্য ময়দানে উপস্থিত হলেন না এবং হুযুরের মৃত্যু পর্যন্ত প্রত্যেক 'রুহানী ও ইল্‌মী', 'জ্ঞানের ও আধ্যাত্মিক' প্রতিটি প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রেই পলায়ন করতে লাগলেন।

অমুসলমানদেরকে মুবাহাসার আহ্বান :

প্রকাশ থাকে এই ধর্মীয় মোকাবেলা হযরত আকদাস শুধু মুসলমানদের সাথে করেননি। মুসলমানদের ধর্ম-বিশ্বাস, তাদের আচার-আচরণও প্রথার সংশোধনার্থে তো তিনি আগমন করেছেনই-তাঁর আগমনের আর একটি অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল অমুসলমানদের কাছে ইসলামের সৌন্দর্যরাজি প্রকাশপূর্বক তাদেরকে ইসলামের প্রতি আহ্বান করা। সুতরাং, মুসলমান উলামাদের ভ্রান্ত ধারণাসমূহ দূরীভূত করার সাথে সাথে এই উদ্দেশ্যটির প্রতিও সর্বদা তার দৃষ্টি নিবদ্ধ থাকতো। খ্রিষ্টান ও আর্য সমাজীদের সঙ্গে মোকাবেলার সম্বন্ধে আমরা ইতিপূর্বে আলোচনা করেছি। 'বারাহীনে আহমদীয়া' প্রকাশের পূর্বেও তিনি অপর ধর্মের দর্শনসমূহের খন্ডনে বহু মূল্যবান প্রবন্ধ লিপিবদ্ধ করেন। তাদের মহাবিজ্ঞ প্রধানদের সঙ্গে মুবাহাসা করেছেন। তাদেরকে নিদর্শন প্রদর্শনার্থে সদা প্রস্তুত ছিলেন। কিন্তু তারা মিমাংসার কোন পন্থাই অবলম্বন করেননি। এখন শেষ প্রতিযোগিতার জন্য শেষ আহবান করে তাদের উদ্দেশ্যে বলেন :

"এখন, অবহিত হোন। খোদা তাআলার ফযলে আমার অবস্থা এই যে, আমি

(১) ১৮৯৩ সালের ২০ শে মার্চ্চের, ইশতেহারের সারমর্ম।

শুধু ইসলামকেই সত্য ধর্ম বলে জানি এবং অন্য ধর্মগুলোকে বৃথা ও আগাগোড়া প্রতারণা বলে মনে করি। আমি দেখেছি, ইসলাম পালনের ফলে আমার মধ্যে জ্যোতির উৎস প্রবাহিত হচ্ছে। শুধু রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের প্রেমের ফলে আমি ঐশী বাক্যালাপ এবং দোয়া কবুলিয়তের সেই সর্বোচ্চ মর্যাদা লাভ করেছি, যা সত্য নবীর অনুবর্তিতা ছাড়া অন্য কেউ লাভ করতে পারে না। যদি হিন্দু খ্রিষ্টান প্রভৃতি ধর্মাবলম্বীরা তাদের মিথ্যা উপাস্য বস্তু বা জীবগুলোর কাছে দোয়া করতে করতে প্রাণত্যাগ করে, তবু তারা সেই মর্যাদা লাভ করতে পারে না যে ঐশী বাণীকে অন্যেরা কাল্পনিক মনে করে, আমি তা শ্রবণ করে থাকি। আমাকে দেখানো হয়েছে, জানানো হয়েছে, বুঝানো হয়েছে যে পৃথিবীতে শুধু ইসলামই সত্য এবং আমার কাছে তা প্রকাশ করা হয়েছে যে '***এই সমস্ত কিছুই হযরত খাতামূল আম্বিয়া সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের অনুবর্তিতার কল্যাণে তুমি প্রাপ্ত হয়েছ এবং যা প্রাপ্ত হয়েছ, তার দৃষ্টান্ত অন্য ধর্মসমূহে নেই। কারণ সেগুলো বৃথা।***'

"এখন যদি কোন সত্যান্বেষী থাকে- সে হিন্দু, অথবা খ্রিষ্টান, আর্য, ইহুদী, ব্রাহ্ম, অথবা অন্য যেই হোক, তার জন্য মহাসুযোগ উপস্থিত। সে আমার সাথে মোকাবেলার জন্য দন্ডায়মান হোক। যদি সে গায়েবের (অদৃশ্য) বিষয়সমূহ প্রকাশ এবং দোয়া কবুল হওয়ার ব্যাপারে আমার সাথে প্রতিযোগিতা করতে পারে, তবে আমি দাবির সাথে বলছি আমার যাবতীয় স্থাবর সম্পত্তি–যার মূল্য প্রায় দশ হাজার টাকা হবে- তাকে সমর্পণ করব, অথবা যেভাবে তিনি চান, সেভাবে ক্ষতিপূরণ করে তাকে প্রবোধ দিব।

বিশেষত: খ্রিষ্টানদেরকে সম্বোধন করে হুযুর আকদাস বললেন :

"যদি আপনারা বলেন যে আপনারা আমার সাথে প্রতিযোগিতা করবেন না এবং বিশ্বাসিগণের লক্ষণও আপনাদের মধ্যে অনুপস্থিত, তবে ইসলাম গ্রহণের শর্তে এক পক্ষের খোদা-তাআলার কাজ দেখুন করুন। আপনাদের মধ্যে খ্যাতনামা, নেতৃস্থানীয় এবং জাতীয় সম্মানিত ব্যক্তিদের কর্তব্য তাঁরা সবাই অথবা তাঁদের কোন একজন আমার সাথে প্রতিযোগিতা করেন এবং প্রতিযোগিতার ক্ষমতা না থাকলে, মানুষের অসাধ্য কোন ক্রিয়া দর্শনে ঈমান আনয়ন করতঃ এবং ইসলাম গ্রহণের অঙ্গীকারে আবদ্ধ হয়ে আমার কাছে নিদর্শন দর্শনের আবেদন করেন এবং এই অঙ্গীকারকে মুসলমান হিন্দু, খ্রিষ্টান, প্রত্যেক ধর্মের চারজন করে অর্থাৎ বারোজনের প্রমাণসহ সাক্ষ্য সম্বলিত মুদ্রিত ইশতেহার প্রকাশ করে আমাকেও প্রেরণ করেন। খোদা তাআলা মানুষের সাধ্যাতীত তাঁর কোন আশ্চর্য মহিমা

প্রদর্শন করলে তাদেরকে ইসলাম গ্রহণ করতে হবে এবং গ্রহণ না করলে বিকল্প নিদর্শন এই হবে, আমি আমার মহামান্য খোদা-তাআলার কাছে প্রার্থনা করব, যাতে এক বছরের মধ্যে ঐসব ব্যক্তির ওপর কোন ভীষণ ধ্বংসাত্মক আপদ অবতীর্ণ করেন, যথা-কুষ্ঠ, রোগঃ অন্ধত্ব অথবা মৃত্যু। যদি এই প্রার্থনা কবুল না হয়, তাহলেও সর্ব প্রকার ক্ষতিপূরণ- যা ধার্য করা হয়–দিতে আমি বাধ্য থাকব।

"এই একই শর্ত আর্য মহোদয়দের খেদমতেও পেশ করা হচ্ছে। যদি তাঁরা তাঁদের বেদকে খোদা তাআলার বাক্য বলে জ্ঞান করেন এবং আমাদের পবিত্র কেতাব কালামুল্লাহ্‌কে মানুষের উদ্ভাবিত ও ঐশীবাণী বলে প্রচারিত মিথ্যা রচনা মনে করেন, তবে তাঁরা মোকাবেলায় উপস্থিত হোন। মনে রাখবেন তাঁরা মোকাবেলার সময় অত্যন্ত লাঞ্ছিত হবেন। তাঁদের মধ্যে নাস্তিকতা এবং যথেচ্ছাচারমূলক চালাকি সর্বাপেক্ষা অধিক। কিন্তু খোদাতাআলা নিদর্শন প্রদর্শন করবেন যে, তিনি আছেন।

"যদি প্রতিযোগিতা না করেন, তবে এক তরফা নিদর্শন দেখার জন্য বিনা শর্তে আমার কাছে আসুন। খোদা-তাআলার পক্ষ থেকে আমার নিদর্শন হওয়ার পক্ষে যথেষ্ট যে, এমন আর্য–যিনি কোন নিদর্শন দর্শন করেন- অবিলম্বে মুসলমান না হলে আমি তাঁর জন্য বদ দোয়া করব। তারপর, যদি এক বছরের মধ্যে তিনি কুষ্ঠ, অন্ধত্ব, বা মৃত্যুর দৈব বিপদ দ্বারা আক্রান্ত না হন তবে সর্ব প্রকার শাস্তি ভোগের জন্য আমি প্রস্তুত আছি। অন্যান্য ভদ্রলোকের জন্যও এগুলোই শর্ত। যদি আমার প্রতি এখনো মনোনিবেশ না করেন, তবে খোদা-তা'লার 'হুজ্জৎ' অর্থাৎ প্রতিযোগিতামূলক উপায়ে খোদা-তাআলার পক্ষে প্রবল যুক্তি দান সমাপ্ত হলো। দুঃখের বিষয়, কোন অমুসলমানই এই মুবাহালার আহ্বানকে গ্রহণ করেনি।

'বারাকাতুদ্-দোয়া' প্রণয়ন, ২০ এপ্রিল ১৮৯৩ সাল :

ভারতবর্ষের একজন প্রসিদ্ধ উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন মুসলিম নেতা, আলীগড় বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা স্যার সৈয়দ আহ্‌মদ খাঁ মরহুম একজন একান্ত মুসলিম দরদী ও সুযোগ্য রাজনৈতিক পথপ্রদর্শক ছিলেন। কিন্তু পশ্চাত্য ভাব ধারায় প্রভাবিত হয়ে তাঁর এই ধারণা জন্মেছিল যে, দোয়া একটি উপাসনা মাত্র। এতে জাগতিক কোন লাভ হয় না। অবশ্য পরকালে এর পুণ্য ফল পাওয়া যাবে। কারণ আমরা অধিকাংশ স্থলেই দেখতে পাই যে দোয়ার ইচ্ছানুরূপ ফল হয় না। এটাও ধারণা ছিল যে, 'ওহী' বাইর থেকে আসে

এমন কোন জিনিস নয়। তাঁর মনের মধ্যেই এর উৎপত্তি।

প্রকাশ থাকে যে, দু'টি বিশ্বাসই অত্যন্ত সাংঘাতিক ও ইসলামী শিক্ষার একান্ত পরিপন্থী। এই জন্য হযরত আকদাস স্যার সৈয়দ আহমদ মরহুমের এই সব মতের বিরুদ্ধে 'বারাকাতুদ্ দোয়া' নামে একটি ক্ষুদ্র পুস্তক রচনা করেন। এতে লেখেন, স্যার সৈয়দের উল্লিখিত বিশ্বাস এমন যে, যার মাধ্যমে স্রষ্টা ও সৃষ্টের পারস্পারিক সম্বন্ধ একেবারে ছিন্ন হয়ে যায়। এছাড়াও, তিনি এই পুস্তকে 'ওহীর' স্বরূপ সম্বন্ধে তাঁর অভিজ্ঞতা ও পর্যবেক্ষণের দিক থেকে একটি বিস্তারিত বক্তব্য লিপিবদ্ধ করেন এবং দোয়া কবুল হওয়া সম্বন্ধে লেখরামের মৃত্যু সম্পর্কে তিনি যে ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন, দোয়া কবুল হওয়ার নমুনা স্বরূপে তা উপস্থিত করে বলেন :

"اے کہ گوئی گر دعا ہا را اثر بودے کجاست سوئے من بشتاب بنمائم ترا چوں آفتاب
ہاں مکن انکار زیں اسرار قدرت ہائے حق قصہ کوتاہ کن ببیں از ما دعائے مستجاب"[২]

অর্থাৎ, "এই যে বলছো, দোয়ার কোন কাজ হলে কোথায়? দ্রুত আমার কাছে আস। আমি তোমাকে দিবালোকের ন্যায় সত্য দোয়ার ক্রিয়া প্রদর্শন করব। সাবধান! খোদার অপার মহিমার রহস্যরাজি অস্বীকার করিও না। গল্প ছাড়, মঞ্জুর হয়েছে, এমন দোয়ার নমুনা আমার কাছে এসে দেখ।"[১]

এই কবিতা পদগুলো সম্বলিত বিষয়ের শিরোনামায় লিখিত আছে "نمونہ دعائے مستجاب" অর্থাৎ, 'কবুল-কৃত দোয়ার নমুনা'। কারণ, তখন পর্যন্ত লেখরামের প্রাণ সংহার সংক্রান্ত ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হয়নি।

মৌলবী মুহাম্মদ হুসায়েন বাটালবী সম্বন্ধে একটি ভবিষ্যদ্বাণী :

যখন মৌলবী মুহাম্মদ হুসায়েন বাটালবী সাহেব হযরত আকদাসের সাথে বিরোধিতায় সকল বিরুদ্ধবাদীদের মধ্যে অধিকতর অগ্রগামী। তখন হযরত আকদাস তাঁর সম্বন্ধে একটি স্বপ্ন দেখেন :

"وَإِنِّي رَأَيْتُ أَنَّ هٰذَا الرَّجُلَ يُؤْمِنُ بِإِيْمَانِي قَبْلَ مَوْتِهِ وَرَأَيْتُ كَأَنَّهُ تَرَكَ قَوْلَ التَّكْفِيْرِ وَتَابَ وَهٰذِهِ رُؤْيَايَ وَأَرْجُو أَنْ يَجْعَلَهَا رَبِّي حَقًّا"[১]

অর্থাৎ, "আমি দেখলাম এই ব্যক্তি (অর্থাৎ, মৌলবী মুহাম্মদ হুসায়েন বাটালবী)

(১) 'বারাকাতুদ-দোয়া'।

তাঁর মৃত্যুর আগে আমি যে, মু'মিন এ কথা স্বীকার করবেন এবং তা প্রমাণিত হবে যে, তিনি কুফরের ফতোয়া পরিত্যাগ করেছেন এবং তাঁর পূর্বানুসৃত কার্য পদ্ধতি থেকে তওবা করেছেন। এটা আমার স্বপ্ন। আমি আশা করি, আমার খোদা তা পূর্ণ করবেন।"[১]

হযরত আকদাসের এই স্বপ্ন পূর্ণ হওয়ার আয়োজন আল্লাহ তাআলা এভাবে পূর্ণ করলেন যে, ১৯১৩ সালে গুজরানওয়ালার প্রথম শ্রেণীর মুনসেফ লালা দেবকিনন্দনের আলাদতে মৌলবী মুহাম্মদ হুসায়েন বাটালবী সাক্ষী স্বরূপে স্বীকার করলেন :

"এই সবগুলো সম্প্রদায়ই কুরআন মজীদকে খোদার কালাম বলে বিশ্বাস করে। এদের প্রত্যেকেই কুরআনের মত হাদিসও বিশ্বাস করে। মির্যা গোলাম আহ্‌মদ কাদিয়ানী 'মসীহ্ ও মাহদী' হওয়ার দাবির সময় থেকে সম্প্রতি আহ্‌মদী নামক আরো একটি সম্প্রদায় আবির্ভূত হয়েছে। এই সম্প্রদায়টিও কুরআন ও হাদিস ওই ভাবেই বিশ্বাস করে। উপরোল্লিখিত কোন সম্প্রদায়কেই আমাদের সম্প্রদায় একেবারে 'কাফের' বলে না।"[২]

আশ্চর্যের বিষয় এই মৌলবী মুহাম্মদ হুসায়েন বাটালবীই অতি নগণ্য বিষয় ও সামান্য সামান্য কথায় হুযুরকে "কাফের", "আকফার" এবং আরো কত অজানা উপাধিসহ স্মরণ করতেন। গুজরানওয়ালার এক আদালতে একজন স্ত্রীলোক তার স্বামী আহমদী হওয়ার কারণে তালাক চাইলে বাটালবী সাহেব আদালতে 'আহমদীরা মুসলমান' ব্যাপারে পরিষ্কার এই কথা স্বীকার করেন।

'জঙ্গে মুকাদ্দাস' মুবাহাসার কার্যবিবরণী :

'জঙ্গে মুকাদ্দাস' হযরত আকদাসের ওই মুাবাহাসা, যা হুযুর আকদাস ১৮৯৩ সালের ২২ মে থেকে ৫ জুন পর্যন্ত অমৃতসরে পাদ্রীদের সাথে করেছিলেন। ওই মুবাহাসার উপলক্ষ এবং কিভাবে এর আয়োজন হয় সেই বিবরণ একজন প্রত্যক্ষদর্শী অমৃতসরের 'রিয়াজে হিন্দ' প্রেসের স্বত্ত্বাধিকারী হযরত শেখ নূর আহ্‌মদ সাহেব তার প্রণীত 'নূর আহ্‌মদ' পুস্তকে এভাবে লিপিবদ্ধ করেছেন। তিনি একদিন কাদিয়ান শরীফে হযরত আকদাসের খেদমতে উপস্থিত ছিলেন-

"তখন জন্ডিয়ালা থেকে কোন মুসলমান ব্যক্তি পান্দাহের একটি পত্র হযরত

---

(১) 'ইশতেহার, তাং ৪ঠা মে, ১৮৯৩ সাল, 'তবলীগে-রিসালত,' তৃতীয় খন্ড, ৪৪ পৃঃ।

(২) বিস্তৃত বিবরণের জন্য দেখুন, 'আল-ফযল,' ১ম বর্ষ, ৩৫ সংখ্যা, তাং ১১ ফেব্রুয়ারি, ১৯১৪ সাল, ৩ পৃঃ।

মসীহ্ মাওউদ আলাইহেস্ সালামের হুযুরে পৌঁছাল। জন্ডিয়ালায় পাদ্রীদের একটি শক্তিশালী মিশন ছিল। এর মিশনারীরা বাজারে ওয়াজ করতেন। পান্দাহ সাহেব তাঁর শিষ্যদেরকে ইঞ্জিল সম্বন্ধে কিছু প্রশ্ন শিখিয়ে দিলেন। ওই শিষ্যেরা খ্রিষ্টান প্রচারকদের সাথে তর্ক করতেন এবং প্রশ্ন উপস্থিত করে উত্তর চাইতেন। ওই খ্রিষ্টানরা যুক্তি সঙ্গত উত্তর দেয়ায় অসমর্থ হয়ে ডাঃ হেনরী মার্টিন ক্লার্কের কাছে অভিযোগ করলো যে মুসলমান পান্দাহের শিষ্যেরা বড়ই বিরক্ত করে। তাদেরকে কোনভাবে রোধ করা হোক। হেনরী মার্টিন সাহেব জন্ডিয়ালা উপস্থিত হলেন এবং পান্দাহ্ সাহেবকে বললেন যে তিনি তাঁর শিষ্যদেরকে খ্রিষ্টান প্রচারকদের বিরুদ্ধে পরিচালনা করছেন। এতে কোন লাভ নেই। কোন সভা আহ্বান করে মৌলবীদেরকে সমবেত করুন। তবেই বুঝা যাবে, কোন্ ধর্ম সত্য? এবং প্রচারকদেরকে যাতে বিরক্ত না করে, সে জন্য আপনার ছেলেদেরকে নিষেধ করুন। পান্দাহ সাহেব এই প্রস্তাবে স্বীকৃত হলেন এবং মৌলবীদেরকে পত্র লিখতে শুরু করলেন যেন পাদ্রীদের সঙ্গে ইসলামের সত্যতা বিষয়ে বাহাস করার জন্য তাঁরা জন্ডিয়ালা আগমন করেন। একটি পত্র তিনি হযরত মসীহ্ মাওউদ আলাইহেস্ সালামকেও লিখলেন। তা আমার উপস্থিতিতে কাদিয়ান পৌঁছালো। হযরত আকদাস এই পত্র পাঠ করে অত্যন্ত খুশি হলেন এবং আমাকে বললেন : 'খোদা-তাআলা আমাদের জন্য একটি শিকার পাঠিয়েছেন। আজই আমি এর উত্তর লিখছি।' আরো বললেন : 'একটি পত্র পান্দাহ সাহেবের নামে এবং একটি পত্র পাদ্রী সাহেবকে লিখতে হবে। অভিজ্ঞতা থেকে জানা আছে যে, পাদ্রী সাহেব শীঘ্রই উত্তর দিবেন এবং পান্দাহ্ সাহেব কবে লিখবেন, জানা নেই।' পরদিন আমি অমৃতসর চলে আসলাম। পাদ্রী সাহেব প্রস্তুত আছেন বলে জবাব দিলেন। হযরত সাহেবের পত্রের মর্ম ছিল : 'যদি জন্ডিয়ালা, অমৃতসর অথবা বাটালায় এই সভা হয়, তবে আমরা নিজ খরচে আসব। কারো ওপর ভারগ্রস্থ হব না। যদি আপনারা কাদিয়ান আসেন এবং এখানে মুবাহাসার সভা হয়, তবে আমরা সম্পূর্ণ সফর খরচ বহন করব এবং খাবার ইত্যাদি ব্যবস্থার দায়িত্বও গ্রহণ করব। এর উত্তরে হেনরী মার্টিন ক্লার্ক লিখলেন, ব্যবস্থা ও পরামর্শের পর জানাবেন এই মর্মে তিনি পান্দাহ্ সাহেবকেও লিখেছিলেন। মিয়া পান্দাহ্ সাহেব মৌলবীদের উত্তর পাওয়ার অপেক্ষা করতে লাগলেন। এতে দুই সপ্তাহ অতিবাহিত হলো এবং মৌলবী সাহেবরা পান্দাহ্ সাহেবকে প্রত্যুত্তরে জিজ্ঞাসা করলেন তাঁদের জন্য থাকার ব্যবস্থা, সফরের খরচ, যাতায়াত ও পানাহারের কি ব্যবস্থা করা হয়েছে ? সভার পর তাদেরকে বিদায় বাবদ কি দেয়া হবে ? পান্দাহ্ সাহেব হযরত সাহেবকে লিখলেন : 'মৌলভী সাহেবরা পুরস্কার এবং সফর খরচ দাবি করেন। আমি গরিব লোক। আপনি শুধু খোদার

সন্তুষ্টির জন্য কাজ করেন বলে আমি আপনাকেই আসার জন্য কষ্ট দিব। মৌলবীদের থেকে বিমুখ হয়েছি। তাঁদের মধ্যে একটুও লিল্লাহিয়ত নেই।' যখন হযরত আকদাস মসীহ্ মাওউদ আলাইহেস্ সালাম এই কথা জানতে পারলেন, তখন তিনি পাদ্রী মার্টিন ক্লার্ককে পুনরায় পত্র লিখলেন : 'মুবাহাসার কোন তারিখ নির্ধারিত হওয়া উচিত। আমার কয়েকজন বন্ধু আপনার কাছে পাঠালাম। তাঁদের সাথে মুনাযারার শর্তাবলী ও তারিখ প্রভৃতি মিমাংসা করুন।' হযরত আকদাস পান্দাহ্ সাহেবকে একটি পত্র হাতে হাতে দেয়ার জন্য ইউসুফ খানকে পাঠালেন। এতে মুবাহাসার তারিখ স্থির করার জন্য তাগিদ করা হলো এবং এটাও জিজ্ঞাসা করা হলো পাদ্রীদের পক্ষে কে মুনাযারা করবেন ? ইউসুফ খান প্রথমে আমার কাছে আসলেন। পরে জন্ডিয়ালা গমন করলেন। তিনি আমাকে সমস্ত অবস্থা খুলে বললেন। এতে খোদা তাআলা আমার মনে এই কথার উদ্রেক করলেন যে, আমি গিয়ে সেই পাদ্রী সাহেবকে তালাস করি, খ্রিষ্টানদের পক্ষে যিনি মুবাহাসায় 'মুনাযের' স্বরূপে উপস্থিত হবেন। আমি মিস্ত্রী কুতুব দ্বীন সাহেবের দোকানে গেলাম। তাঁকে কাজ ছেড়ে আমার সঙ্গে রওয়ানা হতে বললাম। স্থির হলো আমরা পাদ্রী ইমাদ উদ্দীনের কাছে গিয়ে জিজ্ঞাসা করব, কোন্ পাদ্রী সাহেব খ্রিষ্টানদের পক্ষে মুনাযারায় উপস্থিত হবেন। মিস্ত্রী সাহেব কাজ-কর্ম ত্যাগ করে আমার সঙ্গে চললেন। আমরা দুইজন পাদ্রী ইমাদ-উদ্দিনের বাড়ি গিয়ে তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম, কোন্ পাদ্রী সাহেব বাহাস করার জন্য হযরত মির্যা সাহেবের সাথে পত্রালাপ করেছেন ? তখন তিনি বললেন : 'অর্বাচীন হেনরী মার্টিন ক্লার্কই হবে'। তা শুনে আমরা মিশন হাসপাতালে গেলাম! সেখানে হেনরী মার্টিন ক্লার্ক সাহেব ভেতরের কামরায় বসা ছিলেন। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন : 'প্রয়োজন কি?' আমি বললাম : 'জন্ডিয়ালা বাহাস সভার তারিখ নির্ধারণের জন্য এসেছি। হযরত মির্যা গোলাম আহ্মদ সাহেবের মুরিদরা মুনাযারার সময় এবং শর্তাবলী স্থির করার জন্য এসেছেন। তাঁদেরকে কার কাছে, কোথায় নিয়ে যাবো ? তিনি বললেন যে তাঁর তো এখন অবসর নেই, তিনি সফরে বাহির হচ্ছেন এবং সফরের প্রোগ্রাম প্রস্তুত করছেন। আমি বললাম : 'বেশ তো আপনি সফরে বাহির হোন।' কিন্তু তারিখের মিমাংসা করে যান। এটা মাত্র কয়েক মিনিটের কাজ। পাদ্রী সাহেব বহু দ্বিধাপূর্বক বললেন : 'আপনি আপনার লোক নিয়ে আসুন। আমি শুধু আধ ঘন্টা সময় দিতে পারব। এরই মধ্যে শর্তাবলী স্থির করা হবে।' আমি স্টেশনে গেলাম। কাদিয়ান থেকে যে সব বন্ধু এসেছিলেন, তাঁদের সবাইকে ষ্টেশনেই পেলাম। তাঁদের মধ্যে হযরত মৌলবী আবদুল করীম সাহেব শিয়ালকোটী, মুনশি গোলাম কাদের সাহেব ফসিহ শিয়ালকোটী এবং মুনশি জাফর আহ্মদ সাহেব কুপুরথলবী ছিলেন।

বন্ধুগণ সবাই একত্রিত হওয়ার পর আমরা বিছানাপত্রসহ তিন চার গাড়িতে আরোহণ করে সোজা পাদ্রী সাহেবের কুঠিতে পৌঁছালাম। পাদ্রী সাহেব কুঠিতেই ছিলেন। আমরা যাওয়ায়, বারান্দায় চেয়ার রাখবার জন্য আর্দালীকে আদেশ করলেন এবং নিজে অন্য দরজা দিয়ে পাদ্রী আবদুল্লাহ্ আথমের কুঠিতে গেলেন। কিছু বিলম্ব হয়ে পড়লে আমরা আর্দালীকে জিজ্ঞাসা করলাম : 'ডাক্তার সাহেব বাইরে আসছেন না কেন'? সে বলল : 'এখন আসছেন। আথম সাহেবের কুঠিতে গিয়েছেন।' তা কাছেই । মাঝে শুধু একটা রাস্তা। ইতিমধ্যে আসর নামাযের সময় হলো। কুঠির আওতার মধ্যে একটি বড় বট গাছ ছিল। আমরা সবাই তার নিচে বাজামাত নামায পড়লাম। ডাক্তার সাহেব আথম সাহেবের কাছে আমাদের নিয়ে বললেন, কাদিয়ান থেকে কয়েকজন লোক মুনাযারা সভার শর্ত ও তারিখ স্থির করতে এসেছেন। আপনি এসে তারিখ ও শর্ত স্থির করুন। ইতিমধ্যে জন্ডিয়ালা থেকে পান্দাহ্ সাহেবও এসে পৌঁছালেন। আথম সাহেব কানে হাত রেখে বললেন : 'ডাক্তার সাহেব! যদি একশ' অন্য মৌলবী হত, তবে কোন পরওয়া ছিল না। আপনি বাঘের লেজে হাত দিয়েছেন। মির্যা সাহেব কাদিয়ানীর সম্মুখীন হওয়া এবং তাঁর সাথে লড়াই সহজ নয়। খুবই কঠিন কাজ। এই অশান্তির সৃষ্টি আপনি করেছেন। আপনিই এর সুরাহা করুন। আমি কখনো যাব না।' আমি এতে যোগ দেব না।' ডাক্তার সাহেব বললেন: 'খ্রিষ্টান জাতির আপনি বীর পাহ্‌লোয়ান। আপনিই তা সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করতে পারেন। আপনার ভরসাতেই আমি এ কাজে হাত দিয়েছে। আপনি এতে অস্বীকার করছেন! আপনাকে অবশ্যই যোগদান করতে হবে।' এদের দুই জনের মধ্যে আলোচনা দীর্ঘ হয়ে পড়ল। ডাক্তার সাহেব আথম সাহেবকে সঙ্গে আনতে চাচ্ছিলেন আর আথম সাহেব রীতিমত অস্বীকার করেই চলেছেন। অবশেষে, বহু কষ্টে ডাক্তার সাহেব আথম সাহেবকে ফুঁসলিয়ে সঙ্গে নিয়ে উপস্থিত হলেন। দুই জনের এই কথাবার্তা এবং কথাবার্তার প্রকৃতি ডেপুটি আবদুল্লাহ্ আথম সাহেবের মুসলমান খানসামা থেকে পরে জানতে পারি। যখন দুইজনেই এসে চেয়ারে আসন গ্রহণ করলেন, তখন আথম সাহেবের মুখ থেকে অজ্ঞাতসারে শব্দ নি:সৃত হলো: 'হায়, আমি মারা গেলাম। তারপর, আমি কথা শুরু করলাম : 'তারিখ ইত্যাদি মিমাংসা করা কর্তব্য। বাহাস কত দিন চলবে? এই বাহাস লিখিতভাবে হওয়া চাই। সঙ্গে সঙ্গে লিখতে হবে।' তারপর, পারস্পরিক আলাপ-আলোচনার পর তারিখ নির্ধারিত হলো এবং পনের দিন বাহাস চলবে বলে সাব্যস্ত হলো। একবর যখন অমৃতসর ও বাটালার মৌলবীরা জানতে পারলেন, তখন তাঁরা আথম সাহেবের কুঠিতে উপস্থিত হয়ে বললেন যে তিনি অন্য উলামাদের সাথে বাহাস করতে রাজি হননি কেন? মির্যা সাহেবের সাথে বাহাস করতে রাজি হলেন কেন? তাঁকে

তো উলামারা কাফের বলেন। তাঁর ওপর এবং তাঁর শিষ্যদের ওপর কুফরের ফতোয়া দেয়া হয়েছে। আথম সাহেব ইতিপূর্বেই হযরত সাহেবকে ভয় করছিলেন। তিনি ডক্টর হেনরী মার্টিন ক্লার্ককে বলতে লাগলেন : 'আমি তো পূর্বেই বলেছিলাম মির্যা সাহেবের সাথে বাহাস করা সহজ নয়। বাঘের লেজে হাত দেয়া হয়েছে। এখনও প্রাণ বাঁচাবার সুযোগ রয়েছে। প্রাণ রক্ষা করা লক্ষ মুদ্রার চেয়ে শ্রেয়। মির্যা সাহেবকে জবাব দিন এবং এই মৌলবীদের সাথে বাহাস অবশ্যই করুন। ক্ষতি নেই।' তারপর, পাদ্রীরা সম্মিলিতভাবে পরামর্শ করে হযরত সাহেবকে লিখলেন : 'এখন অন্যান্য মৌলবী সাহেব বাহাস করার জন্য প্রস্তুত হয়েছেন। এজন্য আপনার বাহাসের জন্য এসে কষ্ট করার প্রয়োজন নেই। কারণ অন্য মুসলমানরা আপনাকে 'কাফের' মনে করে। এ জন্য আপনি ইসলামের পক্ষে উকিল হতে পারেন না। এই কারণে আমরা মৌলবীদের সাথে বাহাস-মুনাযারার অভিপ্রায় করেছি, আপনার সঙ্গে নয়।' হযরত আকদাস এর উত্তরে লিখলেন : 'এখন আপনাদের অস্বীকার করা ঠিক নয়। আপনাদের পত্র, প্রতিশ্রুতি ও সমর্থিত শর্তাবলী আমাদের কাছে আছে। সুতরাং আপনাদের হয় বাহাস করতে হবে, নতুবা পরাজয় স্বীকার করতে হবে। যদি এই কথা সংবাদপত্রগুলোতে প্রকাশ করেন এবং আপনাদের পরাজয় স্বীকার করেন, তবে আপনারা যে মৌলবীর সঙ্গেই ইচ্ছা, বাহাস করুন। আরো লিখলেন : "আপনারা আমাকে কুফরের ফতোয়ার কথা বলেছেন। এই কুফরের ফতোয়া শুধু আমাদের উপরেই প্রয়োগ হয়নি। আপনাদের উপরেও কুফরের ফতোয়া দেয়া হয়েছে। প্রোটেস্ট্যান্টগণ ক্যাথলিক সম্প্রদায়কে কাফেরই নয়, হত্যাযোগ্য বলে মনে করে। সুতরাং, আপনারাও খ্রিষ্টানত্বের উকিল হতে পারেন না। কুফরের ফতোয়া দ্বারা আমরা এবং আপনারা সমান। বাহাস তো বাস্তবিক সত্য-মিথ্যা নির্ণয়ের জন্য করা হবে–সত্য কি আমাদের পক্ষে আছে ?-না, আপনাদের পক্ষে ? এতে কুফরের ফতোয়ার কোন সংশ্লিষ্টতা নেই। আমার ইসলাম ও কুরআন করীমের ওকালতি করব, আপনারা ইঞ্জিলের করবেন। কুফরের ফতোয়ার সাথে এর সম্পর্ক কি ? মুনাযারায় প্রত্যেক পক্ষের পঞ্চাশ জন লোক মাত্র থাকা সাব্যস্ত হয়েছিল। এরচেয়ে বেশি কোন পক্ষেই যেতে পারত না। হযরত আকদাস প্রথম দিন বাহাসের জন্য যাওয়ার সময় শেখ হামেদ আলী সাহেবকে একটি গ্লাস ও এক সুরাহী পানি সঙ্গে নেয়ার কথা বললেন। ডাঃ মার্টিন ক্লার্কের কুঠিতে পৌঁছে জানা গেল যে বারান্দায় বসে বাহাসের শর্তাবলী নিষ্পত্তি হয়েছিল, সেখানেই বাহাসের ব্যবস্থা করা হয়েছে। কারণ এর আয়তন যথেষ্ট ছিল। ডাঃ হেনরী মার্টিন ক্লার্ক সাহেব মৃন্ময় পান-পাত্র ও বৃহদাকার কলস এনে রেখেছিলেন। কলসগুলোতে বরফ, মিছরি প্রভৃতি দেয়া হয়েছিল, যাতে মুসলমানদেরকে ঠান্ডা

সরবত দ্বারা আপ্যায়িত করা যায়। এই প্রসঙ্গে হযরত আকদাসের জন্য ডাক্তার সাহেবের খানসামা এক গ্লাস বরফ মিশ্রিত সরবত আনল। হুযুর বললেন : 'আমরা আমাদের পানি এনেছি। আমি এবং আমার সাথীরা অন্য পানি পান করব না। অন্য মুসলমান যা ইচ্ছা করতে পারেন। আপনাদের এবং পাদ্রী সাহেবদের মধ্যে এটা একটা ধর্ম যুদ্ধ। আমাদের ও আপনাদের মধ্যে শান্তি স্থাপিত হলে পানি প্রভৃতি পানে কোন বাধা থাকবে না।' এই কথাগুলো গয়ের-আহ্‌মদীদেরকেও বেশ প্রভাবান্বিত করল। তাঁরাও ওই পানি পান করেননি। ঘড়াগুলো এমনি পড়ে রইল। খ্রিষ্টানরাই ওই পানি পান করলেন। মুসলমানরা একটি স্বতন্ত্র কূপ থেকে পানি আনলেন।

"তারপর, বাহাস শুরু হলো। বক্তব্য লেখা শুরু হলো। বক্তব্য লেখা হলে দাঁড়িয়ে পাঠকদের তা শোনানো হলো। মৌলবী আবদুল করীম সাহেব (রাযি আল্লাহু আন্‌হু) হযরত আকদাসের বক্তব্য শোনাবার জন্য দাঁড়ালেন। প্রথমে 'সূরা ফাতেহা' পাঠ করতেন। পরে বক্তব্য এক একটি শব্দ ২/৩ বার পাঠ করলেন। ডাঃ হেন্‌রী মার্টিন ক্লার্ক বললেন : 'দেখুন সাহেব, একবার লেখা হয়েছে। আপনি বার বার পাঠ করেন কেন?' কিন্তু তিনি ভ্রূক্ষেপ করলেন না এবং এভাবেই পাঠ করলেন। খোদা তাআলা তাঁকে আধ্যাত্মিক অন্তর্দৃষ্টি- 'রুহানী বসিরত'- দিয়েছিলেন। এক একটি শব্দের দ্বারা তিনি আনন্দ লাভ করলেন এবং তন্ময় হয়ে পাঠ করতেন। পাদ্রী সাহেবগণ চিৎকার করতেন। তিনি সানন্দ চিত্তে তা করে যেতেন। আমি দেখলাম ঘেরাওর বাইরে শত শত লোক দাঁড়িয়ে রয়েছে। আমি দাঁড়িয়ে নিবেদন করলাম : 'বহু লোক এই বাহাস শোনার জন্য উদ্‌গ্রীব। এক বিপুল জনতা বাইরে দাঁড়ানো আছে। কুঠিতে এক এক পক্ষের পঞ্চাশ জন ব্যক্তি মাত্র আসার অনুমতি আছে। টিকিট দ্বারা প্রবেশ করতে। এজন্য আমি চাই প্রতিদিন উভয় পক্ষের বাহাসের লিখিত বক্তব্যগুলো আমি ছাপিয়ে দিব।' হযরত আকদাস বললেন তাঁর পক্ষ থেকে অনুমতি প্রদত্ত হলো। সতর্কতা বশত: পাদ্রী সাহেবদেরকে জিজ্ঞাসা করলাম তাদের মত কি? তখন আথাম সাহেব মৃদু স্বরে বললেন তাঁদের পক্ষেরও সম্মতি আছে। সুতরাং, আমি প্রতিদিন উভয় পক্ষেরই বক্তব্যগুলো ছাপিয়ে দিতাম। লোকেরা তা ক্রয় করত।

"এই প্রকারে পনের দিন মুবাহাসা হলো। মসীহর ঈশ্বরত্বের খন্ডনে হযরত আকদাস লিখলেন :

"একজন দুর্বল, ক্ষমতাহীন মানুষকে আপনারা খোদার আসন দিচ্ছেন। তিনি একজন স্ত্রীলোকের গর্ভে নয় মাস যাবত বাস করে ঋতুর রক্তে জীবন ধারণপূর্বক

অন্যান্য সাধারণ লোকের মতই জন্মগ্রহণ করেছেন। এমন ব্যক্তিও কি খোদা হতে পারেন ? পাদ্রী সাহেবেরা এই কথাগুলো শুনে উঠে দাঁড়ালেন এবং বলতে লাগলেন তাঁরা প্রভু যিশু খ্রিষ্ট সম্বন্ধে এধরনের কথা শুনতে চান না। মির্যা সাহেব তাদের অন্তরে ছুরিকাঘাত করেছেন–তাঁদের স্কন্ধে তরবারি চালিয়েছেন। এই বলে তাঁরা মুবাহাসার সভা ত্যাগ করতে প্রস্তুত হলেন। এই দৃশ্য দেখে হযরত আকদাস বললেন : 'এরা তো এখন পলায়ন করবেন। যা লিখাচ্ছি, লিখতে থাকুন। অবস্থা দেখে পাদ্রী মার্টিন ক্লার্ক বললেন : আমি ভেবেছিলাম মুসলমানরা গোলমাল করবে। অবস্থা এর বিপরীত, খ্রিষ্টানেরাই গোলমাল শুরু করেছে'। তিনি খ্রিষ্টানদেরকে বসতে বললেন। আরো বললেন : 'এখন যাওয়ার কোন অর্থ নেই। এখন কর্মতৎপরতার সময়। সবাই বসুন। বস্তুত:, যিশুর ঈশ্বরত্ব হযরত আকদাস এমনভাবে খন্ডন করলেন যে খ্রিষ্টানদের কোন উত্তর থাকলো না।

মুনাযারার কার্যবিবরণী 'জঙ্গে মুকাদ্দাস' যিনিই পাঠ করবেন, আপনা-আপনি তিনিই সম্পূর্ণ অবস্থা জ্ঞাত হবেন। আথম সাহেব নিরুত্তর হয়ে তাঁর বক্তব্যে তা লিখতে বাধ্য হলেন যে মসীহ্ ৩০ বছর পর্যন্ত সাধারণ মানুষ রূপেই ছিলেন। যখন তাঁর ওপর রুহুল কুদুস নাযেল হলেন, তখন তিনি 'ঈশ্বরের বিকাশ'- 'মায্হারুল্লাহ্' (Manifestation of God) বলে অভিহিত হলেন। এর জবাবে হযরত আকদাস লিখলেন : 'আমরাও তো এটাই বলি। মসীহ্ মানুষ ও নবী ছিলেন। যখন কোন মানুষের ওপর রুহুল কুদুস নাযেল হন, তখন তিনি আল্লাহ্র প্রকাশস্থল বা নবী হন।' এই কথা শুনে খ্রিষ্টানদের মুখ বিবর্ণ হলো। হেন্রী মার্টিন সাহেব অস্থির হয়ে পড়লেন। আথম সাহেবও বিব্রত হলেন। খ্রিষ্টানেরা তৎক্ষণাৎ বললেন : 'আথম সাহেব, আপনি একি লিখেছেন ?' তখন আথম সাহেব বললেন, তিনি আর কি লিখবেন! যা লিখার প্রয়োজন ছিল, লিখেছেন। আথম সাহেব আরো বললেন, তিনি অসুস্থ। তাঁকে ছাড়া হোক, তিনি যাচ্ছেন। তাঁরা যা চান, লিখতে পারেন।

"পাঠকগণ ' জঙ্গে মুকাদ্দাসের' ছবি থেকে এখনকার সম্যক অবস্থা হৃদয়ঙ্গম করতে পারেন। সত্যের তেজ আথম সাহেবের ওপর জয় লাভ করল। তিনি অসুস্থ হয়ে পড়লেন। কিন্তু শেষদিনগুলোতে খ্রিষ্টানদের তাড়নায় বাধ্য হয়ে আসতে লাগলেন। মাঝে একদিন হেনরী মার্টিন ক্লার্ক বাহাসের জন্য মনোনীত হয়ে এদিক সেদিকের কথায় কোন মতে দিনাতিপাত করলেন।"১

---

(১) রিসালা 'নূর আহমদ,' ২০-৩২ পৃঃ।

ডেপুটি আবদুল্লাহ্ আথম মুবাহাসার শর্ত ভঙ্গ করেন :

মুবাহাসার অন্যতম শর্ত ছিল, উভয়পক্ষ তাঁদের দাবি ও দলিল স্ব স্ব ইল্‌হামী কিতাব কুরআন মজীদ এবং বাইবেল থেকে পেশ করবেন। কিন্তু পাদ্রী সাহেব এই শর্ত মোটেই পালন করেননি। এমন কি, হযরত আকদাস তাঁর শেষ প্রবন্ধে লেখালেন :

“আমার অতিশয় দু:খ হয়, যে সব শর্তে বাহাস শুরু করা হয়েছিল, ওই সব শর্তের প্রতি ডেপুটি সাহেব একটুও লক্ষ্য রাখেননি। শর্ত ছিল আমি যেমন আমার প্রত্যেক দাবির প্রমাণ কুরআন শরীফের যৌক্তিক দলিলসমূহ দ্বারা উপস্থিত করি, ডেপুটি সাহেবও তেমনি করবেন। কিন্তু তিনি কোথাও এ শর্ত পালন করেননি।”[১]

একটি আশ্চর্য ঘটনা :

মুবাহাসার সময় একদিন খ্রিষ্টানেরা গোপনে একটি অন্ধ একটি বধির এবং একটি খঞ্জকে মুবাহাসার স্থানে এনে একদিকে বসিয়ে রাখল। তারপর, তাদের বক্তৃতায় হযরত আকদাসকে সম্বোধন করে বলল : ‘আপনি মসীহ্ হওয়ার দাবি করেন। নিন্ এই অন্ধ, বধির ও খঞ্জ ব্যক্তিরা আছে। মসীহর মত তাদেরকে স্পর্শ করে আরোগ্য করুন।’ মীর সাহেব[২] বলেন, তাঁরা সবাই তখন অস্থির হলেন, দেখা যাক্, হযরত সাহেব এখন কি উত্তর করেন। তারপর, হযরত সাহেব তাঁর উত্তর লেখাতে গিয়ে বললেন : “আমি তো একথা বিশ্বাস করি না যে, মসীহ্ এইভাবে স্পর্শ করে অন্ধ, বধির ও খঞ্জদেরকে ভালো করতেন। এজন্য আমার কাছে তা দাবি করার কোন যুক্তি নেই। অবশ্য, আপনারা মসীহের মুজেযা এইভাবে বিশ্বাস করেন। পক্ষান্তরে, আপনারা এটাও বিশ্বাস করেন, যে ব্যক্তির মধ্যে একটি সরিষার পরিমাণ ইমান থাকবে, সে ওই সমস্তই প্রদর্শন করতে পারবে, যা মসীহ্ প্রদর্শন করেন। সুতরাং, আমি আপনাদের কাছে বড়ই কৃতজ্ঞ। আপনারা আমাকে অন্ধ, বধির ও খঞ্জদেরকে তালাস করা থেকে রক্ষা করেছেন। এখন আপনাদের উপহার আপনাদেরই সামনে রাখা হলো। এই অন্ধ, বধির ও খঞ্জ আপনাদের সামনে হাজির আছে। যদি আপনাদের মধ্যে একটি সরিষার পরিমাণ ইমান থাকে, তবে মসীহের রীতি অনুসারে আপনারা এদেরকে আরোগ্য

---

(১) জঙ্গে মুকাদ্দাস’।

(২) অর্থাৎ হযরত ডা: মীর মুহাম্মদ ইসমাঈল সাহেব মরহুম (রাযি আল্লাহু আনহু) হযরত খলিফাতুল মসিহ সানী আইয়্যেদাহুল্লাহু তাআলার বড় মামু।

করুন।" মীর সাহেব বলেন যে, হযরত সাহেব তা বলা মাত্র পাদ্রীদের হুঁশ উড়ে গেল। তাঁরা সঙ্কেতপূর্বক তৎক্ষণাৎ তাদেরকে সেখান থেকে বিদায় করলেন।[১]

পাদ্রী আবদুল্লাহ্ আথম সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী :

শেষ প্রবন্ধে হযরত আকদাস আল্লাহ্ তাআলার আদেশে পাদ্রী আবদুল্লাহ্ আথম সম্বন্ধে একটি ভবিষ্যদ্বাণী ঘোষণা করেন। তা এই :

"আজ রাতে আমার কাছে যা প্রকাশিত হয়েছে তা হচ্ছে, আমি আল্লাহ তাআলার হুযুরে যখন বহু কান্নাকাটি করে দোয়া করলামঃ 'তুমি এই বিষয়ের মিমাংসা কর। আমরা দুর্বল বান্দা। তোমার মিমাংসা ব্যতীত কিছুই করতে পারি না।' তখন তিনি আমাকে সুসংবাদ স্বরূপ এই নিদর্শন দিলেন যে, এই বাহাসে পক্ষদ্বয়ের মধ্যে যে পক্ষ ইচ্ছাকৃত ভাবে অসত্যকে বরণ করছে, সত্য খোদাকে পরিত্যাগ করছে এবং দুর্বল মানুষকে খোদা নির্ধারণ করছে, সেই পক্ষ মুবাহাসার দিক থেকে এই সব দিনেই অর্থাৎ দিন প্রতি এক মাস হিসাবে, অর্থাৎ পনের মাসের মধ্যে 'হাবিয়ায়' নিক্ষিপ্ত হবে এবং অত্যন্ত লাঞ্ছিত হবে, যদি সত্যের দিকে ফিরে না আসে এবং যে ব্যক্তি সত্যের ওপর আছে এবং সত্য খোদাকে মানে এর মাধ্যমে তার সম্মান প্রকাশিত হবে এবং যখন এই ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হবে, কোন কোন অন্ধ দৃষ্টি ফিরে পাবে, কোন কোন খঞ্জ চলতে শুরু করবে এবং কোন কোন বধির শ্রবণ শক্তি লাভ করবে।"[২]

এই ভবিষ্যদ্বাণীর কারণ সম্বন্ধে হযরত আকদাস বলেন, খ্রিষ্টান তার্কিক ডেপুটি আবদুল্লাহ্ আথম 'আন্দরুনা বাইবেল' নামক একটি বই লিখেছিলেন। সেই বইতে তিনি আঁ হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে (নাউযুবিল্লাহে মিন্‌যালেকা) "দাজ্জাল" লিখেছিলেন এবং ইসলামের প্রতি বিদ্রুপাত্মক কটাক্ষ করেছিলেন। যখন হযরত আকদাস ভবিষ্যদ্বাণীর সাথে তাকে এটাও স্মরণ করিয়ে দিলেন, "তিনি তৎক্ষণাৎ জিহ্বা কামড় দিলেন। কানে হাত দিলেন। চেহারা বিবর্ণ হলো। চোখ সাদা হয়ে গেল এবং মাথা বাঁকিয়ে বললেন তিনি তো এমন লিখেননি।"[৩]

অথচ, তিনি তা লিখেছিলেন। কিন্তু ভবিষ্যদ্বাণীর ভয়ে ব্যাকুল হয়ে তিনি

---

(১) রাওয়াইয়াত' নং ১৭৬, সিরাতুল-মাহদী,' প্রথম খন্ড, ১৯১-৯২ পৃষ্ঠা, হযরত ডাঃ মীর মুহাম্মদ ইসমাইল সাহেব থেকে বর্ণিত।

(২) 'জঙ্গে কাদ্দস'

(৩) রিসালাহ মূর-আহমদ,' ৩২ পৃঃ।

অজ্ঞাতসারে বললেন তিনি "দাজ্জাল" বলেননি।

"অন্য কথায়, সেই সময়েই তিনি সত্যের দিকে প্রত্যাগমন প্রদর্শন করলেন। তারপর, মৃত্যুর মুহূর্ত পর্যন্ত একটি শব্দও ইসলাম বা আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের বিরুদ্ধে বলেননি। আথমের পরিণতি এবং এই ইল্‌হামী ভবিষ্যদ্বাণীর সম্পূর্ণ তথ্যের জন্য 'আনওয়ারুল্‌-ইসলাম' এবং 'আঞ্জামে-আথম' পাঠ করুন।"১

মুবাহাসার সময় বয়আত :

অমৃতসরে হযরত শেখ নূর আহমদ সাহেব এবং হযরত মিস্ত্রী কুতুব দ্বীন সাহেব তো আগে থেকেই আহ্‌মদী ছিলেন। এখন মুবাহাসার সময়ে হযরত মিয়াঁ নবী বখশ সাহেব রিফুগর এবং হযরত কাযি আমীর হুসায়েন সাহেব ভেরুবীও বয়আত করলেন। হযরত কাযি সাহেব একজন অত্যন্ত পবিত্র চিত্র, বেনাফ্‌স পুরুষ ছিলেন। তিনি হাদিস শাস্ত্রের একজন বিজ্ঞ আলেম ছিলেন। তাঁর বয়আত করায় মৌলবীদের মধ্যে ভীষণ আলোচনা সৃষ্টি হলো। প্রত্যেক মহল্লায় হযরত আকদাসের বিরুদ্ধে বিষোদগার শুরু হলো এবং প্রচার চলল, যেন কোন ব্যক্তি "মির্যার" ওয়াজ শুনতে না যায়। নচেৎ তাঁর শিকার হয়ে পড়বে। এই প্রকার নানা কথার জোর প্রচারণা চলল এবং অন্য লোকের মাধ্যমে হযরত আকদাসের খেদমতে পয়গাম আসতে লাগল যে মৌলবী সাহেবদের সাথে বাহাস করুন। হুযুর বললেন: "প্রথমে খ্রিষ্টানদের সাথে বাহাস শেষ করতে দিন। পরে ইন্‌শা-আল্লাহ্‌, আপনাদের সঙ্গেও বাহাস করব।"

'মুবাহালা' থেকে মৌলবী মুহাম্মদ হুসায়েন সাহেব বাটালবীর পলায়ন এবং মৌলবী আবদুল হক গজনবীর উপস্থিতি :

"বাহাসের শেষে মৌলবীরা পুনরায় আন্দোলন শুরু করলেন : 'খ্রিষ্টানদের সাথে বাহাস শেষ হয়েছে। এখন আমদের সাথে বাহাস করুন।' লাহোর থেকে মৌলবী মুহাম্মদ হুসায়েন সাহেব বাটালবীও একটি ইশতেহার এই মর্মে প্রেরণ করলেন মির্যা সাহেবের সাথে 'মুবাহালা' করার জন্য তিনি অমৃতসর আসছেন। শুধু মুবাহালা হবে। কোন বক্তৃতা হবে না। হযরত সাহেব এর উত্তরে একটি ইশ্‌তেহারে লিখে ঘোষণা করলেন যে মৌলবী মুহাম্মদ হুসায়েন বাটালবী কখনও

(১) 'রিসালাহ মূর-আহমদ' ৩২ পৃঃ।
(২) রিসালাহ 'নূর আহমদ,' ৩২-৩৩ পৃঃ।

তাঁর সাথে 'মুবাহালা' করবেন না এবং তাঁর সামনে পর্যন্ত উপস্থিত হবেন না। পরদিন মৌলবী আবদুল হক গজনবীর সাথে মুবাহালা হওয়ার কথা ছিল। মৌলবী মুহাম্মদ হুসায়েন অমৃতসর পৌঁছলেন। ঈদগাহে বিরাট জনসমাগম হলো। মৌলবী মুহাম্মদ হুসায়েনও এই জনসমাজ থেকে বেশ দূরে দাঁড়িয়ে কিছু বক্তৃতা করলেন। লোকেরা মনে করেছিল বক্তৃতার পর মৌলবী সাহেব মুবাহালা করবেন যদিও মির্যা সাহেব লিখেছেন তিনি তাঁর সামনে মুবাহালার জন্য উপস্থিত হবেন না–কিন্তু তিনি তো এসেছেন। তিনি যখন আধ ঘন্টা কি পৌনে ঘন্টা বক্তৃতা করলেন, তখন মৌলবী আবদুল হক গজনবী এবং তার শিষ্যরা, তাদের মৌলবীদের পরামর্শে 'মুবাহালার' জন্য অগ্রসর হলেন।"১

এই মুবাহালায় মৌলবী আবদুল হক গজনবী নিজের সম্বন্ধে কোনই কথা উচ্চারণ করলেন না। কিন্তু হযরত আকদাসের জন্য কঠোর হতে কঠোরতর শব্দ ব্যবহার করলেন এবং গালি-গালাজ দ্বারা রসনা তৃপ্ত করতে কোনই কসুর বাকি রাখলেন না। এর জবাবে হযরত আকদাস শুধু এই কথাগুলো বললেন :

"আমি এই দোয়া করব যে, আমার প্রণীত যত বইপুস্তক আছে, তারমধ্যে কোনটিও খোদা ও রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের বর্ণিত বিষয়ের বিরোধী নয় এবং আমি কাফের নই। যদি আমার কিতাবগুলো খোদা এবং রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের বাক্যের বিরোধী এবং কুফরে পরিপূর্ণ হয়ে থাকে, তবে খোদা তাআলা সেই 'লানত' ও 'আযাব' আমার ওপর নাযেল করুন যা পৃথিবীর আদি থেকে আজ পর্যন্ত কোন কাফের, বেঈমানের ওপর করেননি এবং আপনারা 'আমীন' বলুন। কারণ যদি আমি কাফের-নাউযুবিল্লাহ্-ইসলাম ধর্ম থেকে মুরতাদ এবং বেঈমান হয়ে থাকি, তবে নেহাৎ খারাপ আযাবে আমার মৃত্যুই শ্রেয়। আমি এই প্রকার জীবনের প্রতি সহস্র মনে নারাজ। আর যদি এমন না হয়ে থাকে, তবে খোদা-তাআলা তাঁর পক্ষ থেকে সত্য ফয়সালা করে দিবেন। তিনি আমার হৃদয়ও দেখছেন এবং বিরুদ্ধবাদীদের হৃদয়ও দেখেছেন।"

প্রত্যক্ষদর্শিরা বলেন, যখন হুযুর এই কথাগুলো উচ্চারণ করছিলেন, তখন এক অত্যাশ্চর্য নিস্তব্ধতার সৃষ্টি হয়েছিল এবং অজ্ঞাতসারে লোকের উচ্চ কণ্ঠে ক্রন্দনোচ্ছ্বাস শোনা যাচ্ছিল।

---

(১) রিসালাহ 'নূর আহমদ,' ৩২-৩৩ পৃঃ।

হাফেজ মুহাম্মদ ইয়াকুব সাহেবের 'বয়আত' :

হযরত আকদাস তখনো তাঁর দোয়া শেষ করেননি। গজনবীদের একজন মুরীদ, সেচ বিভাগের জেলাদার হাফেজ মুহাম্মদ ইউসুফ সাহেবের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা হাফেজ মুহাম্মদ ইয়াকুক সাহেব চিৎকার শুনে কান্না করতে করতে হযরত আকদাসের পদমূলে পতিত হয়ে বললেন, "আপনি আমার 'বয়আত কবুল করুন"। হযরত আকদাস বললেন, মুবাহালা থেকে পৃথক হয়ে বয়আত গ্রহণ করবেন। এই দৃশ্য দেখে গজনবী মৌলবীরা এবং তাদের চেলারা হতবুদ্ধি হয়ে পড়লেন। কারণ তাঁরা অনুভব করলেন মুবাহালার ফলে এটা হযরত আকদাসের প্রথম বিজয় ছিল। মৌলবী মুহাম্মদ হুসায়েন সাহেব বাটালবী তো আল্লাহ্-ই জানেন কোথায় গায়েব হয়েছিলেন। তখন লোকেরা নিশ্চিতভাবে বুঝতে পারল যে, হযরত মির্যা সাহেবের বাক্য সফল হয়েছে। তিনি যথার্থই বলেছিলেন মৌলবী মুহাম্মদ হুসায়েন সাহেব সামনেই আসবে না। যা হোক, এইভাবে মুবাহালা শেষ হলো এবং হযরত আকদাস ঘরে ফিরে গেলেন।

এই মুবাহালার প্রতিক্রিয়া :

এই মুবাহালার ফলে কি প্রতিক্রিয়া হয়েছিলো? হযরত আকদাস তাঁর কিতাব 'আঞ্জামে আথমে' দশটি বিষয় বর্ণনা করেছেন। যার মাধ্যমে এটাই প্রতিভাত হয় যে, খোদা তাআলা এই মুবাহালার পর হযরত আকদাসকে অসীম আধ্যাত্মিক ও ঐশী আশিসের দ্বারা পুরস্কৃত করেছেন। নিম্নে আমরা হযরত আকদাসেরই ভাষায় ওই দশটি বিষয়ের সারমর্ম প্রদান করছি :

১) "আথম সম্বন্ধে যে ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছিল, তা ভবিষ্যদ্বাণীর প্রকৃত অর্থে পূর্ণ হয়েছে।

২) মুবাহালার পর যে বিষয় আমার সম্মানের কারণ হয়েছে, তা হলো ওই সব আরবি গ্রন্থ সমষ্টি, যা বিরুদ্ধবাদী মৌলবী এবং পাদ্রীদেরকে লাঞ্ছিত করার জন্য লিখিত হয়েছিল।

৩) মুবাহালার আগে যথাসম্ভব তিন চার শ' লোক ছিলেন এবং মুবাহালার পর এখন আট হাজারের অধিক ওই সব ব্যক্তি আছেন, যাঁরা এই পথে প্রাণ দিতে সদা প্রস্তুত।

৪) মুবাহালার পর আমার সম্মান বৃদ্ধির চতুর্থ বিষয় হলো রমযান মাসে চন্দ্র ও সূর্য গ্রহণ। খোদা তাআলা মুবাহালার পর এই সম্মানও আমাকে দিয়েছেন।

৫) মুবাহালার পর আমার সম্মানের পঞ্চম বিষয় হলো কুরআনের জ্ঞান সম্পর্কিত

'ইৎমামে হুজ্জাও প্রতিযোগিতামূলক চূড়ান্ত প্রমাণ। আপনাদের মধ্যে কারো সাধ্য নেই যে, আমার মোকাবেলা কুরআন শরীফের তত্ত্বরাজি-হাকায়েক-মুওয়ারিফ-বর্ণনা করতে পারেন।

৬) মুবাহালার পর ষষ্ঠ বিষয় যা আমার সম্মানের কারণ হয়েছে এবং আবদুল হক গজনবীর লাঞ্ছনার কারণ হয়েছে, তা হলো এই যে, আবদুল হক মুবাহালার পরে ইশ্‌তেহার দিয়েছিল যে, তার পুত্র জন্মগ্রহণ করবে এবং আমিও খোদা তাআলার থেকে ইলহাম পেয়ে এই ইশতেহার 'আনওয়ারুল ইসলামে' প্রকাশিত করেছিলাম যে আমাকে পুত্র দান করবেন। সে অনুযায়ী খোদা-তাআলার অনুগ্রহে ও অসীম কৃপায় আমার গৃহে তো পুত্র সন্তান জন্ম গ্রহণ করেছে। তার নাম 'শরীফ আহমদ'। এখন আবদুল হককে অবশ্যই জিজ্ঞাসা করতে হবে যে তার পুত্র কোথায় ?

৭) এই মুবাহালার পর যে বিষয় দ্বারা আমার সম্মানও খোদা-তাআলার কাছে কবুল হওয়া প্রকাশিত হয়েছে তা হচ্ছে খোদা তাআলার সত্যপরায়ণ ব্যক্তিদের আন্তরিক উৎসাহ উদ্দীপনা যা তাঁরা আমার সেবার্থে প্রদর্শন করেছেন। খোদা-তাআলার ওই সব অনুগ্রহের শোকর করার ক্ষমতা আমার কখনো হবে না যা আধ্যাত্মিক ও ঐশ্বরিক হিসেবে এই মুবাহালার পর আমি পেয়েছি।
আধ্যাত্মিক অনুগ্রহরাজির দৃষ্টান্ত বর্ণনা করছি। অর্থাৎ, খোদা তাআলার এই ভাষা-জ্ঞান আমাকে শুধু 'এজায' স্বরূপে-অলৌকিকভাবে দান করেছেন। এর প্রতিযোগিতায় কেবলমাত্র আবদুল হক কেন, বিরুদ্ধবাদী সবাই লাঞ্ছিত হয়েছে। যে সব ঐশ্বরিক সম্পদ মুবাহালার পর প্রদত্ত হয়েছে তা হলো ওই সব আর্থিক বিজয়, যা এই দরবেশ খানার জন্য খোদা-তাআলা উন্মুক্ত করেছেন। মুবাহালার দিন থেকে আজ পর্যন্ত প্রায় পনের হাজার 'ফতুহুল্‌-গায়েব', তথা অদৃশ্য বিষয়াবলীর টাকা এসেছে এই সিল্‌সিলার 'রাব্বানী ব্যয় খাতে' খরচ করা হয়েছে।

৮) অষ্টম বিষয় হলো 'সৎ-বচন' পুস্তক প্রণয়ন। এই পুস্তক প্রণয়নের জন্য খোদা-তাআলা আমাকে ওই সমস্ত সামগ্রী দান করেছেন, যা তিন শত বছর ধরে কারো কল্পনায়ও আসেনি।

৯) নবম বিষয়, এই সময়ে প্রায় আট হাজার ব্যাক্তি আমার হাতে বয়আত গ্রহণ করেছেন। সুতরাং, আমি নিশ্চিতভাবে জানি যে এতজন আদম সন্তানের তওবার মাধ্যম আমাকে সত্য প্রতিপন্ন করা তা খোদার দরগাহে কবুল হওয়ার নিদর্শন-যা খোদা-তাআলার সন্তুষ্টি অর্জনের পরেই মাত্র লাভ হয়ে থাকে।

১০) লাহোরের ধর্ম মহাসম্মেলন দশম বিষয়। এই সম্মেলন সম্বন্ধে আমার অধিক লেখার প্রয়োজন নেই। যে প্রকারে এবং যে 'নুরানিয়তের কবুলিয়ত' অর্থাৎ আল্লাহ্‌র দরগাহে গৃহীত হওয়ার যে আধ্যাত্মিক জ্যোতির্বিকাশ আমার বক্তব্য পাঠের সময় হয়েছে এবং যেভাবে আন্তরিক উৎসাহসহ লোকেরা আমাকে ও আমার বক্তব্যকে মহাশ্রদ্ধার চখে দেখেছে, আমার বিস্তৃতভাবে বর্ণনা করার কোনই প্রয়োজন নেই। সবাই নিজে নিজেই মত প্রকাশ করেছেন যে এই বক্তব্য না হলে মুহাম্মদ হুসায়েন প্রভৃতির কারণে ইসলাম হাল্কা হয়ে পড়ত।"

অমৃতসরী মৌলবী জান মুহাম্মদ মসজিদের নিম্ন কক্ষে আত্মগোপন :

পূর্বোক্ত মুবাহালার পর হযরত আকদ্‌াস মৌলবীদের উদ্দেশ্যে একটি ইশ্‌তেহার প্রকাশ করে ঘোষণা করলেন :

"এখন আমি খ্রিষ্টানদের সাথে মুবাহাসা থেকে পৃথক হয়েছি। আজ থেকে তিন দিন পর্যন্ত আমি এখানে থাকব। যদি কোন মৌলবী আমার সাথে বাহাস করতে চান, তিনি যে কোন স্থান মনোনীত করে বাহাস করুন। এমন যেন না হয় যে পরবর্তীতে 'পলায়ন করেছে বলে শোরগোল করে।"

"হযরত আকদাসের এই ইশ্‌তেহারের ফলে মৌলবী সাহেবগণ এমনি ভীত হলেন যে, কেউ মাথা তুলেননি। এতে অমৃতসরের রইস খাজা মুহাম্মদ ইউসুফ সাহেব মৌলবীদের বললেন : 'এখন আপনারা বাহাস করছেন না কেন ? মির্যা সাহেব বাহাস করতে সম্মত হয়েছেন। মির্যা সাহেব চলে যাওয়ার পর আপনারা এই বলে চিৎকার করবেন যে মির্যা সাহেব পলায়ন করেছেন এবং অমৃতসরের উলামাদের সাথে বাহাস করেননি।' উলামারা উত্তর দিলেন যে তাঁরা বাহাস করবেন বলে পরামর্শ করেছেন।"[১]

"মৌলবী মুহাম্মদ হুসায়েন বাটালবী সাহেব মৌলবীদেরকে ভয় প্রদর্শন করলেন যে, তাঁদের মধ্যে কোন মৌলবীই মির্যা সাহেবের সাথে বাহাস করতে পারবে না। তিনি অল্পতেই তাঁদেরকে কাবু করে ফেলবেন। দুই একটা প্রশ্নের প্রত্যুত্তরেই মৌলবী সাহেবদের মুখ বন্ধ হয়ে যাবে। কোন ওজরপূর্বক বাহাস এড়ানোই সর্বোত্তম। তারপর, অমৃতসরের সকল উলামা-মৌলবী আবদুল জাব্বার সাহেব গজনবী প্রমুখ গজনবীগণ, মৌলবী রুসুল বাবা ও মৌলবী গোলামুল্লাহ্‌ কসৌরী প্রভৃতি প্রসিদ্ধ ও অনেক অপ্রসিদ্ধ মৌলবীগণ মুহাম্মদ জান

(১) 'নূর আহমদ' ৩৩ পৃঃ।

মসজিদের নিচের এক কক্ষে বসে মুয়ায্যিনকে বললেন রুমের দরজায় তালা দিয়ে চাবি যেন তার কাছে রাখে। মৌলবী রুসুল বাবা বললেন : 'কেউ জিজ্ঞাসা করলে বলবে, 'কোথাও নিমন্ত্রণে গিয়েছেন, বিলম্বে আসবেন'। খাজা মুহাম্মদ ইউসুফ সাহেব এই মজ্জিদে মৌলবীদের খোঁজ করতে আসলেন। মুয়ায্যিনকে জিজ্ঞাসা করলেন মৌলবী সাহেবান কোথায় ? সে বলল, 'দাওয়াতে গিয়েছেন'। তারপর, জনাব খাজা সাহেব মৌলবী আবদুল জব্বার সাহেবের বাড়িতে গেলেন। সেখানেও প্রত্যুত্তর করা হলো যে, দাওয়াতে গিয়াছেন। তিনি বললেন, 'এখানে কেউ নেই ? আজ বাহাস করার দিন ছিল। মির্যা সাহেব চলে গেলে মৌলবীরা চিৎকার করবেন। 'যাহোক, এই বলে তিনি সেখান থেকে আবার মুহাম্মদ জানের মস্জিদের দিকে আসলে হঠাৎ কেউ বলল সব মৌলবী এই মসজিদের নিচের কক্ষে আছেন এবং দরজায় বাহির থেকে তালা দেয়া হয়েছে, যাতে কেউ সন্ধান না পায়। মুয়ায্যিনকে খাজা সাহেব পুনরায় জিজ্ঞাসা করলেন, 'মৌলভী সাহেবরা কোথায়?' মুয়ায্যিন আবার বলল, 'দাওয়াতে গিয়েছেন।' খাজা সাহেব জিজ্ঞাসা করলেন, 'কার বাড়িতে' ? এই প্রশ্নের উত্তরে সভয়ে সে বলল, জানে না। এতে খাজা সাহেব জানতে চাইলেন, 'মস্জিদের নীচের রুমের চাবি তার কাছে আছে কিনা ? সে বলল, আছে। খাজা সাহেব বললেন চাবি 'আন'। সে তাঁকে চাবি দিল। খাজা সাহেব কক্ষের খুলে ভিতরে গিয়ে দেখলেন সমস্ত মৌলবীরাই কক্ষে বসা। মৌলবীদের চেহারা বিবর্ণ হয়ে গেল। তাঁরা কাঁপতে লাগলেন। খাজা সাহেব বললেন, 'আজ বাহাসের দিন।' আপনারা এখানে আত্মগোপন করে আছেন। আগামীকাল মির্যা সাহেব চলে যাবেন। তখন বাহাস কার সঙ্গে হবে ?' মৌলবীরা অপ্রতিভ হয়ে বললেন তারা পরামর্শ করছেন। কিছুক্ষণের মধ্যেই তাঁকে সংবাদ দেয়া হবে। তিনি যেন শান্ত হোন। খাজা সাহেব তাগিদ করে চলে গেলেন। কিন্তু তিনি বুঝতে পারলেন মৌলবী সাহেবান বাহাস করবেন না।[১]

"হতভম্ব বিড়ালের খাম্বা খামচানো" :

কিন্তু যেই হযরত আকদাস কাদিয়ান চলে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হলেন, মৌলবী সাহেবরা তাঁর ষ্টেশনে পৌঁছার পূর্বেই মুদ্রিত ইশ্তেহার যা পূর্বেই প্রস্তুত রাখা হয়েছিল। হযরত আকদসের গাড়ির পিছনে বিতরণ করতে লাগলেন এবং নানা প্রকার চিৎকার শুরু করলেন। প্রাচীরে, প্রাচীরে ইশ্তেহার লাগান হলো। এতে লেখা ছিল : 'মির্যা পলায়ন করেছে।' মুখেও তাঁরা কৃত্রিম হায় হুতাশ

(১) রিসালাহ 'নূর আহমদ,' ৩৪-৩৫ পৃঃ।

করেছিলেন। দু' চার দিন পর মৌলবী সাহেবরা আবার সমবেত হয়ে পরামর্শ করছিলেন। ঘটনাক্রমে আমিও সেখানে উপস্থিত হলাম। জানতে পারলাম প্রত্যেকেই নিজ নিজ মতানুসারে এক একজন মৌলবীকে বাহাসের জন্য মনোনীত করছিলেন। কেউ মৌলবী মুহাম্মদ হুসায়েন বাটলবীকে হযরত আকদাসের সাথে বাহাসের জন্য দাঁড় করতে বলছিলেন। কেউ মৌলবী আবদুল জব্বার গজনবীর নাম প্রস্তাব করছিলেন। কারো দৃষ্টি রুসুল বাবা অমৃতসরীর ওপর নিপতিত হচ্ছিল। অবশেষে, মৌলবী গোলামুল্লাহ্[১] সাহেব কসৌরী বললেন : 'বাহাস তো অস্বীকার করা উচিত হবে না। কাবুল, মক্কামুয়ায্‌যমা, বা মদিনা মুনাউওরায় বাহাস হওয়া সমীচীন। সেখানে যাবেও না, বাহাসও হবে না।"[২]

আথম সাহেবের অবস্থা :

এখন আমরা আবার আথম সাহেবের প্রসঙ্গে ফিরে আসছি। হযরত শেখ নূর আহমদ রাযি আল্লাহু আনুহু বলেন :

"হযরত আকদাস চলে যাওয়ার পর আমি কোর্টে যাচ্ছিলাম, পথে আথম সাহেবের ঘর। আমি দেখলাম, আথম সাহেব রৌদ্রের মধ্যে ছাতা মাথায় বাড়ির বাগান পরিষ্কার করাচ্ছিলেন। আমি বললাম: 'ডেপুটি সাহেব, এখন কি করছেন? তিনি বললেন : "ঘাস দুর্বা পরিষ্কার করাচ্ছি। এমন না হয়, কোন সাপ বের হয়ে আমাকে দংশন করে এবং আপনারা বলেন যে মির্যা সাহেবের ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হয়েছে।" আমি বললাম: 'বেশ, ভালমত সতর্ক থাকবেন। খোদা-তাআলা নিশ্চয়ই তাঁর কুদরতের কোন দৃশ্য দেখাবেন।" এরপর আথম সাহেব নানা প্রকার ভীতিপ্রদ স্বপ্ন দেখতে লাগলেন। রাতে বার বার শিহরিয়ে উঠেন কখন কখন বিছানা থেকে নিচে পড়ে যেতেন এবং চিৎকার করতেন 'হায়, মারা গেলাম,' 'আমাকে ধর'। আথম সাহেবের এই অবস্থা দেখে তার মুসলমান খানসামাকে বিদায় করা হলো। মুসলমানদের যাতায়াত একদম বন্ধ করা হলো। চাকরি থেকে বিদায় হওয়ার কিছু দিন পর সেই খানসামার সাথে আমার সাক্ষাত হয়। সে আথম সাহেবের বর্তমান অবস্থা বর্ণনা করল এবং বলল যে, তাকে জবাব দেয়া হয়েছে। যখন আথম সাহেব বলেছিলেন 'তিনি ধৃত হয়েছেন, তিনি মারা গিয়েছেন, তখন এই খানসামা তাঁর কাছে দাঁড়ান ছিল। এজন্যেই তাকে বিদায় করা হয়, পাছে এই প্রকার কোন বিষয় প্রকাশ পেলে গোপন বিষয় বের

(১) সম্ভবতঃ ইনি মৌলবী গোলাম আলী ছিলেন। ছাপার ভুলে গোলামুল্লাহ' হয়ে গেছে, কিংবা মৌলবী সাহেব নিজেই পরে তার নাম 'গোলামুল্লাহ' রেখেছেন। ওয়াল্লাহু আলামু বিস-সাওয়াব।

(২) রিসালাহ নূর আহমদ, পৃঃ।

হয়ে পড়ে। খানসামার মুখে এই সমস্ত হাল অবস্থা শুনে আমি আথম সাহেবের বাড়িতে গিয়েছিলাম। দেখলাম, এক ব্যক্তি পাহারায় দাঁড়িয়ে আছে। পাদ্রীরা তাকে তাগিদ করছেন, যাতে কোন মুসলমান সেখানে না যেতে পারে। তাকে বলা হয়েছে আথম সাহেবের সাথে কোন মুসলমানের সাক্ষ্য করার অনুমতি নেই। এই দেখে আমি চলে আসলাম। খানসামার কথার সমর্থন পাওয়া গেল। গয়ের আহ্‌মদী মুসলমানও সাক্ষাৎ বা কোন কাজ উপলক্ষে গেলে তাঁদেরকেও সাক্ষাৎকারের সুযোগ দেয়া হত না। আথম সাহেবকে খেলায় ও তামাসায় নিমগ্ন রাখা হত। বিভিন্ন ধরনের খেলা যেমন তাস, দাবা, ইত্যাদির মাধ্যমে তাঁর মন ভুলানোর চেষ্টা করা হতো কিন্তু আথম সাহেবের অবস্থা দিন দিন অধিকতর ভয়াবহ হতে লাগল। প্রত্যহ তাঁর অবস্থার পরিবর্তন ঘটত। তিনি কোন সময় শান্তি বোধ করতেন না। কখনো কখনো 'হায়' 'হায়' করতেন। কখনো কখনো বলতেন, 'আমি ধরা পড়লাম', 'নিস্তার নেই'। এদিকে আথম সাহেবের তো এই অবস্থা! অন্য দিকে অন্য পাদ্রীদের মনে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হলো। এক সাহেবের তো মৃত্যু হলো। এক সাহেব ভয়ে অমৃতসর ত্যাগ করলে পথে ভ্রমণরত অবস্থায় রেলগাড়িতেই তিনি প্রাণত্যাগ করলেন। পাদ্রী রাইট সাহেবের মৃত্যুতে গীর্জায় যে প্রকার শোক প্রকাশ করা হয়েছিল এবং ওই সময়ে কোন কোন পাদ্রী যে সব উক্তি করেন তা থেকে খ্রিষ্টানদের চাঞ্চল্য ও ভীতি প্রাপ্ত অবস্থার ছবি আপনা আপনি ফুটে উঠে। তাঁরা বলেছিলেন, 'আজ রাতে ঈশ্বরের কোপ জনিত লাঠি অসময়ে আমাদের ওপর পরলো। তাঁর গোপন অস্ত্র অজানিতভাবে আমাদেরকে হত্যা করল।[১] পাদ্রী রাইট সাহেব অমৃতসরের অবৈতনিক মিশনারী ছিলেন। তাঁরা সবই স্বীকার করলেন, শুধু সত্যকেই গ্রহণ করলেন না।

"যখন খ্রিষ্টানরা দেখলেন যে আথম সাহেবের অবস্থা কেবলই খারাপ হচ্ছে, তখন তাঁরা পরামর্শ করলেন তাঁকে অন্যত্র কোথাও পাঠান হোক। বস্তুত: তাঁকে লুধিয়ানা পাঠান হলো। যখন সেখানেও তিনি কোন প্রকার শান্তি বোধ করলেন না, তখন তাঁকে গুজরাত পাঠান হলো। সেখানেও তাঁর কোনই শান্তি হলো না। তখন ফিরোজপুর নিয়ে যাওয়া হলো।

"আথম সাহেবের সেই সুসজ্জিত বাড়ি যা তাঁর খেয়াল মত বেহেশ্‌তের নমুনা স্বরূপ ছিল এবং বড়ই সুখের সাথে নির্মাণ করানো হয়, যার জন্য তিনি সত্যকে বরণ করতে পারেননি এবং সেই অতি মনোহর বাগান, যা তিনি নিজ পছন্দ মত তৈরি করিয়েছিলেন-দুই-ই পরিত্যক্ত হলো এবং তাঁকে স্থান থেকে স্থানান্তরে প্রবাস পরিবর্তন ও শীত গ্রীস্মের কষ্ট ভোগ করতে হলো। কোথাও তিনি শান্তি

(১) "আনওয়ারুল ইসলাম,' প্রথম সংস্করন, ৮ পৃঃ হাশিয়া।

পেলেন না। সর্বদা যে আথমের লেখনী ইসলামের বিরোধিতায় পরিচালিত হত তাও একদম বন্ধ হলো।"[১]

খ্রিষ্টান ধর্মের সাহায্যার্থে লেখার উৎসাহও একদম বন্ধ হলো।

বিস্তৃতভাবে ব্যাপারটি ছিল এই। যখন আথমের মেয়াদ উত্তীর্ণ হলো এবং তিনি সত্যের দিকে ফিরে আসার ফলে পনের মাসের মধ্যে প্রাণত্যাগ করেননি, তখন খ্রিষ্টানেরা 'ভবিষ্যদ্বাণী বিফল হয়েছে' বলে চেঁচামেচি শুরু করল। এতে হযরত সাহেব তাদেরকে বুঝার চেষ্টা করলেন যে ভবিষ্যদ্বাণীতে বলা হয়েছিল আথম ফিরে আসলে 'হাবিয়ায়' নিক্ষিপ্ত হওয়া থেকে রক্ষা পাবেন এবং যদি ফিরে না আসেন, তবে 'হাবিয়ায়' নিক্ষিপ্ত হবেন। তাঁর ভীত হওয়াই তাঁর ফিরে আসা সত্য প্রমাণিত করে। এই দীর্ঘ সময়ের মধ্যে তিনি ইসলামের বিরুদ্ধে কোন শব্দ উচ্চারণ করেননি। এই জন্য 'গফুর ও রহীম' ক্ষমাশীল ও দয়াবান-খোদা তাঁর মৃত্যু টলিয়ে দিলেন। কিন্তু খ্রিষ্টানেরা একথা মানতে রাজি ছিল না, মানেও নাই। বস্তুত: তাদের এই কার্যক্রম দ্বারা তারা মৃত্যুর ফেরেশ্তাকে আহ্বান করছিল। যখন তাদের পৌন:পৌনিক দাবি সীমার বাইরে চলে গেল, তখন হযরত আক্দাসেরও ইসলামী গায়রত প্রবল হলো। তিনি ইশতেহার দ্বারা ঘোষণা করলেন আথম দাবির সাথে বলুক যে, তাঁর ওপর ভবিষ্যদ্বাণীর ভীতি প্রবল হয়নি বা তাঁর হৃদয়ে ইসলাম ও ইসলামের প্রবর্তক হযরত মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম সম্বন্ধে তাঁর পূর্ব ধারণার পরিবর্তন ঘটেনি। তারপর, যদি এক বছরের মধ্যে তাঁর প্রাণসংহার কাজ সমাধা না হয়, তবে হযরত আকদাস তাঁকে নগদ এক হাজার টাকা পুরস্কার প্রদান করবেন। কিন্তু আথম সাহেব টু' শব্দ পর্যন্ত করলেন না।

এতে তিনি দ্বিতীয় ইশতেহার প্রকাশ করলেন যে, দাবি করলে আথম সাহেবকে দুই সহস্র টাকা পুরস্কার প্রদান করা হবে। আথম সাহেব তবু চুপই থাকেন। অবশ্য মৃদুস্বরে এটুকু নিশ্চয়ই স্বীকার করলেন যে :

"আমি সাধারণ খ্রিষ্টানদের 'পুত্রত্ব ও ঈশ্বরত্ব' বিশ্বাসের সাথে একমত নই এবং আমি ওই খ্রিষ্টানদেরও সাথে একমত নই, যারা আপনার (অর্থাৎ, হযরত আকদাসের–উদ্ধৃতকারক) সঙ্গে কোন প্রকার অন্যায় করেছে।"[২] তারপর, হযরত আকদাস তৃতীয় ইশ্তেহার প্রকাশ করলেন এবং দাবি করলে আথম সাহেবকে তিন সহস্র টাকা দানের প্রতিশ্রুতি প্রদান করলেন। কিন্তু তিনি এদিকে আসবার ছিলেন না, আসেননি। অবশেষে, হযরত আকদাসের চূড়ান্তভাবে যুক্তি প্রদান ও

(১) রিসালা 'নূর আহমদ' ৩৫-৩৭ পৃ:।

(২) "খ্রিষ্টান প্রচার পত্রিকা, 'নূর ইফশান,' ১৮৯৪ সাল ২১ সেপ্টেম্বর,।

সমাপনার্থে চার সহস্র টাকা পুরস্কারের প্রতিশ্রুতি দিয়ে আবদুল্লাহ্ আথম সাহেবকে হলফ করার জন্য আহ্বান করলেন। কিন্তু তিনি তবু প্রস্তুত হলেন না। এই ইশ্‌তেহারে হযরত আকদাস লিখেছিলেন :

“এখন যদি আথম সাহেব দাবি করেন (যে তিনি ভবিষ্যদ্বাণী দ্বারা ভীতগ্রস্থ্ হননি এবং কোন দিক দিয়ে প্রত্যাবর্তন করেননি) তবে এক বছরের ওয়াদা অখন্ডনীয় ও সুনিশ্চিত এবং যদি দাবি না করেন, তবু আল্লাহ্ তাআলা যে এই প্রকার অপরাধী, সত্য গোপন করে বিশ্বকে প্রবঞ্চিত করতে চায়–তাকে দন্ড না দিয়ে ছাড়বে না। সেদিন সন্নিকটে, দূরে নয়। যদি খ্রিষ্টানেরা আথমকে খন্ড বিখন্ড জবেহ্ও করে, তবু তিনি দাবি করবেন না।”[১]

বস্তুতঃ আথম সাহেব কোনভাবেই দাবি করার জন্য অগ্রসর হলেন না এবং এই শেষ ইশতেহার প্রকাশের ছয় মাসের মধ্যে ১৮৯৬ সালের ২৭শে জুলাই ফিরোজপুরে প্রাণত্যাগ করেন।[২]

আথমের মৃত্যুর পর হযরত আকদাস তাঁর সব বিরুদ্ধবাদীদেরকে সম্বোধনপূর্বক লিখলেন :

“যদি কোন সাহেবের এই ধারণা থাকে যে, আথম ভবিষ্যদ্বাণীর ভীষণতার ‘আযমত’ বশতঃ ভীত হননি, বরং আমরা তাঁকে বধ করার জন্য কখনও তরবারিধারী লোক পাঠিয়েছি, কখনও তাঁর পিছনে সাপ ছেড়েছি, পিছনে কখনও কুকুর খেপিয়ে দিয়েছি ইত্যাদি, তবে এমন ব্যক্তি এই বিষয়ে হলফ করুন। তারপর, যদি তিনি এক বছর পর্যন্ত জীবিত থাকেন, তবে আমি আমার ভবিষ্যদ্বাণী ভ্রান্ত হওয়া নিজেই স্বীকার করব এবং এই হলফের সাথে কোন শর্ত থাকবে না।”[৩]

কিন্তু খ্রিষ্টানদের মধ্য থেকে অথবা শত্রুতাকারী কাফের নির্দেশক মৌলবীদের মধ্য থেকে কেউ মর্দে ময়দান হয়ে সামনে অগ্রসর হয়নি এবং এভাবে সকল শত্রুর জন্যই তিনি সম্যক যুক্তি প্রদান করলেন।

এক রাতে চার হাজার আরবি ধাতু শিক্ষা :

মুবাহাসা ও মুবাহালা থেকে অবসর লাভের পর হযরত আকদাস কাদিয়ানে ফিরে

(১) ইশতেহার (চার হাজার টাকা পুরস্কার, সম্বলিত ১১ পৃঃ।
(২) বিস্তৃত বিবরণের জন্য ‘আনওয়ারুল-ইসলাম,’ ‘আঞ্জামে আথম’ এবং’ কিতাবুল বারিয়া’ দেখুন।
(৩) ‘আঞ্জামে-আথম,’ ১৫ পৃঃ।

আসলেন। তখন পুনরায় আবার গ্রন্থ প্রণয়ন ও ইশাআতে দ্বীনের কাজে আত্মনিয়োগ করলেন। প্রতিযোগিতামূলক উপায়ে আরবি ভাষায় তফসীর লেখার ও সুক্ষ্ম তত্ত্বাবলী বর্ণনা করার আহ্‌বান তিনি মৌলবী মুহাম্মদ হুসায়েন বাটালবী ও অন্য উলামাদেরকে করেছিলেন, তা 'ফয়সলা আসমানীর' ইশতেহার থেকেই স্পষ্ট জানা যায়। ইতিপূর্বে আমরা লিখেছি যে, এই ইশ্‌তেহার যখন মৌলবী মুহাম্মদ হুসায়েন বাটালবী পাঠ করলেন, তখন (নাউযুবিল্লাহ্‌) হযরত আকদাসকে 'মূর্খ', 'আরবী বিদ্যা থেকে সম্পূর্ণ বঞ্চিত' এবং মৌলবী সাহেব নিজে 'আলেম', 'ফাযেল' এবং যুগের 'অতুলনীয় প্রতিভা' বলে পরিচিত হতে চাইলেন। ভাল, আল্লাহ্‌ তাআলার গায়রত কখন এটা সহ্য করতে পারত ? তিনি মসীহ্‌ পাকের হৃদয়ে দোয়ার প্রেরণা জন্মালেন। হুযুর দোয়া করার পর, আল্লাহ তাআলা এক রাতেই তাঁকে আরবি ভাষার চল্লিশ হাজার ধাতু বা মূল শব্দ শিক্ষা দিলেন। এতে তিনি আরব ও অনারবের ওপর 'হুজ্জৎ' (প্রতিযোগিতামূলকভাবে পরিপূর্ণ যুক্তি) কায়েম করার জন্য এবং মৌলবী মুহাম্মদ হুসায়েন সাহেব বাটালবী ও তাঁর সাথে একমত পোষণকারী মৌলবীদের অহঙ্কার চুরমার করার উদ্দেশ্যে বহু কেতাবই[১] আরবি ভাষায় সহস্র সহস্র টাকা পুরষ্কার ঘোষণাসহ প্রকাশ করলেন। কিন্তু কেউ প্রতিযোগিতার সাহস করল না। হযরত আকদাস বলেন :

آزمائش کے لیے کوئی نہ آیا ہرچند　ہر مخالف کو مقابل پہ بُلایا ہم نے

অর্থাৎ, 'যতই আমি প্রতিযোগিতার জন্য প্রত্যেক বিরুদ্ধবাদীকে আহ্বান করলাম, পরীক্ষার্থে কেউই অগ্রসর হলো না।"

হযরত হাজী উল্‌-হারামাইন মাওলানা হাকীম নূরুদ্দীন সাহেব রাযি আল্লাহু আন্‌হুর হিজরত :

হযরত হাজী-উল-হারামাইন মাওলানা হাকীম নূরুদ্দীন সাহেবের হিজরত ১৮৯৩ সালের একটি বিশেষ ঘটনাতিনি কাশ্মীর ও জম্মুর মহারাজার রাজচিকিৎসক ছিলেন। হযরত আকদাস যখন 'মসীহ ও মাহ্‌দী' হওয়ার দাবি করলেন, তখন মৌলবী সাহেব হযরত সাহেবের খেদমতে লিখেছিলেন, "হুযুর, আমার হৃদয়ের বাসনা হুযুরের খেদমতে আমার অবশিষ্ট জীবন অতিবাহিত করি। যদি অনুমতি হয়, তবে আমি চাকরি ছেড়ে কাদিয়ান এসে বাস করব।" হযরত আকদাস লিখেছেন "চলতি চাকরি ত্যাগ করা আল্লাহ্‌র দানের অস্বীকার বটে। আপনি

(১) আরবি কিতাবগুলো সংখ্যায় প্রায় ২৪ খানি।

পদত্যাগ করবেন না।” কিছুদিন পর আল্লাহ্ তাআলা এমনি উপকরণ সৃষ্টি করলেন যে, হযরত মৌলবী সাহেবকে চাকরি থেকে পৃথক হতে হলো এবং তিনি তাঁর জন্মভূমি ভেরায় গমন করে সেখানে একটি নতুন পাকা বাড়ি নির্মাণ শুরু করেন। তখনও সেই বাড়ি নির্মিত হচ্ছিল এবং প্রায় সাত হাজার টাকা এতে ব্যয় হয়েছিল। এমন সময় হযরত মৌলবী সাহেব কোন প্রয়োজনবশত: লাহোর যান। সেখানে তার মনে পড়্লো কাছেই কাদিয়ান। হযরত আকদাসের সাথে সাক্ষাৎ করবেন। তাঁর নিজের বিবৃতি এই :

“আমার প্রাণ হযরত সাহেবকেও দেখতে চাইল। এজন্য আমি কাদিয়ান আসলাম। ভেরাতে উচ্চ ধরনের পাকা বাড়ি তৈরির কাজ শুরু হয়েছিল। এজন্য আমি যাওয়া–আসা উভয়ের ভাড়া ঠিক করে ঘোড়া গাড়ি নিলাম। এখানে এসে হযরত সাহেবের সাথে সাক্ষাত করলাম। ভাবলাম তাঁর কাছ থেকে এখনি অনুমতি নিয়ে বিদায় হবো। তিনি কথা প্রসঙ্গে বললেন : “আপনি তো ফারেগ হয়েছেন। আমি বললাম: ‘জি হ্যাঁ’। এখন তো আমি ফারেগই আছি’। গাড়িওয়ালাকে বললাম, ‘এখন, তুমি চলে যাও। আজ অনুমতি নেয়া ঠিক নয়। কাল পরশু অনুমতি নেব।’ পরদিন তিনি বললেন : ‘আপনার একাকী থাকায় তো কষ্ট হবে। আপনি আপনার একজন বিবিকে আনিয়ে নিন।’ নির্দেশমত বিবিকে আসার জন্য আমি চিঠি লিখলাম। এটাও লিখলাম ‘এখন যথাসম্ভব আমি শীঘ্র আসতে পারব না। এজন্য নির্মাণ কাজ বন্ধ রাখতে হবে।’ আমার বিবি আসবার পর হযরত সাহেব বললেন : ‘আপনার বই পড়ার বড় সখ। অতএব, আমি সমীচীন মনে করি যে, আপনি আপনার গ্রন্থাগারটি নিয়ে আসুন।’ অল্প দিন পরে বললেন : অপর বিবি আপনার মেজাজ মর্জি ভালো জানেন এবং প্রবীণ। আপনি তাঁকেও নিশ্চয়ই আনিয়ে নিন। মৌলবী আবদুল করীম সাহেবকে বললেন : ‘আমি (মৌলবী) নূরুদ্দীন (সাহেব– সম্বন্ধে ইল্হাম পেয়েছি। হারিরীতে এই কাব্য পদটি আছে :

لَا تَصْبُوَنَّ إِلَى الْوَطَنْ فِيْهِ تُهَانُ وَتُمْتَحَنْ[১]

খোদা-তাআলার আশ্চর্যজনক হস্তক্ষেপ হল। আমার কল্পনা বা স্বপ্নেও আবার আমার জন্মভূমির কথা মনে পড়েনি।”[২]

হযরত মসীহ্ মাওউদ আলাইহেস্ সালাতু ওয়াস্ সালামের সাহাবাদের মধ্যে

---

(১) অর্থাৎ জন্মভূমির প্রতি কখনো খেয়াল করিবেনা নচেৎ তোমার অবমাননা হবে এবং তোমাকে কষ্ট করিতে হইবে।”

(২) ‘মারকাতুল-একীন কি হায়াতে নূরুদ্দীন,’ ১৬৯ পৃ:।

তাঁর অত্যুচ্চ স্থান। তিনি যেভাবে সিলসিলার কাজে হযরত আকদাসকে সাহায্য করেছেন, তাঁর দৃষ্টান্ত অন্য কারো মধ্যে পাওয়া যায় না। কুরআন করীমের দরস দেয়া ছিল তাঁর প্রিয় কাজ, রসুলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের প্রতি হাদিসে তাঁর অসাধারণ প্রেম ছিল। তিনি চিকিৎসা বিদ্যায় সিদ্ধহস্ত ছিলেন। বস্তুত:, আত্মিক, দৈহিক উভয় দিক দিয়েই আল্লাহ্-তাআলার সৃষ্ট জীবের সেবায় তিনি সর্বোত: ভাবে ব্যাপৃত থাকতেন। হযরত আকদাস তাঁর রচিত বহু কিতাবে তাঁর ভূয়সী প্রশংসা করেছেন। দৃষ্টান্ত স্থলে, একটি চতুস্পদির মধ্যে তিনি যাবতীয় প্রশংসা গীতিই একত্রীভূত করেছেন :

چہ خوش بُودے اگر ہریک زِ اُمت نوردیں بُودے
ہمیں بُودے اگر ہر دل پُر از نُورِ یقیں بُودے

অর্থাৎ, "এই উম্মতের প্রত্যেকেই নূরুদ্দীন হলে কতই আনন্দের বিষয় হত। তাই হত, যদি প্রত্যেক হৃদয় একীনের জ্যোতিতে পরিপূর্ণ থাকত।"

১৮৯৩ সালের হযরত আকদাস মসীহ মাউদ (আ.) রচিত গ্রন্থসমূহ :

১। 'আয়নায়ে কামালতে ইসলাম'- এই কিতাবের বিষয়বস্তু সম্বন্ধে ইতিপূর্বে যথেষ্ট আলোচনা করা হয়েছে।

২। 'বারকাতুদ-দোয়া'-হযরত আকদাস এই পুস্তিকা স্যার সৈয়দ আহমদ মরহুমের উদ্দেশ্যে লিপিবদ্ধ করেন। এর সম্বন্ধেও ইতিপূর্বে বলা হয়েছে।

৩। 'হুজ্জাতুল্-ইসলাম'- হযরত আকদাস এই পুস্তকের মাধ্যমে ডাঃ হেনরী মার্টিন ক্লার্ক এবং অন্যান্য খ্রিষ্টানকে এই বাণী প্রচার করেন যে, এ যুগে জীবিত ধর্ম শুধু ইসলাম। এতে ওই সব শর্ত এবং কারণগুলোও বর্ণিত হয়েছে যার ফলে অমৃতসরে খ্রিষ্টানদের সাথে হযরত আকদাসের মুবাহাসা হয় এবং তা 'জঙ্গে মুকাদ্দস' নামে অভিহিত হয়।

৪। 'সাচ্চায়ী কা ইয্হার'- পাদ্রীদের সাথে হযরত আকদাসের মুবাহাসা ঠিক হওয়ার পর পাদ্রী সাহেবের স্বীকৃতি দিয়ে বড়ই অনুতপ্ত হন এবং যাতে এই মুবাহাসা হযরত আকদাসের সাথে না হয়ে জনাব উলামাদের সাথে হয়, সেজন্য চেষ্টা করতে থাকেন। এই জন্য তাঁরা মৌলবী মুহাম্মদ হুসায়েন সাহেবের তৈরি ফতোয়ার তফসীরের' খুব প্রচার করতে থাকেন এবং জন্ডিয়ালার মুসলমানরা–যাদের কারণে এই মুবাহাসা হওয়া স্থির হয়েছিল, তাদেরকে তাঁরা এই বলে উত্তেজিত করার আপ্রাণ চেষ্টা করলেন যে, তাঁরা যাকে মুবাহাসার জন্য তাঁদের প্রতিনিধি করেছেন (অর্থাৎ হযরত

হযরত আলহাজ্ব হাকীম মাওলানা নুরুদ্দীন
(১৮৪১–১৯১৪)
খলিফাতুল মসীহ আউয়াল (রা.)

আকদাসকে) তিনি তো সকল মুসলমানের মতে কাফের। জন্ডিওয়ালার মুসলামনরা অন্য কোন আলেমকে এই কাজের জন্যই মনোনীত করছেন না কেন? কিন্তু তারা পরিষ্কার জানালেন তাঁদের প্রতিনিধি হযরত মির্যা সাহেবই থাকবেন। হযরত আকদাস এই পুস্তকে এই সম্পর্কিত বিষয়ের ওপর আলোকপাত করেন।

৫। 'জঙ্গে মুকাদ্দস'- এই পুস্তকে অমৃতসরের মুবাহাসার হুবহু বিবরণ এবং উভয় পক্ষে বক্তব্যগুলো প্রকাশিত হয়।

৬। 'তোহ্ফায়ে বাগদাদ'- হযরত আকদাস এই পুস্তকে জনৈক সৈয়দ আবদুর রায্যাক কাদেরী বাগদাদীর একটি ইশতেহার ও পত্রের উত্তরে আরবি ভাষায় এই পুস্তক প্রণয়ন করেন। এই পুস্তকে হুযুর তার দাবি বিস্তারিত বর্ণনা করেন।

৭। 'কেরামাতুস্-সাদেকীন্'- হযরত আকদাস এই পুস্তকে আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ও সাল্লামের প্রশংসা-গীতি স্বরূপ চারটি আরবি কাসিদা এবং সুরাহ্ ফাতেহার তফসীর লিপিবদ্ধ করেন। মৌলবী মুহাম্মদ হুসায়েন বাটালবী সাহেব এবং অন্যান্য উলামা সাহেবানকে প্রতিযোগিতাপূর্বক আরবি তফ্সীর ও কসিদা লেখার জন্য আহ্বান করা হয়।

৮। 'শাহাদাতুল-কুরআন'- হযরত আকদাস এই পুস্তকে কুরআন করীম ও সহীহ্ হাদিস সহযোগে তারা মসীহ মাওউদ হওয়ার দলিল উপস্থাপন করেন।

১৮৯৩ সালের সালানা জলসা স্থগিত :

১৮৯৩ সালের সালানা জল্সা হযরত আকদাস দুই কারণে স্থগিত করেন।[১] প্রথম কারণ, বিগত বছর জল্সার সময় স্থানাভাব বশত: কোন কোন মেহমান পারস্পরিক প্রেম, সৌহার্দ্য 'যুহদ' ও 'পরহেজগারীর' উচ্চ আদর্শ প্রদর্শন করেননি। এতে হযরত আকদাস দু:খিত হন।

দ্বিতীয় কারণ, তখনও বিশেষ স্থানাভাব ছিল এবং কিছু জরুরি পুস্তক প্রকাশের ফলে অনেক খরচ হয়েছিল।

(১) 'শাহাদাতুল-কোরআনে' সন্নিবিষ্ট ঘোষণা পত্র।

হযরত শেঠ আবদুর রহমান হাজী আল্লাহ্ রাখা সাহেব মাদ্রাজীর সঙ্গে মৌলবী হাসান আলী সাহেবের কাদিয়ান আগমন :

মৌলবী হাসান আলী সাহেব বিহারের ভাগলপুর জেলার অধিবাসী ছিলেন। তিনি পাটনা হাই স্কুলের হেডমাষ্টার ছিলেন। একজন বড় ইসলাম-ভক্ত, আবেদ, যাহেদ ও বহু গ্রন্থপ্রণেতা ছিলেন। 'মেরাজুল্-মুমেনীন' তাঁর রচিত একটি প্রসিদ্ধ পুস্তক। সেসময়ে তিনি একজন প্রসিদ্ধ বাগ্মী ও তেজস্বী ধর্মীয় বক্তা ছিলেন। তাঁর বহুগুণশীলতা বশত: লোকে তাঁকে মুজাদ্দেদ মনে করত এবং তাঁকেও বলত যে, তিনি তো শতাব্দীর মুজাদ্দেদ। কিন্তু তিনি তা অস্বীকার করতেন। তিনি ইসলামকে অত্যন্ত ভালবাসতেন। ইসলাম প্রচারের এমনি আগ্রহ ও উৎসাহ তাঁর ছিল যে, তিনি চাকরি ত্যাগ করে তবলীগের জন্য জীবন উৎসর্গ করেন এবং ভারতবর্ষের বিভিন্ন শহরে তবলীগী বক্তৃতা করতে থাকেন। হযরত আকদাসের নাম প্রথমে তিনি ১৮৮৭ সালে অমৃতসরে শুনেন। দেখা করার ইচ্ছা হল। তিনি কাদিয়ান আগমন করলেন। তিনি তাঁর হৃদয়াবেগ 'তায়ীদে হক্' নামক পুস্তকে প্রকাশ করেন। তিনি বলেন :

মির্যা সাহেবের মেহমান-নেয়াযী, তাঁর আতিথেয়তা দেখে আশ্চর্যান্বিত হলাম। একটি ছোট্ট বিষয় লিখছি। এটা থেকে পাঠক তাঁর অতিথিপরায়ণতা সম্বন্ধে অনুমান করতে পারবেন। আমার পান খাওয়ার বদভ্যাস ছিল। অমৃতসরে তো আমি পান পেতাম। কিন্তু বাটালায় কোথায়ও আমি পান পাইনি। নাচার এলাচি প্রভৃতি চিবিয়ে ধৈর্য ধারণ করলাম। আমার অমৃতসরের বন্ধু অসাধ্য সাধন করলেন। জানি না কখন তিনি হযরত মির্যা সাহেবকে আমার এই বদভ্যাসের কথা বলেছেন। জনাব মির্যা সহেব এক ব্যক্তিকে গুরুদাসপুর পাঠালেন। পরদিন বেলা ১১ টার সময় আমি আহারের পর পান পেলাম। ষোল মাইল দূরবর্তী স্থান থেকে আমার জন্য পান আনা হলো।"[১]

মৌলানা হাসান আলী সাহেব কাদিয়ান থেকে ফিরে গিয়ে তাঁর প্রিয় কাজ ইসলাম প্রচারে ব্যাপৃত হলেন। ১৮৯৩ সালে আঞ্জুমানে হেমায়েত ইসলামের' বাৎসরিক কনফারেন্স হযরত মৌলানা হাফেজ নূরুদ্দীন সাহেব রাযি আল্লাহু আন্হুর মহাতাত্ত্বিক বক্তৃতা শ্রবণের সুযোগ তাঁর হলো। বক্তৃতা দ্বারা তিনি এমনি প্রভাবান্বিত ও মোহিত হলেন যে বক্তৃতার শেষে তিনি দাঁড়িয়ে বললেন :

"আমি গৌরববোধ করছি, আমি স্বচক্ষে এত বড় আলেম ও মুফাসসের দর্শন করলাম।[২]

---

(১) 'তায়ীদে হক ' ৫৪ পৃঃ।
(২) 'তায়ীদে হক ' ৬৪ পৃঃ।

এপ্রসঙ্গে তিনি লিখেছেন :

"আমার আগ্রহ হলো আমি জনাব মৌলবী হাকীম নূরুদ্দীন সাহেবের সাথে সাক্ষাৎ করব। কিন্তু মৌলবী সাহেব অনুগ্রহপূর্বক নিজেই এই অধমের সাথে সাক্ষাৎ করতে আসলেন। আমি তাঁকে নির্জনে জিজ্ঞাসা করলাম, 'আপনি মির্যা সাহেবের বয়আত করায় কি ফল পেয়েছেন ? প্রত্যুত্তরে তিনি বললেন, 'একটি গুণাহ্ ছিল আমি তা ছাড়তে পারছিলাম না। জনাব মির্যা সাহেবের বয়আত গ্রহণের পর সেই গুণাহ্ শুধু দূর হনি, এর প্রতি ঘৃণা জন্মেছে। জনাব মৌলবী হাকীম নূরুদ্দীন সাহেবের এই কথা আমার ওপর বিশেষ প্রভাব বিস্তার করলো। হাকীম সাহেব আমাকে কাদিয়ান যাওয়ার জন্য বললেন, আমি যাইনি।[১]

আরো লিখেছেন ঃ "আমি মাদ্রাজ আঞ্জুমানে হেমায়েতে ইসলামের বাৎসরিক কনফারেন্সে যোগদানের জন্য প্রতি বছর আঞ্জুমানের নিমন্ত্রণ পেতাম। বোম্বাইর জনাব আবদুর রাহমান, হাজী আল্লাহ্‌রাখা শেঠ সাহেবের সাথে সাক্ষাৎ হলো।[২] জানতে পারলাম আঞ্জুমান এক মাসের জন্য কনফারেন্স স্থগিত করেছে। জনাব শেঠ সাহেব আমার কাছে আগ্রহ প্রকাশ করলেন–আমি তাঁর সাথে ভারতবর্ষের প্রসিদ্ধ শহরগুলো ভ্রমণ করে উভয়ে মিলে কাদিয়ান শরীফ যাই। জনাব আবদুর রাহমান শেঠ সাহেবের ইচ্ছা ছিল তিনি হযরত মির্যা সাহেবের বয়আত করবেন। প্রথমে আমি নানা ওজর–আপত্তি প্রদর্শন করে এই সফরের কষ্ট থেকে মুক্তি চেয়েছিলাম। কিন্তু শেঠ সাহেব আমাকে খুব জোরে ধরলেন। আমার প্রতি তাঁর ভাল ধারণা ছিল। তিনি আমাকে বললেন, গিয়ে দেখুন মির্যা সাহেব সত্যবাদী, না ভন্ড'। আমি বললাম, 'আল-হাম্‌দুলিল্লাহে, আল্লাহ-তাআলা আমার প্রতি এতটুকু অনুগ্রহ করেছেন। আমি চেহারা দেখে মানুষের অভ্যন্তরীণ অবস্থা জানতে পারি। মানুষের পক্ষে সবই সম্ভবপর। ভাল খারাপ হয়ে পড়ে। মন্দও ভাল হয়। যদি মির্যা সাহেব তা না হয়ে থাকেন, যা ১৮৮৭ সালে আমি দেখেছি এবং তাঁর মধ্যে পার্থিবতা ও প্রবঞ্চনা এসে না থাকে, তবে চেহারা দেখামাত্র বলতে পারব।' শেঠ সাহেব বললেন, 'এই জন্যই তো আপনাকে সঙ্গে নিয়ে যেতে চাই।' যা হোক, আমি আবদুর রাহ্‌মান শেঠ সাহেবের সঙ্গে কাদিয়ান শরীফ রওয়ানা হলাম। পথে আলীগড় কনফারেন্সের তামাশা দেখলাম। এবং অমৃতসর হয়ে কাদিয়ান শরীফ পৌঁছলাম। অমৃতসরে আমি একটি স্বপ্ন

(১) 'তায়ীদে হক ' ৪৫৪ পৃঃ।

(২) হযরত শেঠ আবদুর রাহমান সাহেব মাদ্রাজী একজন অত্যন্ত বড় বুজুর্গ এবং সিলসিলাগত প্রাণ ছিলেন। ইসলামের সেবার বেপানাহ্ উৎসাহ তাঁর ছিল। তার তাকওয়া এবং আন্তরিকতা বশতঃ হযরত আকদাস তাঁকে সদর আঞ্জুমনে আহ্‌মদীয়ার একজন ট্রাষ্টি নিযুক্ত করেছিলেন।]

দেখলাম। জনাব মির্যা সাহেবের একটি বিশেষ খাট। হযরত সাহেব আমাকে সেই খাটে ঘুমাতে বললেন। আমি বললাম, 'হুযুরের বিছানায় শোব, আমি এই অপরাধ কিভাবে করতে পারি ? তিনি সামান্য হেসে বললেন, 'না, কোন দোষ নেই। ইতঃস্তত করছেন কেন ? যাহোক ১৮৯৪ সালের ২ জানুয়ারি কাদিয়ান পৌঁছলাম। জনাব মির্যা গোলাম আহমদ সাহেব কাদিয়ানের একজন রইস ব্যাক্তি। যথারীতি আমাদের সাথে সাক্ষাৎ করলেন। আমার ও শেঠ সাহেবের থাকার ব্যবস্থা করলেন এবং গভীর প্রেম ও আন্তরিকতার সাথে কথাবার্তা বললেন। এই প্রথম সাক্ষাতেই দর্শনমাত্র আমার প্রিয় বন্ধু জনাব আবদুর রহমান শেঠ সাহেব তো ইমামুল ওয়াক্তের প্রেমাসক্ত হয়ে পড়লেন। আমাকে শেঠ সাহেব জিজ্ঞাসা করলেন, 'বলুন, জনাব মির্যা সাহেবকে কেমন দেখলেন ?' আমি কি উত্তর দেবো? আমি তো নির্বাক। ১৮৮৭ সালে যে মির্যা সাহেবকে দর্শন করেছি ইনি তিনি নন। কণ্ঠ ও আকৃতি তো সেই একই আছে। কিন্তু অন্য সবই বদলে গেছে। আল্লাহ্, আল্লাহ্! আপাদমস্তক এক জ্যোতির্ময় মূর্তি দেখতে পেলাম। যাঁদের আন্তরিকতা থাকে এবং শেষ রাতে উঠে আল্লাহ্র দরবারে কান্নাকাটি করেন, তাঁদের চেহারাও আল্লাহ্ তাআলা তাঁর জ্যোতির দ্বারা জ্যোতির্ময় করে দেন। যাদের কিছুমাত্র অন্তর্দৃষ্টি থাকে, তাঁরা সেই জ্যোতি চিনতে পারেন। কিন্তু হযরত মির্যা সাহেবকে তো আল্লাহ তাআলা আপাদমস্তক প্রেমাস্পদের বস্ত্র নিজ হাতে পরিয়েছেন। তের দিন কাদিয়ান থাকলাম। দুই বেলাই এই 'ইমামে রাব্বানী', 'মহ্বুবে সুব্হানীর' সাথে সাক্ষাৎ হতে লাগল। এই সময়টি আমার জীবনের অতি উত্তম সময় ছিল। এখানে হযরতের অতুলনীয় গ্রন্থগুলো দেখার উত্তম সুযোগ পেলাম। 'আয়নায়ে কামালাতে ইসলাম', 'ফতেহ্ ইসলাম', 'তৌযিহে মরাম', 'এযালায় আওহাম', 'শাহাদাতুল-কোরআন', 'বরকাতুদ-দোয়া' প্রভৃতি কিতাব অল্প অল্প দেখলাম। আবদুর রাহমান শেঠ সাহেব অনুগ্রহ করে হযরতের কেতাবসমূহের এক এক কপি আমার জন্য খরিদ করলেন; শেঠ সাহেবের এই উৎকৃষ্ট স্মৃতিগুলো এখনো আমার কাছে অক্ষুণ্ন আছে। আমি এগুলোর দ্বারা বহু উপকৃত হলাম। হযরত আকদাসের লেখাগুলো থেকে আমি জানতে পারলাম আমি যে 'মুজাদ্দেদে জামানার' অনুসন্ধান করছিলাম, প্রকৃতপক্ষে ঐশী জ্ঞানে তিনি জনাব হযরত মির্যা গোলাম আহ্মদ সাহেবই ছিলেন। আল্লাহ্ হযরতকেই বর্তমান যুগের ফিৎনার মোকাবেলায় ইসলামের প্রাধান্য স্থাপনার্থে সৃষ্টি করেছেন।"

"এখন প্রধান প্রশ্ন, আমি কি এমন জলীলুল কদর, মহামান্য ইমামের অনুবর্তী হব ? অথবা কাফেরীর ও অনুযোগের টুকরি মাথায় নিব ? একজন ভাল ধর্ম বক্তা হিসেবে সমগ্র ভারতব্যাপী যেটুকু সম্মান অর্জন করেছি, তা এই সত্যের জন্য

কুরবান করে প্রশংসার পরিবর্তে লোকের অভিশাপের পাত্র হব ? না, শিয়াদের নীতি গ্রহণ করে হযরত মির্যা সাহেবের কাছে তাঁর মতাবলম্বী এবং বিরুদ্ধ বাদীদের কাছে (মাআযাল্লাহ্) মির্যা সাহেবের বিরোধী সেজে বাহবা নেব ? আশ্চর্য্যজনক দ্বিধার মধ্যে আমার কয়েক দিন কাদিয়ানে কাটল। প্রতিদিন কেঁদে কেঁদে আল্লাহ-তাআলার কাছে দোয়া করতাম: যদি তোমার সন্তুষ্টি মির্যা সাহেবের অনুবর্তিতা ও তাঁর আজ্ঞা পালনে থাকে, তবে আমাকে স্বপ্নযোগে যেমন বহুবার তুমি করেছো এবারও প্রকৃত বিষয় আমার কাছে পরিস্কার কর। কিন্তু এদিক সম্পূর্ণ নিস্তদ্ধ থাকলো। মহানকর্তার এটাই ইচ্ছা ছিল যে, আমি নিজেই তার প্রদত্ত বুদ্ধি ব্যবহার করে আমার লাভ-ক্ষতি দেখে শুনে কাজ করি। পাটনা হাই স্কুলের প্রধান শিক্ষকের পদত্যাগ করা অপেক্ষা এবার ব্যাপার গুরুতর বোধ হলো। এবার এক ভারী কোরবানীর সুযোগ। এক পা সামনে অগ্রসর হই তো, এক পা পেছনে। শয়তান বলত, 'মিঞা, যদি ধ্বংস হতে, লাঞ্ছনা, অবমাননা থেকে নিরাপদ থাকতে চাও, চুপে চুপে কাদিয়ান থেকে বের হও। ফেরেশ্‌তা বলত : 'দুর্ভাগা, তুমি হাদিস পড়নি? যে ব্যক্তি সমসাময়িক ইমাম না চিনে মরে, সে অজ্ঞের মৃত্যুবরণ করে। তারপর, যে অবস্থায় খোদা প্রদত্ত বুদ্ধি তোমাকে বলছে যে, জনাব হযরত মির্যা সাহেবই যামানার ইমাম, তুমি তাঁর দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে কোথায় যাবে? পার্থিব জীবনের কয়েকদিন কাজ-কর্ম এবং ভুয়া সম্মানের জন্য তোমার চিরদিনের স্বার্থ নষ্ট করবে ? হে, অর্বাচীন, হে অদূরদর্শী, তুমি যে আত্মিক ব্যাধিতে ভুগছ, তার চিকিৎসা আল্লাহ্-তাআলা তোমার কাছে পৌঁছিয়েছেন। কেমন দুর্ভাগা ! তোমার আধ্যাত্মিক স্বাস্থ্যের শক্রতা করে অভ্যন্তরীণ অপবিত্রতা ও কপটতার জীবনে নিমজ্জিত থাকতে চাও? হে বন্ধুগণ, আমি ফেরেশ্‌তার কথা শুনলাম এবং ১৮৯৪ সালের ১১ই জানুয়ারি জুমার রাতে কাদিয়ানের রইস হযরত ইমামুল-ওয়াক্ত যামানার মুজাদ্দেদ জনাব মির্যা গোলাম আহ্‌মদ সাহেবের বয়আত গ্রহণ করলাম এবং তাঁকে আমার ইমাম স্বীকার করলাম। অনন্তর, সেজন্য যাবতীয় প্রশংসা আল্লাহ্ তাআলার।

"বয়আত গ্রহণের পর তিন দিন পর্যন্ত কাদিয়ানে থাকার সুযোগ হলো। এই শেষ তিনদিন যখন আমি জামা'তের সঙ্গে নামায পড়তে থাকলাম, তখন আমি অনুভব করতে লাগলাম যে এখন আমি 'নামায' পড়ি। অর্থাৎ, নামাযে আমি আশ্চার্য্যজনক স্বাদ পেলাম। ১৩ই জানুয়ারি আমি আমার ইমাম থেকে বিদায় গ্রহণ করে লাহোরে এলাম। মহাধুমধামের সাথে ইংরেজিতে বক্তৃতা করলাম। বক্তৃতায় হযরত আকদাসের দ্বারা যে আধ্যাত্মিক উপকার হয়েছিল বর্ণনা করলাম। যখন আমি পাঞ্জাব ভ্রমণ শেষ করে মাদ্রাজ পৌঁছলাম, তখন আমি ওই

সব ব্যাপারেরই সম্মুখীন হলাম, যা সত্যের প্রেমিকেরা প্রতি যুগে প্রতি দেশে ভোগ করেছেন। মসজিদে ওয়াজ করতে নিষেধ করা হলো। প্রত্যেক মসজিদেই ইশ্‌তেহার দেয়া হলো হাসান আলী সুন্নত জামাতে নেই। কেউ তার ওয়াজ শুনবে না। পুলিশকে সংবাদ দেয়া হলো আমি অশান্তি বিস্তার করি। যে ব্যক্তি মাত্র কয়েক দিন আগে 'শামসুল ওয়ায়েযীন জনাব মৌলানা মৌলবী হাসান আলী ওয়ায়েযে ইসলাম' বলে অভিহিত হত, সে এখন শুধু 'হাসান আলী বক্তা' নামে কথিত হতে লাগল। ইতিপূর্বে ওয়াযে একজন 'অলি' বলে মনে করা হতো। এখন আমার চেয়ে বড় 'শয়তান' কেউ থাকলো না। যেদিকেই যেতাম, লোকে আঙ্গুল দিয়ে দেখাত। সালাম করতাম। জবাব পেতাম না। আমার সাথে সাক্ষাৎ করতে লোকে ভয় পেত। এক ভয়াবহ প্রাণীতে পরিণত হলাম।"[১]

জনাব মৌলবী হাসান আলী সাহেব বড়ই সুরসিক, সদাহাস্যময় পুরুষ ছিলেন। যদি এখানে তাঁর পুস্তক থেকে পাঠকদের কাছে তাঁর একটি জ্ঞানমূলক রস-কথা পরিবেশন করা হয় তাহলে অপ্রাসঙ্গিক হবে না। তিনি বলেন :

"মাদ্রাজের ওয়ালাজাহী মস্‌জিদে হযরত মির্যা সাহেবের বয়আত করার পর যখন আমি 'দরূদ' শরীফের ওয়াজ করতে চাইলাম, আমাকে নিষেধ করা হলো। আমি সেখান থেকে রওয়ানা হলে একজন মুসলমান ইমানদার আমাকে বলতে লাগল, 'এই কাফের', 'এই কাফের',। 'এই দাজ্জাল' 'এই দাজ্জাল'। আমি মনে মনে ভাবলাম, এই ব্যক্তিও আমাদেরই দাবির সমর্থন করছে। কারণ, আমি এক চোখ বিশিষ্ট নই। সত্তর গজ গাধার ওপর সাওয়ার নই। জীবিতকে মৃত এবং মৃতকে জীবিত করি না। তবু এই ভাল মানুষ আমাকে 'দাজ্জাল' বলছে কেন? শুধু এই জন্য যে, তার খেয়াল মত সে বুঝে নিয়েছে আমি হযরত আকদাস মির্যা সাহেবের অনুবর্তী হয়ে গুমরাহ্ হয়ে পড়েছি এবং গুমরাহী বিস্তার করছি। সুতরাং, সে যখন একজন কলেমা পড়া আহ্‌লে কেবলাকে'- যে এই মাত্র 'জুমার নামায' পড়ে দরূদ শরীফের মাহাত্ম বর্ণনা করতে চেয়েছিল- তাঁকে 'দাজ্জাল' বলা উচিত মনে করছে, তখন যদি আমরা ঈসাপুজারী জাতিকে গুমরাহ করতে যাদের ন্যায় দ্বিতীয় আর কেউ নেই-'দাজ্জাল' বলি, তবে অন্যায় কি করি ?'[২]

---

(১) 'তায়ীদে হক,' ৭১-৭৫ পৃঃ।
(২) 'তায়াদে হক,' ১৩৬ পৃঃ।

১৮৯৪ সালের এপ্রিল আসমানী নিদর্শন - চন্দ্র ও সূর্য গ্রহণ :

হযরত ইমাম মাহ্দী আলাইহেস্ সালামের আগমনের নির্দশনসমূহের মধ্যে এটাও একটি বড় নিদর্শন ছিল যে, রমযান শরীফের মাসে চন্দ্র গ্রহণ ও সূর্য গ্রহণ হবে। এই সম্পর্কিত হাদীসটি এই :

"إِنَّ لِمَهْدِيِّنَا آيَتَيْنِ لَمْ تَكُوْنَا مُنْذُ خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ يَنْكَسِفُ الْقَمَرُ لِأَوَّلِ لَيْلَةٍ مِنْ رَمَضَانَ وَتَنْكَسِفُ الشَّمْسُ فِي النِّصْفِ مِنْهُ۔[১]

অর্থাৎ, "আমাদের মাহ্দীর জন্য দু'টি নিদর্শন আছে। যতদিন ধরে জমিন আস্মানের সৃষ্টি হয়েছে, এমন নিদর্শন কোন দাবিকারকের জন্য প্রকাশিত হয়নি। এই নিদর্শন দুটি হলো চন্দ্র গ্রহণের তারিখগুলোর মধ্যে প্রথম তারিখ অর্থাৎ ১৩ তারিখ এবং সূর্য গ্রহণের দিনগুলোর মধ্যবর্তী দিবস অর্থাৎ ২৮ তারিখ গ্রহণ হবে।"[১]

এই নিদর্শন ১৩১১ হিঃ মোতাবেক ১৮৯৪ খ্রিষ্টাব্দে পৃথিবীর পূর্ব গোলার্ধ, অর্থাৎ ইউরোপ, এশিয়া ও আফ্রিকায় প্রকাশিত হয়।[২] এবং ১৮৯৫ খ্রিষ্টাব্দে পৃথিবীর পশ্চিম গোলার্ধ অর্থাৎ আমেরিকায় এটা প্রকাশিত হয়। অনন্তর আল্লাহ্ তাআলারই সমস্ত প্রশংসা। فلله الحمد من ذالك۔

আল্লাহ্ তাআলা সমগ্র বিশ্বে এই গ্রহণ প্রদর্শনপূর্বক এই সাক্ষ্য দিয়েছেন এই ইমাম তাঁর পক্ষ থেকে আগমন করেছেন। দ্বিতীয়, এই কথা প্রকাশ করা হয়েছে যে তাঁর আহ্বান ও তিনি যে নবীর অনুবর্তিতা ও আজ্ঞা পালন করেন অর্থাৎ, আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের আহ্বানের মত সার্বভৌমিক, সর্বজনীন। তৃতীয়, প্রথমে পূর্ব গোলার্ধে গ্রহণ দ্বারা যথাসম্ভব এই সঙ্কেত করা হয়েছে যে, তাঁর জন্ম ও আবির্ভাব পূর্ব গোলার্ধেও হওয়ার ছিল এবং পরে তাঁর পক্ষ থেকে ইসলামের আহ্বান পশ্চিম গোলার্ধে পৌঁছান হবে এবং আল্লাহ্ই সর্বাপেক্ষা উত্তম জানেন এবং তাঁর জ্ঞানই সম্যক।

খাজা কামালুদ্দীন সাহেবের বয়আত, ১৮৯৪ সাল :

খাজা কামালুদ্দীন সাহেব লাহোরে ফরম্যান খ্রিষ্টান কলেজে অধ্যয়ন করছিলেন। পারিপার্শ্বিক প্রতিক্রিয়ার ফলে খ্রিষ্টান ধর্মের প্রতি তাঁর আকর্ষণ জন্মেছিল। কিন্তু আল্লাহ্ তাআলা তাঁর হাত প্রসারিত করলেন। কোথাও থেকে তিনি 'বারাহীনে

(২) দার-কুৎনী ১০০০ পৃঃ।
(৩) 'পাইওনিয়র' এবং সিভিল এ্যান্ড মিলিটারী গেজেট' ৬ ডিসেম্বর, ১৮৯৪ খ্রিষ্ট সাল।

আহমদীয়া’ পেয়েছিলেন। পরে, আর কি? ‘বারাহীনে আহমদীয়া’ যতই পাঠ করতে লাগলেন, ততই খ্রিষ্টান মতবাদের প্রভাব তার মন থেকে দূরীভূত হতে লাগল এবং ইসলামের নানা রং প্রকাশিত হতে লাগল। পরবর্তীতে কাদিয়ান উপস্থিত হয়ে হযরত আকদাসের হাতে বয়আত হলেন। তাঁরই অনুপ্রেরণায় লেখ্‌রাম সংক্রান্ত ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হওয়ার পর মৌলবী মুহাম্মদ আলী সাহেব ১৮৯৭ সালের মার্চ মাসে বয়আত গ্রহণ করলেন।

মৌলবী রুসুল বাবা অমৃতসরীর উদ্দেশ্যে শেষ যুক্তি :

অমৃতসরের উলামাদের মধ্যে রুসুল বাবার কথা পূর্বেই বর্ণনা করা হয়েছে। ইনি কাশ্মিরী বংশোদ্ভুত ছিলেন। তাঁর নাম ছিল ‘গোলাম রসুল’। কিন্তু উরফে ‘রুসুল বাবা’ বলেই তিনি বেশি পরিচিত ছিলেন। ইতি খান মুহাম্মদ শাহ মরহুমের মসজিদের ইমাম ছিলেন। তাঁকে কাশ্মিরী ভক্তরা হযরত ইসা মসীহের জীবিত থাকা সম্বন্ধে কোন কিতাব লিখতে বাধ্য করায় তিনি ‘হায়াতুল্‌-মসীহ্‌’ নামক একটি পুস্তিকা লিখলেন। পুস্তিকাটির কোন ‘জবাব নাই’ হওয়ার কাল্পনিক দাবি প্রমাণার্থে এক হাজার টাকার পুরষ্কার ঘোষণাও করা হলো। হযরত আকদাসের কাছে যখন পুস্তিকাটি পৌঁছল, তখন হুযুর এর জবাব লেখার ঘোষণা করলেন এবং বললেন ১৮৯৪ সালের জুন মাসের শেষ পর্যন্ত অমৃতসরের তিন জন প্রসিদ্ধ রইস খাঁ বাহাদুর, খাজা ইউসুফ শাহ্‌ এবং হাজী মীর মাহ্‌মুদ সাহেবদের কাছে পুরষ্কারের টাকা রসুল বাবার জমা করা কর্তব্য এবং তাঁদেরকে ক্ষমতা দিতে হবে, তাঁরা তাঁদের স্বাক্ষরযুক্ত একটি লিখিত বস্তু এই মর্মে প্রেরণ করেন যে, তাঁরা এক সহস্র টাকা বুঝে পেয়েছেন এবং তাঁরা অঙ্গীকার করছেন যে মির্যা গোলাম আহমদ এর জয় নির্ণীত হলে এক হাজার টাকা মির্যা সাহেবকে অবিলম্বে প্রদান করবেন এবং রসুল বাবার সাথে এর কোনই সম্পর্ক থাকবে না।”

হুযুর বললেন যে, তিনি এই মিমাংসার জন্য মৌলবী মুহাম্মদ হুসায়েন সাহেব বাটালবীকেই মনোনীত করেছেন। কিন্তু এই শর্ত থাকবে একটি প্রকাশ্য সভায় উক্ত মৌলবী সাহেব নিম্নলিখিত ‘অঙ্গীকার’ করবেন :

“উপস্থিত শ্রোতাবৃন্দ, খোদার কসম! আমি উভয় পুস্তকই আগাগোড়া দেখেছি। আমি খোদা তাআলার কসম খেয়ে বলছি বাস্তবিক মৌলবী রসুল বাবার পুস্তক সুনিশ্চিতভাবে এবং অখন্ডনীয় উপায়ে হযরত ঈসার জীবিত থাকা প্রমাণিত করেছে এবং যে প্রতিবাদ পুস্তক বের হয়েছে এর জবাব দ্বারা এর মূল কর্তন হয় না এবং যদি আমি মিথ্যা বলে থাকি অথবা আমার মনে এর বিরুদ্ধমূলক কোন কথা থাকে, তবে আমি দোয়া করছি যে এক বছরের মধ্যে আমার কুষ্ঠ ব্যাধি হয়

অথবা অন্ধ হই, বা অন্য কোন জঘন্য আযাবে প্রাণত্যাগ করি।" তখন সমস্ত উপস্থিত ব্যক্তি তিনবার উচ্চ:স্বরে বলবেন,'আমিন', 'আমিন', 'আমিন'। অত:পর, সভাভঙ্গ হবে। তারপর এক বছর সেই কসমকারী নিরাপদ থাকলে মনোনীত কমিটি রুসুল বাবার হাজার টাকা সসম্মানে প্রত্যার্পণ করবেন। তখন আমিও এই স্বীকারপত্র প্রকাশ করব যে, বাস্তবিক রসুল বাবা হযরত মসিহ্ আলাইহেস সালামের জীবিত থাকা প্রমাণ করেছেন। কিন্তু এক বছর পর্যন্ত টাকা মনোনীত কমিটির কাছে জমা থাকবে। যদি রসুল বাবা সাহেব অত্র রেসালা প্রকাশিত হওয়ার দুই সপ্তাহের মধ্যে হাজার টাকা জমা না করেন, তবে তার দিব্য মিথ্যাবাদিতা ও প্রবঞ্চনা প্রমাণিত হবে। তখন প্রত্যেকেরই কর্তব্য হবে, এই প্রকার প্রবঞ্চক মিথ্যাবাদী লোকদের অনিষ্ট হতে আল্লাহ্ তাআলার পানাহ্ ভিক্ষা করা।[১]

হযরত আকদাসের রেসালা "ইৎমামে হুজ্জৎ" নামে লিখিত হয়েছিল। মুদ্রিত হওয়া মাত্র হযরত আকদাস এই রেসালা মৌলবী মুহাম্মদ হুসায়েন সাহেব বাটালবী এবং উপরোল্লিখিত অমৃতসরের প্রভাবশালীদেরকে রেজিস্ট্রী ডাক যোগে প্রেরণ করেন। কিন্তু মৌলবী রসুল বাবা উল্লেখিত শর্তগুলো মঞ্জুরপূর্বক ময়দানে বের হওয়ার সাহস করেননি। ফলে তাঁর দল থেকে হযরত মিঞা জীউন বাট,[২] মিঞা মুহাম্মদ সুলতান সাহেব, মিঞা গোলাম রসুল সাহেব এবং আরো কোন কোন অকপট মুখলিস ব্যক্তি হযরত আকদাসের বয়আত গ্রহণ করেন।

মৌলবী রসুল বাবার প্লেগে মৃত্যু, ১৯০২ সালের ৮ই ডিসেম্বর :

এই ঘটনার কয়েক বছর পরে, যখন হযরত আকদাস আলাইহেস্ সালাম আল্লাহ্ তাআলা থেকে সংবাদ প্রাপ্ত হয়ে এই কথা ঘোষণা করলেন, দেশে প্লেগ বিস্তার লাভ করবে, তখন মৌলবী রুসুল বাবা অত্যন্ত দাম্ভিকভাবে বললেন যে, এই ভীষণ প্লেগে নিরাপদ থাকা তাঁর সততার পরিচায়ক। যখন রসুল বাবার সত্যতার এই দলিল শহরের মধ্যে উত্তমরূপে ছড়িয়ে দেয়া হলো, তখন ১৯০২ সালের ৮ই ডিসেম্বর তারিখে প্লেগ এসে তাঁকে আক্রমণ করল এবং তাঁর মৃত্যু সিলসিলার সত্যতার একটি নির্দশন হয়ে রইলো।

(১) রেসালা 'ইৎমামে-হুজ্জৎ', ২৮ পৃঃ।
(২) ইনি পরে হযরত মৌলানা সৈয়দ মুহাম্মদ সারওয়ার শাহ সাহেবের শ্বশুর হন।

হযরত সাহেজাদা মির্যা শরীফ আহমদ (রা.)

১৮৯৪ সালের গ্রন্থ :

১। 'হামামাতুল বুশ্‌রা'- এই কিতাব হুযুর জনৈক মুখলেস আরব মুহাম্মদ বিন্‌ আহমদ মক্কীর তাহ্‌রীকে হেজাযবাসীদের উদ্দেশ্যে প্রণয়ন করেন। এই কিতাবে হুযুর তাঁর আকায়েদ ও দাবি বিস্তারিতভাবে খুলে বলেন।

২। 'নূরুল্‌-হক্‌', প্রথম ও দ্বিতীয় খন্ড। এটাও হুযুরের আরবি তস্‌নীফ। এর প্রথম খন্ড ১৮৯৪ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে ও এর দ্বিতীয় খন্ড ১৮৯৪ সালের মে মাসে প্রকাশিত হয়। অমৃতসর মুবাহাসায় আবদুল্লাহ্‌ আথম যখন পরাজিত হলেন, তখন পাদ্রী ইমাদউদ্দীন প্রতিশোধ গ্রহণার্থে একটি বই, 'তৌযিনুল আকওয়াল' লিখলেন। এই পুস্তকে আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ও সাল্লামের বিরুদ্ধে অনেক বিষ উদ্‌গিরণ করলেন এবং কুরআন করীমের ফাসাহাত বালাগতের বিরুদ্ধেও নানা প্রকার আপত্তি করলেন। তদ্ব্যতীত ইংরেজদের হযরত আকদাসের বিরুদ্ধে এই বলে উস্কানি দেয়া হলো যে তাদেরকে "দাজ্জাল" বলা হয় এবং একদিন শক্তি সঞ্চয় করে বিদ্রোহ উপস্থিত করা হবে ইত্যাদি। এই বই হযরত আকদাসের কাছে পৌঁছলে, এর জবাবে হুযুর 'নূরুল-হক' প্রণয়ন করেন এবং এর প্রত্যুত্তর লেখক পাদ্রীর জন্য পাঁচ হাজার টাকা পুরষ্কার ঘোষণা করলেন।১

৩। 'ইৎমামুল্‌-হুজ্জৎ'- এই কিতাব হযরত আকদাস আরবি ও উর্দুতে প্রণয়ন করেন। এর সম্বন্ধে উপরে আলোচিত হয়েছে।

৪। 'সির্‌রুল্‌-খুলাফা'- এই কিতাবও আরবি ও উর্দু ভাষায় রচিত হয়। এটি, ১৮৯৪ সালের জুলাই মাসে প্রকাশিত হয়। এতে খিলাফত সম্বন্ধে অত্যন্ত সূক্ষ্ম বাহাস করা হয় এবং শিয়া-সুন্নির বিরোধের অত্যুৎকৃষ্ট পদ্ধতিতে হুযুর মিমাংসা দান করেন।

৫। 'আন্‌ওয়ারুল্‌-ইসলাম'-আবদুল্লাহ্‌ আথম 'রুজু' (প্রত্যাগমণ) করার ফলে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে তার মৃত্যু হয়নি বলে লোকে বহু চেঁচামেচি করে। তাদের শোরগোলের জবাবে হুযুর এই কিতাব প্রকাশ করেন। তা হুযুরের কিছু ইশতেহারের সমষ্টি। এই ইশতেহারগুলো আথমকে হলফ করার জন্য অগ্রসর করার উদ্দেশ্যে হুযুর সহস্র সহস্র টাকা পুরষ্কার ঘোষণাসহ প্রকাশ করেন। এই কিতাব ১৮৯৪ সালের ৬ সেপ্টেম্বরে প্রকাশিত হয়।

---

(১) 'আল-হাকাম,' একাদশ বর্ষ, ১ম সংখ্যা, 'বদর' ৬ষ্ট বর্ষ, ১ম সংখ্যা।

১৮৯৪ সালের সালানা জলসা :

যদিও ১৮৯৩ সালের জলসা হযরত আকদাস কোন কোন কারণে স্থগিত করে ছিলেন, কিন্তু ১৮৯৪ সালের নির্দিষ্ট তারিখগুলোতেই জলসার অধিবেশন হলো। এই জলসায় যোগদানের জন্য হুযুর কোন কোন বন্ধুকে পত্র দ্বারা নিমন্ত্রণ করেন। ফলে এই জলসায় বন্ধুগণ পূর্বাপেক্ষা অধিক সংখ্যায় যোগদান করেন।

সাহেবজাদা মির্যা শরীফ আহ্‌মদ সাহেবের জন্ম, ১৮৯৫ সালের ২৪ মে :

১৮৯৫ সালের ২৪ মে হযরত সাহেবজাদা মির্যা শরীফ আহ্‌মদ সাহেব জন্মগ্রহণ করেন। তার সম্বন্ধে হযরত আকদাস যথাসম্ভব দুবার ইলহাম প্রাপ্ত হলেন, "مُعَمَّرُ اللّٰه" , অর্থাৎ, "খোদা-তাআলার পক্ষ থেকে বয়ঃপ্রাপ্ত" এই ইলহাম-মূলে আমাদের দৃঢ় প্রত্যয় এই যে, আল্লাহ-তাআলা তাঁকে অসাধারণভাবে দীর্ঘায়ু প্রদান করবেন। একবার হযরত আকদাস স্বপ্নে দেখলেন সাহেবজাদা মির্যা শরীফ আহ্‌মদ সাহেব পাগড়ী পড়েছেন এবং দুই ব্যক্তি পাশে দাঁড়িয়ে আছে। একজন শরীফ আহমদ সাহেবের দিকে ইশারা করে বলল, وہ بادشاہ آیا (ওই বাদশাহ্ এসেছেন) দ্বিতীয় ব্যক্তি বলল, এখন তো তিনি কাযি হবেন (ابھی تو اس نے قاضی بننا ہے۔) হযরত আকদাস বলেছেন, "কাযি 'হাকাম'কেও (حَکَم) বলা হয়। কাযি সত্যতার সমর্থন এবং অসত্যের খন্ডন করেন।[১]

একবার সাহেব যাদা হযরত শরিফ আহমদ সাহেব বিশেষ অসুস্থ হলে হযরত আকদাস তাঁর সম্বন্ধে নিম্নলিখিত ইলহামগুলো প্রাপ্ত হন :

۱۔ عَمَّرَهُ اللّٰهُ عَلٰى خِلَافِ التَّوَقُّعِ ؛ ۲۔ اَمَّرَهُ اللّٰهُ عَلٰى خِلَافِ التَّوَقُّعِ ؛

۳۔ اَءَنْتِ لَا تَعْرِفِيْنَ الْقَدِيْرَ ؛ ۴۔ مُرَادُكَ حَاصِلٌ ؛

۵۔ اَللّٰهُ خَيْرٌ حَافِظًا وَّهُوَ اَرْحَمُ الرَّاحِمِيْنَ ؛

ইলহামগুলোর অনুবাদ এই :-

১। 'খোদা তাআলা তাকে আশাতীত আয়ুদান করবেন।

২। 'খোদা তাআলা তাকে আশাতীত অধিক আমীর করবেন।

---

(১) 'বস্তুত: আল্লাহ তাআলা কয়েকবার অসাধারণ পীড়ার মধ্যেও ১৯৬২ সালের ২৬ ডিসেম্বর পর্যন্ত জীবন দান করেন। (অনুবাদক)

(২) 'বদর,'১০ জানুয়ারী, ১৯০৭ সাল।

৩। 'তুমি কি সর্ব শক্তিমানকে চেন না' ? (এটা তাঁর ওয়ালেদা (মাতা) সাহেবার সম্বন্ধে ইলহাম)।

৪। 'তোমার মনস্কামনা পূর্ণ হবে।'

৫। 'খোদা সর্বশ্রেষ্ঠ হেফাজতকারী এবং তিনি সকল দয়াবানের চেয়ে অধিক দয়াবান'।

হযরত ইসা মসীহ্‌ের কবর গবেষণার্থে শ্রীনগর প্রতিনিধি দল প্রেরণের প্রস্তাব :

এই বছরই তিনি শ্রীনগর 'খানইয়ার' মহল্লায় হযরত মসীহ্ নাসেরী আলাইহেস্ সালামের 'কবর' প্রমাণপূর্বক খ্রিষ্টান ও মুসলিম জগতের কাছে একটি তাজা ঐতিহাসিক সত্য উদ্‌ঘাটন করলেন। 'নূরুল-কুরআন' দ্বিতীয় খন্ডে এই গবেষণা নিয়ে সন্তোষজনক আলোচনাকরে প্রমাণ করলেন যে, কাশ্মিরীরা সবাই বনি ইস্রায়িলী। তারা নবুখদ্ নিৎসরের সময়ে আফগানিস্তান ও কাশ্মিরের দিকে হিযরত করে এসেছিলো। আরো অধিক গবেষণার্থে তিনি তাঁর জামা'তের বন্ধুগণ সম্বলিত এক প্রতিনিধিদলও শ্রীনগর প্রেরণ করেন। তাঁরা পুরোপুরি গবেষণার পর তাঁর কাছে রিপোর্ট পেশ করলেন। তা অবলম্বনক্রমে তিনি একটি ঐতিহাসিক কিতাব 'মসীহ্ হিন্দুস্তান মে' প্রণয়ন করলেন। প্রতিশ্রুত মসীহের আবির্ভাবের একটি গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্য ছিল 'ক্রুশ ভঙ্গ' করা। সুতরাং, এই গবেষণা দ্বারা তিনি এর মজবুত ভিত্তি স্থাপন করলেন। তারপর, আল্লাহ-তাআলা এমন অবস্থার সৃষ্টি করলেন যে, স্বয়ং খ্রিষ্টান গবেষণাকারীদের পক্ষ থেকে এই বিষয়ে যথেষ্ট উপকরণ সম্পূর্ণ ধারাবাহিকভাবে সরবরাহ হয়েছে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ পরবর্তী পৃষ্ঠায় এ প্রসঙ্গে গবেষণালব্ধ কিছু ছবি ও প্রাচীন পুস্তকাদি থেকে উদ্বৃতি উপস্থাপন করা হলো।

১। এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটেনিকার, (Encyclopaedia Britannica) চতুর্দশ খন্ডে হযরত মসীহ্ নাসেরীর কোন কোন ছবি প্রকাশিত হয়েছে।[১] তার মাধ্যমে পরিষ্কার জানা যায়, হযরত মসীহ্ নাসিরী নিশ্চয়ই এক শ' বছরেরও অধিক জীবন লাভ করেছিলেন। এ ছবিগুলো রোম নগরীতে পোপের কাছে পবিত্র

(১) আদি যুগের কোন কোন খ্রিষ্টান বিজ্ঞ ব্যক্তি মসীহের দীর্ঘ জীবন প্রাপ্তি স্বীকার করতেন। দৃষ্টান্ত স্থলে, খ্রিষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীতে ইরনিয়ুস লিখেছেন যে, বিশ্বের পুর্ণ্যতম আদর্শ হচ্ছেন হযরত মসীহ্ নাসেরী। তিনি বাল্য, যৌবন ও বার্ধক্য ত্রিকালই জীবিত ছিলেন। (বিশপ ইরুনিয়ুস প্রণীত 'রদ্দে বেদাত' Reputation of Innovations, তৃতীয় অধ্যায়)।

হযরত ঈসা নাসেরী (আলাইহেস্ সালাম)-এর দু'টি ছবি।

এ ছবি দ্বারা তাঁর বয়স একশ' বছর অপেক্ষাও অনেক অধিক অনুমান করা হয়।
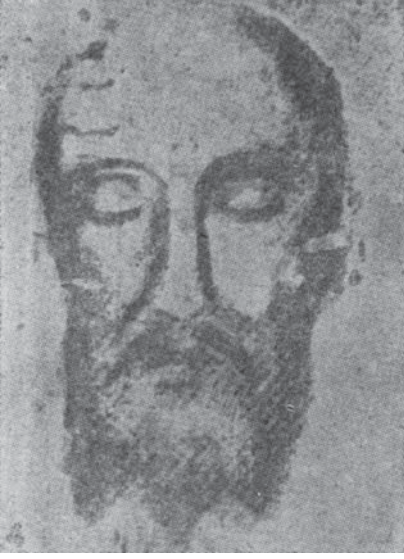
এ ছবি দ্বারা তাঁর বয়স ৬০/৬৫ বছর অনুমান করা হয়।

উপরের ছবি দু'টি ১৮০০ বছর যাবত পবিত্র আমানত স্বরূপ খ্রিষ্টান জগত সংরক্ষণ করে আসছে। ১৯৫৭ খ্রিষ্টাব্দে এগুলো সর্বপ্রথম বিশ্বের সামনে আনা হয় এবং নিম্নলিখিত নোট সহ Encyclopaedia of Britan nica -তে প্রকাশিত হয় :-

"রোমের সেন্ট পিটার্স গীর্জায় কাপড়ের ওপর তৈরি এ ছবি দু'টি প্রাচীন স্মৃতিগুলোর সাথে সংরক্ষিত হয়ে আসছে। ছবিগুলো খ্রিষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীর বলে সুনিশ্চিতভাবে জানা যায়।"

৩৩ বছর বয়সে যীশুখ্রিষ্ট আকাশে গমন করেন বলে খ্রিষ্টানদের বিশ্বাস কতটুকু সত্য, ছবিগুলো থেকে পাঠক বেশ অনুমান করতে পারেন।

আমানত স্বরূপ সংরক্ষিত আছে। 'ইনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটেনিকায়' লিখিত আছে যে দ্বিতীয় বা তৃতীয় শতাব্দীতে খ্রিষ্টানরা এ ছবিগুলো তৈরি করে।

২। আমাদের সামনে ইঞ্জিলের যেসব পুস্তক আছে, তাতে পরিষ্কারভাবে বর্ণিত হয়েছে, হযরত মসীহ্ আলাইহেস্ সালামকে ক্রুশের ঘটনার পর আকাশে উঠান হয়। দৃষ্টান্ত স্থলে, মার্ক ও লুকের শেষাংশে এবং যোহনের তৃতীয় অধ্যায়ের ত্রয়োদশ পদে মসীহ্ আকাশে যাওয়ার কথা লিখিত আছে। কিন্তু বর্তমান সময়ে আধুনিক খ্রিষ্টান গবেষকগণ ইঞ্জিলের প্রাচীন ও বিশ্বস্ত বহু অনুলিপি পুরাতন চিহ্নাবলী থেকে উদ্ধার করেছেন এবং এদের প্রতি দৃষ্টিপাত করে প্রমাণ করেছেন যে, এ বর্ণনাগুলো প্রক্ষিপ্ত। ১৬১১ সালের 'অনুমোদিত অনুবাদ' (Authorised Version) এ সব বিবরণ সন্নিবিষ্ট ছিল। ১৮৮১ সালের 'সংশোধিত অনুবাদ' (Revised Version) পাদ-টীকায় একটি নোট সংযোজন করে বলা হয়, "অনেক অনুলিপিতে এ কথা পাওয়া যায় না।" অর্থাৎ, হযরত মসীহ্ আকাশে গিয়েছেন এবং শিষ্যরা মসীহকে আকাশে যেতে দেখেন, প্রাচীন বিশ্বস্ত অনুলিপিতে লিখিত নেই"। প্রকাশ থাকে যে, এ সময়েই হযরত মসীহ মাউওদ আলাইহেস্ সালাতু ওয়াস্-সালাম তাঁর সুবিখ্যাত পুস্তক 'বারাহীনে আহ্মদীয়া' প্রণয়ন করছিলেন। তা থেকে এ সন্ধান পাওয়া যায় যে, আল্লাহ্ তাআলাও তাঁর কাজের জন্য ফেরেশতাদের মাধ্যমে পথ পরিষ্কার শুরু করেন।

তারপর, ১৯৪৬ সালের 'সংশোধিত আদর্শ অনুবাদ' (Revised Standard Version) থেকে উল্লেখিত পদগুলো সম্পূর্ণ বাদ দেয়া হয়েছে এবং পাদটীকা স্মারকলিপি লিখিত হয়েছে, কোন কোন অনুলিপিতে উল্লেখিত পদগুলোও আছে। বর্তমানে ঊর্দু ইঞ্জিলের হাশিয়াতেও এ নোট প্রদত্ত হয়েছে যে মার্কের শেষ বারটি পদ প্রাচীন অনুলিপিতে নেই। এ বারটি পদেই মসীহ্ আকাশে যাওয়ার কথা লিখিত আছে। উক্ত টীকায় বলা হয়েছে, প্রাচীন অনুলিপিতে এদের স্থানে প্রাচ্যে ও প্রতীচ্যে মসীহের বার্তা প্রচারের কথা লিখিত ছিল।[১]

সি.আর. গ্রেগরী উপরোক্ত উদ্ধৃতির যে অনুবাদ লিখেছেন, তাতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে হযরত মসীহ ক্রুশের ঘটনার পর পূর্ব দেশে আবির্ভূত হন এবং প্রতীচ্যে তাঁর ধর্মের প্রচার তাঁর শিষ্যদের মাধ্যমে চালাতে থাকেন। অন্যকথায়, আকাশে যাওয়ার স্থানে প্রাচীন অনুলিপিগুলোতে লিখিত ছিল যে, ক্রুশের ঘটনার পর নাসেরীর হযরত মসীহ পূর্ব দেশে আবির্ভূত হন।[২] এই হস্তক্ষেপ ও পরিবর্তন

(১) বিশেষ জানার জন্য, বর্তমানে গবেষণার পরিপ্রেক্ষিতে লিখিত আবদুল কাদের লায়েলপুরি প্রণীত 'মার্কস কা আখেরী ওরাক' ('মার্কের শেষ পাতা') পাঠ করুন।

(২) সি, আর, গ্রীগরী প্রণীত,The Canon And The Testamenents দেখুন।

থেকে কি প্রমাণিত হয় না যে, চার ইঞ্জিলের লেখকদের মতে হযরত মসীহ নাসেরী আকাশে যাননি বরং তিনি পূর্ব দিকস্থ দেশে হিজরতপূর্বক আগমন করেন এবং সেখান থেকে তাঁর শিষ্যদের মাধ্যমে প্রতীচ্যে তার ধর্ম প্রচার করেন। যদি তাঁর আকাশে যাওয়ার ব্যাপার সত্য হতো, তবে বিশ্বস্ত চার ইঞ্জিলে এর উল্লেখ না থাকা কখনো সম্ভব ছিল না।

৩। ইদানীং হযরত মসীহের 'কাফন' পাওয়া গেছে। ক্রুশের ঘটনার পর এই কাফন দ্বারা তাঁর পবিত্র দেহকে জড়ানো হয়েছিল। এ কাফন বা শব-পরিচ্ছদ সম্বন্ধে জার্মান বিজ্ঞানীগণ যে নতুন গবেষণা করেছেন, তা স্কেন্ডেনেভিয়ার একটি পত্রিকায় "মসীহ কি ক্রুশে প্রাণত্যাগ করেছেন?" শিরোনামে প্রকাশিত হয়।[১] পত্রিকার সম্পাদক লিখেছেন :

১। "এক দল জার্মান বিজ্ঞানী আট বছর যাবত মসীহের কাফনের উপর গবেষণারত। সম্প্রতি তাদের গবেষণার ফল প্রেসকে জানান হয়েছে। মসীহের দুই হাজার বছরের পুরনো কাফন ইটালীর টুরিন (Turin) শহরে পাওয়া গেছে। এতে মসীহের দেহের চিহ্ন অঙ্কিত আছে।

"বিজ্ঞানীগণ এ গবেষণা সম্বন্ধে পোপকে অবহিত করেছেন। পোপ এখন পর্যন্ত নিশ্চুপ আছেন। কারণ এই গবেষণার ফলে ক্যাথলিক চার্চের ধর্ম ইতিহাসের গুরুত্বপূর্ণ রহস্য ভেদ হয়েছে। ফটোগ্রাফির সাহায্যে বিজ্ঞানীগণ প্রমাণ করতে চেয়েছেন যে, দুই হাজার বছর আগে যা মানুষ "অলৌকিক" বলে বিশ্বাস করতো, তা সম্পূর্ণ স্বাভাবিক বিষয় ছিল। তাঁরা স্পষ্টতই প্রমাণ করেছেন যে, মসীহ্ কখনো ক্রুশে প্রাণত্যাগ করেননি।"

এ গবেষণায় আরো লেখা হয়েছে :
"কাপড়ের অন্যান্য চিহ্ন দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে যে, এর অর্ধাংশ মসীহের দেহের সাথে জড়ানো হয়েছিল এবং অপর অর্ধাংশ মাথায় জড়ানো হয়েছিল। তারপর মসীহের দেহের তাপ ও ওষুধ প্রয়োগের ফলে দেহের চিহ্ন কাপড়ে অঙ্কিত হয়ে পড়ে এবং মসীহের দেহ থেকে নির্গত তাজা রক্ত কাপড়ে শোষিত হয়ে দেহের ছাপ কাপড়ে পরেছে। 'কাঁটার মুকুট' পরানো হয়েছিল বলে হযরত মসীহের কপালে ও কাঁধের উর্ধে ঘর্ষণজনিত ক্ষতচিহ্ন, মসীহের দক্ষিণ নিম্ন চোয়ালের স্ফীতি, বক্ষের ডান পাশে বর্শার ক্ষত-চিহ্ন এবং কোমরে ক্রুশের ঘর্ষণ চিহ্ন এই সমস্ত কিছুই ফটোতে দেখা যায়। কিন্তু

(১) পত্রিকাটির নাম Stockholm Zidiningen.
১৯৫৭ সালে ২ এপ্রিল, উক্ত কাগজে উল্লিখিত প্রবন্ধখানা প্রকাশিত হয়।

কারমান উপত্যকার দশটি গহ্বরের মধ্যে পরীক্ষিত গহ্বরের দৃশ্য।

কারমান গুহার থেকে প্রাপ্ত মসলাদিসহ সুরক্ষিত
হীব্রু ইঞ্জিন পূর্ণ দু'টি মৃত্পাত্র।

নোট : ফিলিস্তিনের পূর্ব-দিকস্থ কামরান উপত্যকার গুহা থেকে পাওয়া পুস্তকগুলো সাংবাদিকদের কাছে 'Dead Sea Scrolls নামে পরিচিত। এই পুস্তকগুলো হলো হযরত ঈসা মুসীহর গীতিকাবলী, শিষ্যদের লিখিত বিবরণ এবং আদি খ্রিষ্টান সাহিত্য। এগুলো ১৯৪৭ সাল থেকে জগদ্বাসীর দৃষ্টিতে আসতে শুরুকরে। দশটি গুহার মধ্যে এখন পর্যন্ত একটি গুহার পুস্তকগুলো প্রকাশিত হয়েছে। কিন্তু এ গুলো থেকে নিশ্চিতভাবে প্রমাণিত হয়েছে যে নাসারীয় মসীহ এবং তাঁর শিষ্যদের ধর্ম বিশ্বাস অবিকল তা'ই ছিল, যা কুরআন করীমে তাঁদের ধর্ম বলে বর্ণিত হয়েছে।

ক্রুশের মৃত্যু হতে অব্যহতি এবং সুবিস্তীর্ণ ভূভাগ পরিভ্রমণের উল্লেখও কামরানে পাওয়া যায়।

> সর্বাপেক্ষা বিস্ময়কর বিষয় এই যে, নেগেটিভ ফটো মসীহের মীলিত চক্ষুদ্বয়কে উন্মীলিত চক্ষুদ্বয় রূপে প্রকাশ করেছে।

ক্রুশে মৃত্যু থেকে অব্যাহতি এবং সুবিস্তীর্ণ ভূ–ভাগ পরিভ্রমণের উল্লেখও কামরান গুহায় প্রাপ্ত পুস্তিকাগুলো থেকে পরিষ্কার পাওয়া যায়।

'ফটোগ্রাফিক পরীক্ষা এটাও প্রকাশ করছে যে, পেরেক হাতের তালুতে নয় হাতের কব্জার মজবুত সংযোগস্থলে বিদ্ধ করা হয়েছিল এবং এটাও প্রকাশ পায় যে, বর্শা মসীহের হৃৎপিন্ড আদৌ স্পর্শ করেনি। বাইবেল বলে, মসীহ প্রাণ দান করেন। কিন্তু বিজ্ঞানীগণ স্থির নিশ্চিত হয়ে বলেন যে, হৃৎপিন্ডের ক্রিয়া বন্ধ হয়নি অর্থৎ মৃত্যুবরণ করেনি।

"গবেষণায় এটিও বলা হয় যে, এক ঘন্টা পর্যন্ত মসীহ প্রাণত্যাগ পূর্বক ঝুলানো থাকলে রক্ত শুকিয়ে নিঃশেষ হয়ে যেত এবং সে অবস্থায় রক্তপাতের দাগ কাপড়ে লাগত না। কিন্তু কাপড় দ্বারা রক্ত শোষিত হওয়ায় প্রমাণিত হয় যে, মসীহকে ক্রুশ হতে যখন নামানো হয়েছিল, সে সময় তিনি জীবিত ছিলেন।"[১]

৪। ভারতীয় প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ কর্তৃক শ্রীনগর এলাকায় যে প্রত্নতাত্তিক খনন কাজ করা হয়, তার ফলে খ্রিষ্টানদের একটি অতি প্রাচীন কবরস্থান পাওয়া যায়। এটিও এ কথার সাক্ষ্য দেয় যে, কোন সময় এখানে খ্রিষ্ট ধর্ম প্রবল ছিল।

৫। ইদানীং ফিলিস্তিনের আগে ও মৃত সাগরের উত্তর দিকে 'কামরান' পর্বতের গুহা হতে খ্রিষ্টান গবেষকদের সংগৃহীত তথ্য অনুসারে নাসীবিয় হযরত মসীহের লিখিত বহু গীতিকা হস্তগত হয়েছে। এই সকল গীতিকায় লিখিত আছে যে, শত্রুরা তাকে বধ করার চেষ্টা করছিল। কিন্তু খোদা তাআলা তাঁকে মৃত্যুর কবল হতে রক্ষা করেছেন এবং কবর, তথা পর্বতগুহা হতে বের করে ভূ-পৃষ্ঠের ওপরে আনেন। পরবর্তিতে, বহু স্থানে তিনি পরিভ্রমণ করেন। এই গীতিকাগুলি অনুসারে মসীহ ওই সকল ধর্ম বিশ্বাসই প্রকাশ করেন, যা কুরআন শরীফে হযরত ঈসা (আ.) সম্বন্ধে বর্ণিত হয়েছে।[২]

---

(১) Stockholm Zidiningen.
১৯৫৭ সালে ২ এপ্রিল উক্ত কাগজে উল্লিখিত প্রবন্ধটি প্রকাশিত হয়।
(২) 'গীতিকা-গুলো পাঠের জন্য দেখুন
The Riddle of the scrolls, by IB.E. Del Medico.

আর্য ও খ্রিষ্টানদের প্রতি ধর্মীয় বির্তকের পদ্ধতি ও নীতি নির্ধারক নোটিশ এবং সরকারের কাছে স্মারকলিপি, ১৮৯৫ সালের ২২ সেপ্টেম্বর :

ধর্মীয় বিতর্ক ক্ষেত্রে ভারতবর্ষের যে দুই জাতির সাথে হযরত আকদাসের সম্পর্ক ঘটেছিল, তারা তাদের কু-বাক্যের জন্য কুখ্যাত ছিল। এই জাতিদ্বয়ের দিয়ে আমরা আর্য ও খ্রিষ্টানদেরকে বুঝাচ্ছি। হযরত আকদাস তাদের কু-বাক্য প্রবণতার কারণে ১৮৮৫ সালের ২২ সেপ্টেম্বর এই উভয় জাতিকেই একটি নোটিশ দেন। তাতে ভারত গভর্ণমেন্টেরও মনোযোগ আকর্ষণ করে বলা হয় যে, প্রচলিত ধর্মীয় বিতর্কের পদ্ধতিতে আমূল পরিবর্তন আসা অত্যাবশ্যক এবং প্রচলিত পদ্ধতির পরিবর্তে এই প্রকার বিধান হওয়া উচিত :

(১) কোন পক্ষ অপর পক্ষের বিরুদ্ধে এমন কোন আপত্তি উত্থাপন করতে পারবে না, যা স্বয়ং তাদেরই এলহামী কিতাবের বিরুদ্ধে যায়।

(২) প্রত্যেক পক্ষ তাদের সর্বজন সমাদৃত ও স্বীকৃত কিতাবগুলোর একটি তালিকা প্রকাশ করবে এবং ওই সকল কিতাবের বাইরে কোন কিতাবের উদ্ধৃতি দিয়ে কোন পক্ষ আপত্তি উত্থাপন করতে পারবে না। তদনুযায়ী হযরত আকদাস নিম্নবর্ণিত কিতাবগুলোর একটি তালিকা ইসলামের পক্ষ থেকে প্রদান করেন :-

প্রথম : কুরআন শরীফ।

দ্বিতীয় : বুখারী শরীফ, যদি এর কোন হাদিস কুরআন শরীফের বিরুদ্ধে না যায়।

তৃতীয় : সহীহ মুসলিম, যদি এর কোন হাদিস কুরআন শরীফের বিরুদ্ধে না যায়।

চতুর্থ : জামে তিরমিযি, ইবনে মাজা, মুক্তা, নেসায়ী, আবু দাউদ, দার-কুত্‌নী, যদি এদের বর্ণিত কোন হাদিস কুরআন শরীফের বিরুদ্ধে না যায়।

আর্য এবং খ্রিষ্টানদেরকেও তিনি লিখলেন যে, তারাও তাদের সর্বজন স্বীকৃত ও সমাদৃত ধর্মগ্রন্থের তালিকা প্রকাশ করুন। অত:পর, সকল পক্ষকে এই নিয়ম পালন করতে হবে যে, কেউ কারো বিরুদ্ধে এমন কোন প্রশ্ন করবেন না, যার প্রমাণ তারা ওই সকল গ্রন্থ হতে প্রদর্শন করতে পারবেন না।

প্রকাশ থাকে যে, ধর্ম সংক্রান্ত অশান্তি ও গোলযোগ নিষ্পত্তির এটি একটি একান্তই যুক্তিসঙ্গত প্রস্তাব ছিল। তিনি হাজার হাজার মুসলমানের স্বাক্ষর সংগ্রহ করে ভারত সরকারের কাছে একটি স্মারকলিপি প্রেরণ করেন। কিন্তু দুঃখের

বিষয় তদানীন্তন সরকার এদিকে মনোযোগ দেননি। অবশ্য, অনেক বছর পরে এই আইন পাশ করা হয় যে, কোন ধর্ম প্রবর্তককে গালি দেয়া বা তাকে অবমাননা করা আইন অনুযায়ী অপরাধ হবে।

ডেরা বাবা নানক যাত্রা (১৮৯৫ সালের ৩০ সেপ্টেম্বর) :

সম্ভবত প্রায় ১৮৭২ সালের কথা। হযরত আকদাস আলাইহেস সালাম বাবা নানক রহমতুল্লাহে আলাইহেকে দুবার স্বপ্নে দর্শন করেন। তাঁর সাথে বাক্যালাপে বাবা নানক প্রকাশ করেন যে, তিনি একজন মুসলমান এবং যে আধ্যাত্মিক প্রস্রবণ হতে হযরত আকদাস পান করেন সেই প্রস্রবণ হতে তিনিও পান করেন। হযরত আকদাস বলেন যে, তিনি তো নিশ্চিতভাবে জানতেনই বাবা নানক সাহেব মুসলমান ছিলেন। কিন্তু লোকের কাছে উপস্থিত করার জন্য কোন দলিল ছিল না। এই জন্য তিনি নিশ্চুপ থাকতেন। কিন্তু দীর্ঘকাল পরে আল্লাহ তাআলা এমন প্রমাণ সংগ্রহ করে দিলেন যে, তার দ্বারা সুনিশ্চিত ও প্রত্যক্ষভাবে জানা যায় যে বাবা নানক মুসলমান ছিলেন। নিম্নে কেবলমাত্র দু'টি প্রমাণ উপস্থাপন করা হল :

একটা কিংবদন্তি প্রচলিত ছিলো যে, হযরত বাবা নানক রহমতুল্লাহে আলাইহের একটি "চোলা" বা গাত্রাবরণ ছিল যা তিনি আকাশ হতে প্রাপ্ত হয়েছিলেন। সেই চোলা বা গাত্রাবরণ জেলা গুরদাসপুরের অন্তর্গত 'ডেরা-বাবা-নানক' নামক স্থানে কাবুলী মলের বংশধরদের হাতে সংরক্ষিত ছিল। এটা দর্শনার্থে বহু দূরদুরান্ত থেকে শিখ সর্দারগণ আসতেন। কোন বিপদ ঘটলে শিখরা এই গাত্রাবরণ মাথার ওপর রেখে দোয়া করতেন। তাতে বিপদ কাটত। "চোলা সাহেবের" এ সমস্ত প্রশংসা শ্রবণে হযরত সাহেবের হৃদয়ে আগ্রহ হলো 'চোলা' অবশ্যই দেখতে হবে। সুতরাং তিনি যথারীতি 'এস্তেখারা' (আল্লাহ তাআলার কাছে মঙ্গলাশিস প্রার্থনার নামায) করে ১৮৯৫ সালের ৩০ সেপ্টেম্বর, সোমবার খুব ভোরে কয়েকজন বন্ধুবান্ধবসহ ডেরা-বাবা-নানক অভিমুখে যাত্রা করেন। এ যাত্রায় যারা সঙ্গী ছিলেন, তারা হলেন :

১। হযরত মৌলানা হাকীম নূরুদ্দীন সাহেব রাযি আল্লাহু আনহু।
২। হযরত মৌলানা সৈয়দ মুহাম্মাদ আহসান সাহেব।
৩। হযরত মৌলানা আবদুল করীম সাহেব শিয়ালকোটী।
৪। জনাব মুনশি গোলাম কাদের সাহেব ফসীহ।
৫। হযরত শেখ আবদুর রহীম সাহেব (ভাইজী)
৬। জনাব শেখ রহমতুল্লাহ সাহেব গুজরাতী।

چولہ حضرت باوا نانک صاحب رحمۃ اللہ علیہ
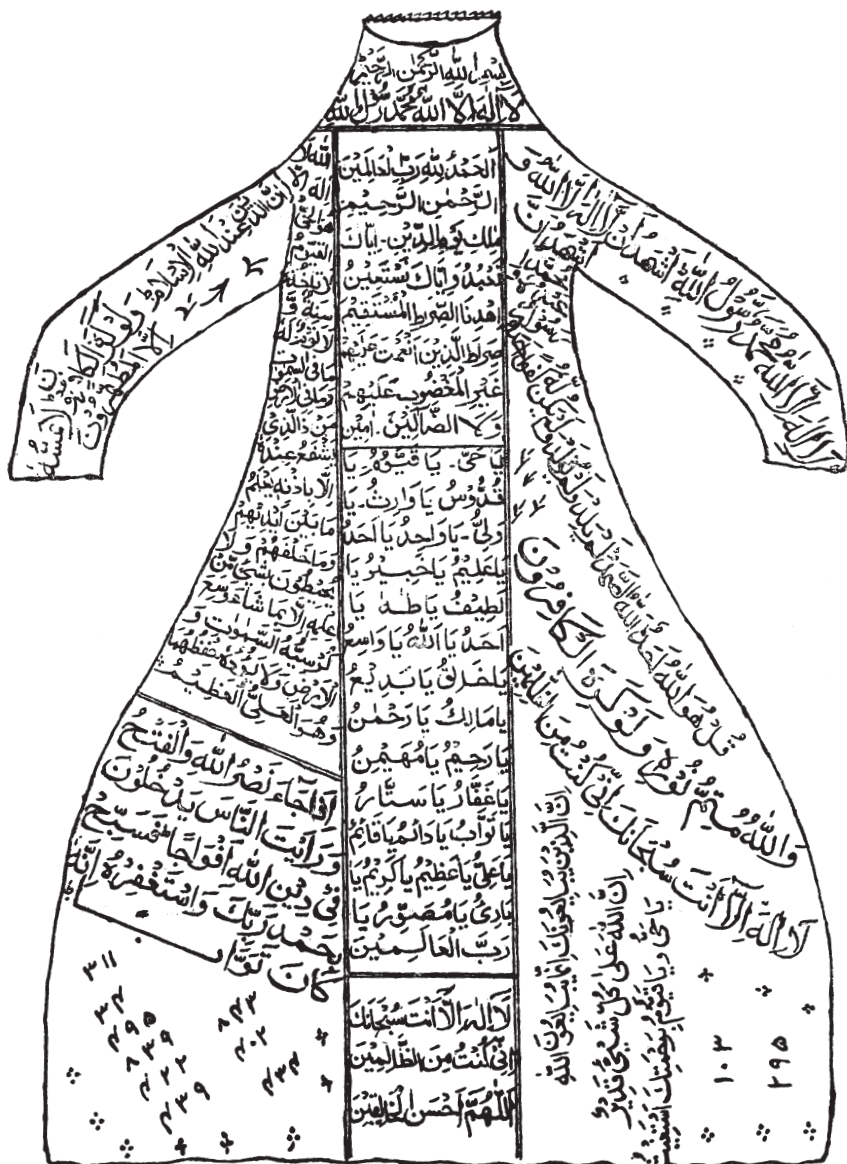
হযরত বাবা নানক (রহমতুল্লাহে আলাইহে) এর
'চোলা সাহেব' নামক পিরহাম।

৭। জনাব মির্যা আইয়ূব বেগ সাহেব।
৮। হযরত মীর নাসের নওয়াব সাহেব।
৯। হযরত মীর মুহাম্মদ ইসমাঈল সাহেব।
১০। হযরত শেখ হামেদ আলী সাহেব।

দুপুরের আগে বেলা প্রায় ১০টায় তিনি ডেরা-বাবা-নানক পৌছলেন। ১১টার সময় একজন অন্তরঙ্গ বন্ধুর চেষ্টায় 'চোলা' দেখার সুযোগ হল। এই 'চোলার ওপর শত শত রুমাল জড়ানো ছিল। যে বড় লোকই আসতেন, এটার ওপর কোন মূল্যবান রুমাল রেখে যেতেন। কিন্তু কেউই জানত না যে, তাতে কি লেখা আছে। হযরত আকদাস এবং তার সাথীরা যথেষ্ট টাকা 'চোলা' প্রদর্শককে উপহার দিয়া 'চোলা' দর্শন করলেন। হযরত আকদাস এক একজন বন্ধুর প্রতি এক একটি কর্তব্য সমর্পণ করলেন। কেউ ডান হাতের, কেউ বাম হাতের, কেউ বুকের, কেউ বক্ষ পার্শ্বের–এভাবে চোলার বিভিন্ন স্থানের লেখাগুলি অনুলিপি করার ভারপ্রাপ্ত হলেন। প্রত্যেক বন্ধুই নিজ নিজ কর্তব্য পালন করলেন। জানা গেল যে, এই চোলার ওপর

لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ - اِنَّ الدِّيْنَ عِنْدَ اللّٰهِ الْاِسْلَامُ -
- اَشْهَدُ اَنْ لَّآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ -

['লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহে। ইন্নাদ-দ্বীনা ইন্দাল্লাহেল-ইসলাম। আশ্‌হাদু আল্‌-লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়া আশ্‌-হাদু আন্না মুহাম্মাদান্‌ আবদুহু ও রাসুলুহু।] এবং সুরা ফাতেহা, আয়াতুল কুরসি, সুরা ইখলাস প্রভৃতিও লিখিত আছে। হুযুর কাদিয়ানে ফিরে গিয়ে এই সফরের অভিজ্ঞতা সম্বলিত 'সৎ-বচন' নামক এক কিতাব প্রণয়ন করলেন। এই কিতাবে 'চোলা সাহেবের' ফটো সংযোজন ছাড়াও বাবা নানকের লিখিত পুস্তিকা 'জনম-সাক্ষী' হতেও বহু উদ্ধৃতি দিয়ে এ কথা প্রমাণ করলেন যে, বাবা নানক সাহেব একজন মুসলমান ছিলেন।

দ্বিতীয়, 'পুঁথি সাহেব'। এটা হযরত বাবা নানক রহমতুল্লাহে আলাইহে মুসলমান হওয়ার আরো একটি মহা গুরুত্বপূর্ণ প্রমাণ সরবরাহ করে। এটা কয়েক বছর পরে ১৯০৮ সালের এপ্রিল মাসে সংগৃহীত হয়। কিন্তু একসঙ্গে আলোচনার সুবিধার্থে এখানে এটার কথাও বলা হল। 'পুঁথি সাহেব'ও হযরত বাবা নানক সাহেবের একটি 'তবরক'। এটা শিখরা ফিরোজপুর জেলার অন্তর্গত 'গুরুহর সহায়' নামক স্থানে কঠোর সতর্কতা ও যত্নের সাথে রক্ষা করে আসছেন। এই 'পুঁথি সাহেব' শিখদের চতুর্থ গুরু রামদাস সাহেবের বংশধরের হাতে আছে। এই পুঁথি সম্বন্ধে শিখগণ বলেন যে, হযরত বাবা সাহেব সর্বদা এটাকে গলায় ঝুলিয়ে রাখতেন এবং অধিকাংশ সময় এটাই পাঠ করতেন। এই 'পুঁথি সাহেব'

দর্শনার্থে বহু দূরদুরান্ত হতে লোক সমাগম হয়ে থাকে এবং হাজার হাজার ভোগ্য সামগ্রী ও দান দক্ষিণা প্রদান করা হয়। এই পুঁথিও "চোলা সাহেবের" ন্যায় শত শত রুমালে আবৃত। মাঝে মধ্যে কাউকে খুলে দেখান হয় মাত্র। কারণ, এটার দর্শন-প্রার্থীকে নগদ একশ' টাকা 'নজরানা' দিতে হয় এবং যিনি গদ্দীনসীন থাকেন, তিনি একশ' একবার স্নান করার পর এটা প্রদর্শন করেন। হযরত আকদাস যখন এই পুঁথি সম্বন্ধে জানতে পারলেন, তখন তিনি এটাকে দর্শন করার জন্য শিষ্য সম্বলিত একদল প্রতিনিধি প্রেরণ করেন। তাঁরা যেয়ে এই পুঁথি দর্শন করেন। পুঁথি খোলামাত্র তাঁরা দেখতে পেলেন "বিসমিল্লাহ" হতে "ওয়ান্নাস" পর্যন্ত লিখিত এটা একখানি 'হামায়েল শরীফ' অর্থাৎ ক্ষুদ্রাকৃতি কুরআন শরীফ। প্রকাশ থাকে যে, এটা এ কথার আরো একটি মস্ত বড় প্রমাণ যে, হযরত বাবা নানক সাহেব মুসলমান ছিলেন।

১৮৯৫ সালে রচিত গ্রন্থসমূহ :

১৮৯৫ সালে হযরত আকদাস নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলো রচনা করেন :

(১) **'মিনানুর রহমান'** -'উম্মুল লেসান' বা 'ভাষা গুলোর মাতা' সংক্রান্ত গবেষণা মূলক অদ্বিতীয় পুস্তক। এতে অকাট্য যুক্তির মাধ্যমে দেখানো হয়েছে যে, আরবি সকল ভাষার জননী'। এই কিতাব প্রণয়ন অসম্পূর্ণ অবস্থায় থাকার কারণে হযরত আকদাসের জীবনকালে প্রকাশিত হয়নি। কিন্তু পরে যে অবস্থায় ছিল, সে অবস্থায় এটাকে প্রকাশ করা হয়।

(২) **'নুরুল-কুরআন'**, প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড যথাক্রমে ১৮৯৫ সালের ১৫ জুন ও ২০ ডিসেম্বর প্রকাশিত হয়। হযরত আকদাসের ইচ্ছা ছিল, কুরআন করীমের আধ্যাত্মিক সৌন্দর্যাবলী প্রদর্শনের জন্য একটি মাসিক পত্রিকা প্রকাশ করো। এজন্য তিনি 'নূরুল কুরআন' নামক এটি রিসালা প্রকাশ শুরু করেন। কিন্তু দুঃখের বিষয়, বহু কর্মব্যস্ততার কারণে এটার কেবল দু'টি সংখ্যাই মাত্র প্রকাশিত হয়েছিল।

(৩) **'সৎবচন'** -এই কিতাবে হযরত আকদাস তাঁর ডেরা-বাবা-নানক সফর বৃত্তান্ত বিশদভাবে বর্ণনা করেন এবং 'গুরুগ্রন্থ' এবং 'জনম-সাখী' হতেও হযরত বাবা নানক রহমতুল্লাহে আলাইহের ধর্মমত সম্বন্ধে আলোকপাত করেন।

(৪) **'আরিয়া ধরম'** -এই কিতাব ১৮৯৫ সালের ২২ সেপ্টেম্বর প্রকাশিত হয়। এতে হযরত আকদাসের বহু বিবাহ, তালাক এবং আর্যদের 'নিয়োগ ধর্ম সম্বন্ধে বিস্তারিত সমালোচনা করেন।

জুমুআ'র ছুটির আন্দোলন (১৮৯৬ সালের ১ জানুয়ারী) :

১৮৯৬ সালের ১ জানুয়ারী হযরত আকদাস বহু মুসলমানের স্বাক্ষর সম্বলিত একটি স্মারকলিপি গভর্ণর জেনারেলের কাছে প্রেরণ করেন। এ স্মারকলিপিতে সরকারের কাছে মুসলমানদের জন্য তাদের ধর্মীয় কর্তব্য জুমার নামায আদায়ের জন্য শুক্রবারকে সরকারি ছুটি ঘোষণার আবেদন করা হয়। কিন্তু দুঃখের বিষয়, একদল মৌলবী এবং তাঁদের প্রভাবাধীন মুসলমান শুধু এই কারণে এর বিরোধিতা করেন যে, এই স্মারকলিপি হযরত মির্যা সাহেবের কলমে লিখিত হয়েছিল। 'ফা-ইন্না-লিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজেউন'।

হযরত আকদাস এই কথা জানতে পেরে মৌলবী মুহাম্মদ হুসায়েন সাহেব বাটালবীকে লিখলেন যে, তিনি এ বিষয়ে চেষ্টা করতে চাইলে এ পর্যন্ত এর জন্য হযরত আকদাস যা করেছেন, মৌলবীদের হাতে সমর্পণ করতে প্রস্তুত আছেন। কিন্তু মৌলবী সাহেব এই কাজ নিজেও করলেন না এবং হযরত আকদাসকেও করতে দিলেন না। ফলে, মৌলবী সাহেবদের বিরোধিতার কারণে তখন এই ব্যাপারে সফলতা না এলেও হযরত আকদাসের ওফাতের পর হযরত খলিফাতুল মসীহ আউয়ালের সময় এই বিষয় নিয়ে পুনরায় আন্দোলন করা হয়। এবার মুসলমানদের ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের ফলে সরকার এটা মঞ্জুর করেন। কিন্তু দুঃখের বিষয়, মুসলমানগণ এই ছুটির দ্বারা যথার্থভাবে উপকৃত হওয়ার প্রতি যত্নবান হননি। খুব অল্পসংখ্যক মুসলমানই জুমুআ'র নামাযে যোগদান করেন।

খ্রিষ্টানদেরকে সর্বোৎকৃষ্ট পন্থায় মিমাংসার জন্য আহ্বান :

ডেপুটি আবদুল্লাহ আথম সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী এবং তাঁর পরিণাম ইতিপূর্বে বর্ণিত হয়েছে। তার মৃত্যুর পর পাদ্রীগণ বহু চেঁচামেচি শুরু করলে হযরত আকদাস তাঁদেরকে প্রতিদিনের ঝগড়াঝাটি ছেড়ে মিমাংসার একটি উৎকৃষ্টতর উপায় নির্ধারণ করে বললেন ;

"এই বাহাস সীমার বাইরে পৌঁছে গেছে। খোদা তাআলার দ্বারা মিমাংসা করা হোক।"

তিনি লিখলেন :- "যদি আমার সমর্থনে খোদা তাআলার মিমাংসা উপস্থিত না হয়, তবে আমি আমার স্থাবর অস্থাবর যাবতীয় সম্পত্তি যার মূল্য দশ হাজার টাকার কম নয়, খ্রিষ্টানদেরকে দিব এবং অগ্রিম তিন হাজার টাকা পর্যন্ত তাদের কাছে জমা করতে পারি। আমার এত বেশি আর্থিক ক্ষতি আমার জন্য যথেষ্ট শাস্তি স্বরূপ হবে। তদুপরি আমি অঙ্গীকার করছি যে, আমার স্বাক্ষরিত মৌলবী

ইশতেহার দিয়ে প্রকাশ করব যে, খ্রিষ্টানরা জয়লাভ করেছেন এবং আমি পরাজিত হয়েছি। আমি আরো অঙ্গীকার করছি যে এ ইশতেহারে কোন প্রকার শব্দগত বা অর্থগত শর্তও থাকবে না।

"রাব্বানী ফয়সালার উপায় এই প্রকার হবে। আমার মোকাবেলায় একজন সম্মানিত পাদ্রী সাহেব নিম্নবর্ণিত পাদ্রী সাহেবদের মধ্য হতে নির্বাচিত হবেন, যিনি ময়দানে মোকাবেলা করার জন্য উভয় পক্ষের সম্মতিক্রমে নির্বাচিত হয়ে প্রস্তুত হবেন। অত:পর, আমরা উভয়েই আমাদের জামা'তসহ নির্দিষ্ট ময়দানে উপস্থিত হব এবং খোদা তাআলার কাছে দোয়ার দ্বারা এই মিমাংসা চাইব যে, আমাদের দুজনের মধ্যে যে ব্যক্তি বাস্তবিক খোদা তাআলার নজরে কোপগ্রস্ত, খোদা তাআলা এক বছরের মধ্যে সেই মিথ্যাবাদীর ওপর ওই 'কহর নাযেল' করুন, যা তিনি তার প্রতিহিংসাস্বরূপ চিরকাল মিথ্যাবাদী ও নবীকে মিথ্যাবাদী প্রতিপন্নকারী জাতি গুলোর ওপর করে এসেছেন -যেমন, তিনি ফিরআউনের ওপর করেছেন, নমরূদের ওপর করেছেন, নূহের জাতির ওপর করেছেন এবং ইহুদীদের ওপর করেছেন। জনাব পাদ্রী সাহেবান এটা স্মরণ রাখবেন যে, এই সম্মিলিত দোয়ায় কোন সম্প্রদায় বিশেষের ওপর কোন অভিসম্পাত করতেও হবে না, কোন কুপ্রার্থনাও করতে হবে না, বরং শুধুমাত্র সেই মিথ্যাবাদীর শাস্তির জন্য দোয়া করতে হবে, যে তার মিথ্যাবাদিতা ছাড়তে চায় না। বিশ্ববাসীর জীবন লাভ একজনের মৃত্যু অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।"

এই ইশতেহারেই একটু পরে হুযুর লিখেছেন :

"সুতরাং, হে পাদ্রী সাহেবগণ, দেখুন, আমি এই কাজের জন্য দণ্ডায়মান আছি। যদি চান যে খোদার আদেশ এবং খোদার মিমাংসার দ্বারা সত্যবাদী ও মিথ্যাবাদীর মধ্যে পার্থক্য প্রকাশিত হোক, তবে আসুন, আমরা এক ময়দানে যুদ্ধ করি, যাতে মিথ্যাবাদীর মুখোশ উন্মোচিত হয়। নিশ্চিতভাবে জেনে রাখুন, খোদা আছেন। সেই সর্বশক্তিমান নিশ্চয়ই আছেন যিনি সর্বদা সত্যবাদীদের সমর্থন করেন। সুতরাং আমাদের দুজনের মধ্যে যিনি সত্যবাদী, খোদা তাআলা নিশ্চয়ই তাঁকে সমর্থন করবেন। একথা স্মরণ রাখবেন যে, খোদা তাআলার কাছে যে ব্যক্তি লাঞ্ছিত, সে এই যুদ্ধের পর লাঞ্ছনা ভোগ করবে এবং তাঁর কাছে যিনি প্রিয়, তিনি সম্মানিত হবেন।'

আরো বললেন : "আমরা উভয়ে এই প্রকার দোয়া করব যে সর্বশক্তিমান খোদা, এখন আমরা দুই পক্ষ পরস্পর মুখোমুখি হয়েছি। এক পক্ষ মরীয়মের পুত্র যিশুকে খোদা বলে এবং ইসলামের নবীকে সত্যবাদী জ্ঞান করে না। অপর পক্ষ মরীয়মের পুত্র ঈসাকে রসুল মান্য করে, তাকে শুধু বান্দা বলে জ্ঞান করে এবং

ইসলামের পয়গম্বরকে প্রকৃতই সত্য এবং ইহুদী ও খ্রিষ্টানদের মধ্যে মিমাংসাকারী জ্ঞান করে। সুতরাং এই উভয় পক্ষের মধ্যে যে পক্ষ তোমার দৃষ্টিতে মিথ্যাবাদী, তাকে এক বছরের মধ্যে সংহার কর এবং 'ওয়ায়েল' বা 'হায় হুতাশের' নরক তার ওপর নাযেল কর। এক পক্ষ যখন দোয়া করবে, তখন অন্য পক্ষ 'আমীন' বলবে।

"আমার একান্ত আগ্রহ এই যে, এই মোকাবেলার জন্য ডাঃ মার্টিন ক্লার্ককে নির্বাচন করা হোক। কারণ তিনি বলিষ্ঠ যুবক। স্বাস্থ্য খুব ভাল। তার ওপর আবার ডাক্তার নিজ আয়ু বৃদ্ধির উপায় অবলম্বন করবেন। ডাঃ মার্টিন ক্লার্ক সাহেব অবশ্যই আমার এই আবেদন কবুল করবেন। এবং যদি তিনি পলায়ন করেন, তবে পাদ্রী ইমাদউদ্দীন সাহেব এই মোকাবেলার যোগ্য পাত্র। তিনি মরীয়মের পুত্রকে খোদা বলে পরিচিত করার জন্য মানুষের পক্ষে সম্ভবপর 'সবধরনের' চতুরতার অবলম্বন করেছেন এবং সূর্যের প্রতি থুথু নিক্ষেপ করেছেন। যদি তিনিও এই ভয়ে পলায়ন করেন যে খোদার 'ওয়ায়েল' নিশ্চয়ই তাকে ভক্ষণ করবে, তবে হুসামুদ্দিন, বা সফদর আলী, বা ঠাকুর দাস, বা টমাস হাওয়েল–সর্বশেষ ফতেহ মসীহ এই ময়দানে উপস্থিত হবেন, কিংবা অন্য যে কোন পাদ্রী অগ্রসর হবেন। এই পুস্তিকা প্রকাশের দুই মাসের মধ্যে যদি কেউই অগ্রসর না হয়, এবং শুধু শয়তানী ওজর আপত্তির টালবাহানা করে, তবে পাঞ্জাব ও ভারতবর্ষের সমস্ত পাদ্রীদের মিথ্যাবাদী হওয়ার ওপর সীলমোহর পড়বে। অত:পর খোদা তাঁর দিক হতে অসত্যের মূলোৎপাটন করবেন। স্মরণ রেখো, নিশ্চয়ই করবেন। কারণ সময় উপস্থিত।"[২]

বিশ্ব ধর্মসভার কার্যবিবরণী, ডিসেম্বর, ১৮৯৬ সাল :

হযরত আকদাসের একটি কর্তব্য ছিল বিশ্বের সব ধর্মাবলীর ওপর ইসলামের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা করা। আল্লাহ তাআলা তাকে এ'জন্য নানা প্রকার সুযোগ প্রদান করেছেন। কিন্তু যে সুযোগের বিষয় আমরা এখন বলছি, সম্ভবত: এটাই সর্ব প্রধান সুযোগ ছিল। বহুকাল ধরে তাঁর আন্তরিক বাসনা ছিল এমন একটি সভার আয়োজন করা হোক, যেখানে বিশ্বের সব ধর্মের নেতৃবর্গ নিজ নিজ ঐশী পুস্তকের সৌন্দর্য প্রদর্শনের জন্য আগমন করবেন। আল্লাহ তাআলা এর জন্য সুবর্ণ সুযোগ উপস্থিত করলেন।

---

(১) ডাঃ হেনরী মার্টিন ক্লার্ক এডিনবার্গ ইউনিভাসিটির একজন এম, ডি, এবং সি-এম, অর্থাৎ 'ডকটর অব মেডিসিন' ও 'মাষ্টার অব সার্জারী' ছিলেন।

(২) ১৮৯৬ সালের ১৪ ডিসেম্বর প্রকাশিত ইশতেহার, 'আঞ্জামে আথম, ৩৪-৪৪ পৃঃ।

১৮৯৬ সালে লাহোরের কোন কোন হিন্দু সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি একটি ধর্ম মহাসম্মেলন অনুষ্ঠানের আয়োজন করলেন। এতে বক্তৃতার জন্য নিম্নলিখিত পাঁচটি প্রশ্নের উত্তর দেয়া নির্ধারিত হল :

(১) মানুষের দৈহিক, নৈতিক ও আধ্যাত্মিক অবস্থা।
(২) মানুষের ইহ-লৌকিক জীবনের পরবর্তী অবস্থা।
(৩) পৃথিবীতে মানুষের জীবন যাপনের উদ্দেশ্য কি এবং এই উদ্দেশ্য কিরূপে সফল হতে পারে?
(৪) পৃথিবীতে ও পরকালে কর্মফল কি প্রকার ?
(৫) জ্ঞান ও ঐশী তত্ত্ব লাভের উপায় কি?

মনে হয় যেন আল্লাহ তাআলা তাঁর উদ্দেশ্য গুলোর সম্যক রূপ দানের জন্যই এই সম্মেলনের আয়োজন করেন। এই সম্মেলনের উদ্যোক্তা স্বামী শোগন চন্দ্র তাঁর কাছে উপস্থিত হলে, তিনি তৎক্ষণাৎ প্রবন্ধ লেখার জন্য সম্মতি জ্ঞাপন করলেন। বরং এর প্রথম ইশতেহার কাদিয়ান হতে মুদ্রিত করে প্রকাশ করতে দিলেন এবং তাঁকে সর্বপ্রকার সাহায্যের জন্য তিনি তাঁর একজন শিষ্যকে নিয়োজিত করলেন। অর্থাৎ খ্রিষ্টান, সনাতন ধর্মাবলম্বী, ব্রাহ্ম সমাজ, শিখ, থিয়োসাফিকেল সোসাইটি, ফ্রি থিঙ্কার বস্তুত: প্রত্যেক ধর্ম ও মতের প্রধানদেরকে উপরোক্ত প্রশ্ন সমূহের প্রত্যুত্তর লেখার জন্য আমন্ত্রণ করা হলো। মুসলমানদের মধ্যে তিনি ব্যতীত মৌলবী মুহাম্মদ হুসায়েন সাহেব বাটালবী, মৌলবী সানা উল্লাহ সাহেব অমৃতসরী এবং আবু ইউসুফ মুহাম্মদ মুবারক আলী শিয়ালকোটি সাহেকেও আমন্ত্রণ জানানো হলো।

১৮৯৬ সালের ২৬, ২৭ ও ২৮ ডিসেম্বর তারিখ এই ধর্ম মহাসম্মেলনের জন্য নির্ধারিত করা হয় এবং সভার অধিবেশনের জন্য ইসলামিয়া কলেজ হল নির্বাচিত হয়েছিল।[১] হযরত আকদাস প্রবন্ধ লিখছিলেন এমন সময় ইলহাম দ্বারা জানতে পারলেন যে, তাঁর প্রবন্ধ সকলের উপরে থাকবে, শ্রেষ্ঠ হবে। তিনি এই ঐশীবাণী প্রচারের উদ্দেশ্যে ১৮৯৬ সালের ২১ ডিসেম্বর, অর্থাৎ সভার ৫/৬ দিন আগে একটি ইশতেহার প্রকাশ করলেন। তা ছিল এই :
"যে মহাধর্ম সভা লাহোরের টাউন হলে[২] ২৬, ২৭ ও ২৮ ডিসেম্বর ১৮৯৬ সাল অনুষ্ঠিত হবে, তাতে এই অধমেরও একটি প্রবন্ধ কুরআন শরীফের সৌন্দর্যাবলী

(১) তৎ কালে বর্তমান ইসলামিয়া কলেজ স্থাপিত হয়নি। সভা লাহোর আঞ্জুমান হেমায়েতে ইসলামের শিরওয়ানওয়ালা দরজায় অবস্থিত প্রাসাদে অনুষ্ঠিত হয়েছিল।
(২) মনে হয়, প্রথমে এই সভা টাউন হলে হওয়া নির্ধারিত হয়েছিল। কিন্তু পরে কার্যত: ইসলামিয়া কলেজ লাহোর হলে সভার অধিবেশন হয়।

ও অলৌকিকতা সম্বন্ধে পঠিত হবে। প্রবন্ধটি মানুষের ক্ষমতার উর্ধে এবং খোদার নিদর্শন গুলোর এক নিদর্শন। তাঁরই বিশেষ সাহায্যে এটা লিখিত হয়েছে। এতে কুরআন শরীফের ওই সকল নিগূঢ় তত্ত্বাবলী লিখিত হয়েছে, যা দ্বারা সূর্যের ন্যায় উজ্জ্বল হয়ে পড়বে যে, বাস্তবিক তা খোদার কালাম এবং 'রাব্বুল আলামীন' বিশ্ব-স্রষ্টার কিতাব। যিনি এই প্রবন্ধে লিখিত পাঁচটি প্রশ্নের জবাব আদ্যপান্ত শুনবেন আমি নিশ্চিতরূপে বিশ্বাস করি এক প্রকার নতুন ইমান তাঁর মধ্যে সৃষ্টি হবে, এক প্রকার নতুন জ্যোতি: তার মধ্যে প্রজ্জ্বলিত করবে এবং খোদা তাআলার পাক কালামের একটি সংক্ষিপ্ত, সর্বাঙ্গীন তফসীর তার হস্তগত হবে। আমার এই বক্তৃতা মানুষের বৃথা বাক্য হতে পবিত্র এবং মিথ্যা আস্ফালন হতে মুক্ত। শুধু মানব জাতির সহানুভূতি আমাকে এই সময়ে এই ইশতেহার লিখতে বাধ্য করেছে, যাতে মানুষ কুরআন শরীফের সৌন্দর্যাবলী প্রত্যক্ষ করে এবং দেখতে পারে যে, আমাদের বিরুদ্ধবাদীগণ কত জুলুম করছে। তারা অন্ধকার ভালবাসে এবং আলোকে ঘৃণা করে। আমাকে সর্বজ্ঞ আলীম খোদা ইলহাম দ্বারা সংবাদ দিয়েছেন যে, এই সেই প্রবন্ধ যা সকলের ওপর প্রাধান্য লাভ করবে এবং এতে সত্য জ্ঞান ও আধাত্মিক তত্ত্বাবলীর এমন আলো আছে, যা অন্যান্য জাতি উপস্থিত হলে এবং এটি আগাগোড়া শুনলে লজ্জিত হবেন। খ্রিষ্টান হোন, আর্য হোন, সনাতন ধর্মাবলম্বী হোন বা অন্য যিনিই হোন, কখনো তাঁর ধর্ম পুস্তকের এই প্রকার সৌন্দর্য প্রদর্শন করতে পারবেন না। কারণ, খোদা তাআলা অভিপ্রায় করেছেন যে, সেদিন এই পবিত্র কিতাবের জ্যোতির্বিকাশ হবে। আমি কাশফ জগতে এর সম্বন্ধে দর্শন করেছি, আমার মহলের ওপর গায়েব হতে একটি থাবা দেয়া হয়েছে এবং ওই হাত স্পর্শে এই মহল হতে এক উজ্জ্বল জ্যোতি: বিকীর্ণ হয়ে চারপাশে বিস্তৃত হয়েছে। আমার হাতের ওপরেও এর আলো নিপতিত হয়েছে। তখন আমার কাছে দাঁড়ানো একব্যক্তি উচ্চস্বরে বলল, اَللّٰهُ اَكْبَرُ خَرِبَتْ خَيْبَرُ- এর তাৎপর্য এই যে এই মহল দ্বারা বুঝায় আমার হৃদয়'। এটি জ্যোতি: অবতরণের স্থান এবং এই জ্যোতি: কুরআনের তত্ত্বাবলী। 'খয়বর' দ্বারা তাবৎ বিকৃত ধর্মগুলোকে বুঝায়, যাদের মধ্যে শেরেক ও অসত্যের সংমিশ্রণ আছে। হয় তো মানুষকে খোদার স্থান দেয়া হয়েছে, না হয় খোদার গুণাবলীকে তার পরম সুন্দর স্থান থেকে নিচে ফেলে দেয়া হয়েছে। সুতরাং, আমাকে বলা হয়েছে যে, এই প্রবন্ধ খুব প্রচারিত হওয়ার পর অসত্য ধর্মগুলোর অসত্যতা স্পষ্ট এবং দৃষ্টিগোচর হবে এবং কুরআনের সত্যতা দিন দিন বিশ্বে বিস্তার লাভ করবে, যে পর্যন্ত এর পরিবেশ পূর্ণাকৃতি ধারণ না করে। তারপর, আমি এই কাশফের অবস্থা হতে ইলহামের দিকে নীত হই এবং এই ইলহাম প্রাপ্ত হই :

اِنَّ اللّٰهَ مَعَكَ۔ اِنَّ اللّٰهَ يَقُوْمُ اَيْنَمَا قُمْتَ۔

অর্থাৎ, “আল্লাহ তোমার সঙ্গে আছে। যেখানে তুমি দাঁড়াও, সেখানে আল্লাহ দণ্ডায়মান হন।” এটা ঐশী সাহায্যের একটি রূপক উক্তি। এখন আমি অধিক লিখতে চাই না। সকলকেই সংবাদ দিচ্ছি যে সকলেই কিছু না কিছু ব্যয় করেও এই তত্ত্বাবলী শ্রবণার্থে অবশ্য লাহোরে সভার নির্ধারিত তারিখে উপস্থিত হবেন, যাতে সকলের বিচার শক্তি ও ঈমান দ্বারা এরদ্বার লাভবান হয় যে, তারা কল্পনাও করতে পারেন না।”[১]

এই ইশতেহারে এক মহাভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছিল। এটি দেশের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে প্রেরণ করা হল। লাহোরের দরজায় দরজায় দেয়ালে দেয়ালে তা লাগান হল এবং ব্যাপকভাবে প্রচার করা হল। তারপর, যখন সভার তারিখ উপস্থিত হল, তখন সমস্ত ধর্মেরই প্রতিনিধিরা আসলেন। হযরত আকদাসের প্রবন্ধ পাঠের জন্য সময় দেড়টা হতে সাড়ে তিনটা পর্যন্ত ছিল।[২] হযরত মৌলাবী আবদুল করীম সাহেব শিয়ালকোটী যখন প্রবন্ধ পাঠ শুরু করলেন, তখন লোকের আশ্চর্যজনক অবস্থা হল। চতুর্দিক হতে করতালি শোনা যেতে লাগল। এই প্রবন্ধের জন্য দুই ঘন্টা সময় নির্ধারণ হয়েছিল। শেষ হল। প্রবন্ধের একাংশও তখন সমাপ্ত হয়নি। শ্রোতাদের সবাই এক বাক্যে বললেন যে, তারা এই প্রবন্ধ অবশ্যই শুনবেন। এর জন্য আরো একটি দিন ধার্য করতে হলেও করা হোক। ফলে, মডারেটররেরা বাধ্য হলেন।[৩] তাঁরা এর জন্য ২৯ ডিসেম্বর একদিন বৃদ্ধি করলেন। বক্তৃতার শেষে একজন সম্ভ্রান্ত হিন্দু, সভার সভাপতি অজ্ঞাতসারে বললেন, “এই প্রবন্ধ সকল প্রবন্ধের ওপরে রয়েছে।”

লাহোরের প্রসিদ্ধ ইংরেজি পত্রিকা ‘সিভিল এণ্ড মিলিটারী গেজেট’ লিখেছিল :

“লাহোর ধর্ম মহাসম্মেলনীর অধিবেশন ১৮৯৬ সালের ২৬, ২৭ ও ২৮ ডিসেম্বর লাহোর ইসলামিয়া কলেজ হলে হয়েছে। এতে বিভিন্ন ধর্মের প্রতিনিধিরা নিম্ন

---

(১) ‘তবলীগে রিসালত’ ইশতেহার, তাং ২১ শে ডিসেম্বর ১৮৯৬

(২) ‘পরে মৌলবী আবু ইউসুফ মোবারক আরলী সাহেব শিয়ালকোটিও তার সময় এই প্রবন্ধ সম্পূর্ণ পাঠের জন্য প্রদান করেন।

(৩) এই সম্মেলনীর মডারেটার (ব্যবস্থাপক সদস্য) ছিলেন : ১। রায় বাহাদুর প্রতুল চন্দ্র চাটর্জি, জজ চিফকোর্ট, পাঞ্জাব, ২। খান বাহাদুর শেখ খোদা বখশ সাহেব, জজ স্মল কাজ কোর্ট, লাহোর, ৩। রায় বাহাদুর পণ্ডিত রাধা কৃষ্ণ কোল উকিল, চিফ কোর্ট; ৪। হযরত মৌলানা হাকিম নূরুদ্দীন সাহেব ভেরবী, ৫। রায় বাহাদুর ভবানী দাস এম-এ, সেটেলমেন্ট অফিসার, ঝিলম এবং ৬। সর্দার জওয়াহের সিংহ, সেক্রেটারী, খালসা কলেজ কমিটি, লাহোর।

লিখিত পাঁচটি প্রশ্নের উত্তর প্রদান করেন। (অত:পর, পাঁচটি প্রশ্ন লিখিত হয়।) কিন্তু সাকুল্য গবেষণার মধ্যে মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানীর সন্দর্ভ সর্বাপেক্ষা অধিক মনোযোগ ও আগ্রহের সাথে শোনা হয়। তিনি ইসলামের একজন বড় সমর্থক ও আলেম। এই বক্তৃতা শোনার জন্য সব ধর্মাবলম্বীরাই অধিক সংখ্যায় সমবেত হন। মির্যা সাহেব স্বয়ং সভায় যোগদান করতে পারেননি বলে প্রবন্ধটি একজন যোগ্য বাগ্মী শিষ্য মৌলবী আবদুল করীম সাহেব শিয়ালকোটি পাঠ করেন। ২৭ শে তাং প্রায় সাড়ে তিন ঘন্টা পাঠ করা হল। তখন প্রথম প্রশ্নের উত্তর মাত্র পঠিত হয়। শ্রোতারা প্রবন্ধটি মন্ত্র মুগ্ধবৎ শুনছিলেন। অত:পর কমিটি এই প্রবন্ধের জন্য ২৯ ডিসেম্বর একদিন সম্মেলনীর তারিখ বৃদ্ধি করেন।"

এই বক্তৃতা সম্বন্ধে হিন্দুদের সম্পাদিত রিপোর্ট এই :

"পণ্ডিত গুরুধন দাসের বক্তৃতার পর আধ ঘন্টার বিরতি ছিল। কিন্তু পরে একজন বিখ্যাত ইসলাম পক্ষ সমর্থনকারীর বক্তৃতা হওয়ার ছিল। এই জন্য অধিকাংশ আগ্রহশীল ব্যক্তিরাই স্থান ত্যাগ করেননি। দেড়টা বাজার তখনো বহু সময় বাকি ছিল। ইসলামিয়া কলেজের প্রশ্বস্ত বাড়ি শীঘ্রই ভর্তি হতে লাগল। কয়েক মিনিটের মধ্যে সমস্ত বাড়ি ভরে গেল। বিভিন্ন ধর্ম, মতবাদ ও সমাজের বহু জ্ঞানী ব্যক্তি উপস্থিত হয়েছিলেন। যদিও চেয়ার, টেবিল ও ফরাসসহ ব্যাপক আয়োজন করা হয়েছিল, কিন্তু শত শত ব্যক্তিদের দাঁড়িয়ে থাকা ছাড়া উপায় ছিল না। এই সকল দণ্ডায়মান আগ্রহশীল ব্যক্তিদের মধ্যে বড় বড় সম্ভ্রান্ত রইস পাঞ্জাবের গণ্যমান্য ব্যক্তি, জ্ঞানী ও বিদ্বান ব্যক্তি, ব্যারিষ্টার, উকিল, প্রফেসার, একষ্ট্রা এ্যাসিস্ট্যান্ট কমিশনার, ডাক্তার–এক কথায়, উচ্চ শ্রেণীর বিভিন্ন বিভাগের মহোদয়গণ উপস্থিত ছিলেন। তাঁরা ধৈর্য্যে সহকারে চার পাঁচ ঘন্টাব্যাপী বলতে কি, তখন যেন এক পায়ের পর দণ্ডায়মান রইলেন। এই প্রবন্ধের জন্য যদিও কমিটির পক্ষ হতে দুই ঘন্টা মাত্র সময় নির্ধারিত হয়েছিল, কিন্তু সভায় উপস্থিত ব্যক্তিরা এর দ্বারা এমনি মুগ্ধ হয়েছিলেন যে, মডারেটার মহোদয়রা অতিশয় প্রীতি ও উৎসাহের সাথে সম্মতি প্রকাশ করলেন যে, এই বক্তৃতা শেষ না হওয়া পর্যন্ত সম্মেলনীর কাজ সমাপন করা হবে না। তাদের এই ঘোষণা সম্মেলনীর কর্তৃপক্ষ ও উপস্থিত জনমণ্ডলীর অভিলাসের যথার্থ প্রতিধ্বনি ছিল। কারণ, সময় উত্তীর্ণ হওয়ার পর যখন মৌলবী আবু ইউসুফ মোবারক আলী সাহেব তার সময়ও এই বক্তৃতা শেষ করার জন্য দান করিলেন, তখন উপস্থিত শ্রোতারা ও মডারেটার মহোদয়রা করতালি দ্বারা মৌলবী সাহেবের কাছে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করলেন। এই বক্তৃতা প্রথম হতে শেষ পর্যন্ত একই প্রকার হৃদয়গ্রাহী ও আদৃত ছিল।"[১]

(১) 'লাহোর মহাধর্মসম্মেলনীর কাজ বিবরণী, (উর্দু) ৭৯-৮০ পৃ:।

পাঠক এই বক্তৃতার মূল্য ও মর্যাদা সম্বন্ধে সঠিক মত গ্রহণ করতে চাইলে সম্মিলনীর পক্ষ হতে সভার যে কার্য বিবরণী প্রকাশিত হয়েছিল, তা পাঠ করুন। তাতে প্রত্যেক ধর্মের প্রতিনিধিরই পুরোপুরি বক্তৃতা সন্নিবিষ্ট আছে। হযরত আকদাসের বক্তৃতা তো পৃথিবীর কয়েকটি ভাষার অনূদিত হয়ে প্রকাশিত হয়েছে। উর্দুতে এর নাম 'ইসলামী ওসুল কি ফিলসফি', ইংরেজিতে 'ফিলসফি অব দি টিচিংস অব ইসলাম' এবং আরবিতে 'আল খেতাবুল জলীল'।

নিম্নে এ সম্বন্ধে কিছু উচুঁমানের অভিমত প্রদত্ত হলো :

১। 'থিওসফিক্যাল বুক নোটস' বলেছেন :
"The best and most attractive presentation of the Faith of Muhammad, which we have yet come across." অর্থাৎ, এটি মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওসাল্লাম) এর ধর্মের শ্রেষ্ঠ ও হৃদয়গ্রাহী উপস্থাপন।

২। 'ইণ্ডিয়ান রিভিয়ু' বলেছেন :
"A very entertaining and pleasant reading, lucid, comprehensive and philosophical *** evokes admiration. The book deserves to be in the hand of every Muhammadan student and also in the libraries of those who wish to know something of Muhammadan religion" অর্থাৎ অত্যন্ত প্রাঞ্জল, হৃদয়গ্রাহী, দার্শনিক, সর্ববিষয়ক এবং প্রশংসনীয়। পুস্তকটি প্রত্যেক মুসলমান ছাত্রের হাতে এবং যারা মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ও সাল্লাম) এর ধর্ম সম্বন্ধে কিছু জানতে ইচ্ছুক তাদের লাইব্রেরীতে রাখার যোগ্য।

৩। 'ব্রিষ্টল টাইমস এণ্ড মিরর' লিখছেন :
'Clearly it is no ordinary person who thus addresses himself to the west.' অর্থাৎ যিনি এই প্রকারে প্রতীচীকে তার দিকে আহ্বান করেছেন, তিনি কখনো সামান্য ব্যক্তি নন।

৪। একজন গয়ের আহমদী সংবাদপত্র সেবী হযরত আকদাসের এই বক্তৃতার সমালোচনা প্রসঙ্গে লিখেছেন :
"এই বক্তৃতাগুলোর মধ্যে সম্মেলনীর প্রাণরূপে শ্রেষ্ঠ বক্তৃতা ছিল মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানীর বক্তৃতা। তা প্রসিদ্ধ সুকণ্ঠ বাগ্মী মৌলবী আবদুল করীম সাহেব শিয়ালকোটি অত্যন্ত সুন্দরভাবে পাঠ করেন। এই বক্তৃতা দুই দিনে সমাপ্ত হয়। ২৭ ডিসেম্বর প্রায় চার ঘন্টা এবং ২৯ ডিসেম্বর দুই ঘন্টা সর্বমোট ছয় ঘন্টায় এই বক্তৃতা সমাপ্ত হয়। বড় সাইজ, এক শ' পৃষ্ঠার মত হবে। যা হোক,

আবদুল করীম সাহেব বক্তৃতা পাঠ শুরু করলেন, কি শুরু করা! সমগ্র শ্রোতামণ্ডলী তন্ময় হয়ে পড়লেন। কথায় কথায় হর্ষধ্বনি হতে লাগল। বহু সময় শ্রোতারা একই বাক্য পুনঃ পাঠের জন্য আগ্রহ প্রকাশ করতে লাগলেন। সারা জীবনে এমন সুন্দর বক্তৃতা আমাদের কানে আর শুনিনি। অন্য ধর্মাবলম্বীরা যে সব বক্তৃতা করেন সত্য বলতে কি, সম্মেলনীর প্রশ্নগুলোর উত্তরের পর্যায়ে পৌছেনি। সাধারণতঃ, বক্তারা চতুর্থ প্রশ্নের উত্তর দেয়ার চেষ্টা করতেন মাত্র। অন্য প্রশ্নগুলো তারা অল্পই স্পর্শ করেন। অনেকে কিছু বলতেন, তন্মধ্যে প্রাণবস্তু কিছু থাকত না কেবলমাত্র মির্যা সাহেবের বক্তৃতাই প্রশ্নাবলীকে স্বতন্ত্রভাবে গ্রহণ করে প্রত্যেকটির সবিশদ ও সম্পূর্ণ উত্তর প্রদান করেছে। সভায় উপস্থিত শ্রোতা মণ্ডলী অত্যন্ত মনোযোগ ও আগ্রহের সাথে ওইগুলো শুনেছেন এবং মহামূল্যবান ও অত্যুচ্চ জ্ঞানমূলক বলে ধারণা করেছেন।

"আমরা মির্যা সাহেবের মুরীদ নই। তার সাথে আমাদের কোনও সম্পর্ক নেই। কিন্তু সত্যের অপালাপ আমরা কখনও করতে পারি না। কোন সুস্থ প্রকৃতি ও সঠিক বিবেকসম্পন্ন ব্যক্তিই তা করতে পারে না। মির্যা সাহেব সকল প্রশ্নগুলোর যথোচিত উত্তর কুরআন শরীফ হতে দিয়েছেন এবং ইসলামের যাবতীয় প্রধান মৌলিক বস্তু ও শাখা উপশাখাগুলিকে যৌক্তিক ও দার্শনিক প্রমাণ দ্বারা সুন্দরতম ও সর্বোৎকৃষ্ট রূপে রূপায়িত করেছেন। প্রথমে যৌক্তিক প্রমাণের দ্বারা অতীন্দ্রিয় ও দার্শনিক বিষয়গুলো প্রকাশ করেছেন। তারপর, 'কালামে এলাহী' উদ্ধৃতি রূপে পাঠ এক বিস্ময়কর জিনিস ছিল।

"মির্যা সাহেব শুধু কুরআনের, বিষয়গুলো তাত্ত্বিক ব্যাখ্যাই করেননি, বরং কুরআনের ভাষাতত্ত্ব সাইকোলজি ও ফিলসফিও সঙ্গে সঙ্গে বর্ণনা করেছেন। বস্তুতঃ, মির্যা সাহেবের বক্তৃতা একটি সর্বতোমুখ, সর্বাঙ্গীন ও সর্বসুন্দর বক্তৃতা ছিল। অগণিত আধ্যাত্মিক সূক্ষ্ম জ্ঞানতত্ত্ব এবং ধর্মের নিগূঢ় রহস্যাবলী মুক্তাবৎ উজ্জ্বলতা প্রকাশ করছিল। ঐশী তত্ত্বের দর্শন এমন সুন্দরভাবে বর্ণনা করেছিলেন যে, সমস্ত ধর্মাবলম্বীরাই তাতে বিমুগ্ধ, নির্বাক ও বিস্ময়াবিষ্ট হয়ে পড়েন। কোন বক্তার সময়েই মির্যা সাহেবের বক্তৃতার সময়ের ন্যায় লোক সমাগম হয়নি। ওপর হতে নিচ পর্যন্ত সমস্ত হলে লোকে লোকারণ্য হয়েছিল। শ্রোতারা খুব মনোযোগ সহকারে বক্তৃতা শোনেন। মির্যা সাহেবের এবং অন্য বক্তাদের বক্তৃতার সময়ের পার্থক্য প্রকাশার্থে শুধু এইটুকু বলা যথেষ্ট যে, মির্যা সাহেবের বক্তৃতার সময় মানুষ মধু মক্ষিকার মত আপনা আপনি ছুটে আসতো। কিন্তু অন্য বক্তাদের বেলায় অপ্রীত হয়ে বহু ব্যক্তি আসন ত্যাগ করে চলে যেতেন। মৌলবী মুহাম্মদ হুসায়েনের বক্তৃতা নেহায়েৎ সাধারণ ছিল। ওইসব মোল্লা সুলভ কথাই ছিল, যা আমরা রোজ শুনি। তাতে কোনও অসাধারণ বিষয় ছিল না। মৌলবী

সাহেবের দ্বিতীয় বক্তৃতার সময় বহু শ্রোতা উঠে চলে গিয়েছিলেন। মৌলবী সাহেব মমদুহকে তার বক্তৃতা সমাপ্ত করার জন্য কয়েক মিনিটও অতিরিক্ত সময় দেয়া হয়নি।"১

যা হোক, এ প্রবন্ধে ইসলামের একটি পূর্ণাবয়ব চিত্র অঙ্কিত হয়েছিল। যিনিই হযরত আকদাসের পূর্ব প্রকাশিত ইশতেহারের ভবিষ্যদ্বাণী ও সন্দর্ভ পাঠ করবেন, তিনি কখনো একথা না বলেই পারবেন না যে, তা বাস্তবিক ঐশী সাহায্যে লিখিত হয়েছিল।

১৮৯৬ সালের গ্রন্থ :

১৮৯৬ সালে নিম্নলিখিত কিতাবগুলো প্রণীত হয়েছিল :

১। 'আঞ্জামে আথম' : এই গ্রন্থ ১৮৯৬ সালে প্রণয়ন শুরু হয় এবং ১৮৯৭ সালের প্রারম্ভে প্রকাশিত হয়। এতে আথমের ঘটনা ওই সংক্রান্ত মুসলমান মৌলবী, খ্রিষ্টান এবং আর্যদের আপত্তিগুলোর জবাব দেয়া হয়।

২। 'ইসলামী ওসুল কি ফিলসফি' : এটি সেই বক্তৃতা, যা লাহোর ধর্ম-মহাসম্মেলনে হযরত আকদাসের পক্ষে পাঠ কর হয়।

এক হাজার টাকা পুরস্কার, ১৮৯৭ সালের ২৮ জানুয়ারি :

খ্রিষ্টানদের কেউ যখন মোকাবেলার জন্য উপস্থিত হলো না, যার জন্য হযরত আকদাস ১৮৯৬ সালের ১৪ ডিসেম্বর ইশতেহার দ্বারা আহ্বান করেন, তখন তিনি আরো পূর্ণাকার যুক্তি প্রদানের উদ্দেশ্যে এক হাজার টাকার পুরস্কার ঘোষণা সহ একটি ইশতেহার প্রকাশ করলেন। তাতে লেখা হয়েছিল :

"আমি এখন এক দৃঢ় অঙ্গীকারসহ এই ইশতেহার প্রকাশ করছি যে, খ্রিষ্টানদের মধ্যে যদি কেউ যিশুর নিদর্শনাবলীকে যা তাঁর ঈশ্বরত্বের দলিল বলে মনে করা হয়—আমাদের নিদর্শন ও অলৌকিক ক্রিয়া সমূহ অপেক্ষা অধিকতর শক্তিশালী প্রমাণযুক্ত ও সংখ্যাধিক হওয়া প্রমাণ করতে পারে, তবে আমি তাকে পুরস্কার স্বরূপ এক হাজার টাকা দেব। আমি হলফ করে সত্য সত্য বলছি যে, এতে কোনও প্রকার ব্যতিক্রম হবে না। আমি এমন তৃতীয় পক্ষের কাছে এই টাকা জমা করতে পারি, যাতে প্রতিপক্ষের সান্ত্বনা হয়।"২

(১) চৌধুবেয়-সাদী', রাওলপিণ্ডি, ১লা ফেব্রুয়ারি ১৮৯৭ সাল।
নোট : খেলাফত লাইব্রেরী রাবওয়ায় মূল কাগজটি আছে।

(২) ইশতেহার, তাং ২৮ শে ফেব্রুয়ারি, ১৮৯৭ সাল।

এই ইশতেহার ছয় হাজার কপি মুদ্রণ করে প্রকাশ করা হল। প্রত্যেক প্রসিদ্ধ পাদ্রী সাহেবকে রেজিষ্ট্রারি ডাকযোগে তা পাঠানো হল। কেউ কোন জবাব দেয়নি। অবশ্য, একজন অখ্যাত খ্রিষ্টান মোকাবেলার আহ্বান গ্রহণ না করলেও লক্ষ্ণৌর 'ক্রীশ্চিয়ান এডভোকেট' পত্রে কতগুলো আপত্তি উত্থাপন করল। ১৮৯৭ সালের ২৮ ফেব্রুয়ারি ওই আপত্তিগুলো প্রত্যুত্তর হযরত আকদাস বিভিন্ন সংবাদপত্রে প্রকাশ করলেন। ক্রোড়পত্র হিসেবে তা মাদ্রাজের 'মুখবির-ই ডেকান' কাগজে ১৮৯৭ সালে, ১১ মার্চ প্রকাশিত হল। হযরত আকদাসের প্রতিবাদের প্রতিবাদ কেইবা কি করতো? অবশ্য, হুযুরের হৃদয়ে খ্রিষ্টান ধর্ম খণ্ডনের এক নব প্রেরণা জন্মালো।

ক্রুশ-ভঙ্গ ও অভিসম্পাত, ১৮৯৭ সালের ৬ ই মার্চ :

১৮৯৭ সালের ৬ মার্চ তিনি "খোদা কি লানাৎ ও কিসরে সলীব" ('খোদার অভিশাপ ও ক্রুশ-ভঙ্গন') শিরোনাম দিয়ে তিনি লিখলেন :

"খ্রিষ্টানদের সর্বসম্মত ধর্মমত এই যে, যিশু 'ক্রুশারোপিত' হয়ে তিন দিনের জন্য 'লানতী' (অভিশপ্ত) হয়েছিলেন এবং তাদের মতে মুক্তির যাবতীয় উপায় এই লানতের ওপরেই নির্ভর করে। এই লানতের ধারণার পরিপ্রেক্ষিতে এমন কঠিন আপত্তি উত্থিত হয় যে, তাতে ত্রিত্ববাদ, প্রায়শ্চিত্তবাদ এবং যাবতীয় পাপ ক্ষমার বিশ্বাস বিলুপ্ত হয়ে এই মতবাদ স্বতঃসিদ্ধভাবে ভ্রান্ত বলে প্রমাণিত হয়। যদি এই ধর্ম সমর্থনের কারো আকাঙ্ক্ষা থাকে, তবে দ্রুত উত্তর দিন। নতুবা দেখুন, সমগ্র সৌধটি ভুমিসাৎ হয়ে এমন ভীষণভাবে নিপতিত হল যে, তাবৎ খ্রিষ্টান ধর্ম বিশ্বাস তার নিচে নিষ্পেষিত হল। ত্রিত্ববাদও নেই। প্রায়শ্চিত্তবাদও নেই। পাপের ক্ষমাও নেই। খোদার মহিমা দেখুন! ক্রুশ কিভাবে ভঙ্গ হলো।" অত:পর, তিনি 'আকরাবুল মুয়ারেদ' নামক সুপ্রসিদ্ধ আরবি অভিধান থেকে 'লানৎ' শব্দের অর্থ ব্যাখ্যা করেন।

তা এই :

"اَللَّعْنُ اَلْاِبْعَادُ وَالطَّرْدُ مِنَ الْخَيْرِ وَمِنَ اللّٰهِ وَمِنَ الْخَلْقِ وَمَنْ اَبْعَدَهُ اللّٰهُ لَمْ تَلْحَقْهُ رَحْمَتُهُ
وَخَلَّدَهُ فِي الْعَذَابِ وَاللَّعِيْنُ الشَّيْطَانُ وَالْمَمْسُوْخُ وَقَالَ الشَّمَّاخُ اَلذِّئْبُ كَالرَّجُلِ اللَّعِيْنِ-

অর্থাৎ, আভিধানিক অর্থ এই যে, 'লানতী' তাকে বলা হয় যে সর্ব প্রকার মঙ্গল, সর্বপ্রকার ব্যক্তিগত যোগ্যতা, ঐশী কৃপা এবং ঐশী তত্ত্বজ্ঞান হতে সম্পূর্ণভাবে বঞ্চিত হয়ে চির আযাবে নিপতিত হয় অর্থাৎ, তার হৃদয় সম্পূর্ণভাবে অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়ে পড়ে এবং বড় ছোট পুণ্য এমন কি মঙ্গলজনক কোন কথাই

তার অন্তঃকরণে অবশিষ্ট থাকে না এবং 'শয়তানে' পরিণত হয়–তার অভ্যন্তর সম্পূর্ণভাবে বিকৃত হয় এবং কবি শম্মাখ এই সামঞ্জস্যের প্রতি লক্ষ্য করেই এক কবিতায় 'লানতী' ব্যক্তির নাম 'ভল্লুক' দিয়েছে, যেহেতু লানতী ব্যক্তির অন্তঃকরণ আমূল বিকৃত ও হিংস্র হয়ে পড়ে।"

"এখন প্রশ্ন এই : যে অবস্থায় লানতের মূলতত্ত্ব এই যে, লানতী হওয়ার অবস্থায় খোদা হতে মানুষের যাবতীয় সম্বন্ধ ছিন্ন হয় এবং তার ও শয়তানের মধ্যে অনুমাত্র প্রভেদ থাকে না, এমতাবস্থায় আমরা পাদ্রী সাহেবদেরকে যথোচিত সম্মান সহকারে এই জিজ্ঞাসা করতে চাই যে, বাস্তবিক এই লানতই উল্লিখিত যাবতীয় উপসর্গসহ যিশুর ওপর খোদা তাআলার তরফ থেকে নিপতিত হয়েছিল, একি সত্য? তিনি কি খোদার 'লানত' এবং কোপগ্রস্ত হয়ে অন্ধকারাচ্ছন্ন অন্তঃকরণময় ও খোদা হতে বিমুখ হয়েছিলেন? আমার মতে, সেই ব্যক্তি নিজেই 'লানতী' যে খোদার এমন একজন মনোনীত বরগুজিদার নাম 'লানতী' রাখে। অন্য কথায়, তাকেই অন্ধকার চিত্ত, খোদা হতে দূরে এবং শয়তান প্রকৃতি বিশিষ্ট বলা যায়। কেউ কি বলতে পারে যে, খোদার এমন প্রিয়জন সত্যই এই 'লানত' গ্রস্ত হয়েছিলেন, যা পুরাপুরি খোদার শত্রুতা ছাড়া কখনও ঘটতে পারে না? অবশেষে বলেন :

"সুতরাং, যদি এটি বলা কখনও সমীচীন নয়, তবে দেখ! প্রায়শ্চিত্তবাদের সম্পূর্ণ সৌধটিই ভূপাতিত হল। ত্রিত্ববাদ ধর্ম ধ্বংস হল। ক্রুশ ভঙ্গ হলো। জগতে এমন কেউ আছে কি যে, এর প্রতিবাদ করে?"[১]

স্বয়ং ঐশী বাণী প্রাপক ও মুলহাম হওয়া সম্পর্কে উলামাগণের নাম বনাম মুবাহালার আহ্বান :

হযরত আকদাসের বিরুদ্ধবাদী মৌলবী সাহেবান তো তার দাবির শুরু হতেই তাকে 'মুবাহালার' (বা দোয়া যুদ্ধের) দাওয়াত করছিলেন। কিন্তু মুসলমান পক্ষ দ্বয়ের পারস্পরিক 'মুবাহালা' বৈধ নয় বলে তিনি তা এড়িয়ে চলছিলেন। কিন্তু উলামারা যখন তার বিরুদ্ধে 'কুফরের ফতোয়া' প্রকাশ করলেন, তখন তাকেও আল্লাহ তাআলার তরফ থেকে মুবাহালার অনুমতি প্রদান করা হল। এই জন্য ১৮৯২ সালে তিনি কাফের ও মিথ্যাবাদী আখ্যাদাতা 'মুকাফ্‌ফের' ও 'মুকায্‌যেব' মৌলবীদের উদ্দেশ্য করে বললেন যে, এখন এই উলামাদের মধ্যে যিনিই তার

(১) 'ইশতেহার,' ৬ই মার্চ, ১৮৯৭ সাল, 'তবলীগে রিসালাত', ষষ্ঠ খণ্ড, ৩৩-৩৫ পৃঃ।

সাথে মুবাহালা করতে চান, তাকে খোলাখুলি অনুমতি দেয়া হলো। তখন কোন মৌলবীই সামনে অগ্রসর হলেন না।

পাদ্রী আবদুল্লাহ আথমের সম্বন্ধে যখন ভবিষ্যদ্বাণী করলেন, তখন বিরুদ্ধবাদী উলামারা তাদের অভ্যাসানুসারে খ্রিষ্টানদের সাথে প্রকাশ্যে যোগদান করলেন। এতে তিনি ওই সব উলামাকে সম্বোধন করে 'ইশতেহারে মুবাহালা' লিখলেন। এই ইশতেহারে প্রথমে তার মসীহ মাওউদ হওয়ার দাবি উপস্থিত করলেন এবং বললেন যে, মসীহ মাওউদের কাজই হল ক্রুশ ভঙ্গ করা 'কিসরে সলীব'। এর নিমিত্ত শ্রেষ্ঠ অস্ত্র হল মসীহ নাসেরী আলাইহেস সালামের মৃত্যু প্রমাণ করা। তারপর হযরত উলামাদের অনুসৃত এই নীতির প্রতি আক্ষেপ প্রকাশ করলেন যে, তারা কুরআন ও হাদিসে বর্ণিত স্পষ্ট উক্তির প্রতি কর্ণপাত না করে খোলাখুলিভাবে এ বিষয়ে পাদ্রীদের দিয়েছেন। অত:পর লিখলেন:

"এখনও যদি মৌলবী সাহেবান আমাকে ভণ্ড ও মিথ্যাবাদী মনে করেন, তবে এটি অপেক্ষা বড় আরো একটি মিমাংসার উপায় আছে এবং তা হলো, আমি ওইসব ইলহাম হাতে নিয়ে যা আমি প্রকাশ করেছি, মৌলবী সাহেবানের সাথে এই প্রকারে মুবাহালা করে নেই যে, আমি খোদা তাআলার কসম খেয়ে বলবো যে, আমি সত্য সত্যই তাঁর সাথে বাক্যালাপের সম্মান লাভ করেছি এবং তিনি আমাকে চতুর্দশ শতাব্দীর শিরোভাগে প্রেরণ করেছেন, যাতে আমি ওই বিপ্লবের অবসান করি, যা ইসলামের বিরোধী সর্বাপেক্ষা বড় ফেৎনা এবং তিনিই আমার নাম ঈসা রেখেছেন এবং ক্রুশ ভাঙ্গার জন্য আমাকে 'মামুর' (প্রত্যাদিষ্ট) করেছেন।"

অত:পর, হুযুর তাঁর ঐসকল ইলহাম লিপিবদ্ধ করলেন, যা

يَا عِيْسَى الَّذِيْ لَا يُضَاعُ وَقْتُهٗ

(ওগো সেই ঈসা, যার সময় নষ্ট করা হবে না') হতে শুরু হয়ে

"لیکن خدا اُسے قبول کرے گا اور بڑے زور آور حملوں سے اس کی سچائی کو ظاہر کر دے گا"

কিন্তু মহা আক্রমণ সমূহ দ্বারা তাঁর সত্যতা প্রকাশিত করবেন) পর্যন্ত গিয়ে শেষ হয়েছে।

তারপর, আরো অগ্রসর হয়ে লিখলেন :

"এটি কি আশ্চর্যজনক নয় যে, এহেন মহামিথ্যাবাদী প্রবঞ্চক ও ভণ্ড, 'কায্যাব', দাজ্জাল' ও 'মুফতরী' যে অনবরত বিশ বছর যাবত খোদা তাআলার ওপর মিথ্যা

আরোপ করে আসছে, এখন পর্যন্ত কোন লাঞ্ছনার আঘাতে সংহার হয়নি ? তৌরত এবং কুরআন শরীফ উভয়েই সাক্ষ্য যে, খোদার ওপর মিথ্যা আরোপকারী শীঘ্রই ধ্বংস হয়। তার নাম উচ্চারণ করার কেউই থাকে না। ইঞ্জিলেও লেখা আছে যে, মানুষের পরিকল্পিত কাজ হলে তা শীঘ্রই বিনাশ হবে। কিন্তু খোদার হয়ে থাকলে, এমন না হয় যে তোমরা বিরুদ্ধাচরণ করে অপরাধী সাব্যস্ত হও। আল্লাহ্ জাল্লা শানুহু কুরআন শরীফে বলেন :

إِنْ يَكُ كَاذِبًا فَعَلَيْهِ كَذِبُهُ وَإِنْ يَكُ صَادِقًا يُصِبْكُمْ بَعْضُ
الَّذِي يَعِدُكُمْ - إِنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ كَذَّابٌ

অর্থাৎ, "যদি সে মিথ্যাবাদী হয়ে থাকে, তবে তার মিথ্যা তার ওপর বর্তিবে এবং যদি সে সত্যবাদী হয়ে থাকে, তবে তোমরা তার ওই সকল কোন কোন ভবিষ্যদ্বাণী হতে রক্ষা লাভ করতে পার না, যা সে তোমাদের সম্বন্ধে অঙ্গীকার করে। খোদা কখনো এরূপ ব্যক্তিকে সফলতার পথ প্রদর্শন করেন না, যে বৃথা বাক্যালাপ করে এবং ঘোর মিথ্যাবাদী।"[১]

অত:পর, হযরত উলামা ও সাজ্জাদা-নশীনদের উদ্দেশ্য করে তিনি লিখলেন :

"এখন, হে বিরুদ্ধবাদী মৌলবীগণ এবং হে সাজ্জাদা-নশীনগণ! এই ঝগড়া আমার এবং আপনাদের মধ্যে সীমার বাইরে বৃদ্ধি লাভ করেছে। যদিও এই জামা'ত আপনাদের সম্প্রদায়গুলো তুলনায় খুব অল্প এবং 'ফিয়াতুন কালিলাতুন' (লঘিষ্ট সম্প্রদায়) যথাসম্ভব এক্ষণে চার পাঁচ হাজারের বেশি নয়[২] তথাপি নিশ্চিত জানবেন যে, এটি খোদার নিজ হাতে লাগানো নতুন গাছ। খোদা একে কখনো বিনষ্ট করবেন না। তিনি কখনও সন্তুষ্ট হবেন না, যে পর্যন্ত এটিকে সম্পূর্ণতা প্রদান করেন। তিনি এটাকে জল দান করবেন। এর পরিবেশ সৃষ্টি করবেন এবং বিস্ময়কর উন্নতির পর উন্নতি দান করবেন। আপনারা কি অল্প ক্ষমতা প্রয়োগ করেছেন? যদি এটি মানুষের ক্রিয়া হতো, তবে কবেই এই বৃক্ষ কর্তিত হতো এবং এর নাম বা চিহ্নও থাকত না।"

"তিনিই আমাকে আদেশ করেছেন, যেন আমি আপনাদের সামনে 'মুবাহালার আবেদন' উপস্থিত করি, যাতে সত্যের শত্রু ধ্বংস হয় এবং অন্ধকারকে যে ভাল বাসে, সে আযাবের অন্ধকারে নিপতিত হয়। এর আগে আমি কখনো মুবাহালার সঙ্কল্প করিনি এবং কারো জন্য 'বদ দোয়া' করতে চাইনি। আবদুল হক গজনবী,

(১) 'সুরাহ মুমেন', ৪র্থ রুকু।
(২) এখন আল্লাহর অনুগ্রহে কয়েক লক্ষ। এটি কি সেই মহান ভবিষ্যদ্বাণীর সফলতা নয় ?

অত:পর অমৃতসরী আমার কাছে প্রার্থী হন। কিন্তু আমি দীর্ঘকাল যাবত অন্যমুখী হয়ে থাকি। অবশেষে, তার নেহাত পীড়াপীড়ির ফলে মুবাহালা হয়। কিন্তু আমি তাঁর জন্য কোন কু-প্রার্থনা করিনি। কিন্তু এখন আমি অত্যন্ত নিপীড়িত হয়েছি। আমাকে 'দাজ্জাল বলা হয়েছে। আমার নাম 'শয়তান' রাখা হয়েছে। আমাকে 'কাযযাব' ও 'মুফতরী' জ্ঞান করা হয়েছে। তাদের ইশতেহারগুলোতে আমাকে 'লানতের সাথে' স্মরণ করা হয়েছে। আমি তাদের মজলিসে ঘৃণার সাথে আহূত হয়েছি এবং ঘৃণিতভাবে আমার নামোচ্চারণ করা হয়েছে। আমাকে 'কাফের' নির্ধারণ করতে আপনারা এমনই জোর দিয়াছেন, যেন আমার 'কুফর' সম্বন্ধে আপনাদের কোনই সন্দেহ নেই।

"সুতরাং, এখন উঠুন। মুবাহালার জন্য প্রস্তুত হোন। আপনারা শুনিয়েছেন যে, আমার দাবির ভিত্তি দু'টি বিষয়ের ওপর স্থাপিত ছিল। প্রথম, কুরআন ও হাদিসের স্পষ্ট উক্তি। দ্বিতীয়, ঐশী ইলহামাবলী। আপনারা কুরআনের এবং হাদিসের স্পষ্ট নির্দেশগুলি মান্য করেননি। তৃণাদি উৎখাত করার মত আপনারা খোদার কালামকে প্রত্যাখ্যাত করেছেন। এখন, আমার দাবির দ্বিতীয় দিক বাকি আছে। সুতরাং, আমি সেই 'কাদের' ও 'গাইয়ূর', সর্বশক্তিমান, প্রতিহিংসাকারী খোদার কসম আপনাদেরকে দিচ্ছি যার কসম কোন ইমানদার রদ করতে পারে না এখন এই দ্বিতীয় ভিত্তি বলে মিমাংসার্থে আমার সাথে 'মুবাহালা' করুন।

"এটি এই প্রকারে করতে হবে যে, মুবাহালার তারিখ ও স্থান নিরূপিত হওয়ার পর আমি এই ইলহামগুলো যত কাগজে লিখেছি, সব আমার হাতে নিয়া মুবাহালার ময়দানে উপস্থিত হয়ে দোয়া করবঃ

'এলাহী, যদি এই সকল ইলহাম যা আমার হাতে আছে আমারই মিথ্যা তৈরি এবং তুমি জান যে আমি এগুলো আমার তরফ হতে সৃষ্টি করেছি, কিংবা যদি এগুলো শয়তানী কান কথা এবং তোমার ইলহাম নয়, তবে আজকের দিন হতে এক বছর অতিক্রম করার আগে আমাকে মৃত্যু দাও, কিংবা মৃত্যু অপেক্ষাও মন্দ কোন আযাবগ্রস্ত কর এবং মৃত্যু উপস্থিত না হওয়া পর্যন্ত তা হতে নিস্কৃতি দিও না, যাতে আমার স্পষ্ট লাঞ্ছনা হয় এবং মানুষ আমার ফেৎনা হতে রক্ষা লাভ করে। কারণ আমি চাই না যে, আমার কারণে তোমার বান্দা ফেৎনা ও বিপথগামিতায় নিপতিত হয়। এমন ভ- ও মিথ্যাবাদীর মৃত্যুই শ্রেয়। কিন্তু হে 'আলীম ও খাবীর', সর্বজ্ঞ খোদা! যদি তুমি জান যে, এই যে ইলহামগুলো আমার হাতে আছে, তোমারই ইলহাম এবং তোমারই মুখ নি:সৃত বাণী, তবে এই সকল বিরুদ্ধবাদীকে–যারা এখানে উপস্থিত আছে এক বছরের মধ্যে অত্যন্ত কঠোর, কষ্টদায়ক মার দাও। কাউকে বাতব্যাধিগ্রস্ত কর। কাউকে উন্মাদ কর।

কাউকে মৃগী দাও। কাউকে সর্প বা উন্মাদ কুকুর দংশনে ধ্বংস কর। কারো মালের ওপর আপদ অবতীর্ণ কর। কারো প্রাণের ওপর এবং কাহারো সম্মানের ওপর আক্রমণ কর।'

"আমি এই দোয়া করার পর উভয় পক্ষই বলবেন, 'আমীন'।

"সেইভাবে, প্রতিপক্ষের জামা'ত হতে যিনিই মুবাহালার জন্য উপস্থিত হবেন, খোদা তাআলার জবাবে এই দোয়া করবেন :

'হে 'আলীম, খাবীর', সর্বজ্ঞ খোদা ! আমরা এই ব্যক্তিকে যার নাম হচ্ছে গোলাম আহমদ বাস্তবিকই 'কাযযাব' 'মুফতরী' এবং 'কাফের' জ্ঞান করি। যদি এই ব্যক্তি 'কাযযাব' এবং তার এই সমস্ত ইলহাম তোমার তরফ হতে নয়, বরং তারই রচিত তোমার প্রতি মিথ্যারোপ ও মিথ্যা-উক্তি, তবে এই অনুগ্রহিত, 'মরহুমা উম্মতের' প্রতি দয়া কর এই মিথ্যাবাদী 'মুফতরীকে' এক বছরের মধ্যে সংহার কর, যাতে মানুষ তার ফেৎনা হতে নিরাপদ হয় এবং যদি সে মিথ্যাবাদী ও 'মুফতরী' নয়, এবং তোমার তরফ হতে এসেছে, এবং এই সব ইলহাম তোমারই মুখ নিঃসৃত পবিত্র বাক্য, আমরা যারা তাকে 'কাফের' এবং 'কাযযাব' জ্ঞান করি আমাদের ওপর দুঃখ লাঞ্ছনাকারী আযাব এক বছরের মধ্যে অবতীর্ণ কর। কাউকে অন্ধ কর। কাউকে কুষ্ঠগ্রস্থ কর। কাউকে বাতব্যধি দ্বারা আক্রমণ কর। কাউকে উন্মাদ কর। কাউকে মৃগীগ্রস্ত কর। কাউকে সর্প বা পাগল কুকুরের দংশন দ্বারা ধ্বংস কর। কারো মালের ওপর আপদ অবতীর্ণ কর। কারো প্রাণ এবং কারো সম্মানকে আক্রমণ কর।'

"প্রতিপক্ষ এই দোয়া করার পর উভয় পক্ষই বলবেন, 'আমীন'।

"এই মুবাহালার পর যদি আমি এক বছরের মধ্যে মারা যাই, বা কোন আযাবের মধ্যে নিপতিত হই যা হতে প্রাণ রক্ষার লক্ষণ পাওয়া না যায়, তবে মানুষ আমার ফেৎনা হতে রক্ষা লাভ করবে এবং আমাকে চিরদিন লানতের সাথে স্মরণ করা হবে। কিন্তু যদি খোদা এক বছরের মধ্যে আমাকে মৃত্যু ও দৈহিক বিপদ হতে রক্ষা করেন এবং আমার বিরুদ্ধবাদিদের ওপর 'কহর' ও 'এলাহী গযবের' লক্ষণ প্রকাশিত হয়, তবে পৃথিবীতে সত্য উদঘাটিত হয়ে পড়বে এবং মধ্যকার প্রাত্যহিক বিবাদ বিস্বম্বাদ তিরোহিত হবে।

"আমি পুনরায় বলছি যে, আমি ইতিপূর্বে কখনো কোন কলেমা পাঠকের জন্য 'বদ-দোয়া' করিনি এবং 'সবর' করে এসেছি। কিন্তু এখন খোদার কাছে ফয়সালা চাইব এবং তাঁর পবিত্রতা ও মর্যাদার বস্ত্রাঞ্চল ধরব, যাতে তিনি আমাদের মধ্যে জালেম ও মিথ্যাবাদী পক্ষকে ধ্বংস করে এই শক্তিশালী ধর্মকে

বিপ্লব হতে রক্ষা করেন। আমি এই শর্ত করছি যে, আমার দোয়ার ক্রিয়া সেই অবস্থাই মাত্র স্বীকার করতে হবে, যারা মুবাহালার ময়দানে মোকাবেলার জন্য উপস্থিত হন তাদের প্রত্যেকেই যদি এক বছরের মধ্যে উল্লিখিত বিপদাবলীর মধ্যে কোন একটি দ্বারা আক্রান্ত হন তারা হাজার জন হোন, কিংবা দুই হাজার জন হোন। যদি একজনও বাকি থাকেন, তবে আমি আমাকে মিথ্যাবাদী জ্ঞান করব। সাক্ষী থাক, হে জমিন ও আসমান! খোদার 'লানত' ওই ব্যক্তির ওপর, যে এই 'রিসালাহ' (পুস্তিকা) পৌঁছার পর মুবাহালায়ও উপস্থিত হয় না কাফের প্রতিপন্ন করা এবং অবমাননা করাও পরিত্যাগ করে না এবং উপহাসকারীদের মজলিস হতেও পৃথক হয় না। এবং হে মুমেনরা, খোদার উদ্দেশ্যে তোমরা সকলে বল, 'আমীন'।"[১]

অত:পর হযরত আকদাস ওই সকল বহু উলামা ও সাজ্জাদানসীনের নাম লিপিবদ্ধ করেন, যাদেরকে মুবাহালার জন্য আহ্বান করা হয়। তন্মধ্যে মশহুর উলামা ও সুফিদের নাম এই :

উলামাদের নাম : (১) মৌলবী সৈয়দ মুহাম্মদ নযির হুসায়েন সাহেব, প্রকাশ 'সোখুল-কুল', সুরোজগড়ী, অত:পর দেহলবী। (২) মৌলবী রশীদ আহমদ সাহেব, গাঙ্গাহী। (৩) মৌলবী আবু সায়ীদ মুহাম্মদ হুসায়েন সাহেব, বাটালবী। (৪) মৌলবী আবুল ওফা সানাউল্লাহ সাহেব, অমৃতসরী।

সুফীদের নাম : (১) গোলাম নেযামুদ্দীন সাহেব সাজ্জাদানসীন ই জনাব সৈয়দ নিয়াজ আহমদ সাহেব, বেরেলবী (২) মিয়া আল্লাহ বখশ সাহেব সাজ্জাদানসীন, তুনসবী (৩) হযরত মিয়াঁ গোলাম ফরীদ সাহেব, চাচড়াঁ শরীফওয়ালা।

হযরত খাজা গোলাম ফরীদ সাহেব চাচড়াঁ শরীফওয়ালার সমর্থন :

এই 'মুবাহালার' সমর্থন কি অসমর্থন করে জবাব দেয়ার সাহস অন্য কোন 'আলেম' কিংবা 'সাজ্জাদানসীন' তো করেন নেই। অবশ্য, বাহাওয়ালপুরের নবাব সাহেবের পীর হযরত খাজা গোলাম ফরীদ সাহেব চাচড়াঁ শরীফওয়ালা, একটি পত্র আরবি ভাষায় হযরত আকদাসের খেদমতে লিখলেন। এর অংশ বিশেষের অনুবাদ নিম্নে প্রদত্ত হল :

"প্রকাশ থাকে যে, আমি আপনার ও কিতাবটি পেয়েছি, যার মধ্যে 'মুবাহালার' জবাব তলব করা হয়েছে। যদিও আমার অবসর ছিল না, তবু আমি এই

---

(১) 'তবলীগে রিসালত', পঞ্চম খণ্ড, ৫৪-৫৫ পৃ:।

কিতাবের একাংশ পাঠ করেছি। সেই অংশে উত্তম সম্বোধন ও রোষের উপায় বর্ণিত ছিল। সুতরাং, সকল বন্ধু অপেক্ষা পরম প্রিয় বন্ধু, আপনি অবহিত হোন, আমি প্রথম হতেই আপনার জন্য সম্মানজনক স্থানে দাঁড়ান আছি, যাতে আমি সাওয়াব লাভ করি। কখনো আমার মুখে শ্রদ্ধা ও ভক্তি ছাড়া আপনার জন্য অন্য কোন উক্তি করিনি। এখন আমি আপনাকে জানাচ্ছি যে, আমি নি:সন্দিগ্ধভাবে আপনার সাধু অবস্থা স্বীকার করি এবং আমার প্রত্যয় এই যে, আপনি খোদার একজন সালেহ বান্দা এবং আপনার প্রচেষ্টা আল্লাহর কাছে গৃহীত। এর ফল প্রাপ্ত হবেন এবং খোদা পরম দানময় বাদশাহের বিশেষ অনুগ্রহ আপনার ওপর আছে। আমার শেষ মঙ্গলার্থে দোয়া করুন এবং আমি আপনার জন্য মঙ্গলময়, সর্বকুশল পরিণামের জন্য দোয়া করে থাকি।”[১]

হযরত মিয়া গোলাম ফরীদ সাহেবের এই পত্র দর্শনে হযরত আকদাস অত্যন্ত প্রীত হলেন একে ‘আঞ্জামে আথমের’ পরিশিষ্টে সন্নিবিষ্ট করে অন্য সাজ্জাদা নশীনদিগকেও মিয়া গোলাম ফরীদ সাহেবের আদর্শ পালন করতে আহ্বান করলেন।

সৈয়দ রশীদ উদ্দীন সাহেব পীর সাহেবুল আলমের তসদিক :

আরো একজন সাজ্জাদা নসীন সৈয়দ রশীদ উদ্দীন সাহেব পীর সাহেবুল আলাম হযরত আকদাসের সত্যতার সমর্থন করেন। তার কাছে তার কোন কোন মুরীদ হযরত আকদাসের সত্যতা জানার জন্য আবেদন করেছিলেন। তিনিও হযরত আকদাসকে আরবিতে পত্র করেছিলেন। অনুবাদ নিম্নে প্রদত্ত হল :

“আমি রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামকে কাশফ জগতে দর্শন করলাম। আমি নিবেদন করলাম, ‘রসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম), এই যে ব্যক্তি মসিহ মাওউদ হওয়ার দাবি করছেন, ইনি কি সত্যবাদী? না, মিথ্যাবাদী ও ভণ্ড’? রসুলূল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম বললেন, ‘তিনি সত্যবাদী খোদা তাআলার তরফ হতে এসেছেন’। আমি বুঝতে পারলাম যে, আপনি সত্যের ওপর আছেন। অত:পর, আমি আপনার বিষয়ে কোন সন্দেহ পোষণ করব না। আপনার মর্যাদা সম্বন্ধে আমার কোনই সন্দেহ উপস্থিত হবে না। আমাকে যাহা আদেশ করবেন, তাই করব। যদি আপনি বলেন যে আমেরিকা যাও, তবে আমি সেখানেই যাব। আমি আমাকে আপনার হাওলা করেছি। ইনশাআল্লাহ, আমাকে বিশ্বস্ত বলেই পাবেন।”[২]

(১) ‘যমিমা, আঞ্জামে আথম’, ৩৬ পৃ:।
(২) ‘যমিমা আঞ্জামে আথম’, ৫০ পৃ: হাশিয়া।

হযরত আকদাস তাঁর সম্বন্ধে লিখেছেন :

"এঁর খলিফা আবদুল লতিফ মরহুম এবং শেখ আবদুল্লাহ আরবের প্রমুখ ব্যক্তির কাছে আমি এই সকল কথাই শুনেছি। ইদানিং, আমার অন্তরঙ্গ বন্ধু শেঠ সালেহ মুহাম্মদ হাজী আল্লাহ রাখা সাহেব মাদ্রাজ হতে তার কাছে গিয়েছিলেন। তিনি তাকে যথারীতি সমর্থক হিসেবেই পান। তিনি বরং প্রকাশ্য দরবারে দাঁড়িয়ে 'চোঙ্গা' হাতে নিয়া উপস্থিত সমস্ত শ্রোতাকে উচ্চ কণ্ঠে বলেছেন যে, তিনি আমার দাবি যথার্থ জ্ঞান করেন এবং এটিই তিনি কাশফযোগে জানতে পারেন। তার সাহেবজাদা সাহেবও বলেছেন যে, তার পিতা যখন তসদিক করেছেন, তিনিও অস্বীকার করেন না।[১]

মৌলবী গোলাম দস্তগীর কসৌরীর বদদোয়ার পরিণতি, ১৮৯৭ সাল :

মৌলবী গোলাম দস্তগীর কসৌরী হযরত আকদাসকে মুবাহালার জন্য আহ্বান করলেন। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এই শর্তও প্রকাশ করেন যে, "মির্যা সাহেব সত্য হলে মুবাহালার মাঠেই আমার ওপর আযাব নাযেল হয়।" হযরত আকদাস এর জবাবে ১৮৯৭ সালে ১৫ জানুয়ারী, একটি ইশতেহার প্রকাশ করেন। এই ইশতেহারে তিনি লিখিলেন যে সেটাই মুবাহালার 'মসনুন' বা সুন্নত সিদ্ধ পদ্ধতি, যাহা আঁ–হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম নাজরানের খ্রিষ্টানদের সাথে মুবাহালা করার সময় অবলম্বন করেন এবং সেটি এই ছিল যে, তারা মুবাহালা করলে এক বছরের মধ্যে ধ্বংস হত। প্রকাশ থাকে যে, এটাই 'মসনুন' বা সুন্নত সিদ্ধ পন্থা। এই সুন্নতের পথ অবলম্বন করাই মৌলাবী গোলাম দস্তগীর কসৌরীর উচিত ছিল! তিনি এই কর্তব্য বিচ্যুত হয়ে তার জন্য ধ্বংসের অন্য পথ গ্রহণ করলেন। ১৩০৫ হিজরী সালে তিনি একটি কিতাব 'ফতেহ রাব্বানী' লিখলেন। তাতে লিখেছিলেন :

"হে যাল জালাল ওয়াল ইকরাম, হে মালেকুল-মুলক! হে মহামহিমাময় মহা গৌরবময়! হে বিশ্বের অধীশ্বর! যেমন তুমি একজন রাব্বানী আলেম হযরত মুহাম্মদ তাহের, 'মজমাউল বেহার' প্রণেতার দোয়া ও চেষ্টায় সেই মিথ্যাবাদী মাহদী এবং ভণ্ড মসীহকে ধ্বংস করেছিলে (যে তার সময় অভ্যুথান করেছিল), তেমনি দোয়া ও প্রার্থনা করছে ফকির কসৌরী (আল্লাহ তাঁর হোক)। এই দীন দরিদ্র তোমার মহাশক্তিশালী ধর্মের যথাসাধ্য সাহায্য করছে। তুমি মির্যা কাদিয়ানী এবং তার হাওয়ারীদেরকে তওবা নসুহের সামর্থ্য দাও এবং যদি এটি

(১) 'যমিমা আঞ্জামে আথম', ৫০ পৃঃ হাশিয়া।

ভাগ্যে না থাকে, তবে দেরকে কুরআনের এই আয়াতের গন্তব্যে পৌঁছাও :

فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ-
اِنَّكَ عَلٰى كُلِّ شَيْئٍ قَدِيْرٌ وَبِالْاِجَابَةِ جَدِيْرٌ- اٰمِيْن-

অর্থাৎ, 'যারা জালেম তাদের মূলোচ্ছেদ করা হবে এবং খোদারই যাবতীয় প্রশংসা। তুমি সর্বশক্তিমান এবং তুমি দোয়া কবুল করে থাক'।[১]

মৌলবী গোলাম দস্তগীর কসৌরী তার কিতাব হযরত আকদাস সম্বন্ধে আরো লিখেছিলেন :

تَبًّا لَّهٗ وَلِاَتْبَاعِهٖ

অর্থাৎ "সে ও তার শিষ্যরা ধ্বংস হোক।" খোদার কি কুদরত! তার কি মহিমা! মৌলবী গোলাম দস্তগীর কসৌরী মিমাংসার যে উপায় নির্ধারণ করেছিলেন, এই দোয়ার পর সেই অভিলাস অনুসারে কয়েক দিনের মধ্যে নিজেই প্লেগের খাদ্য হন। এখন মৌলবী গোলাম দস্তগীর কসৌরীর কোন উল্লেখযোগ্য সন্তান বা স্মৃতি নেই। হে অন্তর্দর্শিগণ, সতর্ক হোন।

فَاعْتَبِرُوْا يَآ اُولِي الْاَبْصَارِ-

মৌলবী গোলাম দস্তগীর সাহেবের সখ জন্মিয়াছিল ইমাম মুহাম্মদ তাহের যেরূপ একজন ভণ্ড মসীহের জন্য দোয়া করেছিলেন এবং খোদা তাআলা তাকে ধ্বংস করেছিলেন, সেভাবে তাঁর বদদোয়াতেও খোদা তাআলা তাঁর সমসাময়িক মাহদী দাবিকারীকে ধ্বংস করবেন। কিন্তু ফলে কি হলো ? কু–প্রার্থনা করার পর কয়েক দিনের মধ্যে নিজেই ধ্বংস হলেন !

বিরুদ্ধবাদী উলামাদেরকে নিদর্শন প্রদর্শনের জন্য প্রতিযোগিতার আহ্বান :

হযরত আকদাস যখন দেখলেন যে, বিরুদ্ধবাদী উলামারা 'এলহামাত' সম্বন্ধে ও তার সাথে মুবাহালা করতে প্রস্তুত নন, তখন 'ইৎমামে হুজ্জৎ' করার জন্য তাদেরকে নিদর্শন প্রদর্শনের ব্যাপারে প্রতিযোগিতার আহ্বান করেন। তিনি বললেন যে, আল্লাহ তাআলার ছয় প্রকার নিদর্শন তার সঙ্গে আছে। হুযুরের ভাষায়ই নিম্নে সার সঙ্কলন করা হল :

"প্রথম, যদি কোন মৌলবী আরবি 'বলাগত' ও 'ফসাহতে' আমার কিতাব

(১) ফতেহ রাব্বানী' ২৬-২৭ পৃঃ।

('আঞ্জামে আথাম') এর মোকাবেলা করতে চান, তবে লাঞ্ছিত হবেন।

"দ্বিতীয়, যদি এই নিদর্শন গৃহীত না হয়, তবে আমার প্রতিকূলে কুরআন করীমের কোন সুরার তফসীর সামনে বসে লিখতে পারেন।

"তৃতীয়, যদি এই নিদর্শনও গৃহীত না হয়, তবে এক বছর পর্যন্ত বিরুদ্ধবাদীদের মধ্যে প্রসিদ্ধ মৌলবী আমার কাছে এসে বাস করুন। যদি এই সময়ের মধ্যে মানুষের শক্তির বহির্ভূত কোন নিদর্শন আমার দ্বারা প্রকাশিত না হয়, তবে আমি মিথ্যাবাদী।

"চতুর্থ, যদি এটিও গৃহীত না হয়, তবে একটি প্রস্তাব এই যে, কোন কোন খ্যাতনামা বিরুদ্ধবাদী ইশতেহার দিন যে, অমুক তারিখের পর এক বছরের মধ্যে কোন নিদর্শন প্রকাশিত হলে, তারা তওবা করবেন এবং সত্যতার সমর্থন করবেন।

"পঞ্চম, যদি এটিও গৃহীত না হয়, তবে শেখ মুহাম্মদ হুসায়েন বাটালবী এবং অন্যান্য বিখ্যাত বিরুদ্ধবাদী আমার সাথে মুবাহালা করুন। যদি মুবাহালার পর আমার বদদোয়ার ক্রিয়া হতে একজনও রক্ষা লাভ করেন, তবে আমি স্বীকার করব যে, আমি মিথ্যাবাদী ও ভণ্ড।

"ষষ্ঠ, যদি এই সকল বিষয়ের একটিও গ্রহণ না করেন, তবে আমার সাথে এবং আমার জামা'তের সাথে সাত বছর পর্যন্ত এই প্রকারে সন্ধি সূত্রে আবদ্ধ হোন যে 'তকফীর তকযীব' কাফের ও মিথ্যাবাদী প্রতিপন্নের চেষ্টা এবং কুবাচ্য প্রয়োগ হতে মুখবন্ধ রাখবেন এবং সকলের সঙ্গেই প্রেম ও শিষ্টাচারের সাথে মেলামেশা করবেন। অত:পর, যদি এই সাত বছরে আমার তরফ হতে খোদা তাআলার সাহায্যে ইসলামের খেদমতের ব্যাপারে দেদীপ্যমান ক্রিয়া প্রকাশিত না হয় এবং মসীহের হাতে যেন অসত্য ধর্ম গুলোর মৃত্যু না ঘটে, অর্থাৎ খোদা তাআলা আমার হাতে ওই সকল নিদর্শন প্রদর্শন না করেন যাদ্বারা ইসলামের বাক্য সর্বোপরি প্রাধান্য লাভ করে, যার ফলে চারদিক হতে ইসলামে লোক প্রবেশ শুরু করে এবং খ্রিষ্টান ধর্মের অসত্য উপাস্য লয় পায় এবং পৃথিবী অন্য প্রকার রূপ ধারণ করে, তবে আমি খোদা তাআলার কসম খেয়ে বলছি যে আমি আমাকে মিথ্যাবাদী মনে করব। এই সাত বছর কোন বেশি সময় নয়। এই প্রকার মহাপরিবর্তন এত অল্প সময়ের মধ্যে সাধন করা মানুষের কর্তৃত্বাধীন নয়। সুতরাং, আমি সাচ্চা দিলে এবং খোদা তাআলার কসম সহ এটি স্বীকার করছি এবং আপনাদের সকলকে আল্লাহর নামে সোলাহর দিকে আহ্বান করছি। আপনারা এখন খোদা তাআলাকে ভয় করুন। যদি আমি আল্লাহ

তাআলার তরফ হতে না হয়ে থাকি, তবে আমি ধ্বংস হব। নতুবা, খোদা তাআলার মামুরকে কেউ ধ্বংস করতে পারে না।”[১]

হযরত আকদাস গয়ের আহমদী মুসলমানদেরকে এই আহ্বান করার মূলে ছিল ইসলাম প্রচারের যে কাজ হুযুর করছিলেন, মৌলবী সাহেবান তাতে প্রতিবন্ধক হচ্ছিলেন। তারা চিৎকার করছিলেন যে, এরা মুসলমান নয়। ইত্যাদি, ইত্যাদি। যদি অন্যদের মোকাবেলায় সমগ্র মুসলমান সম্মিলিতভাবে ব্যূহ রচনা করতেন, তবে নিশ্চিতই কয়েক বছরের মধ্যেই ভারতবর্ষের চিত্র আমূল পরিবর্তিত হত। কিন্তু দুঃখের বিষয়, মুসলমানদের পারস্পরিক কুফরের ফতোয়াবাজি ইসলাম ধর্মের সাংঘাতিক ক্ষতি করল। হযরত আকদাস চার পাঁচ বছর পর ১৯০১ সালে পুনরায় এই প্রস্তাব উপস্থিত করেন এবং সন্ধির মুদ্দতও হ্রাস করে মাত্র তিন বছর করেন। কিন্তু দুঃখের বিষয়, মৌলবী সাহেবান এই প্রস্তাবও আগ্রাহ্য করলেন।[২]

(১) ‘যমিমা আঞ্জামে আথম’, ২০-৩৫ পৃ।
(২) ইশতেহার صلح خیر তাং ৫ মার্চ, ১৯০১ সাল; ‘তবলীগে রেসালত’, দশম খণ্ড, ৬ পৃ :।

পণ্ডিত লেখরামের মৃত্যু সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী :

পণ্ডিত লেখরাম অতিশয় তীক্ষ্ণ কটুভাষী ও খ্রিষ্ট প্রকৃতির আর্যসমাজী নেতা ছিলেন। হযরত মসীহ মাওউদ আলাইহেস সালাতু ওয়াস সালাম যখন ১৮৮৫ সালে অমুসলমানদেরকে নিদর্শন প্রদর্শনার্থে আহবান করেন, তখন তিনিও মোকাবেলার জন্য কাদিয়ান আগমন করেন এবং বিরুদ্ধবাদিদের সাথে কিছুদিন বাস করে ফিরেযান। তিনি বার বার হযরত আকদাসের কাছে নিদর্শন চাইতে থাকেন এবং বলতে থাকেন, “আমার সম্বন্ধে যা ইচ্ছা ভবিষ্যদ্বাণী করুন, আমি তাতে সম্মত আছি।”[৩] হযরত আকদাস তাঁর জন্য দোয়া করলেন। তখন ইলহাম হল :

عِجْلٌ جَسَدٌ لَّهٗ خُوَارٌ لَهٗ نَصَبٌ وَّعَذَابٌ

[“ইজলুন জাসাদুল লাহু খুওয়ারুন লাহু নাসাবুও ও আযাবুন”]

(১) ইশতেহার ১৮৯৩ সালের ২০ ফেব্রুয়ারি।
(২) ওই, ‘তবলীগে রিসালত’, তৃতীয় খণ্ড।
(৩) ২০ ফেব্রুয়ারি ১৮৯৩ সালের ইশতেহার।

পন্ডিত লেখরামের মৃত্যু শয্যা

অর্থাৎ, "সে একটি প্রাণহীন গো বৎস এর ভিতর হতে এক প্রকার ঘৃণিত শব্দ বার হচ্ছে। অমর্যাদা সূচক ব্যবহার এবং কুবাচ্যের প্রতিফল স্বরূপ সাজা, দু:খ ও আযাব নির্ধারিত হয়েছে। তা সে অবশ্যই ভোগ করবে।" ১

এই ইলহামের পর ১৮৯৩ সালের ২০ ফেব্রুয়ারি হযরত আকদাস এই আযাবের সময় কখন জানার জন্য ধ্যান মগ্ন হলে তখন আল্লাহ তাআলা তাঁর কাছে প্রকাশ করেন :

"আজকের তারিখ, ২০ ফেব্রুয়ারি, ১৮৯৩ সাল হতে ছয় বছর সময়ের মধ্যে এই ব্যক্তি তার কুভাষা প্রয়োগের সাজা রূপে, অর্থাৎ যে সকল বে-আদবী এই ব্যক্তি রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ও সাল্লামের সম্বন্ধে করেছে, ওই সকলের সাজা রূপে ভীষণ আযাব গ্রস্ত হবে।"২

এ সম্বন্ধে হযরত আকদাস আরো একটি ইলহাম প্রাপ্ত হলেন :

يُقْضٰى أَمْرُهٗ فِيْ سِتٍّ

['ইয়ূকযা আমরুহু ফি সেত্তিন']

অর্থাৎ পণ্ডিত লেখরামের বিষয়ের পরিসমাপ্তি ছয়ের মধ্যে করা হবে।"৩

হযরত আকদাস ১৮৯৩ সালের ২০ ফেব্রুয়ারীর ইশতেহারের প্রথমে পণ্ডিত লেখরাম সম্বন্ধে নিম্নলিখিত ফারসি কাব্য পদাবলীও লিখেছিলেন :

الا اے دشمنِ نادان و بے راہ — بترس از تیغِ بُرّانِ محمدؐ
رہِ مولیٰ کہ گم کردند مردم — بجو در آل و اعوانِ محمدؐ
الا اے منکر از شانِ محمدؐ — ہم از نورِ نمایانِ محمدؐ
کرامت گرچہ بے نام ونشان است
بیا بنگر ز غلمانِ محمدؐ

অর্থাৎ, "সাবধান, ইসলামের ওহে অজ্ঞ ও বিপথগামী শত্রু! তুমি মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের তীক্ষ্ণ তরবারিকে ভয় কর। আল্লাহ তাআলা পর্যন্ত পৌছার যে পথ মানুষ হারিয়েছে, এসে! ইহা মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে

(১) ওই, 'তবলীগে রিসালত', তৃতীয় খণ্ড।
(২) ইশতেহার ২০ ফেব্রুয়ারি, ১৮৯৩ সাল 'তবলীগে রিসালত', তৃতীয় খণ্ড।
(৩) 'ইস্তেফ্তাহ' (উর্দূ) পাদটীকা ১৭ পৃঃ।

ওয়া সাল্লামের আধ্যাত্মিক সন্তান এবং তার আনীত ধর্মের সমর্থকদের কাছে অনুসন্ধান কর। অবহিত হও, ওহে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের মর্যাদা এবং তাঁর উজ্জ্বল জ্যোতি অস্বীকারকারী! যদিও কেরামতের নাম ও চিহ্ন নেই, এসে, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের আধ্যাত্মিক সন্তান ও সেবকদের কাছে দর্শন কর।”

তার পর, ১৮৯৩ সালের ২ এপ্রিল, হযরত আকদাস এক ইশতেহার দ্বারা ঘোষনা করেন :

“আজ, ২ এপ্রিল, ১৮৯৩ সাল মুতাবেক ১৪ মাহে রমজান, ১৩১০ হিজরী ভোরে কিছুটা তন্দ্রাবস্থায় আমি দর্শন করলাম যে, আমি একটি বিরাট আয়তন বাড়িতে উপবিষ্ট আছি্ কয়েকজন বন্ধুও আমার কাছে আছেন। ইতিমধ্যে একজন বিপুলায়তন, বলিষ্ট, ভয়ানক আকৃতি বিশিষ্ট ব্যক্তি যেন তার চেহারা হতে রক্ত ঝরঝর করে নিপতিত হচ্ছে আমার সম্মূখে এসে দাড়াল। আমি যখন চোখ তুলিয়া দেখলাম, তখন আমি জানতে পারলাম যে, সে একজন অভিনব দেহ ও চরিত্র বিশিষ্ট ব্যাক্তি। অন্য কথায়, মানুষ নয়। নির্মম, কঠোর প্রকৃতি ফেরেশতাদের অন্যতম। সকলের মনেই তার হযরত অধিকার করল। আমি তার প্রতি তাকান অবস্থায়ই ছিলাম, সে আমাকে জিজ্ঞাসা করল, ‘লেখরাম কোথায়? আরো এক ব্যক্তির নাম নিয়ে বলল যে, অমূক কোথায়? তখন আমি বুঝিতে পরিলাম যে, এই ব্যক্তি লেখরাম এবং অপর ব্যক্তিকে দণ্ড দেয়ার জন্য নিযুক্ত হয়েছে। কিন্তু অপর ব্যক্তি কে ছিল, আমার স্মরণ থাকল না।[১] তারপর, তিনি ১৮৯৩ সনেই স্যার সৈয়দ আহমদ খাঁন মরহুম সাহেবকে তার কিতাব ‘বরকাতুদ দোয়া’ তে সম্বোধন পূর্বক লিখেছিলেন :

ایکہ گوئی گر دعا ہا را اثر بودے کجاست — سوئے من بشتاب بنمائم ترا چوں آفتاب
ہاں مکن انکار زیں اسرارِ قدرتہائے حق — قصہ کوتاہ کن ببیں از ما دعائے مستجاب

অর্থাৎ, “ওহে, এই যে তুমি বলছো, দোয়ার কোন ক্রিয়া থাকলে তা কোথায়? আমার কাছে এসো। আমি তোমাকে দিবালোকের ন্যয় দোয়ার ক্রিয়া প্রত্যক্ষ করাবো। তুমি খোদা তাআলার সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম কুদরত সমূহকে অস্বীকার করো না। যদি দোয়ার ক্রিয়া দেখার আগ্রহ থাকে, তবে এস এবং আমার দোয়ার ফল দেখ। এ’ব্যক্তি সম্বন্ধে খোদা আমাকে বলেছেন যে, কবুল হয়েছে। অর্থাৎ, “লেখরাম সম্বন্ধে আমার দোয়া।”

---

(১) ‘আয়নায়ে কামালাতে ইসলাম।’

তারপর, ১৮৯৩ সালে প্রনীত তার কিতাব 'কেরামাতুস সাদেকীনে' তিনি লিখেছেন :

وَبَشَّرَنِیْ رَبِّیْ وَقَالَ مُبَشِّرًا
سَتَعْرِفُ يَوْمَ الْعِيْدِ وَالْعِيْدُ اَقْرَبُ

অর্থাৎ, "আমাকে লেখরামের মৃত্যু সম্বন্ধে খোদা তাআলা সুসংবাদ দিয়েছেন এবং বলেছেন যে, শীঘ্রই তুমি সেই ঈদের দিনের পরিচয় লাভ করবে এবং প্রকৃত ঈদের দিনও সেই ঈদের নিকটবর্তী হবে।"

পণ্ডিত লেখরাম সাহেব বার বার নিদর্শন দেখতে চাওয়ায় হযরত আকদাস তাকে যে নিদর্শন দেখাতে চাইলেন, তৎ-সংক্রান্ত ভবিষ্যদ্বাণীর আমরা বিস্তারিত আলোচনা করেছি। এখন চিত্রের অন্য দিকও দেখুন।

পণ্ডিত লেখরাম সাহেব যেহেতু হযরত আকদাসের ভবিষ্যদ্বাণী গুলোর প্রতি লক্ষ্য করা একেবারেই অযোগ্য মনে করতেন, সেই জন্য যতই হযরত আকদাসের পক্ষ হতে সম্পূর্ণ স্পষ্ট ভবিষ্যদ্বাণী করা হল, ততই ধৃষ্টতার ও দুষ্টতার আরও বেশি পণ্ডিতজী অগ্রসর হতে লাগলেন। তিনি একটি ভ্রান্ত ধারণার বশবর্তী হয়েছিলেন। তিনি কয়েক বছর আগে হযরত আকদাস সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী করতে গিয়ে দাবি করেছিলেন :

"এই ব্যক্তি (অর্থাৎ হযরত মির্যা সাহেব) তিন বছরের মধ্যে বিষুচিকা রোগে প্রাণত্যাগ করবে। কারণ, তিনি (নাউযূবিল্লাহ) ঘোর মিথ্যাবাদী, কাযযাব।"

আরো লিখেছিলেন :

"তিন বছরের মধ্যে এর পরিসমাপ্তি ঘটবে এবং তার সন্তানদের মধ্যেও কেউ অবশিষ্ট থাকবে না।"[১]

তিনি ভেবেছিলেন যে, হযরত আকদাসের ভবিষ্যদ্বাণীও (নাউযূবিল্লাহ) এই প্রকারেই মিথ্যায় পরিণত হবে।

কিন্তু মহামহিমান্বিত মহা গৌরবময় 'যুল-জালাল' খোদার শেষ মিমাংসা দেখুন। হযরত আকদাসের ভবিষ্যদ্বাণীর পঞ্চম বর্ষে যেমন একটি এলহামে বলা হয়েছিল, يُقْضٰى اَمْرُهٗ فِیْ سِتٍّ ["ইয়ূকযা আমরুহু ফি-সেত্তিন"] অর্থাৎ, "পণ্ডিত লেখরাম সাহেবের ব্যাপার ছয় বছরের মধ্যে শেষ করা হবে।" তদ্রূপই ঈদুল আযহার পর দিন ১৮৯৮ সালের ৬ মার্চ সন্ধ্যা ৬টার সময় ভবিষ্যদ্বাণী অনুসারে

(১) 'পণ্ডিত লেখরাম প্রণীত, 'তকযীরে বারাহীনে আহমদীয়া,; ৩১১ পৃ :।

পন্ডিত লেখরাম নিহত হলেন[১] এবং এই প্রকারে নিশ্চিতভাবে প্রমাণিত হল যে, হযরত মসীহ মাওউদ আলাইহেস সালামের ভবিষ্যদ্বাণী তার নিজের দিক হতে ছিল না, বরং 'আল্লামুল-গুয়ূব' অন্তর্যামী খোদার তরফ হতে ছিল।

হত্যার পরবর্তী ঘটনা :

পণ্ডিত লেখরাম সাহেব আর্য সমাজের একজন প্রসিদ্ধ নেতা ছিলেন। হযরত আকদাসের ভবিষ্যদ্বাণী সম্বন্ধে গৃহে গৃহে ব্যাপক আলোচনা হচ্ছিলো। অতএব, যখন পণ্ডিত সাহেবের হত্যাকাণ্ড ঘটল, তখন দেশময় চিৎকার শুরু হল। হিন্দু পত্রিকাগুলো এই হত্যাকে খোলাখুলিভাবে হযরত আকদাসের ষড়যন্ত্র বলে নির্দেশ করল। হযরত আকদাসকে হত্যা করার হুমকি দিয়া বহু বেনামী চিঠি লেখক হল। গুপ্ত সংগঠনগুলোতে হত্যাকারীর পরিচয়দাতার জন্য এবং হযরত আকদাসকে হত্যা করার জন্য বড় বড় পুরস্কার ধার্য হল। কিন্তু হত্যা সন্ধান পাওয়ার কথা ছিল না, পায়নি। তারপর, হযরত সাহেবের হেফাজতের বিষয়। এর ভার খোদা তাআলা নিজ হাতে গ্রহণ করেছেন। আল্লাহ তাআলা তাঁকে ইলহাম দ্বারা জ্ঞাত করিয়াছিলেন :

وَاللّٰهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ

["ও আল্লাহু ইয়াসেমুকা মিনান নাস"।]

অর্থাৎ "আল্লাহ তাআলা তোমাকে মানুষের আক্রমণ হতে রক্ষা করবেন"।[২]

হযরত আকদাসের গৃহ তল্লাসি :

যখন হিন্দুদের কোন চেষ্টা চরিত্রই কার্যকরী হল না, তখন তারা গভর্ণমেন্টের ওপর চাপ দিতে লাগলেন যে হযরত আকদাসের বিরুদ্ধে হত্যার ষড়যন্ত্রের মোকদ্দমা চালান হোক! ফলে, খ্যাতনামা ও বিশেষ অভিজ্ঞ সরকারি গোয়েন্দারা নিযুক্ত হলেন। তারা নানা দিক দিয়া তদন্ত শুরু করলেন। লাহোরে এবং অমৃতসরের সম্ভ্রান্ত মুসলমানদের বাড়িতেও খানা তল্লাশি হলো। ১৮৯৭ সালে ৮ এপ্রিল, মিঃ লিমারচণ্ড (এস-পি, গুরুদাসপুর) এবং বাটালার ডেপুটি পুলিশ ইন্সপেক্টর মিয়াঁ মুহাম্মদ বখশ সাহেব অল্পসংখ্যক এক দল পুলিসসহ এসে হযরত আকদসের গৃহেরও তাল্লাশি করলেন। কিন্তু ফলে ইহাই নির্ণীত হলো যে, তিনি বা তাঁরা জামা'তের সাথে এই ঘটনার কোনই সম্পর্ক নাই।

(১) হত্যাকাণ্ডের বৃত্তান্ত শেষ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

(২) 'আঞ্জামে আথম' ৫১-৬২ পৃষ্ঠায় প্রকাশিত ১৮৯৬ সালে প্রাপ্ত এলহামাতের অন্তর্গত।

হত্যার ষড়যন্ত্রে হযরত আকদাস লিপ্ত থাকার সন্দেহপোষণকারীকে সদুপদেশ :

আর্য প্রেস এবং আর্য নেতারা তাঁকেই এই হত্যাকাণ্ডের জন্য দায়ী মনে করতেন বলে তিনি "লেখরামের মৃত্যু সম্বন্ধে আর্যদের ধারণা" শিরোনামে এই ইশতেহার প্রকাশ করলেন। তাতে লিখিত হল :

"যদি এখনো কোন সন্দেহকারীর সন্দেহ দূর না হয় এবং আমাকে এই হত্যাকাণ্ডে ষড়যন্ত্রে জড়িত বলিয়া মনে করেন, যেমন হিন্দু পত্রিকাসমূহ মত প্রকাশ করেছে, তা হলে আমি একটি সদুপদেশ দিচ্ছি, যা দ্বারা এই ঘটনার মিমাংসা হয়ে যাবে এবং তাহল অভিযোগকারী ব্যক্তি আমার সম্মুখে হলফ করবে। হলফের ভাষা এভাবে হবে : 'আমি নিশ্চিতভাবে জানি যে এই ব্যক্তি (অর্থাৎ, হযরত আকদাস আলাইহেস সালাম) হত্যার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিল, বা তাঁরাই আদেশে হত্যাকাণ্ড ঘটেছে। যদি তা সত্য নয়, তবে হে সর্বশক্তিমান খোদা! এক বছরের মধ্যে আমার ওপর ভয়াবহ 'আযাব' অবতীর্ণ কর, কিন্তু কোন মানুষের হাতে নয় এবং মানুষের ষড়যন্ত্রের যেন এতে কোন প্রকার অধিকার থাকা ধারণা করা না যায়।' অত:পর, যদি এই ব্যক্তি (অর্থাৎ শপথকারী) এক বছর পর্যন্ত আমার বদদোয়া হতে রক্ষা পায়, তবে আমি অপরাধী এবং হত্যাকারীর প্রাপ্য দণ্ডের যোগ্য। এখন যদি কোন সাহসী আর্য বীর পুরুষ থাকে যে এই প্রকারে সারা বিশ্বকে সংশয়মুক্ত করে তবে এই পন্থা অবলম্বন করুক।"[১]

গঙ্গাবিষ্ণুর দু:সাহস ও পৃষ্ঠ প্রদর্শন :

হযরত আকদাসের এই হলফের আহ্বানের মোকাবেলায় কেউ এই প্রকার শপথ করার দু:সাহস করেনি। আর্য সমাজের মধ্য হতে মাত্র জনৈক গঙ্গাবিষ্ণু তাঁর কাছে লিখলেন, "আমি শপথ করতে প্রস্তুত।" কিন্তু এর জন্য তিনি তিনটি শর্তও উপস্থিত করলেন। প্রথম, যদি ভবিষ্যদ্বাণী সফল না হয়, তবে (নাউযূবিল্লাহ মিন যালেকা) হযরত আকদসকে ফাসির দণ্ড পেতে হবে। দ্বিতীয়, গঙ্গাবিষ্ণুর জন্য দশ হাজার টাকা গভর্ণমেন্টের কাছে জমা করতে হবে, বা কোন বিশ্বস্ত ব্যাঙ্কে জমা করতে হবে, যাতে গঙ্গাবিষ্ণু নিশ্চিত থাকতে পারেন এবং বদদোয়ায় তার মৃত্যু না ঘটলে তিনি টাকা লাভ করতে পারেন। তৃতীয়, যখন তিনি কাদিয়ান

(১) ইশতেহার, ১৫ মার্চ, ১৯৯৭ সাল, তবলীগ রিসালাত ৫২ পৃঃ।

আসবেন, তখন এ ব্যাপারে দায়িত্ব গ্রহণ করতে হবে যে, তিনি লেখরামের ন্যায় নিহত হবেন না।[১]

গঙ্গাবিষ্ণু মহাশয়ের এই তিন শর্তকেই হযরত আকদাস মঞ্জুর করলেন এবং লিখলেন যে, গঙ্গাবিষ্ণু নিম্নলিখিত কথায় শপথ করুন :

"আমি অমুকের পুত্র অমুক, জাতি অমুক, সাকিন অমুক, জেলা অমুক আল্লাহ জাল্লা শানুহুর, বা পরমেশ্বরের শপথ পূর্বক বলছি যে, মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী বাস্তবিকই পণ্ডিত লেখরামের হত্যাকারী। আমার দৃঢ় প্রত্যয় যে, এই ভবিষ্যদ্বাণী খোদা তাআলার তরফ হতে ছিল না। আ মানুষের একটি ষড়যন্ত্র মাত্র, যা ভবিষ্যদ্বাণীর ছলনায় কার্যকরী করা হয়। যদি আমার এই বর্ণনা অসত্য হয় তবে হে সর্বশক্তিমান খোদা! এই ব্যক্তির সত্যতা নির্দেশনার্থে তোমার এই নিদর্শন প্রদর্শন কর যে, এক বছরের মধ্যে আমাকে এভাবে মৃত্যু দাও যা মানুষের পরিকল্পিত নয়। যদি আমি এক বছরের মধ্যে প্রাণত্যাগ করি, সমস্ত জগদ্বাসী স্মরণ রাখবে যে, আমার মৃত্যু এ কথার সাক্ষ্য হবে যে, বাস্তবিকই ইহা খোদার প্রকৃত ইলহাম ছিল, মানুষের পরিকল্পনা ছিল না এবং বাস্তবিকই কেবলমাত্র ইসলামই সত্য ধর্ম এবং অন্যান্য ধর্ম, যথা আর্য ধর্ম, সনাতন ধর্ম, খ্রিষ্টান ধর্ম প্রভৃতি সকলই বিকৃত মতবাদ।

"বস্তুত: শপথের এই মজমুনটি কোন বিশ্বস্ত ও প্রসিদ্ধ সংবাদপত্রে প্রকাশ করতে হবে এবং এই শপথই কাদিয়ানে এসে প্রকাশ্য জনসভায় করতে হবে। এখন যদি আমি এই ওয়াদা হতে ফিরে যাই, তবে আমার ওপর খোদার 'লানত'। নচেৎ, আপনার ওপর।

"আপনার আবেদন মাফিক আমার কর্তব্য হবে আমি দশ হাজার টাকা জমা করে দেই এবং আমার আবেদন অনুসারে আপনার কর্তব্য হবে আপনি কোন কাট ছাট না করে এই প্রকার অঙ্গীকারই হলফ করে কোন নির্ভরযোগ্য প্রসিদ্ধ সংবাদপত্রে, যথা 'আখবারে আম' এ প্রকাশ করবেন। আমি যেমন স্বীকার করছি, আপনার এই মুদ্রিত স্বীকৃতি পৌঁছার দুই মাসের মধ্যে দশ হাজার টাকা জমা করে দিব। যদি না করি, তবে মিথ্যাবাদী বলিয়া গণ্য হব।"[২]

হযরত আকদাস যখন লালা গঙ্গাবিষ্ণু সাহেবের তিনটি শর্তই মঞ্জুর করলেন এবং হলফের বাক্যগুলোও লিখে দিলেন, তখন লালা গঙ্গাবিষ্ণু সাহেব লাহোরের

---

(১) ইশতেহার, ৫ মার্চ, ১৯৯৭ সাল, তবলীগ রিসালাত ষষ্ঠ খন্ড, ৭৫-৭৯ পৃ:।
(২) ইশতেহার, ১৬ এপ্রিল, ১৯৯৭ সাল, তবলীগ রিসালাত ৮৭-৮৮ পৃ:।

"হামদর্দে হীন্দ" পত্রিকায় ১২ এপ্রিল আর একটি শর্ত বৃদ্ধি করলেন। (হযরত আকদাস) "মীর্যা সাহেব ('নাউযুবিল্লাহে মিন যালেকা') মিথ্যাবাদী ফাসিতে সাব্যস্ত হয়ে মারা গেলে তাঁর লাশ আমাকে (অর্থাৎ, লালা গঙ্গাবিষ্ণুকে) দিতে হবে। অতঃপর, এই লাশকে আমি যা ইচ্ছা, করব, দগ্ধ করিব, নদীতে নিক্ষেপ করবো, বা অন্য যা করতে হয়

এই শর্তের প্রত্যুত্তরে হযরত আকদাস লিখিলেন :

"এই শর্তও আমি মঞ্জুর করছি। আমার মতেও মিথ্যাবাদীর লাশ সর্বপ্রকার লাঞ্ছনার যোগ্য। এই শর্ত বাস্তবিকই অত্যাবশ্যকীয় ছিল। এটি গঙ্গাবিষ্ণু সাহেব যথাসময়ে স্মরণ করেছেন। কিন্তু প্রতিপক্ষ রূপে এই শর্তই বহাল রাখার আমারও অধিকার আছে। এবং তা এই যে, গঙ্গাবিষ্ণু সাহেব এই ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী প্রাণত্যাগ করলে তার লাশ আমি পাইব, যাতে বিজয় চিহ্নস্বরূপ সেই লাশ আমার অধিকারে থাকবে। আমি এই লাশ নষ্ট করব না। উপযোগী মশলা দ্বারা সংরক্ষণপূর্বক সর্বজনের গোচরীভুত হয়, এমন স্থানে বা লাহোর মিউজিয়ামে 'বিজয় স্বারক' হিসেবে রাখার ব্যবস্থা করিব। কিন্তু লাশ পাওয়ার জন্য এখন হতে কোন উত্তম ব্যবস্থা হওয়া অত্যাবশ্যক। এতদুদ্দেশ্যে তা অপেক্ষা উৎকৃষ্টতব ব্যবস্থা মনে পড়ে না যে, পণ্ডিত লেখরামের স্মৃতি রক্ষার্থে যে পঞ্চাশ বা ষাট হাজার টাকা সংগৃহীত হয়েছে, তাহতে দশ হাজার টাকা লাশের জমানতস্বরূপ গৃহীত হয়েছে, তাহতে দশ হাজার টাকা লাশের জামানত স্বরূপ গৃহীত হয়ে সরকারি ব্যাঙ্কে জমা থাকে এবং কোষাগারের কাগজা তাতে ইহা লিখে দেয়া হয় যে এক বছরের মধ্যে গঙ্গাবিষ্ণুর মৃত্যু হলে এবং তার লাশ আমার হাওয়ালা করা না হলে তা পরিবর্তে লাশের মূল্য বাবদ বা লাশ হাওয়ালা না করার ক্ষতিপূরণ স্বরূপ উক্ত জমাকৃত ১০,০০০ টাকা আমার হাওয়ালা করতে হবে। এই স্বীকৃতির একটি নকল কোষাধ্যক্ষের দস্তখত সহ আমারও পাইতে হবে।'[১]

হযরত আকদাসের এই শর্তেই প্রত্যুত্তরে লালা গঙ্গবিষ্ণু সাহেব লিখিলেন :

"আমি আর্য সমাজের সদস্য নই যে, তারা আমার জন্য সহানুভূতিপূর্বক দশ হাজার টাকা জমা করিয়া দেবেন।"[২]

হযরত আকদাস জবাব দিলেন :

"স্মরণ রাখতে হবে, গঙ্গাবিষ্ণু সাহেবের পক্ষে দশ হাজার টাকা সংগ্রহ করা

(১) ইশতেহার, ১৬ এপ্রিল, ১৯৯৭ সাল, তবলীগ রিসালাত ষষ্ঠ খন্ড ৯১-৯২ পৃঃ।
(২) ইশতেহার, ২৭ এপ্রিল, ১৯৯৭ সাল, তবলীগ রিসালাত ষষ্ঠ খন্ড।

কিছুই কঠিন নয়। কারণ, যদি আর্য সাহেবানও সত্যই এই অভিমত পোষণ করেন যে, প্রকৃত পক্ষে এই লেখকই লেখরাম হন্তা এবং তারা আন্তরক নিশ্চিত প্রত্যয় রূপে তাই জানেন যে ইলহাম এবং ঐশী বাক্যালাপ সমস্তই মিথ্যা কথা বস্তুত: এই লেখকের ষড়যন্ত্রেই হত্যাক্রিয়া সংঘটিত হয়েছে, তবে তারা সাগ্রহে লালা গঙ্গাবিষ্ণুকে সাহায্য করেন। দশ হাজার কেন, পঞ্চাশ হাজারও জমা করতে পারেন। তারা এরও ব্যবস্থা করতে পারেন যে, আমার কাছ হতেও দশ সহস্র টাকা নেওয়া হবে, তা আর্য সমাজের কল্যাণকর কাজে ব্যয় করা হয়। সুতরাং, জামানত হিসেবে দশ হাজার টাকা জমা করতে আর্য সাহেবানের পক্ষে এখন বাধা কি? তা তো একটা বিনা পয়সার সওদা। এতে দ্বিধার কোন হেতু নেই। এতে এই লাভও আছে যে, সরকার জানতে পরিবেন যে আর্য সমাজের সম্মতিক্রমে এই ব্যাপার ঘটেছে এবং এই মহানিদর্শন দ্বারা চিরকালে বিবাদ মিটবে।

"আর যদি এই অবস্থা হয়ে থাকে যে, আর্য সমাজের সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিরা লালা গঙ্গাবিষ্ণুর এই যে অভিমত এই অধম লেখরামের হত্যাকারী এটিকে মিথ্যা বিবেচনা করেন, তবে আমার কি প্রয়োজন আছে যে, আমি এভাবে ব্যক্তির মোকাবেলার ভাবনা করব, যাকে তার স্বজাতিই মিথ্যাবাদী বলে সাব্যস্ত করেছে।

"যদি গঙ্গাবিষ্ণু আমার এই শর্ত মঞ্জুর না করেন, তবে ভবিষ্যতে তাকে কখনো উত্তর দেয়া হবে না এবং তার উদ্দেশ্যে এই আমার শেষ ইশতেহার।"[১]

মৌলবী মুহাম্মদ হুসায়েন বাটালবীকে শপথ করার আহ্বান :

পাঠক মহোদয়রা তা শুনে আশ্চর্য হবেন যে, মৌলবী মুহাম্মদ হুসায়েন বাটালবী সাহেব এই প্রসঙ্গেও হযরত আকদাসের বিরুদ্ধাচরণ করতে কুণ্ঠিত হননি। তিনি লেখনি ও বক্তৃতা দ্বারা প্রকার করতে লাগলেন যে, ভবিষ্যদ্বাণী মিথ্যা হয়েছে। এতে হযরত আকদাস লিখলেন :

"মৌলবী মুহাম্মদ হুসায়েন সাহেব যদি সাচ্চা দেলে একীন রাখেন যে, লেখরাম সংক্রান্ত এই ভবিষ্যদ্বাণী মিথ্যা হয়েছে, তবে তাকে বিরোধিতজনক লেখার কষ্ট করার কোন প্রয়োজন নেই। আমি আল্লাহ তাআলার কসম করে বলছি, যদি তিনি প্রকাশ্য জনসভায় আমার সম্মুখে হলফ করেন যে,

'এ ভবিষ্যদ্বাণী খোদা তাআলার তরফ হতে ছিল না এবং সফলও হয়নি এবং

(৩) ইশতেহার, ২৭ এপ্রিল, ১৯৯৭ সাল, তবলীগ রিসালাত ষষ্ঠ খন্ড ১০১-১০২ পৃঃ।

যদি তা খোদা তাআলার তরফ হতে ছিল এবং বাস্তবিক সফল হয়েছিল, তবে হে কাদের মুৎলক খোদা! এক বছরের মধ্যে আমার ওপর কোন ভীষণ আযাব নাযেল কর, তারপর, যদি মৌলবী সাহেব মসুফ এই ভীষণ আযাব হতে এক বছর পর্যন্ত রক্ষা পান, তবে আমি আমাকে মিথ্যাবাদী জ্ঞান করব এবং মৌলবী সাহেবের হাতে তওবা করবো। আমার কাছে এসম্বন্ধে যত কিতাব আছে, তাবৎ দগ্ধ করবো। যদি তিনি এখনো পৃষ্ঠ প্রদর্শন করেন, তাহলে আহলে ইসলাম অবহিত হোন যে তাঁর অবস্থা কি এবং তিনি কোথায় পৌছেছেন?"[১]

এই ইশতোহারের পর মৌলবী সাহেব কয়েকজন অযৌক্তিক ও অমূলক ওজর আপত্তি প্রদর্শনের পর নীরব হলেন।

এই হত্যার অর্থনৈতিক উপকারিতা :

এই হত্যার ফলে মুসলমানার অর্থনৈতিকভাবে উপকৃত হলেন। সেকালে দুগ্ধ, দধি ও মিষ্টান্নের দোকানপাট শুধু হিন্দুদেরই ছিল। এই ঘটনার ফলে হিন্দু দোকানদাররা কোন কোন মুসলমান বালক-বালিকাকে মিঠাইর সাথে বিষ প্রদান করে। এতে মুসলমানদের চক্ষু খুলল। তারা দুগ্ধ, দধি ও মিষ্টান্নের দোকান খোলা শুরু করলেন।

হযরত আকদাসের দ্বীনী গয়রত :

আমরা পণ্ডিত লেখরামের বিষয় নিয়ে আলোচনা করতে ছিলাম। এ প্রসঙ্গে পণ্ডিত লেখরাম সংক্রান্ত একটি ঘটনার উল্লেখ জরুরি মনে করি। এতে হযরত আকদাসের 'দ্বিনী গয়রত' প্রকাশ পায়। হযরত শেখ ইয়াকুব আলী সাহেব ইরফানী রাযি আল্লাহু আনহু লিখিয়াছেন :

"একবার হযরত মসীহ মাওউদ আলাইহেস সালাম ফিরোজপুর হতে কাদিয়ান আসছিলেন। আমি রায়বুণ্ড পর্যন্ত সঙ্গে ছিলাম। সেখানে তিনি দয়াপরবশ হয়ে আমাকে বললেন : 'আপনি তো চাকরি করেন না। লাহোর পর্যন্ত চলুন'। আসরের নামাযের সময় ছিল। তিনি নামায পড়ার জন্য প্রস্তুত হচ্ছিলেন। তখন সেখানে একটি মঞ্চ (চবুতরা) ছিল। এখন সেখানে প্ল্যাটফরম নির্মিত হয়েছে। আমি প্ল্যাটফরমের দিকে গেলাম। তখন পণ্ডিত লেখরাম, 'আর্যা মুসাফের' সম্পাদকের যৌবনকাল। তিনি পণ্ডিত দয়ানন্দ সাহেবের জীবনী লেখতে ছিলেন।

(১) 'ইশতেহার', ১১ এপ্রিল, তবলীগে ষষ্ঠ খন্ড, ৮০ পৃঃ হাসিয়া।

তিনি জলন্ধর যাওয়ার ছিলেন। কারণ তিনি সম্ভবতঃ সেখানেই কাজ করতেন। কোথা হতে এসেছি, তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করেন। আমি হযরত আকদাসের আগমন সম্বন্ধে বললাম। তখন খোদা জানেন, তাঁর মনে কি ভাবোদয় হল। দৌড়িয়ে সেখানে উপস্থিত হয়ে, যেখানে হযরত আকদাস 'অজু' করছিলেন (আমি এখনো ওই দৃশ্য যেন দেখছি ইরফানী) তিনি জোর হাতে আর্যদের প্রথানুযায়ী হযরত আকদাসকে সালাম করেন। হযরত আকদাস এমনি মাথা তুলিয়া কিঞ্চিৎ দৃষ্টিপাত করেন। তারপর অজু করতে লাগলেন। পণ্ডিত লেখরাম মনে করলেন যে, বোধ হয় শোনেন নাই। তিনি আবার 'সালাম' বললেন। হযরত আকদাস আগের মতোই 'অজু' করতে নিমগ্ন রহিলেন। কতক্ষণ অপেক্ষা করে পণ্ডিত লেখরাম চলিয়া গেলেন। কেউ বলেন যে, পণ্ডিত লেখরাম 'সালাম' করতে ছিলেন। হুযুর বলিলেনঃ 'এ আঁ হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ও সাল্লামের বড়ই অবমাননা করেছে। এর সালাম নেয়া আমার ইমানের খেলাফ। আঁ হযরতের (সাঃ) পবিত্র জীবনের ওপর তো আক্রমণ চালায়, এদিকে আমাকে সালাম করতে আসে'!"

আল্লাহ, আল্লাহ! আঁ–হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ও সাল্লামের ব্যাপারে তাঁর কত 'গাইরত' ছিল। ভিন্ন জাতির একজন সম্মানিত নেতা আঁহযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওসাল্লামের প্রতি অমর্যাদা প্রদর্শন করত বলে তার 'সালাম' পর্যন্ত গ্রহণ করা পছন্দ করেননি।

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّاٰلِ مُحَمَّدٍ وَّخُلَفَاءِ مُحَمَّدٍ وَبَارِكْ وَسَلِّمْ۔

হযরত সাহেবজাদী মুবারাকা বেগম সাহেবার জন্ম, ১৮৯৭ সালের ২ মার্চঃ'

১৮৯৭ সালের ২ মার্চ মোতাবেক ২৭ রমজানুল মুবারক ১৩১৪ হিজরি সাল ঐশী সুসংবাদ অনুক্রমে হযরত আকদাসের এক কন্যা সাহেবজাদী মুবারাকা বেগম সাহেবা জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর জন্মের আগে হযরত আকদাস তাঁর সন্বন্ধে ইলহাম প্রাপ্ত হলেনঃ

تُنَشَّؤُا فِى الْحِلْيَةِ ط

(তুনাশ-শাউ ফিল হিলয়াতে)

অর্থাৎ "অলঙ্কারের মধ্যে প্রতিপালিত হবে।"[১] এর অর্থ ছিল তাঁর অসচ্ছলতার

(১) 'হকিকতুল অহি,' ২১৭ পৃঃ।

অবস্থা কখনও ঘটবে না এবং তিনি অল্প বয়সে প্রাণত্যাগ করবেন না। পরবর্তী ঘটনাবলী হতে জানা যায় যে, হযরত আকদাসের এই ভবিষ্যদ্বাণী অক্ষরে অক্ষরে পূর্ণ হয়েছে। তাঁর বিবাহ হযরত নবাব মুহাম্মদ আলী খাঁ সাহেবের সাথে হয়েছিল। তিনি একজন বড় জায়গীরদার ছিলেন। মালিয়কোটলা রাজ্যের শাহী পরিবারের সাথে তাঁর ঘনিষ্ট সম্পর্কিত আত্মীয়তা ছিল ও বিশেষ সম্ভ্রান্ত রয়িস ছিলেন।

কাদিয়ানে তুর্কী কনসাল হুসায়েন কামীর আগমন ১৮৯৭ খ্রিষ্টাব্দ ১০ বা ১১ মে

১৮৯৭ সালের প্রারম্ভে করাচীস্থ তুর্কী সাম্রাজ্যের কনসাল হুসায়েন বেক কামী লাহোর আগমন করেন। তিনি নেহাৎ সম্ভ্রমপূর্বক একটি পত্র লেখে হযরত আকদাসের সাক্ষাৎ লাভের আগ্রহ প্রকাশ করেন হযরত আকদাস তাঁকে সাক্ষাতের সুযোগ দানে অনিচ্ছুক ছিলেন। কারণ, আল্লাহ তাআলা ইতিপূর্বে তাঁকে জ্ঞাত করেছিলেন :

"اس شخص کی سرشت میں نفاق کی رنگ آمیزی ہے"

"এই ব্যক্তির প্রকৃতিগত কপটতার ভাব মিশ্রণ আছে।"[১] কিন্তু এর মনোকষ্ট না হয় এই ভেবে অনুমতি প্রদান কলেন। ১০ কিংবা ১১ মে ১৮৯৭ সাল কনসাল সাহেব কাদিয়ান আগমন করেন এবং নির্জন সাক্ষাৎকারের জন্য আবেদন করেন। হযরত আকদাসের মন তাঁকে এই সুযোগ দিতে চাইছিল না কারণ, দুনিয়া পরস্তির গন্ধ অনুভূত হচ্ছিল। কিন্তু শিষ্টাচার বশত: অনুমতি দান করেন। সাক্ষাৎকালে "কনসাল সাহেব তুর্কী সুলতানের জন্য বিশেষ দোয়ার আবেদন করে আগ্রহ প্রকাশ করেন যে, ভবিষ্যতে 'আসমানী কাজা কদরে' তাঁর জন্য কি আছে, জানান হয়।" হযরত আকদাস তাকে পরিষ্কার বলিলেন, "সুলতানের সাম্রাজ্যের অবস্থা ভাল নয়। আমি কাশফীভাবে তাঁর আমত্যদের অবস্থা ভাল দেখছি না। আমার মতে এই সকল অবস্থায় পরিণাম ভাল নয়।"

হযরত আকদাসের এই কথাগুলো কনসাল মহোদয়ের কাছে অপ্রিয় বোধ হল। তিনি লাহোর প্রত্যাগমন করিয়া "নাযেমে হীন্দ' সম্পাদকের নামে একটি পত্র লিখলেন। এই পত্র হযরত আকদাসের বিরুদ্ধে নানা প্রকার অমূলক কথায় পূর্ণ ছিল। সম্পাদক সাহেব পত্রটি প্রকাশ করেন। এতে হযরত আকদাস একটি

(১) 'ইশতেহার' ২৪ মে, ১৮৯৭ সাল।

ইশতেহার দ্বারা প্রকৃত অবস্থা জনসমাজের সম্মুখে উপস্থিত করেন।[১]

তুর্কী কনসালের পর্দাফাক

এই ঘটনার পর এমন অবস্থার উদ্ভব হল যে, সেই বছরই, অর্থাৎ ১৮৯৭ সালে গ্রস ও তুর্কীর মধ্যে যুদ্ধ বাধল। ভারতবর্ষের মুসলমানরা তুর্কীর সাহায্যার্থে চাঁদা সংগ্রহ করে তুর্কী কনসাল হুসায়েন কামীর হাতে সমর্পণ করেন। তিনি তা তুর্কী গভর্ণমেন্টের কাছে জমা না দিয়া আত্মসাৎ করেন। এর ফলে তাঁর যে পরিণতি ঘটেল, কনসাটান্টিনোপলের পত্রের মর্ম হতে তা প্রকাশ পায়। সলীম পাশা চাঁদা কমিটির কর্মকর্তা ছিলেন। সংবাদ পেয়ে তিনি বহু কায়ক্লেশে এই টাকা উদ্ধারের চেষ্টা করেন এবং হুসেন কামীর সম্পত্তি নিলাম করে টাকা আদায়ের ব্যবস্থা করে। তারপর সুলতানের কাছে রিপোর্ট করে তাঁকে চাকরি হতে বরখাস্ত করা হয়।[২]

‘চৌধওয়েঁ সদি’ পত্রিকার বুজুর্গের তওবা :

তুর্কী কনসাল হুসায়েন বেক কামীর কথা উপরে বলা হয়েছে। তিনি যখন নিরাশ হয়ে লাহোর প্রত্যাগমনের পর ‘নাযেমে হীন্দ’ সম্পাদকের নামে হযরত আকদাসের বিরুদ্ধে নেহায়েত অশ্লীল, নীতি ও মনুষ্যত্ব বিবর্জিত একটি পত্র লেখেন এবং সেই পত্রিকায় তা ১৮৯৭ সালে ১৫ মে প্রকাশিত হয়, তখন বিভিন্ন সংবাদপত্র তাঁকে একজন মুসলমান বৈদেশিক কনসাল মনে করে তাঁর পত্রের বহু গুরুত্ব প্রদান করেন। সেকালে রাওয়ালপিণ্ডি হতে ‘চৌধওয়েঁ সাদী’ নামে একটি পত্রিকা প্রকাশিত হত। ওই পত্রিকার একটি সংখ্যায় যখন পত্রটি প্রকাশিত হলো এবং সেখানকার একজন ‘বুজুর্গ’ পত্রটি পাঠ করলেন, তখন অজ্ঞাতসারে তার মুখ হতে এই শের বের হল :

چوں خدا خواہد کہ پردۂ کس دَرد   میلش اندر طعنۂ پاکاں برد

অর্থাৎ, ‘খোদা যখন কারো পর্দা বিদারণ করতে চান; তখন সে পবিত্রাত্মাদের বিদ্রূপ করার প্রতি আকৃষ্ট হয়।”

পত্রিকার এই সংখ্যা যখন কাদিয়ানে হযরত আকদাসের হুযুরে পাঠ করা হল, হুযুরের মনে এই ‘বুযূর্গ’ সম্বন্ধে আলোড়ন উপস্থিত হল। তিনি যতই এটি তাঁর

(১) ‘ইশতেহার’ ২৪ মে, ১৮৯৭ সাল।

(২) বিস্তারিত বিবরণ ‘তিরইয়াকুল কুলুব,’ ১২১ পৃ : এবং ‘নাইয়্যারে আসফী (মাদ্রাজ) সালের ১২ ই অক্টোবর সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

চিত্ত হতে দূরীভূত করার চেষ্টা করলেন, দূর হল না। তখন তিনি সেই বুজুর্গ সম্বন্ধে আল্লাহ তাআলার কাছে দোয়া করলেন : "এলাহি! যদি তুমি জান যে আমি তোমার তরফ হতে তোমার প্রেরিত এবং মসিহ মাওউদ, তবে তুমি সেই ব্যক্তির পর্দা ছিন্ন কর, যাকে 'বুজুর্গ' বলে এই কাগজে প্রকাশ করা হয়েছে। কিন্তু যদি তিনি কাদিয়ানে এসে সর্বসাধারণের সম্মুখে তওবা করেন, তবে তাকে ক্ষমা করো। কারণ তুমি রহীম ও করীম পরম দয়াময়।" ক্ষমার জন্য ১৮৯৭ সালের ১ জুলাই হতে ১৮৯৮ সালের ১ জুলাই পর্যন্ত এক বছরের সময় নির্ধারণ করেন ও বর্ণিত যাবতীয় বিষয় ১৮৯৭ সালের ২৫ জুন এক ইশতেহার প্রকাশ করেন। হযরত আকদাসের এই ইশতেহার যখন এই 'বুজুর্গের' কাছে পৌঁছল, তখন তিনি অত্যন্ত ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়লেন। ইতিমধ্যে এভাবে কোন কোন লক্ষণ দেখা দিল, যার দ্বারা তার ভীষণ পর্দা ফাঁকের সম্ভাবনা তৈরি হলো। সম্যক অবস্থার প্রতি লক্ষ্য করে তিনি ক্ষমা চেয়ে পত্র লেখেন এবং এটিও লিখেন যে, কোন কোন অবস্থার কারণে আপাতত: তিনি হাজির হওয়ার বিষয়ে ক্ষমার পাত্র এবং যথাসম্ভব ১৮৯৮ সালের জুলাইর পূর্বেই তিনি হাজির হবেন।

হযরত আকদাস এই পত্রের জবাব লিখেন যে, খোদা তাআলা এই বুজুর্গের অপরাধ ক্ষমা করুন এবং তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট হোন। হুযুর তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছেন এবং ক্ষমা করছেন।[১]

আফগানিস্তানের আমীরকে তবলীগ :

এ বছর আফগানিস্তানের আমীর আবদুর রহমান খাকে তিনি তার একজন মুখলিস মুরীদের মারফত–এর নাম, আবদুর রহমান খাঁ ছিলও একটি তবলীগী পত্র প্রেরণ করেন। আফগানিস্তানে মৌলবীদের মহাপ্রতিপ্রত্তি ছিল। এই কারণে, সম্ভবত:, পত্রখানি আমীর আবদুর রহমান খাঁর কাছে পৌছেনি। এবং মৌলবীদের ফাৎওয়ার ফলে হযরত আকদাসের দূত আবদুর রহমান খাঁ 'শহীদ' হলেন। فَاِنَّا لِلّٰهِ وَ اِنَّا اِلَيْهِ رَاجِعُوْنَ۔

'মাহমূদ কী আমীন':

হযরত আকদাস কুরআন করীমের প্রেমে বিলীন ছিলেন। কুরআন করীমের শিক্ষা দান এবং এর বিস্তার সাধনে তাঁর অনন্যসাধারণ আসক্তি ছিল। এ জন্য হযরত

(১) 'ইশতেহার', ২০ শে নভেম্বর ১৮৯৭ সাল, তবলীগে রিসালত, ষষ্ঠ খণ্ড, ১৭৮-৭৯ পৃ:।

সাহেবজাদা মির্যা বশীরুদ্দীন মাহমুদ আহমদ (ইমাম, জামা'ত আহমদীয়া মাত্তানাল্লাহু বেতুলে হায়াতেহী) যখন কুরআন করীম দেখে পাঠ খতম করেন, তখন হযরত আকদাস বড়ই প্রীত হলেন। তিনি এই উপলক্ষে এক মজলিসের অনুষ্ঠান করতে চাইলেন। বাইর হতে খেদমতগারদেরও এতে যোগদানের জন্য নিমন্ত্রণ করলেন এবং অনুষ্ঠানে পাঠ করার জন্য একটি কবিতাও লেখেন। তা 'মাহমুদ কী আমীন' নামে বিদিত। তা উর্দূ 'দুররে সামীনে' সন্নিবিষ্ট আছে। দৃষ্টান্ত স্বরূপে এই কবিতা হতে চারটি 'শের' নিম্নে উদ্ধৃত করা হলো :

یا رب ہے تیرا احساں میں تیرے در پہ قرباں　　تُونے دیا ہے ایماں - تو ہر زماں نگہباں
تیرا کرم ہے ہر آں تو ہے رحیم و رحماں　　یہ روز کر مبارک سُبْحَانَ مَنْ یَّرَانِیْ
تُونے یہ دن دکھایا محمود پڑھ کے آیا　　دل دیکھ کر یہ احساں تیری ثنائیں گایا
صد شُکر ہے خُدایا صد شُکر ہے خُدایا　　یہ روز کر مبارک سُبْحَانَ مَنْ یَّرَانِیْ

অর্থাৎ, "হে রাব্ব, তোমারই এহসান। আমি তোমার দ্বারে কুরবান। তুমিই দিয়াছ ইমান। প্রতিক্ষণ তুমি নেগাহবান। প্রতিক্ষণ তোমারই কৃপা। তুমি রহীম ও রহমান সৎকাজের বহু সুফল বার বার দাতা, না চহিতেও দাতা। এই দিবসে আশীর্ব্বাদ দুও। পবিত্র, যিনি আমাকে এই দিন দেখিয়েছেন। তুমিই এই দিনের সাক্ষাৎ করিয়েছ। মাহমুদ কুরআন পাঠ করে আসছে। মন তোমার এই অনুগ্রহ দর্শনে তোমার প্রশংসা গীতি গেয়েছে। শত শোকর, ওগো খোদা! শত শোকর, ওগো খোদা! এই দিনে আশীর্বাদ দাও। পবিত্র তিনি, যিনি আমাকে এই দিন দেখিয়েছে।"

মহারাণী ভিক্টোরিয়ার ষষ্ঠিতম জুবিলী ১৮৯৭ সাল, ১৯ জুন :

১৮৯৭ সালের ১৯ জুন ইংলেন্ডে ও ভারতবর্ষে মহারাণী ভিক্টোরিয়ার ষষ্টিতম রাজ্যাভিষেক ও আনন্দোৎসব পালিত হয়। এই উপলক্ষে হযরত আকদাস 'তোহফা কয়সরিয়া' নামক একখানি কিতাব প্রণয়ন করেন। এই কিতাবে হযরত মসীহকে খোদা তাআলার একজন বান্দা এবং সত্য রসুল হওয়ার কথা প্রকাশ করা হয়। বর্তমান খ্রিষ্ট দর্শন ভ্রান্ত হওয়া এবং ইসলাম বিশুদ্ধ সঠিক ধর্ম হওয়ার কথাও প্রকাশ করা হয়। মহারাণীকে ইসলামের আহবান জ্ঞাপন করেন। যথেষ্ট পরিমাণ এই কিতাব বিনামূল্যে বিতরণ করা হয়। মহারাণীর ভারতস্থ ভাইসরয় এবং পাঞ্জাবের লেফট্যান্যান্ট গভর্ণরকেও প্রেরণ করা হয়।

মশায়েখ ও সুলাহাকে আল্লাহ জল্লা শানুহুর কসমসহ আহবান, ১৫ জুলাই ১৮৯৭

হযরত আকদাস ১৮৯৭ সালের ১৫ জুলাই মাশায়েখ, সুলাহা প্রমুখ আল্লাহ ওয়ালাদেরকে 'ইৎমামে হুজ্জৎ, তথা পূর্ণমাত্রায় প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক যুক্তি প্রদানের উদ্দেশ্যে আরো একটি প্রস্তাব দেন। তা ছিল এই :

"আমি হিন্দুস্তান ও পাঞ্জাবের তাবৎ মাশায়েখ, ফকির ও সালেহদেরকে আল্লাহ জল্লা শানুহুর কসম দিচ্ছি, যার নামের সম্মুখে গরদান নত করা প্রত্যেক ধর্ম-পরায়ণ দ্বীনদারের কর্তব্য। তাঁরা আমার সম্বন্ধে আল্লাহ তাআলার প্রতি অন্ততঃ একুশ দিন মনোসংযোগ করুন, অর্থাৎ এই প্রকার করুন যে, একুশ দিনের আগে কিছু বোধগম্য না হলে, খোদা তাআলার কাছ হতে এই তত্ত্ব ও তথ্য উদঘাটিত হওয়ার জন্য প্রার্থনা করুন যে, আমি কে? আমি মিথ্যাবাদী? না, আল্লাহ তাআলার তরফ হতে এসেছি? আমি বার বার বুজুর্গানে দ্বীনের খেদমতে আল্লাহ জল্লা শানুহুর কসম দিয়ে এই ভিক্ষা করছি যে, নিশ্চয়ই একুশ দিন পর্যন্ত যদি তৎপূর্বে জানা না যায় এই মতভেদ দূর করার জন্য দোয়া ও ধ্যান করুন। আমি সুনিশ্চিত জানি যে, খোদা তাআলার কসম শুনে প্রত্যেক পবিত্র হৃদয়, খোদা তাআলার আযমতের ভয়কারী নিশ্চয়ই মনোযোগ নিবদ্ধ করবে। অতঃপর, এই প্রকার এলহামী সাক্ষ্যাবলী একত্রিত হওয়ার পর যেদিকে সংখ্যাধিক্য হবে, তা আল্লাহ তাআলার তরফের বলে জ্ঞান করতে হবে।

"এই প্রস্তাবের দ্বারা 'ইনশাআল্লাহ' খোদার বান্দাদের বহু উপকার হবে এবং মুসলমানদের দেল সাক্ষ্যধিক্যের দ্বারা একদিকে স্বস্তি প্রাপ্ত হয়ে 'নাজাত' লাভ করবে। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ও সাল্লামের বাণী দ্বারা এইভাবে প্রতীত হয় যে, প্রথমত : মাহদী আখেরজামানকে 'কাফের' প্রতিপন্ন করা হবে। মানুষ তাঁর সাথে শত্রুতা করবে। অশ্লীল বাক্যের একশেষ ব্যবহার করবে। অবশেষে, খোদা তাআলার নেক বান্দাদেরকে তার সত্যতা সম্বন্ধে 'রোইয়া' (সত্য স্বপ্ন) ও 'এলহাম' প্রভৃতি দ্বারা সংবাদ দেয়া হবে এবং অন্যান্য আসমানী নিদর্শনও প্রকাশিত হবে। তখন ওয়াক্তের উলামা স্বেচ্ছায় বা অনিচ্ছায় তাকে গ্রহণ করবেন। সুতরাং, হে বন্ধুরা, হে বুজুর্গরা! অন্তর্যামী 'আলেমুল গায়েব', খোদার প্রতি মনোনিবেশ করুন। আপনাদেরকে আল্লাহ তাআলার কসম দেয়া হলো। আমার এই আবেদন গ্রহণ করুন। সেই 'কাদীর', 'যুল জালালের' করবেন না"।

মসজিদ মুবারকের আয়তন বৃদ্ধি :

'মসজিদ মুবারক' অত্যন্ত অল্পায়তন ছিল। এর এক পংক্তিতে কষ্টে সৃষ্টে ছয় জন দাঁড়াতে পরত। সম্পূর্ণ

(১) ইশতেহার' ১৮৯৭ সাল ১৫ জুলাই।

(২) ইশতেহার, ১৮৯৭ সাল ২৯ জুলাই।

আয়তনের মধ্যে ত্রিশ বত্রিশ জন নামাযীর অধিক সংকুলান হত না বলে কোন কোন সময় 'বয়তুল ফেকের'ও মসজিদস্বরূপে ব্যবহৃত হত। এতে মসজিদের আয়তন বৃদ্ধির খেয়াল হযরত আকদাসের হলো। হুযুর তাঁর বন্ধুদের কাছে একটি ইশতেহারের মাধ্যমে চাঁদার তাহরীক করেন। মুখলেসরা উন্মুক্ত হৃদয়ে চাদা প্রদান করেন। মসজিদের আয়তন বৃদ্ধি করা হল।

পন্ডিত লেখরাম হত্যার একজন প্রত্যক্ষদর্শির সাক্ষ

আজ, শুক্রবার, ১২/২/৬০ ইং আমাদের নামাযের পর লাহোর, বেরুন দিল্লী দরোজায় অবস্থিত আহমদীয়া মসজীদে মুহতরমী মৌলবী মুহিববুর রহমান সাহেব ইবনে হযরত মুনশি মিয়া হবিবুর রহমান সাহেব ইবনে হযরত মুনশি মিয়া হাবিবুর রহমান সাহেব (রাযি আল্লাহু আনহু) কপুরথলবী কয়েকজন বন্ধুর সম্মুখে নিম্নলিখিত বিবৃতি নিজ হাতে লিখে দিয়েছে :

"খাকসার মুহিববুর রহমান নিবেদন করছি যে, আনুমানিক ১৯০৯ সাল এই অধমকে জনৈক পণ্ডিত গোকুল চাদ হেডমাষ্টার, নডওয়াল, জেলা হুশিয়ারপুর বলেন যে, পণ্ডিত লেখরাম নিহত হওয়ার কিছুকাল আগে তিনি তার কাছে সংস্কৃত অধ্যয়ন করেন। সেই সময় একজন মুসলমান তাঁর কাছে সংস্কৃত শিক্ষার আগ্রহ প্রকাশ করে কিছুদিন অধ্যয়ন করতে থাকে। যেদিন এই ঘটনা ঘটে, সেদিন তিনি তথায় উপস্থিত ছিলেন। নিহত হওয়ার সময় ছুরিকা বিদ্ধ হওয়া মাত্র তিনি 'মা' বলে চিৎকার করেন। তাঁর মাতা দৌড়ে এসে দেখেন যে, হত্যাকারী শান্তভাবে আস্তে আস্তে লেখরামের কাছ থেকে গিয়ে সামনে একটি প্রকোষ্টে প্রবেশ করলো। লেখরামের মাতা অগ্রসর হয়ে কোষ্ঠের দরজা বন্ধ করে তালাসংযুক্ত করলেন এবং পুলিশকে বলেন যে, ঘাতক এই প্রকোষ্ঠে আছে। তখন ইংরাজ পুলিশ সুপারিনটেনডেন্ট উপস্থিত ছিলেন। কোন সিপাহী প্রকোষ্ঠের মধ্যে যাইতে প্রস্তুত হয়নি। পুলিশ সুপারিনটেনডেন্ট নিজেই এক হাতে পিস্তল এবং অপর হাতে লণ্ঠন নিয়া (কারণ প্রকোষ্ঠের ভিতর অন্ধকার ছিল) ভেতরে প্রবেশ করেন এবং লণ্ঠন দ্বারা সমগ্র প্রকোষ্ঠ ভালভাবে দেখে বলেন যে, সেখানে কেউ নাই। লেখরামের মাতা পুন:পুন: বলতে লাগলেন যে, ঘাতক এই প্রকোষ্ঠেই আছে। এতে পুলিশ সুপারিনটেনডেন্ট বলেন : 'যদি মাছি হয়ে বের হয়ে গিয়ে থাকে, তবে তা সম্ভব। নতুবা মানুষের বাইর হওয়ার কোন স্থান নাই'। এই ঘটনা পণ্ডিত গোকুল চাদ হলফ করে বর্ণনা করেছেন এবং আমিও হলফ করে বর্ণনা করছি।"

লিখক : মুহিববুর রহমান।
১২/০২/৬০
সাক্ষীঃ ডাঃ ওবায়দুল্লাহ খাঁ বাটালবী।
সাক্ষীঃ মাষ্টার মুহাম্মদ ইবরাহীম;
প্রেসিডেন্ট, দিল্লী দরোযাহল্কা।

নোট : এই ঘটনা সম্পর্কে সাধারণত : যে সকল বর্ণনা সর্বজনসমক্ষে উপস্থিত হয়েছে তৎ সম্বন্ধে মৌলবী সাহেব বলেন যে, পণ্ডিত গোকূল চাদ বলত যে ওই সকল বিবৃতি আর্যেরা তাদের উকিলদের সাহায্যে তৈরি করেছে। নচেৎ তিনি যা বর্ণনা করেছেন, তাই প্রকৃত বিষয়। 'ওয়াল্লাহু আলামু বিস্ সাওয়াব' (প্রকৃত তত্ত্ব আল্লাহ তাআলাই সর্বাপেক্ষা ভাল জানেন)।

খাকসার
আবদুল কাদের।
১২/০২/৬০ ইং

Hayat-e- Tayabah (Original in Urdu)

A Biography of Hazrat Mirza Ghulam Ahmad of Qadian [as]
Founder of Ahmadiyya Muslim Jama'at

By **Sheikh Abdul Qadir** (Saudagar Mal)
Bangla Translation Part-1
A Project of Khilafat Centenary Publications

Published by
Zillur Rahman Academy for Oriental Studies
12-D, 27/32, Pallabi, Mirpur, Dhaka-1216, Bangladesh
Printed by : **Bud-O-Leaves,** Motijheel, Dhaka

ISBN 978-984-992-005-2